ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়

ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়

রবীন্দ্র লাইব্রেরী
১৫-২, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা -১২

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
১৫।২, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রচ্ছদ :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
দি সত্যনারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
২০৯-এ, বিধান সরণী,
কলিকাতা-৬

দীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরে

বিদেশে নির্বাসনে

যিনি নিরন্তর ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভের চেষ্টায়

এবং

সর্ব-এশীয় আমেরিকা-প্রবাসী ছাত্রদের কল্যাণে

আত্মনিবেদন করে গেছেন,

আমার পরম শ্রদ্ধেয় সেই পিতৃব্য

স্বর্গত হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের

স্মরণে

এ গ্রন্থ-অর্ঘ্য

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

সবার অলক্ষ্যে

[প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব]

বিজ্ঞানের চিঠি

[অপর যুগ্ম-গ্রন্থাকার : জ্যোতিষ জোয়ারদার]

দুই ধ্রুব

[মারাঠী থেকে অনূদিত]

বিপ্লব তীর্থে

ভূমিকা

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামে 'সশস্ত্র বিপ্লব' যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে, এই সত্য কথাটি বহুদিন অহিংসবাদীরা মেনে না নিলেও আজ কেবল জনসাধারণ নয়, ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত এর কোন যথাযথ ইতিহাস লিখিত হয় নি। এ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য জানতে হলে প্রধানতঃ সরকারী কাগজপত্র ও রিপোর্ট, বিপ্লবীদের ব্যক্তিগত স্মৃতি কথা এবং বিশেষ কয়েকটি ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ—এই কয়টি উপাদানই প্রধান। বাংলাদেশের বিপ্লব সম্বন্ধে নলিনী কিশোর গুহের 'বাংলায় বিপ্লববাদ' এবং সামগ্রিকভাবে ভারতের বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে সুপ্রকাশ রায় লিখিত 'ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস'ই একমাত্র গ্রন্থ। আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায় প্রণীত "ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব" গ্রন্থখানি ভারতের বিপ্লব সম্বন্ধে দ্বিতীয় গ্রন্থ। ইতিহাসের দিক থেকে এই জন্য এর মূল্য খুব বেশী।

লেখক নিজে একজন প্রসিদ্ধ বিপ্লবী, বিপ্লবীদের সাহচর্যেই তাঁর জীবন কেটেছে। তাই সযত্নে ও আয়াস সহকারে পরিচিত অনেক বিপ্লবী বন্ধুর নিকট শোনা বিবরণ ও তাঁদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সাহায্যে, এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই বিরাট গ্রন্থখানি প্রণয়ন করে বাংলা সাহিত্যের এবং বর্তমান যুগের ভারত-ইতিহাসের একটি বড় অভাব দূর করেছেন।

এই গ্রন্থখানিতে কেবল বিপ্লবের সুপরিচিত কাহিনী নয়, বিপ্লবের নানা শাখা ও ভাবধারা, তার আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি, বহু অখ্যাত অজ্ঞাত বিপ্লবীদের জীবনী ও কর্মশক্তি, স্বদেশপ্রেমের অভূতপূর্ব নিদর্শন, সাহস, উদ্যম ও নির্ভীকতা প্রভৃতির চরম দৃষ্টান্ত এমন সহজ সুললিত ভাষায় তিনি নিজের অনুভূতি দিয়ে বিবৃত করেছেন যে, একবার পড়তে আরম্ভ করলে চিত্তাকর্ষক উপন্যাসের মত উহা শেষ পর্যন্ত না পড়ে তৃপ্তিলাভ হয় না।

তিন বছর আগে "সবার অলক্ষ্যে" এই নামে বাংলাদেশের বিপ্লবের কাহিনীর একটি অধ্যায় দুই খণ্ডে প্রকাশ করে লেখক যে খ্যাতি অর্জন

করেছেন, ভারতের বৃহৎ পটভূমিকায় সেই বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখে তিনি তার চেয়েও বেশী খ্যাতি পাবেন। সেই গ্রন্থের ভূমিকায় আমি বিপ্লব সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে যে কথাগুলি লিখেছিলাম—এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধেও তা পুরোপুরি খাটে। সুতরাং তার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই।

আগের গ্রন্থের তুলনায় বৃহত্তর পটভূমিকাই এই গ্রন্থের একমাত্র বিশেষত্ব নয়। এর মধ্যে অনেক বিচার বিশ্লেষণের পরিচয় এবং বহু নূতন অথবা অপেক্ষাকৃত অজ্ঞাত তথ্য আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আলিপুর বোমার মামলায় নরেন গোসাঁইয়ের রাজসাক্ষী হবার এবং বারীন ঘোষের স্বীকারোক্তির কারণ কি এবং দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর কে বোমা নিক্ষেপ করেছিল এই সমুদয়ের আলোচনা, রডা-অস্ত্রলুণ্ঠনের রাজনৈতিক গুরুত্ব, কয়েকজন এ-দেশীয়া ও বিদেশিনী মহীয়সী বিপ্লবিনীর বিবরণ, বৈকুণ্ঠ সুকুলের আত্মবিসর্জনের অপূর্ব কাহিনী প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের বিপ্লবীদের সম্বন্ধে মনোভাব, এবং তাঁদের উপর প্রভাব সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য এই গ্রন্থে আছে। চট্টগ্রামের মহান নায়ক সূর্যসেন ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও 'বিভি' দলের সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের কাহিনী, অবিভক্ত বাংলার মুসলমান-বিপ্লবীদের পরিচয়, বিনয় বসুর পলায়ন কাহিনী, দীনেশ গুপ্তের জীবনী, রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, শহীদদের পত্রাবলী, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের টেস্টামেণ্ট, জার্মাণীতে ও আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞাতব্য তথ্য গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। সারা ভারতের বিপ্লব-কাহিনী সুষ্ঠুরূপে লেখার এখনও ব্যবস্থা হয় নি—কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থখানি যে ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার একটি মূল্যবান উপকরণ রূপে স্বীকৃত হবে, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।

৪নং বিপিন পাল রোড,
কলিকাতা-২৬

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

গ্রন্থকারের কথা

অধুনালুপ্ত 'শিখা' সাপ্তাহিকে এই গ্রন্থের বহুলাংশ প্রকাশিত হয়েছিল। ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলোর নাম ছিল 'বিপ্লবের কিছু কাহিনী'। আলোচ্য গ্রন্থের নাম দেওয়া হল **ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব**।

১৮৯৭ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে এবং বহির্ভারতে সংঘটিত বৈপ্লবিক নানা ঘটনার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই গ্রন্থে লিখিত রইল। কিন্তু লিখিত রইল না ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত বাঙলায় অনুষ্ঠিত প্রচণ্ড বৈপ্লবিক-কর্মকাণ্ডের ইতিহাস। অবশ্য ঐ কালের বঙ্গদেশীয় বিপ্লবী-চরিত্র ও বৈপ্লবিক-সাধনার সঙ্গে কিছু পরিচয় ঘটানর উদ্দেশে লিখিত হয়েছে এই গ্রন্থের কুড়ি নং থেকে সতাশ নং অধ্যায়গুলো। বাঙলার বৈপ্লবিক-কর্মকাণ্ড (১৯৩০-'৪০) এ-গ্রন্থে না লেখার কারণ, 'সবার অলক্ষ্যে' নামক গ্রন্থের দুই খণ্ডে আমি তার ইতিহাস বিশদভাবে লিখেছি। তবে তৎকালে অনুষ্ঠিত সমগ্র গোপন কহিনী উক্ত গ্রন্থেও সম্পূর্ণ হয় নি বা হতে পারে না। সুতরাং 'ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লবে'র দ্বিতীয় খণ্ড কোন কালে প্রকাশিত হলে সে-যুগের অনুক্ত ঘটনা এবং ১৯৪৭ সাল অবধি বাঙলায় ও বহির্ভারতে 'আজাদ হিন্দ্ বাহিনী' বিচরিত সার্থক বিপ্লবের শেষ ধাপের ইতিবৃত্ত লেখার ইচ্ছা রইল। অবশ্য উহা সুদূর ভবিষ্যতের কথা।

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 'শরৎ প্রসঙ্গে' লেখাটি বেরিয়েছিল 'বাটানগর রিক্রিয়েশান্ ক্লাবে'র কর্মীদের ম্যাগাজিনে। কুড়ি, তেইশ ও চব্বিশ নং অধ্যায়গুলোর মূল রচনা এবং সাতাশ নং অধ্যায়ের 'অন্যায় যে করে' শীর্ষক অংশটুকু যথাক্রমে 'সাপ্তাহিক বসুমতী', 'মাসিক নবরূপা', 'দৈনিক যুগান্তর' এবং বিপ্লবী নিকেতন প্রকাশিত 'নেতাজি জয়ন্তী সংখ্যা' (১৯৬৭) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। ছাব্বিশ নং অধ্যায়ের প্রবন্ধটি আমি বার্ণপুর 'ভারতী ভবনে' নেতাজী-জয়ন্তী-উৎসব সভায় ১৯৬৭ সালে পাঠ করেছিলাম। তবে উক্ত প্রবন্ধের শেষাংশ পরে যুক্ত হয়েছে। এ ছাড়া আরো কয়েকটি নূতনতর অধ্যায়ও এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে যা 'শিখা' সাপ্তাহিকের প্রকাশ সহসা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে উক্ত কাগজে ছাপা হতে পারে নি। তাদের সংখ্যা অল্প নয়।

'ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব' গ্রন্থ রচনায় প্রামাণ্য পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ব্যতীত বহু বিপ্লবী, দেশপ্রেমী, সতীর্থ ও বন্ধুজনের কাছ থেকে আমি বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করেছি। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।...অকুণ্ঠচিত্তে, উদার দৃষ্টিকোণ থেকে এবং ভাবীকালের তরুণ-তরুণীদের ভারতীয়-শৌর্যকথা শোনানর চেষ্টায় সাহায্যদানের বোধে আগ্রহান্বিত হয়ে তথ্যাদি পরিবেশন করে অথবা তাঁদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেবার অনুমতি দিয়ে যাঁরা সাহায্য করেছেন —তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে সর্বশ্রী বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত (পুরুলিয়া), বাসুদেব বলবন্ত গোগ্‌টে (পুণা), বটুকনাথ আগরওয়াল (জৌনপুর), অধ্যাপক কল্যাণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (হিজলি), ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার (পাটনা) ও কে. পি. বিশ্বাস (কলিকাতা) প্রমুখ সজ্জনদের কাছে আমি ঋণবদ্ধ। আমি আরো ঋণবদ্ধ প্রবীণ বিপ্লবী-নেতা ও সাহিত্যিক শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র গুহ-রায় মহাশয়ের কাছে।...শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষের 'Roll of Honour'-এ সংগৃহীত কিছু তথ্য এই গ্রন্থের প্রথম দিকের কয়েকটি অধ্যায়ে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারায় কালীবাবুকে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানালাম।

এই গ্রন্থরচনায় পূর্বাপর সর্বাধিক উৎসাহ যাঁর কাছে পেয়েছি তাঁর নামোল্লেখ না করলে আমার পক্ষে প্রত্যবায় হবে। তিনি প্রখ্যাত বিপ্লবী-নায়ক সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ। তাঁর আশীর্বাদ শুধু অমূল্য নয়, সসমুখও।

এখানে আমি স্বীকার করব যে, 'শিখা' কর্তৃপক্ষের—বিশেষ করে স্নেহভাজন সতু সেনের সনির্বন্ধ চাপ ব্যতীত সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অত সময় নিয়ে লেখা তৈয়ের করার ইচ্ছা বা সুযোগ আমার হত না। সেজন্য তাঁদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অসামান্য।

শ্রীমান পার্থসারথি বসু এই বৃহৎ গ্রন্থের নাম-সূচী তৈয়ের করে দিয়ে আমার পরিশ্রম লাঘব করেছেন। তাঁকে ঘিরে রইল আমার অপরিমিত স্নেহ।

গ্রন্থপ্রকাশনে 'আমি সুভাষ বলছি'র গ্রন্থকার প্রীতিভাজন শ্রীশৈলেশ দে'র উদ্যোগ যথার্থই আশাতীত। তাঁরই চেষ্টায় এবং 'রবীন্দ্র লাইব্রেরী'র আগ্রহে এই গ্রন্থ বহু অর্থব্যয়ে প্রকাশিত হল। গ্রন্থের জন্য অজস্র ছবি নির্বাচনের এবং গ্রন্থ-সাজানর সর্বদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শৈলেশ দে ও রবীন্দ্র লাইব্রেরীর সত্বাধিকারী শ্রীরবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। এঁদের ধন্যবাদ জানাবার চেষ্টা আমি করব না। এঁদের শুধু জানিয়ে গেলাম নিরবচ্ছিন্ন শুভেচ্ছা। এখানে অবশ্য উল্লেখ করব যে, শহিদদের কিছু ছবি 'Who's Who of Indian Martyrs,

'মৃত্যুঞ্জয়ী', 'শহিদ স্মরণে' ও 'Roll of Honour' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে এবং 'সতীর্থ সংহতি', 'বালেশ্বর শহিদ-স্মরণ সমিতি', 'বিপ্লবী নিকেতন', 'বিপ্লবী পরিষদ' ও ভারতের বহু বিপ্লবী বন্ধুদের কাছ থেকে সংগ্রহ করার সুযোগ পেয়েছি বলে সকলের উদ্দেশেই জানালাম ধন্যবাদ।

রবীন্দ্র লাইব্রেরীর মাধ্যমে, এই গ্রন্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে, আমার বিশেষ যোগাযোগ ঘটেছে শ্রীপরিতোষ চক্রবর্তি ও শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে। তাঁদের কর্তব্যবোধ, আন্তরিক সহযোগিতা, চিত্ত-মাধুর্য এবং গ্রন্থের বিষয়বস্তুর প্রতি অফুরন্ত শ্রদ্ধা প্রতিক্ষণে আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁরা আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আমার সহৃদয় ধন্যবাদ রইল প্রচ্ছদপট-শিল্পী শ্রীশচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস এবং এই গ্রন্থপ্রকাশ-কার্যে যুক্ত প্রত্যেকটি কর্মীর উদ্দেশে।

দেশের তরুণ-তরুণী ও পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ এই গ্রন্থ-কাহিনীর মধ্যে নিজেদের জীবন-গড়ার কিছু মূলধন খুঁজে পেলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

সর্বশেষে আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তাঁকে, যাঁর কথা ইচ্ছা করেই সর্বাগ্রে উল্লেখ করা হয় নি। তিনি আমার পরমপূজনীয় আচার্য ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার। বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক তিনি। তিনি আমার গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে সম্মানিত করেছেন।

১০৪-সি কড়েয়া রোড,
কলিকাতা-১৭
॥ ১৯শে জুন ১৯৬৭ সাল

শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়

বিষয়-সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

॥ পাঁচ ॥

॥ ছয় ॥

বিষয় | পৃষ্ঠা

॥ সাত ॥

॥ আট ॥

॥ নয় ॥

॥ দশ ॥

বিষয় পৃষ্ঠা

॥ এগার ॥

॥ বার ॥

॥ তের ॥

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

॥ তেইশ ॥

॥ চব্বিশ ॥

॥ পঁচিশ ॥

॥ ছাব্বিশ ॥

॥ সাতাশ ॥

॥ আটাশ ॥

॥ পরিশিষ্ট ॥

বিষয়		পৃষ্ঠা

চন্দ্রশেখর আজাদ

ফাড়কে

শুকদেব

রাজগুরু

সোহনলাল পাঠক

রামপ্রসাদ বিসমিল

ঠাকুর রোশন সিং

বৈকুণ্ঠ শুকুল

উধম সিং

মহাদেব বিনায়ক রানাডে

আল্লুরি সীতারাম রাজু

মদনলাল ধিংড়া

দামোদর চাপেকার

বালকৃষ্ণ চাপেকার

বাসুদেব চাপেকার

অনন্তলক্ষণ কানহার

হরনাম সিং

আসফাকউল্লা

ক্ষুদিরাম

প্রফুল্ল চাকী

কানাই লাল দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

কর্তার সিং

বিষ্ণু গণেশ পিংলে

আমীরচাঁদ

অবোধবিহারী

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী
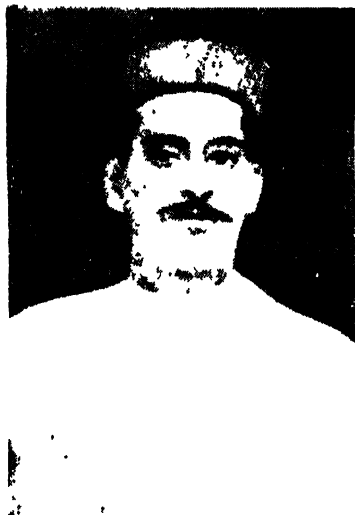
মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখার্জী
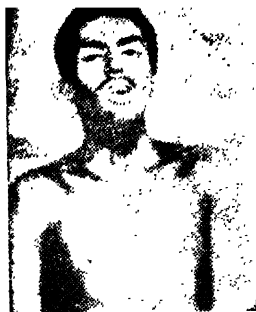
জ্যোতিশ পাল

নীরেন দাশগুপ্ত
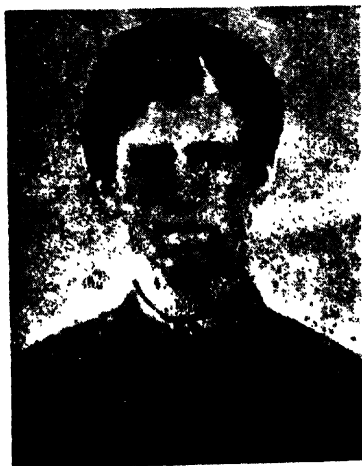
মনোরঞ্জন সেন

নলিনী বাগচী

তারিণী মজুমদার

গোপীনাথ সাহা

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সর্বাধিপতি
সূর্য সেন (মাষ্টারদা)

ল সেন

প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার

তারকেশ্বর দস্তিদার

অমরেন্দ্র নন্দী

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস

দেবপ্রসাদ গুপ্ত

রজত সেন

বি. ভি.-র সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ ও
অনুশীলন-সমিতির নেতা ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ

জালালাবাদ-যুদ্ধের
নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন ও বিধু ভট্টাচার্য

জালালাবাদ-যুদ্ধের
টেগরা ও মতি কানুনগো

জালালাবাদ-যুদ্ধের
প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত ও নির্মল লালা

জালালাবাদ-যুদ্ধের
জিতেন দাস, মধু দত্ত ও পুলিন বিকাশ ঘোষ

দীনেশ মজুমদার

অনুজা সেন

কানাই ভট্টাচার্য (পুলিশ দপ্তর থেকে সংগৃহীত)

অতুল সেন

অসিত ভট্টাচার্য্য

বিনয় বসু

বাদল গুপ্ত

দীনেশ গুপ্ত (ফাঁসির পূর্বদিনে গৃহীত ছবি)
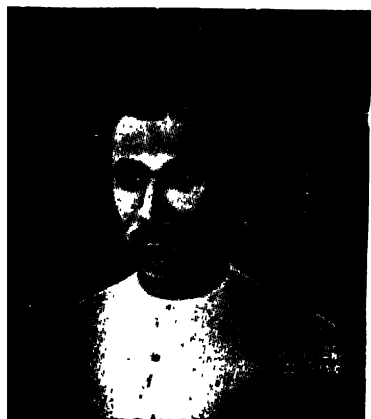
ভবানী ভট্টাচার্য

নির্মলজীবন ঘোষ

নবজীবন ঘোষ

রামকৃষ্ণ রায়

মতি মল্লিক

স্বামী বিবেকানন্দ

ঋষি অরবিন্দ

মহানায়ক রাসবিহারী বসু

দেশনায়ক বালগঙ্গাধর তিলক

কালজয়ী পুরুষ

সুভাষ

॥ এক ॥

সূচনা

আমরা তাজমহল দেখে মুগ্ধ হই। কিন্তু যে-সব শিল্পী এই অভূতপূর্ব স্মৃতিসৌধ প্রতি মুহূর্তের শ্রমে ও সাধনায় দীর্ঘকাল ধরে গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের কথা মনে করি না। সংসারের প্রতি ক্ষেত্রেই ফলভোগ আমরা পরমানন্দে করি, কিন্তু যাঁদের চেষ্টায় ফললাভ হয় তাঁদের কথা ভুলে থাকি।

স্বাধীনতা-সৌধের ছায়াতলে দাঁড়িয়েও আমরা অনেক ভাল কথা বলি। কিন্তু যাঁদের কর্ম, আত্মদান ও তপস্যার বনিয়াদের উপর এই অভ্রংলিহ কীর্তি দাঁড়িয়ে আছে তাঁদের কথা স্মরণ করি না। তাঁদের কথা আজকের মানুষের জানা নেই।

কারো কারো কাছে এও শুনি যে, ভারতবর্ষের বর্তমান স্বাধীনতা নাকি এক 'ঝুটা' বস্তু। একথা যে কত বড় মিথ্যা তা বক্তাদেরও অজানা নেই। কারণ, বাক্-স্বাধীনতা না থাকলে তাঁদের কণ্ঠ থেকে তথাকথিত বিপ্লব-বাণীর তুব্‌ড়ি ঝরে পড়া সম্ভব হত না। 'বাক্-স্বাধীনতা' পরাধীন জাতির অধিকারে কখনো থাকে না।

স্বাধীনতা যেভাবেই হোক এসেছে। তার আগমন মিথ্যে নয়। কিন্তু তাকে গড়ে তোলার দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের সঠিক পথে চলতে বাধ্য করার দায়িত্ব যাঁদের ছিল তাঁরাও অক্ষমতা দেখিয়েছেন। স্বাধীনতা লাভের পর গত বাইশ বছর ধরে সবাই মিলে নিজেদেরকে আমরা সকল ক্ষেত্রেই 'ঝুটা' বানিয়ে তুলেছি। তারই ফলস্বরূপ আজ আমাদের স্বাধীনতা আপাতদৃষ্টিতে 'ঝুটা' মনে হতে পারে। আমরা দেশকে নিয়ন্ত্রিত করে, দেশবাসীকে স্বাজাত্যবোধে প্রবুদ্ধ করে স্বাধীনতার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করতে পারিনি। আমাদের অপরাধে দেশের গতি 'মবক্রেশি'র অভিমুখে ধাওয়া করেছে।

এজন্যে দায়ী তাঁরাই, যাঁরা সংগ্রামী-ভারতকে 'বিক্রি' করে স্বার্থান্ধ হয়েছিলেন ; যাঁরা ভুলে গেছেন তাঁদেরকে, যাঁরা ছিলেন আদর্শলালনে সুন্দর, আত্মত্যাগে মহান, কর্মস্পৃহায় অপরাজেয়, নিয়মানুবর্তিতায় নিখুঁত, নিষ্ঠায় অনন্য, চরিত্রে অসাধারণ। এইসব গুণে বিভূষিত স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিকদের অপ্রতিহত রূপ আমাদের চিন্তা ও কর্মকে আজ প্রভাবিত করে না। আমরা সকলে মিলে তাই 'শিব' গড়ার ছলে 'বাঁদর' সৃষ্টি করে চলেছি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রাম দুইটি ধারায় প্রবাহিত। ১৮৫৭ সালের 'সিপাহী-বিদ্রোহের' পর থেকেই ভারতের সংগ্রামী-মনে বিদ্রোহ-স্বপ্ন বিচ্ছিন্নভাবে লালিত হয়ে এসেছে। সেই স্বপ্ন রূপ-গ্রহণ করেছে পরবর্তীকালে নানা ক্রমে, নানা পরিবেশে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটিশের কবল থেকে ভারত-মুক্তির পরিকল্পনা তরুণচিত্তকে অধিকার করে বসল। বিপ্লবের বাণী বৈপ্লবিক-সংগঠনের মাধ্যমে প্রথম প্রচারিত হল মহারাষ্ট্রে। চাপেকার-ভ্রাতৃবৃন্দ পুণা শহরে তার বাহক। ঠাকুর সাহেব মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে সে-বাণীর নায়ক। বিপ্লব-বাণীর শক্তিমান সমর্থক লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। সে-বাণী কণ্ঠে নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ বরোদা থেকে চলে এলেন কলকাতা। বাঙলা দেশে এসে তিনি দেখলেন জমি একান্ত উর্বর। শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রমেশচন্দ্র, রাজনারায়ণ, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, মধুসূদন এবং জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবার বিপ্লবের ভূমিকে বাঙলার আবহে ফল-প্রসূ করে রেখেছেন। অরবিন্দ পেলেন লোকমাতা নিবেদিতার অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও পরামর্শ। পেলেন পি. মিত্র, বিপিন পাল, ব্রহ্মানন্দ উপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিশির ঘোষ, চিত্তরঞ্জন প্রমুখের সহায়তা। পেলেন একদল প্রতিভাদীপ্ত,

বীর্যবান, আত্মবিলয়নে উন্মুখ তরুণ-বীর। গড়ে উঠল সারা বাঙলায় প্রচণ্ড বিপ্লবী-শক্তির নিয়ন্ত্রিত সংস্থা। সেটা ১৯০১-১৯০২ সাল। ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশ লর্ড কার্জনের আদেশে দ্বিখণ্ডিত। সারা বাঙলায় বঙ্গভঙ্গ রোধ করার অভিযান শুরু হল। সুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন পাল, আনন্দমোহন বসু, অশ্বিনী দত্ত, লিয়াকৎ আলি, ফজলুল হক, রসুল সাহেব, সরলা দেবী, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রমুখের নেতৃত্বে সে-অভিযান দুর্জয় হয়ে উঠল। তেমন দেশপ্রেম, তেমন সর্বস্ব-লুটিয়ে-দিয়ে কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার সমষ্টিগত প্রেরণাবোধ পূর্বে কেউ দেখেনি। রাজনীতির ক্ষেত্রে অহিংস স্বদেশী-আন্দোলনের এ অপূর্ব অভিব্যক্তি বাঙলাদেশেই প্রথম দেখা গেল।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ'-প্রতিরোধ আন্দোলন একটি প্রাদেশিক-যুদ্ধ হলেও তার 'ইমপ্যাক্ট'-এর তুলনা নেই। এই সংগ্রামের মাধ্যমে সারা বঙ্গদেশ কর্ম ও ভাব রাজ্যে সহসা যৌবনদীপ্তিতে নবজন্ম লাভ করল। গোখেলের মত রাষ্ট্রনায়ক তাই পরম শ্রদ্ধায় বলে উঠলেন: 'What Bengal thinks to-day, India will think to-morrow.'

বাঙলাদেশের আন্দোলন ব্রিটিশের দম্ভকে কিছু খর্ব করল। 'Settled Fact'-কে তার 'unsettled' করতে হল। দ্বিখণ্ডিত বাঙলা আবার জোড়া লেগে গেল। অহিংস-আন্দোলনও আপাতত থেমে গেল। কিন্তু সশস্ত্র-আন্দোলন বিপ্লবের পথে, গোপন সংগঠনের পথে ক্রমশ এগিয়ে চলল। দুঃসহ সে-যাত্রা ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত থামেনি। নেতাজির 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ'-এর পদভারে ইম্ফল রণাঙ্গনে তাঁর পদধ্বনি বিশ্ববাসী শুনেছে, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে 'আজাদ হিন্দ্ বাহিনী'র বলিষ্ঠ বাহুর প্রসাদে স্বাধীনতা-পতাকা উড্ডীন হতে তারা দেখেছে। নেতাজির নির্দেশে ব্রিটিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জেরই নব-নামকরণ ('শহিদ' ও 'স্বরাজ' দ্বীপপুঞ্জ) তাদের চোখে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।

সশস্ত্র-সংগ্রামের ধারার পাশে পাশে অহিংস-সংগ্রামের ধারা কখনো ধীরে, কখনো প্রচণ্ড আবেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ১৯০৫ সালের পর ১৯২১ সালে প্রথম মহাত্মা গান্ধী তাঁর অসহযোগ আন্দোলন অহিংসার পথে পরিচালিত করে আসমুদ্র-হিমাচল আলোড়িত করে তোলেন। তারপর তাঁর আহ্বানে বারে বারে দেশবাসী ব্রিটিশদ্রোহী-সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। তাঁরই নেতৃত্বে ভারতের জনসাধারণ সহসা 'এক জাতি', 'এক প্রাণ' হয়ে ইংরেজ-শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস ও স্পর্ধা অর্জন করে ফেলে। সে উৎসাহ, সে আবেগ জনচিত্তে কখনো দুর্জয় তরঙ্গে, কখনো স্তিমিত গতিতে প্রবাহিত হয়েছে সংগ্রামী-ভারতের আভ্যন্তরীণ ইতিহাসে। তার পরিক্রমা ১৯২১ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত। অবশ্য ১৯৪২ সালের আন্দোলনের উপর নেতাজির সশস্ত্র বৈপ্লবিক-অভিযানের নিগূঢ় প্রভাব লক্ষণীয়। সেই প্রভাবের ফলে সারা ভারতবর্ষের 'বিয়াল্লিশের 'আগস্ট বিদ্রোহ' অহিংসার মুখোশ ত্যাগ করে সহিংস রূপ ধারণ করেছিল। 'বিয়াল্লিশের আন্দোলনের সর্বভারতীয় নায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের কণ্ঠে উচ্চারিত হল : "My own interpretation of the Congress position (not Gandhiji's) is clear and definite. Congress is prepared to fight aggression violently if the country became independent. Well, we have declared ourselves independent and also named Britain as an aggressive power ; we are therefore, justified within the terms of the Bombay resolution itself, to fight Britain with arms. If this does not accord with Gandhiji's principles that is not my fault." ('History of Freedom Movement,' Vol. III, P. 669)

[কংগ্রেসের মানসিক-অবস্থান সম্পর্কে (গান্ধীজির নয়) আমার ধারণা পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট। দেশ স্বাধীন হলে আক্রমণকারীকে হিংসার আশ্রয়ে হলেও প্রতিরোধ করতে কংগ্রেস বদ্ধপরিকর।

বর্তমানে আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি, এবং ব্রিটেনকে আক্রমণ-কারী শক্তি বলে অভিহিত করেছি। সুতরাং কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে আমরা ব্রিটেনকে ন্যায়ত সশস্ত্র প্রত্যাঘাত করতে পারি। আমাদের কাজ গান্ধীজির নীতির অনুগামী না হলে দোষটা আমার নয়।]

সশস্ত্র ও নিরস্ত্র—অর্থাৎ সহিংস ও অহিংস—এই দুইটি ধারায় প্রবাহিত সংগ্রামের অবদান হল ভারতবর্ষের 'স্বাধীনতা'।

আমরা সশস্ত্র-বিপ্লবের পথে যাঁরা সংগ্রাম করে গেছেন, তাঁদের কীর্তি-কাহিনীর ইতিহাস আজকের ছেলেমেয়েদের কাছে বলে যাব। যে-স্বাধীনতা আজ তারা অনায়াসে ভোগ করছে, তা কেমন করে, কাদের শৌর্যে ও পরম ত্যাগে সম্ভব হল তা তাদের বারে বারে শোনার প্রয়োজন আছে। কারণ, তারাই তো বর্তমান স্বাধীনতার রক্ষক এবং দেশ-পরিচালনার ভাবী কর্ণধার।

বিদ্রোহী মহারাষ্ট্র

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের রূঢ় শাসন সারা ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত। আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবাসী দাস-জাতিরূপে চিহ্নিত হয়ে গেছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সাম্রাজ্যে নাকি সূর্য অস্ত যায় না। সে-সাম্রাজ্য অক্ষয়, অনড়, অন্তহীন! ভারতবাসী সে-সাম্রাজ্যেরই প্রভুভক্ত প্রজা। প্রভুর কল্যাণে তার কল্যাণ, প্রভুর সুখ ও সম্পদের জন্য তার জীবন। দাসত্বের এ বন্ধনে বুঝি কোথাও ফাঁক নেই!

কিন্তু 'শিবাজীর মহারাষ্ট্র' সেদিনও যে স্বাধীন ছিল! কাজেই, মারাঠার মন ইংরেজের অধীনতা সহজে মেনে নিতে পারছিল না। ১৮৫৭ সালের 'সিপাহী বিদ্রোহ' দমনের নৃশংসতা আপাতদৃষ্টিতে ইংরেজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করলেও ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে ভারতীয় বিদ্রোহী-চিত্ত গুমরে মরছিল। মাঝে মাঝে তার প্রকাশের

চেষ্টা দেখা গিয়েছে সশস্ত্র বা নিরস্ত্র পন্থায় পাঞ্জাবের কুকা বিক্ষোভে, মণিপুর-উত্থানে, মুণ্ডা-অভিযানে, ওহাবী-আন্দোলনে অথবা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের নানা অভ্যুত্থানে। কখনো ব্যক্তিক-বিদ্রোহও দেখা গেছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মহারাজা নন্দকুমার একা দাঁড়িয়ে ফাঁসির দণ্ড সানন্দে বরণ করেছিলেন বাঙলাদেশে। তার গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহকে অবলম্বন করে 'আনন্দ মঠ' রচিত হল। মন্ত্রদাতা ঋষির কণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চারিত করালেন 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র। বাঙলার শিক্ষিত-সম্প্রদায় ও মধ্যবিত্ত-শ্রেণী আত্মপ্রতিষ্ঠায় তৎপর হলেন। কিন্তু 'মহারাষ্ট্রে'র কথা আলাদা। সেখানকার জনসাধারণ তখনো অদূর অতীতের গৌরব স্পর্শ করে 'স্বাধীনতা'র স্বাদ স্মরণে রেখেছিল। তারা তখনো ভুলে যায়নি তাদের রাষ্ট্রনিয়ন্তা নানাসাহেব ও তান্তিয়া তোপীকে। তাছাড়া পর্বতে, গিরিকন্দরে, অরণ্যে ও বহুর প্রান্তরে সশস্ত্র মারাঠা-তরুণদের অশান্ত জীবনযাত্রায় রোমাঞ্চ লেগে থাকত। হয়তো অনেকের উপজীবিকা (খেতখামার থাকলেও) অনেকাংশে নির্ভর করত দস্যুবৃত্তির উপর। এর মূলে আর্থিক প্রয়োজন অপেক্ষা শৌর্যময় 'এ্যাডভেঞ্চারিজম্'ই ছিল অধিক। সুতরাং সামরিক-জাতি এই মারাঠা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না তার সামরিক পরাজয়।...

এমন সময় এগিয়ে এলেন একটি তরুণ। চোখে তাঁর স্বপ্ন। বাহুতে তাঁর অমিত শক্তি। দেশাত্মবোধে দৃঢ় তাঁর আদর্শনিষ্ঠা। তাঁর নাম **বাসুদেব বলবন্ত ফাড্‌কে**। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা হল শিবাজী মহারাজের সমরকৌশল অনুসরণ করে এই অশান্ত তরুণদলকে নিয়ন্ত্রিত করা। তিনি গোপনে প্রচার করে চললেন যে, তরুণদের নিয়ে এক সৈন্যবাহিনী গড়ে, সশস্ত্র-বিদ্রোহ করে, দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা বিদেশীর হাত থেকে ছিনিয়ে এনে তুলে দিতে হবে দেশবাসীর হাতে। সেই শুভলগ্নের দেরি নেই। ফাড্‌কে ক্রমশ সৈন্যদল গড়ে তুললেন

মহারাষ্ট্রের পার্বত্য-উপজাতিগুলোর জোয়ানদের নিয়ে। তাঁর বিদ্রোহীবাহিনী ইংরেজ-শাসনকে নানা ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত করে তুলল। তাঁর দল বহু রাজনীতিক-ডাকাতির জন্যে দায়ী বলে পুলিশের অভিমত। বোম্বাই প্রদেশের গভর্ণর রিচার্ড টেম্পল্‌কে হত্যার জন্য ফাড্‌কে পাঁচশত টাকা পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করে দিলেন। মোটের উপর ফাড্‌কে ও তাঁর বাহিনী ইংরেজ-রাজপুরুষদের চোখের ঘুম কেড়ে নিলেন। কিন্তু এদিকে মহারাষ্ট্রের নরনারী তাঁকে 'দ্বিতীয় শিবাজী'রূপে হৃদয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করল।...এইভাবে কেটে গেল কিছুকাল।...

১৮৭৯ সাল। সেদিন ছিল ৩রা জুলাই। দুর্দৈব নেমে এল। হায়দ্রাবাদ জিলায় 'কালাদ্‌গি'-র মন্দিরে বলবন্ত ফাড্‌কে গ্রেপ্তার হলেন। মারাঠী-শৌর্যশিখার দুর্জয় প্রকাশ আবার স্তিমিত হল।

বিচারে ফাড্‌কে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড লাভ করলেন। তরুণ বীরকে শৃঙ্খল পরিয়ে পাঠান হল ভারতের বাইরে সুদূর এডেন বন্দরের নির্জন কারাকক্ষে। সেখানে দৈহিক অত্যাচারের অন্ত ছিল না। কিন্তু মন তাঁর কখনো ভাঙেনি। পরম প্রাপ্তি যে তাঁর ঘটে গেছে! দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচন করার তপস্যায় তিনি আপন অঙ্গে শৃঙ্খল ধারণ করেছেন। এর অধিক কামনা তাঁর নেই।...

কিন্তু অসহ্য নিপীড়নে তাঁর দেহ ভেঙে গেল। চিকিৎসা বলে কোন বস্তুই তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। কাজেই, ভারতবর্ষের মুক্তিলোভী এই যোদ্ধা ১৮৮৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি আত্মীয়বন্ধু ও দেশবাসী-বিহীন অবস্থায় বহির্ভারতের অন্ধ-কারার এক নিরন্ধ্র সেল্‌-এ দেহত্যাগ করলেন।

দেশের লোক বড় একটা কিছু জানল না।

কিন্তু বিদ্রোহী-ভারত অতি সঙ্গোপনে তাঁর কর্মবাণী মর্ম দিয়ে গ্রহণ করল

॥ দুই ॥

মহারাষ্ট্র—বিপ্লবের উৎসভূমি

চাপেকারদের তিন ভাই

১৮৮৩ সালে ভারতের বাইরে বন্দীদশায় বাসুদেব বলবন্ত ফাড্‌কের মৃত্যু কিন্তু মারাঠী-চিত্তে ভয় বা অবসাদ আনেনি। দুর্দান্ত বিদেশী-শাসকের হিসেবে গরমিল থেকে গেল। বাঙলার কবি বলেছিলেন নাঃ 'বেত মেরে মা ভুলাবে, আমরা কি মায়ের তেমন ছেলে?...' গর্বোদ্ধত মারাঠার কীর্তিময় জাতীয়-জীবনে বরঞ্চ ফাড্‌কের আত্মদান আর একটি কীর্তিরূপে সংযুক্ত হয়। মহারাষ্ট্রের বিদ্রোহী-মন তাই প্রকাশের পথ না পেলেও সংগোপনে বেঁচে রইল।...

এদিকে বাঙলার রাজনীতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিগন্ত যে পুনর্জন্মের রঙে রাঙা হয়ে উঠেছিল, তার প্রেরণা এসেছিল পশ্চিম থেকে। বুদ্ধি ও হৃদয় দিয়ে কর্ম রচনা করেছিল বাঙালী পশ্চিমের যা কিছু ভাল তাকে আত্মসাৎ করে। সেই কর্মের ফলশ্রুতি ঐ পুনর্জন্মলাভের কাহিনী। কিন্তু পশ্চিমের দিকে চোখ মেলে তাকাবার অবকাশ তখনো মহারাষ্ট্রের হয়নি। মহারাষ্ট্র স্বভাবতই স্বাজাত্যবোধের গৌরবে ছিল দীপ্ত। তার দেশপ্রেম তখনো শীতল হয়ে আসেনি। দাস-মনোভাব তখনো তাকে অন্ধ করেনি। তবু পরাধীনতার নানা আঘাতে সে পথহারা।...

এমন সময় আবির্ভূত হলেন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। স্বাধীনতার আপোষহীন পূজারী, ব্রিটিশের আজন্ম শত্রু, স্বদেশ এবং স্বজাতি ও ভারতীয়-সংস্কৃতির একান্ত বন্ধু, মহা পণ্ডিত এবং অপূর্ব

শক্তিধর এই দুঃসাহসী নায়ক ছিলেন ভারতীয়-সংগ্রামের জনক, বিদ্রোহের ধারক, চিন্তাজগতের পথিকৃৎ।

তিলকের নেতৃত্বে তাই মহারাষ্ট্র প্রাণ পেল, পথ পেল, পাথেয় পেল। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে মহারাষ্ট্রের বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় দুঃসাহসী চিন্তারাজ্যে বিচরণ করার আহ্বান শুনল। 'কেশরী' পত্রিকার পাতায় পাতায় দেশের বেদনা ও দুঃখদৈন্য প্রতিকারের উদ্দেশ্যে মানুষ-তৈরির সংকল্প-বাণী আক্ষরিত হতে থাকল···তরুণ মহারাষ্ট্র এবার শুধু নিজের কথা নয়, সর্বভারতীয় বিপ্লবের কথাও ভাবতে শুরু করল।

তিলক প্রবর্তন করলেন 'সার্বজনীন গণপতি পূজা' এবং 'শিবাজী উৎসব'। এই উৎসবের মাধ্যমে গণদেবতার পূজা চলল, শৌর্যবীর্যের চর্চা চলল। শতধা-বিভক্ত, বর্ণবিভেদে ন্যুব্জ হিন্দু-সমাজে মিলনের বার্তা এসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রচারিত হত। আরো প্রচারিত হত যে, এই মিলন বিহনে ইংরেজকে শায়েস্তা করা সম্ভব নয়। শিবাজী-উৎসবের বাহ্যিক রূপ ছিল শারীর-চর্চার কার্যক্রমে ভরা। তার মর্মবাণী ছিল রাষ্ট্রগুরু শিবাজী মহারাজের শক্তি ও নেতৃত্বের মত শক্তি ও নেতৃত্ব সৃষ্টি করে দেশকে স্বাধীন করার সংকল্পে অগ্নিগর্ভ।···

ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রের আকাশে কালো মেঘ-সম্ভার ঘনীভূত হয়ে এল। তখন অবশ্য কেউ বোঝেনি যে, ঐ মেঘের অন্তরালেই লুকিয়ে আছে প্রাণ-সূর্য, যার আলোকে মহারাষ্ট্রের মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মেঘের আশ্রয়ে মৃত্যুবজ্র ঘনঘন নির্ঘোষে মারাঠার বুক কাঁপিয়ে তুলল।···হ্যাঁ, অভিশাপ-কুটিল ঐ কালোমেঘের কথাই বলব।

১৮৯৬ সালের ডিসেম্বর মাস। পুণা ও তার চতুষ্পার্শ্বে মারাত্মক প্লেগ অভিশাপের মতই দেখা দিল। মহামারীর ভীষণ প্রকোপে সারা দেশ ছারখার হতে চলল। অল্পকালের মধ্যেই বোম্বাই প্রদেশের

বহু অঞ্চল মৃত্যুর লীলাভূমিতে পরিণত হল। মানুষ দিশেহারা। সরকার কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সাধারণ চেষ্টা ব্যর্থ হলে সরকার বিশেষ ব্যবস্থার জন্য একটি আইন করলেন। জরুরী আইন। তার নাম 'Epidemic disease Act', অর্থাৎ, মহামারী দমনের আইন। এই আইনের বলে সরকারের লোক যখন-তখন যেকোন গৃহে প্রবেশ করে নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রত্যেকের দেহ পরীক্ষা করতে পারত। রোগীকে তো বটেই, সন্দেহজনক মনে হলে যেকোন ব্যক্তিকে প্লেগ-হাসপাতালে নিয়ে আসার অধিকার তাদের ছিল। 'সেগ্রিগেশান্' বা স্বাস্থ্যবানদের মধ্য থেকে রোগী বা রোগী-সন্দেহে অপরকে পৃথকীকরণ, এসব ছোঁয়াচে রোগের প্রসারে একান্ত প্রয়োজন নিশ্চয়ই। কাজেই, আইনটি খারাপ ছিল না। খারাপ ছিল সেটির প্রয়োগকর্তার দল এবং তাদের প্রয়োগবিধি। এসব কাজে সর্বপ্রথম প্রয়োজন হৃদয়, সেবানুরাগ ও বিচারবুদ্ধি। এর কোন গুণই কর্মকর্তা বা তাঁদের অনুচরদের ছিল না। গোরা-পল্টন আমদানি করে কর্তৃপক্ষ রাস্তাঘাটে এবং ঘরে ঘরে মানুষের উপর নির্দয় অত্যাচার, নিষ্ঠুর আধিপত্য এবং স্থূলতম বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের ব্যবস্থা করলেন। সারা প্লেগ-অধ্যুষিত অঞ্চলে নরক সৃষ্টি হয়ে চলল। দেহ পরীক্ষাকল্পে নির্বিচারে নারীদেহ উলঙ্গ করে সরকারের 'শ্বেতবর্ণ মিলিটারি' পশুর মত উল্লসিত। দলে দলে নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধকে যুদ্ধবন্দীর মত সান্ত্রী-পরিবেষ্টিত হয়ে যেতে হত প্লেগ-হাসপাতালে। কোন আব্রু নেই, কোন মায়া নেই, কোন মানবিক-ব্যবহারের বালাই নেই। সরকারী নিয়ামকদের অনাচারে এবং শ্বেত সামরিক-বাহিনীর বর্বর খবরদারিতে ভীত হয়ে উঠল দেশের মানুষ। তারা দেখল—প্লেগের চেয়ে অধিক শালীনতাহীন, নির্মম ও নির্লজ্জ রূপে দেখা দিয়েছে সরকারী নিয়ন্ত্রণ-বিধি, সরকারী নিয়ামকদল ও সামরিক-বাহিনী। যারা সাধারণ এবং নিরীহ, তারা সন্ত্রাসে ঘর-শহর-গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল। যারা সাহসী, তাদের রক্তে আগুন জ্বলে উঠল। এই সময় সরকারী

নিয়ামকদের কর্তা করে আনা হয়েছে মিঃ র‍্যাণ্ড্ নামক এক ইংরেজ রাজপুরুষকে। সাতারা জিলার সহকারী কালেক্টররূপে তাঁর কদর্য পরিচয় দেশবাসীর জানা ছিল। এহেন অফিসার নিয়োগ করায় দেশের বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিলক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ হল ঃ র‍্যাণ্ড্-এর নিয়োগ একটি অপকার্য। র‍্যাণ্ড্-এর মত বদ্‌মেজাজী, সন্দেহপ্রবণ, নিষ্ঠুর ও দাম্ভিক ব্যক্তি অফিসাররূপে প্লেগ-নিবারণের চেষ্টাকে আরো ঘোরালো করে তুলবেন।

নেতৃবৃন্দের আশঙ্কা সত্য হয়ে উঠতে সময় লাগল না। র‍্যাণ্ড্-সমাগমে আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ল। অত্যাচার ক্রমশ নগ্ন, বীভৎস ও ঘৃণিত রূপ ধারণ করল। 'মানুষ'কে ভুলে গিয়ে তার 'রোগ'কে তাড়া করার ব্যাধি র‍্যাণ্ড্‌কে পেয়ে বসল। মানুষের জন্যেই যে রোগ তাড়াতে হবে, তা বুঝবার মন র‍্যাণ্ড্-এর ছিল না। বিধাতার বিধান অমোঘ। তাঁর নাট্যমঞ্চে এ-যাত্রা তাই তাঁরই নির্দেশে র‍্যাণ্ড্‌কে ভিলেন্-এর পার্ট করতে হবে। র‍্যাণ্ড্ তাঁর পার্ট জমজমাটভাবে করে চললেন।...

শুধু মহারাষ্ট্রে নয়, সারা ভারতবর্ষের কাগজগুলোতে সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন চলল। বাঙলার 'অমৃতবাজার পত্রিকা' সেদিনের মহারাষ্ট্রের 'মারাঠা' ও 'কেশরী' পত্রিকার পাশে দাঁড়িয়ে যে বিচক্ষণ প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল তার তুলনা নেই। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। র‍্যাণ্ড্-জাতীয় রাজপুরুষদের রক্তে আছে সেই শয়তান, যে 'নীরো'-র সগোত্র ; জনপদের ধ্বংসস্তূপের উপর বসে বাঁশী বাজান যার স্বভাব।...

বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় আবেদন-নিবেদন কিংবা আইন বাঁচিয়ে শক্ত কথা বলার প্রশ্রয় নেই। বিপ্লবীর লক্ষ্য স্থির। তাঁর চলার পথে

সর্বস্ব দানের আহ্বান। লক্ষ্যে পৌঁছবার মাশুল দিতে গিয়ে ফাঁকি থাকলে তাঁর পথে চলা যায় না।···

মিঃ র‍্যাণ্ড্ ব্রিটিশ-শাসনের প্রতীক হয়ে পুণায় আসেন। র‍্যাণ্ড্ ভাল কি মন্দ সে বিচার বিপ্লবী করবেন না। বিপ্লবী বিচার করবেন, র‍্যাণ্ড্ ব্রিটিশ-শাসনের কোথাও 'প্রতীক' হয়ে আছেন কিনা! র‍্যাণ্ড্-এর কার্যকলাপ তো ব্রিটিশ-শাসনেরই প্রতিচ্ছবি। এ মুহূর্তে তাঁকে সরিয়ে দিলে ব্রিটিশের শাসন-কাঠামো আঘাত পাবে কিনা এবং তাঁকে বিনাশ করলে দেশবাসীর দুর্বল মন আত্মপ্রত্যয়ে বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে কিনা এইটুকু বুঝে দেখবার কথাই বিপ্লবীর। সুতরাং ব্রিটিশ-রাজকে এই দেশ থেকে তাড়াবার সংকল্প যাঁদের, তাঁরা র‍্যাণ্ড্কে 'ব্ল্যাক্ লিস্ট'-এ তুলে দিলেন।···

* * *

২২শে জুন, ১৮৯৭ সাল। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার 'জুবিলি' সারা সাম্রাজ্যে পালিত হচ্ছে। পুণা শহরেও মহা ধুম-ধড়াক্কায় 'জুবিলি দিবসে'র উৎসব আয়োজিত হল। ইংরেজ রাজপুরুষ ও ভারতীয় খয়েরখাঁদের আনন্দ প্রকাশের নানা ব্যবস্থা শহরের নানাস্থানে। 'কাউন্সিল হল্'-এ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশ। সেণ্ট মেরী গীর্জায়ও লোকের ভিড়। র‍্যাণ্ড্ সাহেব সর্বত্র টহল দিয়ে গণেশখিন্দ্-এর গভর্ণমেণ্ট-হাউসে ফিরে গেছেন। তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। ইতিমধ্যে একটি বেনামী-পত্রে তিনি জেনেছিলেন যে, 'জুবিলি দিবসে' তাঁর নাকি ঘটবে অবধারিত মৃত্যু, তাঁর দুষ্কার্যের শাস্তিরূপে। কিন্তু শক্তিগর্বে দৃপ্ত র‍্যাণ্ড্ ওসব শাসানিতে ভীত হবার পাত্র নন।

('Roll of Honour', P. 44)

এদিকে কিন্তু 'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'। সেই কাহিনী এখন উল্লেখ করব।

দামোদর হরি চাপেকার পুণার অধিবাসী। তিনি ছিলেন

দাক্ষিণাত্যের চিৎপাবন ব্রাহ্মণবংশীয় এক তরুণ। শারীর-চর্চায় তাঁর দক্ষতা যুবক ও ছাত্রদের কাছে ছিল বিস্ময়কর আকর্ষণ। নিয়মানুবর্তিতা ও সামরিক-শিক্ষার প্রতি তাঁর ছিল প্রচুর আসক্তি। সংগঠন-ক্ষমতারও ধারণা ছিল তাঁর। ছাত্র ও যুবকদের নিয়ে তিনি দল সংগঠন করতেন। সাহসী ও ডানপিটে ছেলেরা তাঁর চতুষ্পার্শ্বে ভিড় জমাত। শুধু বাহির নয়, তাঁর গৃহও ছিল তাঁর দলভুক্ত। ছোট ভাইগুলি দলের একনিষ্ঠ সভ্য। দেশবাসীর দুঃখ দূর করার ব্রত গ্রহণ কালেই তাঁর ধারণা হল যে, এই দেশকে দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত না করতে পারলে কোন কল্যাণকর কাজই সফল হবে না। সঙ্গোপনে বিদ্রোহীর চিন্তাধারায় তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। তিলকের বাণী তাঁকে উদ্বুদ্ধ করত, মারাঠার অতীত গৌরব তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য আশাবাদী করে তুলত। এমন সময় হঠাৎ পুণা শহরে ও তার চতুষ্পার্শ্বে ঘটল প্লেগের দুরন্ত আক্রমণ, তৎসঙ্গে দুষ্টগ্রহের মত র‍্যাণ্ড্-এর পুণাতেই আবির্ভাব।...অত্যাচার ও অনাচার অপ্রতিহত হয়ে উঠেছে। ...দামোদর তাঁর একান্ত বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করলেন, র‍্যাণ্ড্‌কে দণ্ড দিতে হবে। সে দণ্ডের স্বরূপ নির্ণীত হয়ে গেল।...

লক্ষ্য স্থির হওয়া মাত্র লক্ষ্যে পৌঁছবার সংগঠন-কার্য শুরু হয়ে গেছে। দল তাঁর ছিলই। কিন্তু ষড়যন্ত্র সফল করার জন্যে গড়তে হবে গোপন ইউনিট। যোগাড় করা হল অস্ত্রশস্ত্র। তৎকালে মহারাষ্ট্রে অস্ত্র সংগ্রহ করা সহজতর ছিল। কারণ, 'মার্শাল রেস্' মারাঠাদের রাজ্যে বাঙলার মত অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ তখনো তেমন করে করা হয়নি, বা করে উঠতে পারেনি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট।

ছোট ভাই বাসুদেব চাপেকারের উপর ভার দিলেন নেতা দামোদর, র‍্যাণ্ড্-সাহেবকে ভাল করে চিনে নেবার। বাসুদেবের মাস তিনেক সময় লাগল র‍্যাণ্ড্-এর চেহারা, গতিবিধি ও আচরণের খুঁটিনাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে। দামোদর ও তাঁর অন্তরঙ্গ সাথীবৃন্দ চুপ করে বসে ছিলেন না। ('Roll of Honour')

পূর্বেই বলা হয়েছে, ক্রমে 'জুবিলি দিবস' এসে গেল। নানা উৎসব-কেন্দ্র ঘুরে ঘুরে সেদিন র‍্যাণ্ড্‌কে একাধিকবার হাতের কাছে পেলেও এ্যাকশন্-এর সঠিক সুযোগ তাঁরা পেলেন না।

কাজেই অপেক্ষা করতে হবে। আরো কয়েক ঘণ্টা, নয় তো কয়েক দিন, মাস বা বছর। কিন্তু ধৈর্য হারালে চলবে না। বিপ্লবী ধৈর্যের প্রতীক। গন্তব্যে তাঁকে পৌঁছতেই হবে। কবে, কখন, তা বহু কিছুর উপর নির্ভর করে বলেই সাফল্যের লগ্ন তাঁর কাছে অ-দৃষ্ট এবং অ-জ্ঞাত।···

রাত তখন সাড়ে এগারটা। গভর্ণমেণ্ট হাউসের সিংহদ্বারের অনতিদূরে দামোদর চাপেকার লুকিয়ে আছেন। তাঁর অপর ভ্রাতা বালকৃষ্ণ চাপেকার কিছু দূরে রাস্তার পাশে আত্মগোপন করে রয়েছেন। আরো কিছু পথ এগিয়ে ঐ রাস্তারই ধারে সংগোপনে অপেক্ষমান মহাদেব বিনায়ক রাণাডে—দামোদরের দলের সক্রিয় সভ্য। তিনজনের সঙ্গেই মারণাস্ত্র। এসব অস্ত্র দামোদর ও বিনায়ক যোগাড় করেছিলেন সংগোপনে।

সরকারী-ভবন থেকে নৃত্যগীত ও খানাপিনা সাঙ্গ করে বেরিয়ে আসছেন অতিথি-অভ্যাগতের দল। অন্তরাল থেকে দামোদর পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন বাহিরাগত প্রত্যেকটি শ্বেতাঙ্গের মুখ। র‍্যাণ্ড্ যাতে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে না যান।

বেরিয়ে এলেন লেফটেন্যাণ্ট আয়ার্স্ট্ ও তাঁর পত্নী একটি ঘোড়ার গাড়িতে। তার কয়েক গজ দূরে দূরে আসছিল র‍্যাণ্ড্-এর গাড়ি। কিছুটা এগিয়ে যেতেই দামোদর একই দূরত্ব বজায় রেখে ও-গাড়ির পশ্চাতে দৌড়ে চললেন। দৌড়ে এক লম্ফে তিনি গাড়ির পেছনে উঠেই র‍্যাণ্ড্-এর প্রায় পিঠ ছুঁইয়ে পিস্তলের নিশানা করলেন। গিরি-প্রান্তর কাঁপিয়ে গর্জে উঠল বিপ্লবীর আয়ুধ। দুর্দান্ত 'স্যাটান'-এর

সকল দম্ভ ধূলিসাৎ হয়ে গেল। রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়লেন ব্রিটিশ-শক্তির প্রতীক র‍্যাণ্ড্ অসহায়ের দৈন্যে, গাড়ির মধ্যে। দশ দিন যমে-মানুষে টানা-হ্যাঁচড়া করার পর মৃত্যু তাঁর ঘটেছিল হাসপাতালে, ৩রা জুলাই (১৮৯৭) তারিখে।...

এদিকে কিছুটা এগিয়ে এসেছে র‍্যাণ্ড্-এর গাড়ি থেকে আয়ার্স্ট্-এর গাড়ি। দূরের পিস্তলের গর্জনে আয়ার্স্ট্-দম্পতি চমকে উঠলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই বিনায়ক রাণাডের পিস্তলের গুলি এসে সমান প্রচণ্ডতায় আয়ার্স্ট্‌কে বিদ্ধ করল। অয়ার্স্ট্ মুহূর্তে পত্নীর ক্রোড়ে ঢলে পড়লেন। তাঁর বক্ষ-স্পন্দন আর ফিরে এল না।...

বিপ্লবীর 'ন্যায়দণ্ড' রুদ্রের বেশে 'দীপ্তিমান' হয়ে নেমে এল। দণ্ড দান করে দণ্ডদাতারা রাতের অন্ধকারে উধাও হয়ে গেলেন! পেছনে তাঁরা কোন নিদর্শনই রেখে যাননি।...

এরপর কর্তৃপক্ষের মনোভাব ধারণা করা সহজ। প্রথমে বিস্ময়, তৎপর জিঘাংসা-চরিতার্থতার মত্ততা। প্রচণ্ড খোঁজাখুঁজির পালা। প্রলোভন ও নির্মম অত্যাচারের বিনিময়ে পুলিশ আততায়ীর সন্ধান পেতে চাইল। পেলও সে-সন্ধান। চাপেকারদের নাম রটে গিয়েছিল যেভাবেই হোক। বিস্তর তালাশির পর ৯ই আগস্ট দামোদর গ্রেপ্তার হলেন। বীরের মত তিনি জানালেন তাঁর বক্তব্য। এ বক্তব্য রেখে গেলেন তিনি শাসকগোষ্ঠী বা সাধারণ দেশবাসীর কাছে শুধু নয়, রেখে গেলেন অনাগত কালের নির্যাতিত জাতিগুলোর ভাবী বিদ্রোহীদের কাছেও। তিনি যা বলেছিলেন তার মর্ম হলঃ স্বাধীনতা আপোষ-রফা বা 'রিফর্ম'-এর পথে আসে না। আত্মসম্মান নতজানু হয়ে রক্ষা করা চলে না। তিনি একদিন সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মর্মরমূর্তি আলকাতরা লাগিয়ে কালো করে দিয়েছিলেন সত্যি—কারণ, ভারতবাসীকে বিশ্বাস করানো হয়েছে যে, যাঁর সাম্রাজ্যে সূর্য

অস্ত যায় না, তাঁর প্রতীকও নেটিভ্-এর কাছে অক্ষয় এবং দিব্য।···
তিনি বিদ্রোহী।—হ্যাঁ, সেই বিদ্রোহী দামোদর চাপেকারই সজ্ঞানে ও সানন্দে র‍্যাণ্ড্‌কে হত্যা করে মহান্ কর্তব্য পালন করেছেন। এ কার্য দেশবাসীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার দুর্বার তাগিদে।···

দামোদরকে দায়রায় সোপর্দ করা হল। সেসন জজের কোর্টে বিচার-প্রহসন চলছে। তারিখ হল, ১৮৯৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি। জজসাহেব সেদিন দামোদরের বিরুদ্ধে যা কিছু অভিযোগ ছিল তা জুরিদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। জুরিরা সলাপরামর্শ করে ফিরে এসে জানালেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে হত্যাপরাধ প্রমাণিত হয়নি, তবে তিনি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। (Roll of Honour', P. 46)

কোর্ট এক অনিয়ম করে বসল। শ্বেতাঙ্গ হত্যা করে কালো আদমী আইনের ফাঁকে রেহাই পাবে, এ অসম্ভব। হোক না সে আইন 'ব্রিটিশ-জাস্টিস্'-এর মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক নিদর্শন!···জুরিদের রায়-এর সঙ্গে একমত হওয়া বা না হওয়ার স্বাধীনতা জজের আছে বটে, কিন্তু জুরিদের কোন পক্ষে প্রভাবিত করার এক্তিয়ার কোন জজেরই নেই। কিন্তু পুণা কোর্টের জজসাহেব জুরিদের নানা প্রশ্ন করে ভয় পাইয়ে দিলেন। তাঁরা আবার গিয়ে বসলেন সলাপরামর্শ করতে। ফিরে এসে ঢোক গিলে বললেন যে, আসামী হয়তো হত্যাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

এসব 'হয়তো' দিয়ে কাজ চলে না। কাজেই, জজের ধমক পুনরায় খেতে হল জুরিদের। তৃতীয়বারে তাঁরা পরিষ্কার করে জানাতে বাধ্য হলেন যে, আসামী হত্যাপরাধে অপরাধী।···

(Roll of Honour')

বিচার-প্রহসন সমাপ্ত হল। বিদ্রোহী দামোদর চাপেকার মৃত্যুদণ্ড

লাভ করলেন। তিনি সহাস্যে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ এই মাত্র! আর কিছু নয়?···

হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ড স্বভাবতই বহাল রাখলেন।···যথানির্দিষ্ট দিনে পুণার যারবেদা জেলের ফাঁসি-মঞ্চে দামোদর চাপেকার আরোহণ করলেন জীবনের জয়গান গাইবার আনন্দে। হাতে তাঁর ভগবদ্‌গীতা।

ফাঁসি-মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছেন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর প্রশান্ত নয়নে। মৃত্যু তাঁর কাছে আসছে বন্ধুর বেশে, সহচরের আনুগত্যে।

হাসি-ঠাট্টার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহী বীর, স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম বিপ্লবী-শহীদ দামোদর হরি চাপেকার মৃত্যুকে স্পর্শ করে অমরত্ব লাভ করলেন। হাত থেকে তখনো গীতাখানি খসে পড়েনি!···

('Roll of Honour', P. 47)

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সেদিনটি ছিল ১৮৯৮ সালের ১৮ই এপ্রিল। তখন সারা বিশ্বে প্রভাত-সূর্যের আলোক ছড়িয়ে পড়েছে। জেলের ঘড়িতে বেজেছে ৬টা ৪০ মিনিট। বিপ্লবী-ভারত সেই সূর্যোদয়ে নূতন সূর্যের পদক্ষেপ লক্ষ্য করেছিল। মহারাষ্ট্রের বুকে যে কালো মেঘ ঘনীভূত হয়ে দুর্যোগ সৃষ্টি করেছিল, তার অন্তরালে লুকিয়ে-থাকা জাতির 'প্রাণ-সূর্য' আজ সহসা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। জ্যোতির্ময় সেই সূর্যকে মেঘাবরণ থেকে মুক্ত করে গেলেন চাপেকার-ভ্রাতৃবৃন্দ ও বিনায়ক রাণাডে। ফাঁসির মঞ্চে দামোদর তাঁদের অগ্রদূত। কিন্তু অনুগামীরাও পিছিয়ে নেই। তাঁদের মৃত্যু-বরণের কথা এর পরে আসছে।

ইতিহাস জানে মহারাষ্ট্রের সূর্যালোক কি করে ছড়িয়ে গেল কিছু কালের মধ্যে বাঙলায়; বাঙলা থেকে পাঞ্জাবে; পাঞ্জাব থেকে

উত্তর-ভারতে এবং সর্বশেষে বর্মার উপকূলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পথে-প্রান্তরে। ভারতবর্ষের সশস্ত্র-বিপ্লবের ধারাপথের ইতিহাস ক্রমে ক্রমে তরুণ বন্ধুদেরকে শুনিয়ে যাব।

ফাঁসির মঞ্চে বালকৃষ্ণ চাপেকার

পূর্বেই বলা হয়েছে, পুণা শহরের গণেশখিন্দ্ এলাকায় অবস্থিত ছিল গভর্ণমেন্ট-হাউস। ২২শে জুন (১৮৯৭) রাত সাড়ে এগারটার কাছাকাছি, র‍্যাণ্ড্ ও আয়ার্স্ট্ সাহেব ঘায়েল হবার সাথে সাথেই বালকৃষ্ণ চাপেকার অন্ধকারের আড়ালে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন।

তারপর চলল পুলিশের তরফ থেকে আততায়ীদের খুঁজে বার করার পালা। দামোদরের নাম বেরিয়ে গেছে। বালকৃষ্ণের নামও গোপন রইল না। গোপন রইল না এই কথা যে, দামোদরের পেছনে আছে একটি সুসংগঠিত দল। দামোদরের সঙ্গী-সাথীদের সন্ধান তাই পেতে হবে। যে বা যারা সে-সন্ধান দিতে পারবে এবং যারা দামোদর-সহ দলের প্রধানদের ধরিয়ে দেবে—সে বা তারা বিশ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার পাবে। সরকারের এই ঘোষণা সুযোগসন্ধানীদের কাছে লোভের দুয়ার খুলে দিল।

১৮৯৮ সালের খ্রীষ্টপর্বের সময় বালকৃষ্ণ হায়দ্রাবাদে ধরা পড়লেন। সরাসরি প্রমাণ ব্যতীত সেখান থেকে ব্রিটিশের সন্দেহভাজন হলেই কাউকে ব্রিটিশ রাজ্যে ধরে আনা যায় না। কারণ, হায়দ্রাবাদ প্রথম-শ্রেণীর সামন্তরাজ্য। কিন্তু ইংরেজ এদেশে ক্ষাত্রধর্ম নিয়ে আসেনি, এসেছে স্বার্থান্ধ-বণিকের প্রবৃত্তি নিয়ে। কাজেই, সকল নিয়ম-কানুনই তার দুর্জনের ছল মাত্র। প্রতিশ্রুতিমত বিশ হাজার টাকার অর্ধেক—অর্থাৎ, দশ হাজার টাকা ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট আদায় করে নিলেন বোম্বাই-সরকারের কাছ থেকে, হায়দ্রাবাদ-পুলিশের যে-সব লোক

বালকৃষ্ণকে খুঁজে বার করেছিল, তাদের জন্যে।...ইতিমধ্যে নিজামের রাজ্য থেকে বালকৃষ্ণ আনীত হয়েছেন ব্রিটিশের পুণা জেলে।

('Roll of Honour')

১৮৯৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি পুণা সিটি-ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে বালকৃষ্ণ চাপেকারের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হল। অভিযোগ—'র‍্যাণ্ড্ ও আয়ার্স্ট্-হত্যা'। হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল প্রায় পৌনে দু'বছর পূর্বে, ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন তারিখে।

কোর্টে বালকৃষ্ণ দেখলেন কনিষ্ঠ ভাই বাসুদেব হরি চাপেকারকে। বাসুদেব শুধু কি ভাই? এই কিশোর যে তাঁর মনের সাথী, কর্ম ও বিপ্লবী-জীবনের সতীর্থ! আবেগের মাধুরী বালকৃষ্ণের নয়নে। কিছু কথা হল না। পুলিশ বাধা দিল। পুলিশের নিষ্ঠুর মন, বর্বর তার রুচি।...

১৮৯৯ সালের ৮ই মার্চ জজসাহেব সরাসরি সাক্ষ্য-সাবুদের অভাব সত্ত্বেও বালকৃষ্ণ চাপেকারকে হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দান করলেন। ন্যায় ও বিচারের মাহাত্ম্য এইভাবে বজায় থাকল।

বীর বালকৃষ্ণের ওষ্ঠে মধুর হাসি, যে-হাসি অস্তগামী-সূর্য রঙিন করে ভুবনে ছড়িয়ে যান।...

ইতিমধ্যে বালকৃষ্ণের ছোট ভাই বাসুদেব এবং বিনায়ক রাণাডে ইন্‌ফর্মার দ্রেভিড্-ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করার অপরাধে গ্রেপ্তার হয়েছেন। বিচারে তাঁদেরও ফাঁসির হুকুম হয়ে গেছে। সে-সব ঘটনার উল্লেখ পরে হবে।

য়ারবেদা জেলের কন্‌ডেম্‌ড্ সেলে বালকৃষ্ণ চাপেকার মৃত্যুর জন্য সানন্দে অপেক্ষা করছেন। হাইকোর্ট তাঁর মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখেছে।...

১৮৯৯ সালের ১২ই মে। ফাঁসির জন্যে অপেক্ষিত লগ্ন সমাগত। গত চারদিনে ছোট ভাই বাসুদেব ও সতীর্থ বিনায়ক পরপর হাসিমুখে ফাঁসির দাঁড় গলায় পরেছেন ঐ জেলেরই ফাঁসি-মঞ্চে। তারও পূর্বে বড় ভাই ও নেতা দামোদর মৃত্যুবরণ করেছেন ঐ একই স্থানে। দু'টি ভাই ও একটি বন্ধু তাঁরই বাঞ্ছিত-পথের পূরযায়ী। তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করবেন আজ তিনিও পরম গৌরবে, প্রশান্ত মাধুর্যে।···

এল সেই অপেক্ষিত ক্ষণ। মরণজয়ীর পদক্ষেপে মৃত্যু-মঞ্চে আরোহণ করলেন বালকৃষ্ণ চাপেকার। মুহূর্তে তাঁর পূত দেহ ধরণীর ধূলায় লুটিয়ে পড়ল। দেশজননীর বুকে স্থান হল দেশসেবকের। মাতা-পুত্রের এই মিলনক্ষেত্র জাতির মহাতীর্থ। এর দিব্য আলোকে বন্ধুর-পথ আলোকিত।···

মহাদেব বিনায়ক রাণাডে

ও

বাসুদেব হরি চাপেকার

দামোদর, বালকৃষ্ণ এবং বাসুদেব। চাপেকার-পরিবারে তাঁরা তিনটি ভাই। বিপ্লব-সংস্থার সম্পর্কেও তাঁরা ভাই। যাঁরা বৈপ্লবিক-সংস্থার সম্পর্কে 'ভাই' হন, তাঁদের সম্পর্ক আরো গভীর। রক্ত থেকে আদর্শের টান অধিক।

দামোদর ছিলেন দলের নেতা। দামোদরের বিশ্বস্ত সাথী হলেন মহাদেব বিনায়ক রাণাডে।

মাধব বিনায়ক ছিলেন পুণায় গভর্ণমেণ্ট-ওয়ার্কশপে শিক্ষার্থী। আয়ার্স্ট্‌কে স্বহস্তে হত্যা করে বিনায়ক অনায়াসে সরে এসেছিলেন। তাঁর পাত্তা কেউ পায়নি। 'র‍্যাণ্ড্‌ ও আয়ার্স্ট্‌ হত্যা'র জন্য পুলিশ দামোদর ও বালকৃষ্ণকে চিহ্নিত করলেও কোনও তৃতীয় ব্যক্তি ঘটনা-স্থলে ঐ কাজে যে ছিলেন, তা তাদের হিসেবে আসেনি। সুতরাং

বিনায়ক নিশ্চিন্তে তাঁর স্বাভাবিক চলাফেরা বজায় রেখেছিলেন। গুপ্ত-সমিতির প্রয়োজনে গভর্ণমেণ্ট-ওয়ার্কশপ থেকে তেমন সব মাল-মশলা পাচার করা তাঁর একটি কাজ ছিল, যা দিয়ে গুলি তৈরি হতে পারে অথবা অস্ত্রশস্ত্র মেরামতের কাজ চলতে পারে।

দামোদরের ছোট ভাই বাসুদেব বয়সে কচি। কৈশোরে বিচরণ করছেন। কিন্তু কর্ম-দায়িত্বের চাপে বয়স তাঁর বুঝি অনেক বেড়ে গেছে! 'বালক-বীরের বেশে' তিনি 'বিশ্বজয়ে' সমর্থ হয়ে উঠছেন। হয়তো এঁদের মত বীরের চরিত্র অনুধাবন করেই বিশ্বকবি অবাক হয়ে বলেছিলেন ঃ

'তরুণ হাসির আড়ালে
কোন্ আগুন ঢাকা রয়—
এ কি গো বিস্ময়।'

অথবা প্রশ্ন করেছিলেন ঃ 'অস্ত্র তোমার গোপন রাখ কোন্ তূণে ?'

বাসুদেব ও বিনায়ক পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। বাসুদেবের অন্তরে অগ্নিদাহ। তাঁর দু'টি ভাই বিশ্বাসঘাতকদের অপচেষ্টায় গ্রেপ্তার হয়েছেন—বড়ভাই দামোদরের ফাঁসি হয়েছে, মেজভাই বালকৃষ্ণ ফাঁসির আসামী। এ বিশ্বাসঘাতকদের অব্যাহতি দিলে চলবে না।···
মা'র মুখের দিকে তাকান যায় না। পুত্র দামোদরের আত্ম-নিবেদনের সাথে সাথে তিনি সুদূরের মানুষ হয়ে গেছেন। চৈতন্য তাঁর অন্তর্মুখী হয়ে উঠেছে। সংসারে আছেন তিনি—কিন্তু অনাসক্ত, নিস্পৃহ, স্তব্ধ তাঁর বাইরের রূপ। দ্বিতীয় পুত্র বালকৃষ্ণের আসন্ন মৃত্যু তাঁকে আরো উদাসীন করে তুলেছে, বৈরাগীর উত্তরীয় দুল্‌ছে তাঁর মনের অঙ্গনে।··

বাসুদেবকে প্রায়ই থানায় ডেকে নেওয়া হয়। নানা প্রশ্ন করে করে পুলিশ তাঁকে বিব্রত করে। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করলেন এই 'বালক-

বীর' যে, ভাইদের হিসেবমতই প্রত্যুত্তর দিতে হবে। বালকৃষ্ণ তো শুধু 'ভাই' নন, তিনি যে বাসুদেবের বন্ধু, গুরু ও পথস্রষ্টা !···

বাসুদেবেরা বুঝেছেন যে, এই দেশের চূড়ান্ত ক্ষতি হয়েছে দল নেতা দামোদরের মৃত্যুতে। বিশ্বাসহন্তাদের অপকৌশলে গ্রেপ্তার না হলে 'নেতার' মৃত্যু হত না। শুধু দামোদর নন, বালকৃষ্ণ নন—প্রত্যেকটি বিপ্লবীকেই ধরিয়ে দেবে এই বিশ্বাসঘাতকের দল পয়সার লোভে। তাদের কাছে দেশ নেই, জনকল্যাণ নেই, আত্মসম্মানবোধ নেই। তারা স্বার্থলোভী, কুলাঙ্গার, অপাংক্তেয়—হোক না তারা স্বদেশবাসী !

বাসুদেব নিজে স্থির করলেন, যারা তাঁর দেবতুল্য দু'টি ভাইকে ধরিয়ে দিয়েছে তাদের প্রচণ্ডতম দণ্ড তিনি স্বহস্তে দেবেন। বিনায়ক এবং বিপ্লবী বন্ধুরা তাঁর সংকল্পের তারিফ করলেন।

তাঁদের প্রথম দৃষ্টি নিবদ্ধ হল রামপাণ্ডু নামক জনৈক হেড কনস্টেবল্-এর প্রতি। এই লোকটি বালকৃষ্ণের গ্রেপ্তারের মূলে অনেকখানি। বালকৃষ্ণের মামলা সম্পর্কে এর উৎসাহ নিঃসন্দেহে গর্হিত।

৩রা ফেব্রুয়ারি (১৮৯৮) রামকে সত্যি সুবিধা মত পাওয়া গেল। কিন্তু কাজ হল না।···

এদিকে বাসুদেবের তো থামা চলে না ! মৃত্যু তাঁকে ডাক দিয়েছে। তাই বহু মৃত্যু ঘটিয়ে তাঁকে 'বীরের মৃত্যু' লাভ করতে হবে। বিপ্লবের পথে পথ-চলার ঐ তো রীতি !

বাসুদেবের চিন্তা ও কর্মের সাথী, একান্ত বন্ধু এবং দাদাদের মতই আত্ম-নিবেদিত বিপ্লবী বিনায়ক রাণাডে। বিনায়ক তো সোজা পাত্র নন ! আয়ার্স্ট্‌কে স্বহস্তে মৃত্যুদান করে সফল বিপ্লবীর দক্ষতায় তিনি পালিয়ে এসেছেন। কেউ তাঁকে ধরতে পারেনি ; কেউ তাঁর খোঁজ পায়নি। পুলিশ এতাবৎ জানতেও পারেনি যে, আয়ার্স্ট্‌-হত্যার নায়ক তিনি। মন্ত্রগুপ্তি তাঁর এমনই নিখুঁত।

বিনায়ক ও বাসুদেবের ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন এক হয়ে গেছে। রক্ত

চাই! বিশ্বাসঘাতকের রক্ত চাই! সে রক্তে স্নান না করলে দেশ-জননীর পূজায় বসবার অধিকার নেই।···

৮ই ফেব্রুয়ারির (১৮৮৯) আঁধার রাত্রি। আজও বাসুদেব এবং বিনায়ক সঙ্গোপনে পথের আড়ালে লুকিয়ে আছেন। অঙ্গে লুকানো গোপন-অস্ত্র। উদ্দেশ্য কনস্টেবল্ রামকে তার বাড়ি ফেরার কালে আবার তাক্ করা। কিন্তু সময় বয়ে যায়—রাম আসে না। তখন বিনায়ক ও বাসুদেবের মাথায় আর একটি বুদ্ধি এল। রামকে ছেড়ে দ্রেভিড্-ভ্রাতৃদ্বয়কে মৃত্যুফাঁদে ফেলতে পারলেই ভাল। এই ভ্রাতৃদ্বয় নামকরা ক্রিমিন্যাল্। জেল থেকে তারা মুক্তি পেয়েছে গুপ্তচরবৃত্তি গ্রহণ করার অঙ্গীকারে। চাপেকারদের ধরিয়ে দেবার জন্য বিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণার পর অনেক সমাজদ্রোহী, জালিয়াত ও জোচ্চোর এই টাকাটা পাবার লোভে অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু পুলিশের ধারণায় জোচ্চোরদের রাজা এই দ্রেভিড্-ভ্রাতৃদ্বয়। এদের মত দক্ষ সমাজদ্রোহী জোচ্চোর পাওয়া দুষ্কর। এদের পক্ষে হয়তো অসাধ্য হবে না আততায়ীদের খোঁজ পাওয়া। আসামী যদি ঘোরে ডালে-ডালে, ওরা ঘুরবে পাতায়-পাতায়। এদের নাম হল গণেশশঙ্কর দ্রেভিড্ এবং রামচন্দ্র দ্রেভিড্। গণেশ সত্যিই দামোদর চাপেকারকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে প্রধান সহায়ক ছিল। গণেশ ও রামচন্দ্রের কাছ থেকে নিয়মিত সংবাদ পেয়েই পুলিশ দামোদরের বন্ধুদের, বিশেষ করে, বিনায়ক ও বাসুদেবের পেছনে অত করে লেগেছিল। এবং তারই ফলে বিনয়াক ও বাসুদেবকে মাঝে মাঝে থানায় যেতে হত দারোগার তলবে, নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দিতে।···

দ্রেভিড্-ভ্রাতাদের কথা মনে আসতেই বিপ্লবীর মাথায় প্ল্যান্ এসে গেল, এসে গেল তাকে কার্যকরী করার পথও।

('Roll of Honour', P. 49)

রাত দশটার কাছাকাছি। গণেশ ও রামচন্দ্র দ্রেভিড্ তাদের গৃহে তাস খেলছে। এমন সময় দু'টি অজ্ঞাত পাঞ্জাবী যুবক ঘরে ঢুকে সেলাম করে বলল যে, পুলিশ-সুপার বিশেষ জরুরি কাজের জন্য অনতিবিলম্বে তাদের সঙ্গে দেখা করতে চান।…গণেশ প্রত্যুত্তরে বলল: তোমরা বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করো। আমরা আসছি।…

গণেশ ও রামচন্দ্রের খেলা শেষ হতে দেরি হল না। দুই ভাই গৃহের বাইরে চলে এল। বাইরে এসে কয়েক পা এগুতেই গর্জে উঠল বিপ্লবীর পিস্তল। পাড়ার লোকজনের ভিড় জমে গেল। বিহ্বল-বিস্ময়ে সবার নজরে এল—শয়তানের রাজা গণেশ নিহত, তার প্রধান সাগরেদ ও ভ্রাতা রামচন্দ্র মারাত্মকভাবে আহত। রামচন্দ্রকে হাসপাতালে নেওয়া হল। পরদিন ঢলে পড়ল সে মৃত্যুর ক্রোড়ে। অমন বিপুল এক সাম্রাজ্যের মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর আশ্রয়টি মিথ্যে হয়ে গেল! দ্রেভিড্-ভ্রাতৃদ্বয়কে ব্রিটিশ-সরকার শেষটায় রক্ষা করতে পারল না!…জনসাধারণ বুঝল দামোদর চাপেকার তাহলে মিথ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মর্মরমূর্তির মুখে কালি লেপন করেননি! আজ দ্রেভিড-ভ্রাতাদের রক্ষা করতে না পারায় মহারাণী তো স্বহস্তে আপন-মুখে কালি মেখে দিলেন, সাম্রাজ্য-স্থাপকদের কণ্ঠের বিজয়মাল্য ম্লান করে দিলেন! সত্যি রাণীর ক্ষমতা সীমিত, তাঁকে ঘিরে দিব্য বিভা নেই!…দামোদরের উক্তি তাঁর অনুগামী বিপ্লবীরা হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিলেন। জোড়া 'বিভীষণ' খুন হল। সসাগরা পৃথিবীর ভাগ্যনিয়ন্তা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যশক্তির পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েও 'বিভীষণ' বাঁচতে পারল না!…

বাসুদেব ও বিনায়ক উধাও হয়ে গেছেন কাজ হাসিল করেই। কেউ কোথাও নেই। পুলিশ এসে তছ্‌নছ্ করল। তাদের যে অসামান্য ক্ষতি! 'প্রেস্টিজ্' লস্ট্! দামোদর চাপেকারের গ্রেপ্তার, দণ্ডলাভ এবং ফাঁসির মঞ্চে আরোহণের মূলে এই গণেশশঙ্কর দ্রেভিড্। তার সুদক্ষ সাহায্যেই পুলিশ যাবতীয় তথ্য যোগাড় করে দামোদরকে

শৃঙ্খল পরিয়ে মৃত্যুর দ্বারে পাঠাতে পেরেছিল। এমন যে প্রয়োজনীয় ব্যক্তি গণেশ এবং তার ভাই রামচন্দ্র—তাদের হত্যা করার এই দুঃসাহস অসহ্য। তাই পুণার পুলিশবাহিনী ক্ষিপ্ত।···

এদিকে পুলিশের সন্দেহ বাসুদেব ও দামোদরের বন্ধুদের উপর বেড়ে গেছে। ১০ই ফেব্রুয়ারি থানা থেকে ডেকে পাঠাল বিনায়ক, বাসুদেব এবং তাঁদের অপর এক বন্ধুকে 'ইন্টারোগেশান্'-এর (পুলিশী-প্রশ্ন) জন্য।···

বাসুদেব ও বিনায়ক থানায় গেলেন ঠিকই। কিন্তু লুকিয়ে সঙ্গে নিলেন মারণাস্ত্র। তাদের ইচ্ছা, হেড্ কনস্টেবল্ রামকে এবার ছাড়া নেই। কারণ—বন্দী বালকৃষ্ণকে ফাঁসি দেবার মত সাক্ষ্য-প্রমাণ এই লোকটাই সাগ্রহে যোগাড় করার চেষ্টা করছে। রামকে বাগে না পেলে, হাতের কাছে যেকোন পুলিশ-কর্তাকে পেলেই তাঁরা শাস্তি দেবেন। শহরময় নির্যাতন চালিয়ে যাবার জবাব এখুনি দেওয়া প্রয়োজন।··· ('Roll of Honour')

বিকেলের দিকে থানায় পুলিশ-কর্তারা এই তরুণদের নানা প্রশ্ন করে যাচ্ছেন। কথার উত্তর কথা দিয়ে চালাতে বাসুদেব নারাজ। উত্তর দেবে তাঁর গোপন-অস্ত্র। কিন্তু ব্যর্থ হল সব। থানার লোকেরা সেটা বুঝতে পেরে বাসুদেবকে শৃঙ্খলিত করল। আর, অনতিবিলম্বে রাণাডেও শৃঙ্খলিত হলেন।···

বাসুদেব ও বিনায়ক রাণাডে বন্দী। উভয়েই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিভীষণদ্বয়কে পরম কর্তব্যবোধে তাঁরাই হত্যা করেছেন। কারণ, তাঁদের দেশে 'বিভীষণে'র স্থান নেই।···

বাসুদেব চাপেকার ও বিনায়ক রাণাডেকে দায়রায় সোপর্দ করা হল ১৮৯৯ সালের ২রা মার্চ।

বিচারে ফাঁসির হুকুম হল। রায় শুনে কিশোরকণ্ঠে স্মিত হাসি।

এ তো হাসি নয়, এ যে উপেক্ষার 'ভীষণ' চাবুক! 'বজ্র হেন ভারী'।··

হাইকোর্টে সাত-তাড়াতাড়ি এঁদের মৃত্যুদণ্ড বহাল হল। তারিখ—৩১শে মার্চ, ১৮৯৯।

শিবাজী মহারাজের পুণা। ভারতীয় বিপ্লব-সূচনার পুণ্যভূমি পুণা। সেই পুণা শহরেরই ব্রিটিশ-কারাগার 'যারবেদা সেণ্ট্রাল জেল'। সংগ্রামী-ভারতবর্ষের প্রথম শহিদের মৃত্যুবরণ ঘটে এই জেলেরই ফাঁসি-কাষ্ঠে, মাত্র একবছর পূর্বে। আজ সেই বীর্যবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ফাঁসির অপেক্ষায় আছেন তিনটি তরুণ—নয়নে তাঁদের অগ্নিলেখা, রক্তে দেশপ্রেমের অনির্বাণ শিখা, কিন্তু ধ্যানে তাঁদের প্রশান্ত এক মহাযাত্রার স্বাক্ষর—যা অতুলনীয়, অপূর্ব।···

১৮৯৯ সালেরই ৮ই মে। প্রত্যূষে বাসুদেব হরি চাপেকারকে নিয়ে যাওয়া হল ফাঁসির মঞ্চে।

বাসুদেব ফাঁসির মঞ্চে বীরদর্পে আরোহণ করলেন। মৃত্যুকে গ্রহণ করলেন তিনি নির্দ্বিধায়, নিশ্চিন্তে।···

চাপেকার-ভাইদের বিপ্লবী সতীর্থ এবং প্রিয়তম বন্ধু মহাদেব বিনায়ক রাণাডে ১০ই মে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরলেন। মহামৃত্যুর শীতল ওষ্ঠ উষ্ণ-অনুরাগে তিনি চুম্বন করে অমৃতলোকে চলে গেলেন। তাঁর গৌরবময় আড়ম্বরহীন অভিযাত্রা পরাধীন জাতির ইতিহাসে অমূল্য সঞ্চয়।

আকাশচুম্বী-প্রাচীরঘেরা যারবেদা জেলের আকাশপথে দিব্য-লোকে যাত্রার পথ। সেই পথে বীরের মহাপ্রয়াণ সাড়ম্বরে শুরু

হয়েছে। ৮ই মে চলে গেলেন বাসুদেব। ১০ই মে গেলেন বিনায়ক। আজ ১২ই মে যাচ্ছেন বালকৃষ্ণ। লোক থেকে লোকান্তরে আজ বালকৃষ্ণের তীর্থযাত্রা।···

যথাসময়ে বীর বালকৃষ্ণ চাপেকার মৃত্যুর বেদীতে আরোহণ করে সন্নত শিরে একবার ঊর্ধ্ব গগনের পানে তাকালেন। ঐ নভোপথে তাঁর পরমপ্রিয় দু'টি ভাই এবং মহান্ সতীর্থ বিনায়ক রাণাডে দিব্যধামে যাত্রা করেছেন। তিনিও সেই পথেরই যাত্রী। তাঁর আনন্দের সীমা নেই। ··তারপর তাকালেন একবার পৃথিবীর দিকে। একান্ত পরিচিত পৃথিবী। যার মানুষদের কল্যাণ-প্রচেষ্টার বিনিময়ে আজ তাঁকে প্রিয়তম ধরণী ছেড়ে যেতে হচ্ছে।···মনে পড়ল তাঁর—তিন-তিনটি সন্তানকে দেশজননীর পায়ে অর্ঘ্য দিয়ে রিক্ত হয়েছেন যে স্নেহময়ী গর্ভধারিণী, তাঁর কথা, তাঁর দিব্য মুখখানির কথা, তাঁর অব্যক্ত কান্নাভরা বুকের কথা। বালকৃষ্ণের চোখ দু'টি ঝাপ্‌সা হতে চায়—কিন্তু মুহূর্তে গর্ভধারিণীর মূর্তি দেশজননীর লাস্যে রূপান্তরিত হয়ে ওঠে। বালকৃষ্ণ গভীর প্রণামে মাতা ও দেশমাতার সমন্বিত-রূপকে বন্দনা জানান।···

মৃত্যু অমোঘ পদক্ষেপে নেমে আসে। বালকৃষ্ণ অকুতোভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। বন্ধুর বেশে সে এসেছে। পরমের দ্বারে বালকৃষ্ণকে হাত ধরে নিয়ে যাবে।···

চাপেকার-জননী

যাঁরা বৃহৎ কাজ করেন, তাঁদের প্রত্যেকটি কাজের পেছনে একটি অসাধারণ মন থাকে। সে-মন হঠাৎ তৈরি হয় না। তার মূলে থাকে পরিপার্শ্ব, পরিবার এবং বিশেষ করে পিতামাতার অবদান। একটু খোঁজ নিলেই প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই এই সত্য স্বীকৃত হবে।

চাপেকার-ভাইদের পরিবারেও নিশ্চয় অনুকূল আবহ পরিব্যাপ্ত ছিল। নইলে একই গৃহ থেকে তিন-তিনটি 'শহিদ' বেরিয়ে আসা সম্ভব হত না। ভারতীয় বিপ্লবের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসে একই জননীর তিনটি সন্তান 'শহিদ' হয়েছেন এমন ঘটনার তুলনা পাই কেবল মেদিনীপুরের কর্মকাণ্ডে। সেখানেও ১৯৩১-'৩৪ সালের বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞে একই পরিবার থেকে তিনটি ভাই বেরিয়ে এসেছিলেন শহিদ-বাণী কণ্ঠে নিয়ে। মেদিনীপুর জেলা-শাসক 'পেডি'কে হত্যা করে যতিজীবন ঘোষ ধরা পড়লেন না বলেই ফাঁসির রজ্জু তাঁকে গলায় পরতে হয়নি। কিন্তু তাঁর দু'টি সহোদর নির্মল-জীবন ও নবজীবন ঘোষ শহিদের গৌরবে দেশবাসীর হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত।

দামোদর, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেবের জ্যোতির্ময় মূর্তি দেশের মানুষকে বিস্মিত করেছিল। কিন্তু শুধু অবাক-বিস্ময়ে বসে থাকার লোক যাঁরা নন, তাঁদের মন আবিষ্কার করতে চেয়েছিল যে, চাপেকার-ভ্রাতৃ-বৃন্দের শক্তি-উৎস কোথায় ?

এই জিজ্ঞাসুদের মধ্যে সর্বোত্তমা হলেন ভগ্নী নিবেদিতা। তাপসী নিবেদিতা—বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা, ভারতবর্ষের লোকমাতা, এই ধরণীর শ্রেষ্ঠা-নারীদের অন্যতমা নিবেদিতা। তিনি ছুটে চলে গেলেন পুণা শহরে শহিদত্রয়ের শক্তি-উৎস সন্ধানে। দেখতে হবে তাঁকে, তাঁদের গর্ভধারিণী—কে এবং কেমন ?···

চাপেকার-গৃহে লোকমাতা প্রবেশ করতেই দেখলেন এক মহিয়সী নারী পূজার আসনে উপবিষ্টা। গৃহদেবতার আরাধনায় সকল সত্তা তাঁর তন্ময়।···ক্রমে আলাপ হল দু'জনার। অনুভব করলেন নিবেদিতা যে, এই মহিলা আপন অন্তরের শক্তিতে এক অন্তহীন শান্তির রাজ্যে বাস করছেন ;—তাঁর সকল শোক, তাপ, দুঃখ, বেদনা 'নারায়ণে'র পায়ে নিবেদিত। তাঁর ভাল-মন্দ, ইহলোক-পরলোক বিশ্বনিয়ন্তার

ধ্যানে সমর্পিত। নিবেদিতা স্পর্শ করলেন এই মহিয়সী নারীর মধ্যে চাপেকার-ভাইদের শক্তি-উৎস। তিনি প্রণাম করলেন চাপেকার-জননীকে। প্রণাম করলেন শহিদত্রয়ের শক্তি-উৎসকে। লোকমাতা নিজেই প্রেরণা লাভ করলেন শহিদ-মাতার নিরাসক্ত দিব্যমূর্তির কাছে।...

ঐতিহাসিক এই অপূর্ব মিলন সম্পর্কে লিখেছেন 'রোল্ অব অনার্'-এর গ্রন্থকার : "Nivedita came away with a sense of deeper philosophy in an Indian Mother's life. The spirit of self-respect and march towards self-realisation of the Indian Nation was well on its way and Nivedita came to realise that it had proceeded far ahead of the stage of which she had any idea."

('Roll of Honour', P. 52)

[ভারতীয়-জননীর জীবনদর্শন সম্পর্কে গভীর এক অনুভূতি নিয়ে নিবেদিতা প্রত্যাগমন করলেন। তিনি বুঝলেন ভারতীয় মহাজাতির আত্মসম্মানবোধ ও আত্মোপলব্ধির পথে সফল যাত্রা শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু সে-যাত্রা যে অত দূর এগিয়ে গেছে তা এতকাল তাঁর জানা হয়নি।]

নিবেদিতার জানা সম্পূর্ণ হল। সম্পূর্ণ হল বলেই তিনি শ্রীঅরবিন্দকে অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন বৈপ্লবিক কর্মে। কিন্তু শহিদ-জননীদের জীবনদর্শন আজও আমরা বুঝেছি কি ?

॥ তিন ॥

বিপ্লবী বাঙলা

বিপ্লবের লীলাভূমি বাঙলাদেশ। বাঙলার জলবায়ু, মাটি ও আবহাওয়া চিরদিনই বিপ্লবের অনুকূলে। ধর্মে-রাষ্ট্রে, সাংস্কৃতিক-চিন্তায় ও সমাজে বাঙালী কোনদিনই অন্যায় ও স্থিতিশীলতাকে সহ্য করেনি।

হিন্দুধর্ম শৃঙ্খলের বোঝা হয়ে বাঙালীর আত্মবিকাশের পথে যখন অবরোধ সৃষ্টি করতে চাইল, তখন বৌদ্ধধর্ম এসে বাঙালীর কানে কানে মুক্তির বাণী শোনাল। বাঙালীর জীবন এই ধর্ম-বিপ্লবে সচল ও সুন্দর হয়ে গেল। সাহিত্যে, সমাজে, সাংস্কৃতিক-জগতে এবং বিশ্বচিত্ত-জয়ে বৌদ্ধ-বাঙালীর অবদান গৌরবের বস্তু। আবার বৌদ্ধধর্ম যখন মৃতের ভার হয়ে বাঙালীর জীবনকে নিস্তরঙ্গ করে দিতে চাইল, তখনই ঘটল নব-হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান। এরূপ বিবর্তনের পথে বঙ্গ-মনের সক্রিয়তা খুব বেশি।

অতঃপর এল পঞ্চদশ শতাব্দী। শ্রীচৈতন্য জন্ম নিলেন নবদ্বীপে, ১৪৮৫ সালে। ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্ম ও সমাজ-জীবনে তিনি এক মহাবিপ্লব সংঘটিত করলেন। সেই বিপ্লবে বাঙলার জমি উর্বর হল। সে-বিপ্লব বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয়-পুনর্জন্মের পথ সহজতর করে দিল। মানব-মুক্তির বাণীই শ্রীচৈতন্যের বাণী। সে-বাণীর প্রভাবে বহু উদ্বুদ্ধ হলেন, সৃষ্টিক্ষরা অপূর্ব বৈষ্ণব-সাহিত্য রচিত হল। জীবন-স্পন্দনে বাঙলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক-চিন্তা থর থর কেঁপে উঠল।...

এই বাঙলাদেশই অবশ্য ইংরেজের দাসত্ব সর্বপ্রথম স্বীকার করে নিয়েছিল। আবার এই বাঙলাদেশেরই মহারাজা নন্দকুমার সর্বপ্রথম সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন ইংরেজের নীচতা ও অন্যায়ের প্রতিবাদ

করে এবং ইংরেজের কারাগারে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে।...তাঁর মহান্ মৃত্যুর তারিখ ১৭৭৫ সালের ৫ই আগস্ট। নন্দকুমারের বিদ্রোহকে শুধুই ব্যক্তিক-ব্যাপার বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা বাঙালীকে চেনেন না ; বাঙালীজাতের সঙ্গে পরিচয় তাঁদের নেই। শ্রীচৈতন্য, রামমোহন, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ বা রবীন্দ্রনাথ তো এক-একটি ব্যক্তিবিশেষ নন —তাঁরা প্রত্যেকেই সমগ্র বাঙালীজাতির জীবন্ত প্রতিনিধি, বাঙলার নিজস্ব 'প্রোডাক্ট'। নন্দকুমারও তেমনি বিদ্রোহী-বাঙলার প্রতীক, বিপ্লবী-বাঙলার সূচনা।

ফাঁসির মঞ্চে আরূঢ় মহারাজা নন্দকুমার 'বিদ্রোহী-বাঙলার প্রতীক' কিনা অথবা 'বিপ্লবী-বাঙলার সূচনা' কিনা তৎসম্পর্কে ঐতিহাসিক মতদ্বৈধতার কথা আমরা জানি। এই সূত্রে একথা বলতে হবে যে, বিপ্লবের এই সব ঐতিহাসিক কাহিনী আমরা লিখে যাচ্ছি ঐতিহাসিকের বিচারবুদ্ধি থেকে নয়, বিপ্লবীর দৃষ্টিকোণ থেকে। ...আমরা লিখে যাচ্ছি সে-যুগে বিপ্লবীরা কোন্ তথ্য ও কোন্ ঘটনাকে অবলম্বন করে অমিত শক্তি অর্জন করতেন, দুর্গম পথে যাত্রা রচনায় নিযুক্ত হতেন, দুঃসহ বিপ্লব ঘটাতে সমর্থ হতেন—তার ইতিহাস। নন্দকুমারের ফাঁসি, মঙ্গল পাঁড়ের আত্মদান, নানাসাহেব বা ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ বা প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব-গাথা বাঙলার তরুণ-তরুণীকে দুর্জয় পথে চলার যে নিখুঁত পাথেয় দান করত তা সত্য—তা ঐতিহাসিক সত্য।

বিপ্লবীরা জানতেন যে, 'বিদ্রোহ' বিপ্লবেরই পূর্বগামী। বিদ্রোহ ব্যতীত 'বিপ্লব' আসে না, বিপ্লবের মধ্যে 'বিদ্রোহী'রই পদ-সঞ্চার। একটা জাতি সব দিক থেকে দুর্বল ও অধঃগতিত হলেই তাকে অপর কোন শক্তিশালী জাতি পদানত করতে পারে। সেই পরাধীনতার অভিশাপে উক্ত জাতির বাইরেকার রূপ প্রাণহীন হয়,

নিরাশা তাকে নির্বীর্য করে। তখন সারা দেশ জুড়ে একটি মানুষেরও উষ্ণ নিঃশ্বাস উঠে আসে না। সর্বত্র বিরাজ করে দাসত্ব-সুখে বিহ্বল একপ্রকার অসহায় জীবের অস্তিত্ব।

এই যে অন্ধকারময় নৈরাশ্যের যুগ—এই যুগে যে-মানুষ ইংরেজের অনাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানবকণ্ঠে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানালেন, তিনি নিশ্চয়ই অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র! হোক না এ-বিদ্রোহ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে উচ্চারিত, হোক না তাঁর এ-প্রতিবাদ দেশ বা জাতি-সম্পর্কিত না হয়ে স্ব-স্বার্থপ্রণোদিত! কিন্তু এই ব্যক্তি তো জাতিরই একজন! কোন ব্যক্তির অপকার্য যেমন জাতিকে স্পর্শ করে, তাঁর মহৎ কার্যও তেমনি জাতির মনকে আমূল নাড়া দেয়। তাই সে-যুগে সকল মানুষ যখন ক্লীবত্বের ক্লেদগর্ভে লুকিয়ে আছে—তখন নিজের স্বার্থকে অন্যায়ভাবে বিলুণ্ঠিত হতে দেখেই কেউ যদি সর্বস্ব পণ করে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুকে সাগ্রহে বরণ করতে পারেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

বাঙলার বিপ্লবীরা দাস্যসুখে সুখী ঐ অন্ধকারময় যুগে প্রথম 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গে'র পানে তাই পরম আশায় এবং গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে উৎসাহিত হয়েছিলেন। তাঁরা তাই সাদরে ও অগ্নি-আক্ষরিত শ্রদ্ধায় বরণ করে নিয়েছিলেন এই 'অগ্নিস্ফুলিঙ্গ'কে। মহারাজা নন্দকুমার এজন্যেই বিপ্লবীর কাছে অন্তত, দুঃসহ-বিদ্রোহের পথিকৃৎ। যে বাঙলা ইংরেজ-শাসনকে কায়েম করেছিল—সেই বাঙলারই প্রথম বিদ্রোহী-পুরুষ ইংরেজের নির্দেশ অমান্য করে, রাজার ঐশ্বর্য ও সম্মান পায়ে ঠেলে, ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করলেন—এটা তো ঐতিহাসিক সত্য! এও সত্য যে, এ-বিদ্রোহ খাঁটি 'বিদ্রোহ' বলেই ছিল ভীষণ সংক্রামক। পরাধীন জাতির কাছে তাই এ-বিদ্রোহ আশার আলোক হয়ে এসেছিল।

নন্দকুমারের ফাঁসি যদি সত্য হয়, নানাসাহেব-লক্ষ্মীবাঈদের বিদ্রোহ যদি সত্য হয়, মঙ্গল পাঁড়ের ইংরেজের বুলেট-বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ

যদি সত্য হয়—তবে তাঁদের এই বিদ্রোহ ও আত্মদান যে বিপ্লবী-বাঙলাকে কানাই-ক্ষুদিরামের যুগ থেকে বালাসোর-চট্টগ্রাম-রাইটার্স বারান্দা-যুদ্ধের যুগ পেরিয়ে নেতাজির আজাদ হিন্দ্ ফৌজের যুগ পর্যন্ত ঠেলে নিতে প্রেরণা যুগিয়েছিল তাও অম্লান সত্য।

প্রতাপাদিত্যের শৌর্যবীর্য ও ঐতিহাসিক অবদান নিয়ে অনেক মনীষী এখন অনেক তর্ক তোলেন। ইতিহাসের বিচারে কোন্‌টা সত্য বা কোন্‌টা অসত্য তা ঐতিহাসিকদের বুঝবার কথা। কিন্তু 'দিল্লীনাথ'কে যে বাঙালী প্রতাপাদিত্যের প্রতাপে একদিন হট্‌তে হয়েছিল বলে ভারতচন্দ্র অমর ছন্দে লিখে গিয়েছেন, সেই প্রতাপাদিত্যের শৌর্য-গাথা তৎকালের তরুণ-বাঙলা বিশ্বাস করেছিল। এবং তা বিশ্বাস করে বাঙালী যে কিছুমাত্র ঠকেনি সে-সত্যও ইতিহাস-সমর্থিত।...

সুতরাং বাঙলার বিপ্লবীদের দুর্জয় পথচলায় নন্দকুমারকে যদি তাঁরা 'বিদ্রোহী বাঙলার প্রতীক' অথবা 'বিপ্লবী বাঙলার সূচনা' রূপে গ্রহণ করে থাকেন এবং তাঁদের সেই পথচলা যদি সার্থক বিপ্লব-যাত্রার রূপ গ্রহণ করে থাকে—তবে ঐতিহাসিকের বিচারে নন্দকুমার প্রমুখের যে মূল্যায়নই হোক না কেন, বিপ্লবীর এবং বিপ্লববাদের ইতিহাসে তাঁদের অবদান স্বীকার না করে উপায় নেই। যে-মুহূর্তে ঐ মীরজাফর-উমিচাঁদের পঙ্কিল যুগে একটা রায়দুর্লভ বা একটা ভবানন্দ কিংবা রাজবল্লভের স্থলে সহসা আবির্ভাব ঘটে একটি 'মহারাজা নন্দকুমারে'র সে-মুহূর্তে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, এই বিদ্রোহ-স্পৃহা কি জাতির জীবনে একটা ব্যতিক্রম ?

বাঙলার বিপ্লবী তাঁদের প্রতি রক্তকণার বিপ্লব-জিজ্ঞাসা দিয়ে আপন হৃদয়গভীরে তার উত্তর পেয়েছিলেন। উত্তর পেয়েছিলেন যে, —নন্দকুমারের উষ্ণ রক্তই প্রবাহিত হচ্ছে তাঁদের শিরায়, মোহনলাল-মীরমদনের বীর্যবান বংশধরই তাঁরা। তাঁরা জেনেছিলেন—মীরজাফর-ভবানন্দশ্রেণীর লোকগুলো তাঁদের কেউ নয়, তারাই বরঞ্চ

বাঙালীর জাতীয়-জীবনে ব্যতিক্রম। তাই পলাশীর মাঠে ঘটেছিল যে পরাজয়, তার মধ্যে বাঙলাকে খুঁজতে যাননি বাঙলার বিপ্লবীরা। তাঁরা বাঙলাকে খুঁজে পেয়েছিলেন সিরাজদ্দৌলা-মোহনলাল-মীরমদনের উক্ত পরাজয়কে আমৃত্যু অস্বীকার করার অঙ্গীকারে, নন্দকুমারের বিদ্রোহ-বিভূষিত মৃত্যুবরণের নির্মল সৌন্দর্যে।

প্রতাপাদিত্য, নন্দকুমার, নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাঈ, মঙ্গল পাঁড়ে বিপ্লবীদের নমস্য। কারণ, তাঁদের বন্ধুর পথে সেদিন এসব বীর ও বীরাঙ্গনারা 'বন্ধু'র মত আলোক হস্তে এগিয়ে এসেছিলেন, বিপ্লব-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস দিয়েছিলেন।

জাতির শক্তি-সংগ্রহের এই যে ইতিহাস, এর মূল্য অন্য স্তরের। আলোচ্য গ্রন্থে বিপ্লববাদ ও বিপ্লবী-চরিত্র বুঝবার উদ্দেশ্যে জাতির শক্তি-আহরণের ইতিহাস সংগ্রহ করার চেষ্টা আমরা করেছি মাত্র, আর কিছু প্রমাণ করতে যাইনি।···

নন্দকুমারের বিদ্রোহ-স্পৃহাই ১৮৫৭ সালে ভারতবর্ষময় 'সিপাহী-বিদ্রোহ' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতি মানুষের অন্তর্দাহ সমষ্টিগত রূপ ধারণ করে মহাবিদ্রোহে পরিণত হয়। কার্য-কারণ আলাদা হলেও বিদ্রোহ-বহ্নির লক্ষ-কোটি স্ফুলিঙ্গে পারস্পারিক কোন পার্থক্য নেই।···সিপাহী-বিদ্রোহের ভাষা মঙ্গল পাঁড়ের মৃত্যুবরণে বাঙালী সহজে বুঝে নিল। বিদ্রোহী-বাঙলার মন কোনকালে ভুলতে পারল না ১৮৫৭ সালের ২৯শে মার্চ-এর কাহিনী। ভুলতে পারল না ঐ কাহিনীর নায়ক, বেঙ্গল নেটিভ্ ইন্ফ্যান্ট্রির 'চৌদ্দশ' ছেচল্লিশ' নম্বরের সৈনিক মঙ্গল পাঁড়েকে। বাঙালী দেখল বীর পাঁড়েকে ব্যারাকপুর-ছাউনীর কাছে ময়দানে কোর্ট-মার্শাল হতে। দেখল, ইংরেজের অব্যর্থ গুলি এসে বীরের অঙ্গ দিল বিদ্ধ করে। 'শহিদে'র মূর্তি নিয়ে বাঙালীর হৃদয়ে এই বীর্যবানের আসন চিরদিনের তরে স্থাপিত হয়ে গেল স্নেহে ও শ্রদ্ধায়।···

বাঙলার কবি রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কাব্যে-গানে-লেখায় শৌর্যময় এক আবহ সৃষ্টি করে বাঙলার জমিতে দুর্ধর্ষ বিপ্লবের ফসল তোলার সূচনা করে গেলেন। ১৮৭৩ সালেই হেমচন্দ্র বাজিয়ে দিলেন বিজয়-শিঙ্গা। চারণ-কবির ভূমিকায় কবির আহ্বান শুনি ঃ

"বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়॥"

আকুলকণ্ঠে বললেন জাতিকে ঃ

"জপ, তপ, আর যোগ আরাধনা,
পূজা, হোম, যাগ, প্রতিমা-অর্চনা
এ সকলে এবে কিছুই হবে না
তূণীর কৃপাণে কর্‌ রে পূজা।"

আরো স্পষ্ট বললেন ঃ

"দেব-আরাধনে ভারত-উদ্ধার
হবে না, হবে না,—খোল্‌ তরবার ;
এসব দৈত্য নহে তেমন।"—

শ্রীচৈতন্যের বাঙলায় 'রেনেসাঁস' বা 'পুনর্জন্ম' ঘটানর নায়করূপে জন্মগ্রহণ করলেন রামমোহন, ১৭৭৪ সালে। তাঁর পদভারে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা ও ভারতবর্ষ থর থর কেঁপে উঠল। রামমোহনের বাঙলায় ক্রমে আবির্ভূত হলেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র, নবীনচন্দ্র এবং আরো কত মহাজন।

সমাজে, ধর্মে, সাহিত্যে এবং রাজনীতিক-চিন্তাধারায় তাঁরা বিপ্লবের বাণী শুনিয়ে গেলেন। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির গৌরবে বঙ্কিমচন্দ্র দান করেছেন 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র। 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' মনে রেখে রচনা করেছেন তিনি 'আনন্দমঠ'। বাঙালীর বিপ্লব-প্রবণতা সাংগঠনিক খোরাক পেয়েছে আনন্দমঠের 'সন্তান'দের সংঘ-গড়ার পদ্ধতিতে। অধিকন্তু, নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচারিত হতে দেখেছে বাঙালী, দীনবন্ধু মিত্রের অমর গ্রন্থ 'নীলদর্পণে'র মাধ্যমে। আর বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বিপ্লব-দর্শনকে কর্মময় এক 'ডিনামিক্' রূপদান করে সারা ভারতবর্ষের জীবনে বিদ্যুৎগতিতে তাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। - সেখানে ধর্ম, কৃষ্টি ও রাষ্ট্র একাকার হয়ে একটি অগ্নি-ক্ষরা ও গতিমুখর জীবনবাদে পরিণত হয়েছে।...

১৮৯৫ থেকে ১৯০৮ সাল বাঙলার জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় বাঙালীর কানে পৌঁছেছে নূতনতর জীবনের আহ্বান, মর্মে লেগেছে দুর্জয় অভ্যুত্থানের দোলা। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, গিরিশচন্দ্র, রজনীকান্ত দেশের অতীত শৌর্য, ঐতিহ্য ও গর্বের কাহিনী এবং বর্তমান দুর্দশার কথা অনবদ্য ছন্দে-রসে-সুরে অজস্র ধারায় পরিবেশন করে চললেন। জাতির আত্মগরিমা ও স্বাজাত্যবোধ গভীর প্রত্যয়ে বাঙালীর শিরদাঁড়া শক্ত করে তুলল। ক্রমে বাঙলার ভূমিতে দলে দলে কবি ও লেখকের আবির্ভাব দেখা গেল। তাঁদের কবিতা, গান, নাটক ও নানা রচনা বাঙালীর নিত্যকার জীবনকে আদর্শ-চঞ্চল অনুরাগে সম্মুখের পানে টেনে নিয়ে চলল। মুকুন্দদাস প্রমুখ চারণ-কবির গানে ও যাত্রাভিনয়ে গণ-মানস উচ্ছল, উদ্বেল ও দেশপ্রেমে সুন্দর হয়ে উঠল। এছাড়া জাতীয়তাবাদী কাগজগুলো পরস্পর পরস্পরকে ছাড়িয়ে স্বজাতির সম্মান রক্ষার্থে ইংরেজের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। এই সূত্রে 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'অমৃত-বাজার', 'বেঙ্গলী' প্রভৃতি পত্রিকার অবদান অবিস্মরণীয়। কিন্তু বিপ্লবের অগ্নি-ক্ষরা ভাষা কণ্ঠে নিয়ে এগিয়ে এল 'ডন', 'নিউ

ইণ্ডিয়া', 'যুগান্তর', 'বন্দেমাতরম্', 'সন্ধ্যা', 'কর্মযোগিন্', 'নবশক্তি'। তাদের প্রচারে বাঙলার মাটিতে 'সিপাহী-বিদ্রোহে'র পরে, রঙ্গলাল-হেমচন্দ্রের কাল থেকে সূক্ষ্ম তাৎপর্যে ও অতি ধীরে বিপ্লবের যে-সূচনা জন্ম নিচ্ছিল তা স্পষ্ট সুদৃঢ় হয়ে উঠল। ১৮৯৭-'৯৯ সালের প্রসারে চাপেকার-ভ্রাতৃবৃন্দের এবং বিনায়ক রাণাডের আত্মদান বাঙলার রক্তে আগুনের স্পর্শ দিল। বরোদা থেকে বাঙলায় শ্রীঅরবিন্দের আগমনে সে-আগুন বাঙালীর সমস্ত জড়তা বিনষ্ট করে এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করল। বাঙালীর কামনা বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতি গঠনের পথে এই সময় থেকে নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়। ইতিমধ্যে পি. মিত্র ও সরলা দেবীর নেতৃত্বে কলিকাতায় 'অনুশীলন-সমিতি' নামক প্রতিষ্ঠান তরুণদের শারীর-চর্চা ও বীর-ধর্ম পালনের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। ঢাকায় ঐ অনুশীলন-সমিতিরই শাখা স্থাপিত করে এসেছেন স্বয়ং পি. মিত্র সাহেব মূল অনুশীলন-সমিতির সভাপতিরূপে। ঢাকা সমিতির সেক্রেটারী হয়েছেন পুলিনবিহারী দাস। দুর্ধর্ষ এই বিপ্লবী নায়ক ঢাকার অনুশীলন-সমিতিকে সঙ্গোপনে বিপ্লবী গুপ্তসমিতিরূপে সংগঠিত করে ফেললেন। উক্ত 'অনুশীলন-সমিতি'ই ক্রমে প্রসিদ্ধ বিপ্লবী-অনুশীলন দলরূপে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল।

এদিকে অরবিন্দের গুপ্ত বিপ্লবী-সমিতি প্রতিষ্ঠার আয়োজনও সঙ্গোপনে ১৯০১-১৯০২ সাল থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল। জাতীয়তা-বাদী অগ্রগামী নানা প্রকাশ্য-প্রতিষ্ঠান সারা বাঙলায় ক্রমশ গুপ্ত-সংস্থার নেতৃত্বে নিজেদের স্থান খুঁজে নিল। তবে ১৯০৫ সালের পূর্বে বৈপ্লবিক-সংগঠনের কাজ অতি ক্ষীণধারায় ফল্গুর মত গোপনে বাঙলার বুকে বয়ে যাচ্ছিল।...

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর। লর্ড কার্জনের কলমের খোঁচায় বাঙলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হল। পূর্ব বাঙলার রাজধানী ঢাকা, পশ্চিম বাঙলার রাজধানী কলকাতা। দুই বঙ্গের অধিকর্তা দু'জন লেফ্‌টনেণ্ট গভর্ণর। একটি পুরো 'লাট' দু'টুকরো হয়ে দু'টি ছোটলাট-এর গৌরবে দুই খণ্ডে সমাসীন।

ছোট কর্তার বড় গলা। বিশেষ করে, ঢাকায় ছোটলাট-এর দাপটে মানুষ অস্থির। ছোটলাটদের নর্তন-কুর্দন দেখবার মত। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির পুণ্যকর্মে তাঁরা তৎপর হয়ে উঠলেন। জাতীয়তাবাদী মনকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চলল। সুতরাং যে পার্টিশান্-প্রস্তাবকে 'প্রস্তাব'রূপেই ১৯০৩ সাল থেকে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান নিন্দা করে এসেছে, সে-প্রস্তাব ১৯০৫ সালে কার্যকরী হতেই বিদ্রোহ-অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ল। 'স্বদেশী আন্দোলন' দিনে দিনে ব্যাপক ও গভীর হয়ে উঠতে লাগল। সমগ্র বাঙালী জাতি যুদ্ধদানে প্রস্তুত। বিদেশী মাল বয়কট্, বিদেশী-শাসিত স্কুল-কলেজ প্রত্যাহার, বিদেশী চিন্তা বর্জন, ব্যাপক পিকেটিং ইত্যাদি প্রচণ্ড আবেগে শুরু হল। পরিবর্তে স্বদেশী জিনিস ক্রয়, স্বদেশী পণ্য উৎপাদন, স্বদেশীভাবাপন্ন হবার শিক্ষাগ্রহণের সংকল্পে বাঙালী এগিয়ে চলল। ইংরেজ ভয় পেল। এমন অগ্ন্যুৎপাত ইংরেজ আশঙ্কা করেনি। বাঙলার বুদ্ধিজীবী ও মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং ছাত্র-সমাজ যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয়-মথিত প্রতিজ্ঞা :

'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে।'
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় রে!'...

গভর্ণমেণ্ট দমন-নীতিতে বিশ্বাসী। তাদের তরফ থেকে 'এণ্টি-স্বদেশী সার্কুলার' বেরুল ছাত্রদের শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যে। তার

প্রত্যুত্তরে দেশে 'এন্টি-সার্কুলার সমিতি'ও গঠিত হয়ে গেছে। ছাত্র-ফ্রন্টে দানা বেঁধে উঠেছে স্কুল-কলেজ ছেড়ে দিয়ে 'জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে'র (Bengal National College) ছায়াতলে আসার আন্দোলন। রাজা সুবোধ মল্লিক, তারক পালিত, রাসবিহারী ঘোষ, মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, গোপালচন্দ্র রায়চৌধুরী, গোপালচন্দ্র সিংহ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রমুখ দান-বীরের বদান্যতায় এই মহাবিদ্যালয় ও জাতীয়-শিক্ষা দিনে দিনে প্রসারিত হয়ে চলল। শ্রীঅরবিন্দ নিলেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের দায়িত্ব।

ক্রমে বৃহত্তর বাঙলায় একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নিরস্ত্র-যুদ্ধের টেক্‌নিকে গড়ে উঠল। বয়কট্, পিকেটিং এবং কর্মক্ষেত্রে হাস্যমুখে ব্রিটিশের নির্যাতন উপেক্ষা করে এগিয়ে যাবার প্রোগাম বাঙালী গ্রহণ করল। এ যুদ্ধে কেউ পিছিয়ে থাকল না। দেশবরেণ্য নেতা আনন্দমোহন বসু, সুরেন ব্যানার্জি, বিপিন পাল, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, রসুল সাহেব, লিয়াকৎ হোসেন, ফজলুল হক্, সরলা দেবী, ভগ্নী নিবেদিতা, সখারাম গণেশ দেউস্কর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অশ্বিনী দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র থেকে শুরু করে শিশু-বৃদ্ধ সাধারণ নরনারী পর্যন্ত প্রত্যেক বঙ্গবাসী এই স্বদেশী-আন্দোলনকে বাঙলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি বিপুল ব্যাপকতায় জীবন্ত করে তুলেছেন। বেত মেরে, আগুনে দগ্ধ করে, কারা-গর্ভে নিক্ষেপ করে, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়ে, সংবাদপত্র দাবিয়ে, পাইকারী অর্থদণ্ডের আঘাত দিয়ে এই আন্দোলনকে ব্রিটিশ থামাতে পারল না। বাঙালীর একতাবোধ, স্বাজাত্য-গরিমা এবং স্বদেশপ্রেম সারা ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করল। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি অক্ষয় কবচ হয়ে সকলকে মনেপ্রাণে অসামান্য সামর্থ্য দান করে চলল। এই যৌবন-জলতরঙ্গ লক্ষ্য করে স্যার হেনরি কটন পর্যন্ত বললেন: "Babus from Bengal, strenuous and able, who rule and control public opinion from

Peshwar to Chittagong"—অর্থাৎ চট্টগ্রাম থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে বাঙালীরা একান্ত সামর্থ্যে বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ-আন্দোলনের স্বপক্ষে জনমতকে এনে ফেলেছেন।···

এদিকে অরবিন্দ বললেন : "Tyrants have tried but have they ever succeeded in repressing the natural love of Freedom in man? Repressed it has gorwn in strength; crushed under the heel of the tyrant, it has assumed a myriad forms."

('Roll of Honour', P. 122)

[অত্যাচারী-শাসক কোনকালে কি স্বাধীনতার প্রতি মানুষের স্বভাবজাত ভালবাসাকে শাসনের আঘাতে দমন করতে পেরেছে? অত্যাচারে এই 'ভালবাসা' শক্তিলাভ করে, শাসকের পদভারে দলিত এর রূপ সহস্রদলে বিকশিত হয়।]

অরবিন্দ তাই 'বঙ্গভঙ্গ'কে পরম আনন্দে গ্রহণ করলেন। "He (Arobindo) regarded the partition of Bengal as the greatest blessing that had ever happened in India. No other measure could have stirred national feeling so deeply or roused it so suddenly from lethergy of previous years." ('শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশী যুগ', পৃঃ ৩৬৯)

[অরবিন্দ 'বঙ্গভঙ্গ'কে ভারতবর্ষের জীবনে সর্বোত্তম আশীর্বাদ বলে মনে করেন। অন্য কোন ঘটনাই এতকালের জড়তা এত সহজে দূর করে জাতির জীবনে জাতীয়তাবোধ অমন তীব্র ও গভীর অনুরাগে জাগ্রত করতে পারত না।]

বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ-আন্দোলন তাই বাঙলার জীবনে 'সেটল্ড্ ফ্যাক্ট্'-কে 'আন্‌সেটল্‌' করা পর্যন্ত তুরন্ত বেগে বৃহৎ ও ব্যাপকভাবে

প্রসারিত হয়ে চলেছিল। কখনো একটু থামেনি। দীর্ঘ আট বছরের অবিরাম সংগ্রামে কখনো মানুষের মনে ক্লান্তি আসেনি। ১৯০৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর বাঙলাকে ভাগ করার প্রস্তাব করেন লর্ড কার্জন। ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করে দুই বাঙলাকে মুক্ত করেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং। অন্তর্বর্তী এই ৮ বছর ১০ দিন ধরে বাঙালীর অনাহত সংগ্রাম বিস্মিত-ভারতবর্ষকে আত্মপ্রত্যয় দান করে গেছে। বাঙলার এই কীর্তি ভারতেরই কীর্তি—কারণ বাঙালীর মধ্যে সর্বভারতীয়-চেতনা শুরু থেকেই ছিল অটুট।

বঙ্গভঙ্গ রদ করার পর 'বয়কট্' ও 'পিকেটিং' থেমে গেল। প্রকাশ্য আন্দোলন প্রত্যাহার করা হল। কিন্তু গোপন-পথে বৈপ্লবিক অভিযাত্রা থামল না। তার দুর্জয় গতি অরবিন্দের নেতৃত্ব থেকে ক্রমান্বয়ে যতীন মুখার্জি-রাসবিহারী-সূর্য সেন-নেতাজি প্রমুখ বহু জানা-অজানা নায়কের নেতৃত্বে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের বন্ধুর পথে পরিচালিত হয়ে ১৯৪৭ সালে এসে থেমেছিল।

এ তো অনস্বীকার্য যে, 'বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন' বৈপ্লবিক, তথা সশস্ত্র আন্দোলনের ধারাকে উত্তরোত্তব শক্তিশালী করে তুলেছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, অরবিন্দ বাঙলায় আসার পর যে বৈপ্লবিক-চেতনা 'সাংগঠনিক আকার' ধারণ করেছিল তা স্বদেশী-আন্দোলনের ধারায় অপূর্ব প্রেরণা লাভ করে চলল। তার বহিঃপ্রকাশ যুগান্তর, সন্ধ্যা, বন্দেমাতরম্, নবশক্তি, কর্মযোগিন্ প্রভৃতি বিপ্লবী-কাগজগুলোর পাতায়-পাতায় দেখে দেশবাসী অভূতপূর্ব দেশাত্মবোধে ও প্রবল কর্মানুগত্যে চঞ্চল হল। সেই চাঞ্চল্য সরকারকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিল।...

বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ', অরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' নামক প্রবন্ধ, যুগান্তর পত্রিকার কতিপয় রচনা সংগ্রহ করে প্রকাশিত 'মুক্তি কোন্

পথে' পুস্তিকা এবং 'বর্তমান রণনীতি' প্রভৃতি গ্রন্থ বাঙালীর চিন্তা ও কর্মজগতে আগুনের ছোঁয়া দিল। প্রকাশ্য পুস্তক-পুস্তিকার পাশে পাশে প্রচারিত হতে থাকল গোপন-ইস্তাহার ও গোপন-পুস্তিকা। ওসবের ভাষায় কোন সংকোচ, দ্বিধা বা আব্রু নেই। শাণিত ক্ষুরধার তার প্রকাশ। বিপ্লবের সরাসরি আবেদন সে-সব রচনায়। ভারতবাসীকে আহ্বান জানান হচ্ছে অস্ত্র-হাতে বেরিয়ে পড়ার। সঙ্ঘবদ্ধভাবে যুদ্ধ করে ইংরেজকে তার তাড়াতে হবে দেশ-মুক্তির প্রয়োজনে।...

১৯০৫ সাল থেকে বাঙলায় স্বদেশী-আন্দোলন প্রলয় নাচনে নেচে উঠেছে। 'বন্দেমাতরম্'-ধ্বনি কণ্ঠে নিয়ে যেকোন বাঙালী, যেকোন অত্যাচার বরণ করে নেয়। ইংরেজ-শাসন ক্ষিপ্ত। শিশুর কণ্ঠে ঐ ধ্বনি শুনলেও যেকোন শ্বেতাঙ্গ তার টুঁটি চেপে ধরে ব্রিটিশের ইজ্জৎ রক্ষা করে।

বাঙলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের জাতীয়তাবাদী কাগজগুলোর মুখে একটি কথা ঃ 'Discard Fear'—'ভয় ত্যাগ কর'।

'বন্দেমাতরম্' কাগজের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা উঠেছে কলকাতা চীফ-প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট-এর এজলাসে। ম্যাজিস্ট্রেটের নাম কিংস্‌ফোর্ড—জাঁদরেল শাসক।...'বন্দেমাতম্' কাগজে রাজদ্রোহী-মূলক প্রবন্ধগুলোর রচয়িতার নাম নেই। পুলিশের সন্দেহ যে, ওগুলো অরবিন্দেরই রচনা। বিপিনচন্দ্র 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদনায় সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এবং তখনো উক্ত কাগজের তিনি খ্যাতনামা লেখক। যদিও সম্পাদকরূপে বা লেখক হিসেবে তাঁরও নাম নেই। চীফ-প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে তলব করলেন সাক্ষ্য দেবার জন্যে। উদ্দেশ্য—উকিলের জেরায় প্রকাশ পাবে, এই লেখার লেখক-

রূপে এবং সম্পাদকের দায়িত্বে অরবিন্দ কতখানি জড়িত। বিপিনচন্দ্র কোর্টে এলেন, কিন্তু সাক্ষ্য দিলেন না। বললেন: "I have conscientious objection against taking part in a prosecution which I believe to be unjust and injurious to the cause of popular freedom and the interest of public. I have objection to swear in these proceedings. I refuse to answer any question in connection with case."

('শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশী যুগ', পৃঃ ৬১৫-১৬)

[এ-মামলায় কোন অংশগ্রহণে আমার সজ্ঞান আপত্তি আছে। কারণ, আমি বিশ্বাস করি যে, এ-মামলা ন্যায়বিগর্হিত এবং গণ-স্বাধীনতার স্বার্থ ও জনগণের শান্তির বিরোধী। এ-মামলায় শপথ-গ্রহণ করাতেও তাই আমার আপত্তি। সুতরাং এ-সম্পর্কে কোর্টের কোন প্রশ্নের উত্তরই আমি দেব না।]

বিপিনচন্দ্রের এই স্পর্ধায় ব্রিটিশরাজ চমকে গেল। সারা ভারতবর্ষ বিদ্রোহী এই দেশনায়কের পানে শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। গান্ধীজি যে 'অসহযোগ' ও 'নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধ' রূপ নিরস্ত্র বিদ্রোহের পথ চালু করেছিলেন, তা অন্তত ষোল-সতের বছর পূর্বে বাঙলাদেশে অরবিন্দ-বিপিনচন্দ্রই কার্যকরী করেছিলেন। ইংরেজের আদালতে দাঁড়িয়ে আদালতকে অস্বীকার করে বিপিনচন্দ্রই সর্বপ্রথম নিষ্ক্রিয়-প্রতিরোধের (Passive Resistance) দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন।

আদালত অবমাননার অপরাধে লোকনেতা বিপিনচন্দ্র পালের ছ'মাস কারাদণ্ড লাভ হল। সেদিন ছিল ২০শে আগস্ট, ১৯০৭ সাল। কোর্টের বাইরে বিপুল জনসমুদ্র। তাদের দেবতুল্য নেতা বিপিনচন্দ্রকে অভিনন্দন জানানোর আবেগে তারা দলে দলে এসেছে। সেই জনতার কণ্ঠে শুধু 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি। সে কী উচ্ছ্বাস, সে কী

আকুলতা! দেশাত্মবোধে ঝঙ্কৃত সে কী যুদ্ধ-নিনাদ! শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্টদল বেটন্-হস্তে দস্যুর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে জনতার উপর। নিরস্ত্র মানুষদের মাথা ফেটে যাচ্ছে। তাদের দোষ—তারা বন্দনা জানাচ্ছে দেশ-মাতাকে, তারা শ্রদ্ধা জানাতে এসেছে নির্যাতিত দেশ-নেতাকে।···

এ-দৃশ্য অসহ্য হয়ে উঠল একটি বালকের কাছে। বালকের বয়স হবে বছর পনের। বীরদর্পে এগিয়ে গিয়ে এক শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্টকে তার দুষ্কার্যের জন্যে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন এই উদ্ধত বীর। কিশোর সুশীল সেনের উদ্যত ঘুষি সার্জেণ্টের উদ্যত বেটন্‌কে স্তব্ধ করলেও গভর্ণমেণ্টকে স্তব্ধ করেনি। কিংস্‌ফোর্ড-এর কোর্টেই পরদিন (২৭শে আগস্ট) বিচারে সুশীলের পনেরটি বেত্রাঘাতের সাজা হল। সারা দেশ ও দেশবাসী নির্মম ও অভিনব এই বিচারে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। ছাত্রকে নিয়মানুবর্তিতা শেখাবার এই বর্বর পন্থায় ইংরেজের কাগজ 'The Nation' পর্যন্ত না লিখে পারল না: "···The flogging of an educated man for political offence is surely a novel infamy. The flogging of politicals is rare even in Russia of Czar," ('Roll of Honour', P. 157)
[রাজনৈতিক কারণে কোন শিক্ষিত ব্যক্তিকে বেত্রাঘাতে দণ্ডিত করা নিশ্চয়ই অভিনব এক কলঙ্ক। জার্-এর রাশিয়াতে পর্যন্ত রাজ-নৈতিক অপরাধে বেত্রাঘাতে দণ্ড বিরল।]

সুশীল সেন

সুশীলচন্দ্র সেন বিপ্লবীদের অগ্নিস্পর্শে দুর্জয় এক কর্মী। একের পর এক বেত্রাঘাত করে যাচ্ছে তাঁর কিশোর-অঙ্গে, বন্দী অবস্থায়, জেলের অভ্যন্তরে। কিন্তু তাতে তাঁর মুখে চাঞ্চল্য নেই, নয়নে

আতঙ্কের ছায়া পড়েনি। ধ্যানস্থ অপরূপ তাঁর রূপ। মাতৃমন্ত্রের সাধকের কাছে মাতৃহন্তারক দস্যুর গর্জন নিরর্থক।

বেত খেয়ে বেরিয়ে এলেন সুশীল। জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সুশীল। তাই মহাবিদ্যালয় বন্ধ রইল সেদিন মাতৃপূজারীর সম্মানার্থে।

২৮শে আগস্ট কলেজ স্কোয়ারে বিরাট সভা। বীর বালককে দেশবাসী বরণ করে নেবে। দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি একটি স্বর্ণপদক পাঠিয়ে দিলেন উক্ত সভার সভাপতির কাছে বীর বালককে উপহার দেবার জন্যে। জনতা শোভাযাত্রা করে নিয়ে গেল সুশীলকে সভাস্থলে। কলকাতার রাস্তাঘাট ঝঙ্কৃত হল একটি গানে ঃ

"যায় যাবে জীবন চলে
জগৎ মাঝে তোমার কাজে 'বন্দেমাতরম্' বলে ;
বেত মেরে কি মা ভোলাবি,
আমরা কি সেই মায়ের ছেলে ?"

বেত মেরে 'মা' ভোলাতে পারেনি কাউকেই—না সুশীলকে, না সংগ্রামী-ভারতকে।

ইতিমধ্যে সুশীল চলে গেছেন তাঁর গ্রামে। সীলেট জিলায় 'বানিয়াচঙ' হল তাঁর গ্রাম। হঠাৎ একদিন পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করল। তারিখটি ছিল ১৯০৮ সালের ১৫ই মে। তাঁকে কলকাতায় আনা হল। তিনি অভিযুক্ত হলেন 'আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা'য়। নিম্ন আদালতে সাত বছরের সাজা হলেও হাইকোর্টে প্রমাণাভাবে তাঁর মুক্তিলাভ ঘটে।

১৯১৫ সালে সুশীল সেনকে তাঁর পরিপূর্ণ যৌবনে পুনরায় দেখা যায় অপর একটি বৈপ্লবিক কাণ্ডে জড়িত হতে। কয়েকটি সতীর্থ মিলে তাঁরা নদীয়া জিলার 'প্রাগপুরে' একটি অর্থলুটের পরিকল্পনা নিয়ে যান। ৩০শে এপ্রিল এবং ২রা মে সাফল্যের সঙ্গে তাঁরা

একাধিক ডাকাতি করেন। তারপর এক সময় গ্রামের লোক ও পুলিশের লোকের তাড়া খেয়ে জলপথে পালাবার কালে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। নিজেদের গুলিতেই বিপ্লবীদের একজন আহত হন। রক্তে স্নান করে উঠলেন আহত যুবক। অতি ত্বরায় আহত যুবককে নৌকায় তুলে নিয়ে বিপ্লবীরা প্রাণপণে দাঁড় টেনে পালিয়ে যেতে লাগলেন। এই আহত যুবকই সুশীলচন্দ্র সেন। সুশীল ক্ষীণ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বন্ধুদের বলেছেন: "আমার মৃত্যু এসে গেছে। মৃত্যু আমাকে স্পর্শ করা মাত্র তোমরা দেহ থেকে আমার মাথাটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। মাথা কাদামাটির মধ্যে লুকিয়ে রেখো; দেহটা ভাসিয়ে দিয়ো জলে। নইলে মৃতের বোঝা নিয়ে সবাই ধরা পড়ে যাবে। বিপ্লবের কাজ ব্যাহত হবে।"

মুহূর্ত পরে সুশীল ঢলে পড়লেন মৃত্যুর ক্রোড়ে। তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে তাঁর মাথা দেহ থেকে কেটে ফেলা হল। দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হল স্রোতের জলে। মাথা পুঁতে রাখা হল কাদামাটিতে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে। ভারতবর্ষের একটি বর্ণোজ্জ্বল অশান্ত বিপ্লবীর জীবনদীপ এইভাবে নির্বাপিত হল।...

সুশীলচন্দ্রের কর্মকাণ্ড আরো ছিল। জানা গেছে যে, মাণিকতলা ও কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের মোড়ে দারোগা সুরেশ মুখার্জিকে হত্যার ব্যাপারে সুশীল সেনও জড়িত ছিলেন।

যা' হোক, ১৯১৫ সালের ৩রা মে একান্ত ঐ বেদনাময় পরিবেশে সুশীলচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ ঘটেছিল। আত্মীয়-পরিজন কেউ নেই। কয়েকটি সহকর্মীর সান্নিধ্যে পথের বুকে কর্মরত এই বিদ্রোহী সহসা এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। কিন্তু এই ঘটনার মধ্যেও

বিপ্লবীর সেই চরিত্রই পরিস্ফুট, সেই রূপই উদ্ভাসিত—যার অফুরন্ত শৌর্য ও শক্তি লক্ষ্য করে মনে হয় ঃ

"বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
অমানিশা গেল ফাটিয়া ;
তোমার খড়্গ আঁধার মহিষে
দু'খানা করিল কাটিয়া।"

দেশের অমারাত্রি সত্যি সুশীল সেনের অঙ্গে বেত্রাঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে গিয়েছিল। নববঙ্গ সৃষ্টির মূলে এই আঘাতের বেদনা।

"ব্যথায় ভুবন ভরিছে ;
ঝর ঝর করি' রক্ত-আলোক
গগনে-গগনে ঝরিছে।"...

সেই রক্ত-ঝরা ইতিহাসের কাহিনী ক্রমশ ব্যক্ত হবে। উনিশশ' পাঁচ থেকে উনিশশ' দশ হল সেই ইতিহাসের প্রথম কাল।

এখানে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু বঙ্গদেশের অঙ্গচ্ছেদ ঘটাতেই স্বদেশী-আন্দোলন অমন ব্যাপক হয়ে ওঠেনি, শুধু সস্তা ভাব-প্রবণতাই এই আন্দোলনের উৎস ছিল না। 'কারণ' ব্যতীত 'কার্য' ঘটে না। বঙ্গের এই ঐতিহাসিক-বিদ্রোহের পশ্চাতে গভীর-ভাবে ছিল নানা কারণ। অর্থনৈতিক-দুর্দশা, রাজনৈতিক-পরাধীনতার গ্লানি, সামাজিক-অত্যাচার এবং ইংরেজ-প্রভুদের অপমানকর ব্যবহার লোকের মনকে বীতশ্রদ্ধ ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন করে রেখেছিল। বিপ্লবের ইন্ধন সর্বত্র ছড়ান ছিল। বিদ্রোহের আগুন দেশময় সঙ্গোপনে সবার অলক্ষ্যে ধূমায়িত হচ্ছিল। 'বঙ্গভঙ্গ' শুধু সেই ধূমায়িত চাপা-আগুনে প্রচুর ঘৃতাহুতি দিল। অদৃশ্য অগ্নিকণা মুহূর্তে অভ্রংলিহ-শিখায় বাঙলার আকাশ স্পর্শ করল। সেই শিখা ক্রমে বাঙলা অতিক্রম করে বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, বিহার,

উড়িষ্যা, আসাম ও বর্মার আকাশকে রাঙিয়ে দিল। সারা ভারতবর্ষ বিদ্রোহের এক অদম্য অনুভূতি লাভ করে বাঙলার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। সেই সাড়া দু'টি ধারায়ই পাশাপাশি প্রবাহিত হয়েছে —সশস্ত্র অভিযাত্রায় এবং নিরস্ত্র ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে।···

কিংস্‌ফোর্ড-হত্যার চেষ্টা

কলকাতার চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কিংস্‌ফোর্ড। ১৯০৭ সালে এই শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষ দেশবাসীর তৎকালের হৃদয়ের নেতা বিপিনচন্দ্র পালকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন; তাঁরই হুকুমে বালক সুশীল সেনকে ইংরেজের ঘাতক গুনে গুনে পনেরটি বেত মারে। তাছাড়া ঐ রাজপুরুষটির ভারতীয়-বিদ্বেষ এবং অত্যাচার-প্রবণতার নজির সামান্য ছিল না। তাঁর হাতে যুগান্তর, বন্দেমাতরম্, সন্ধ্যা প্রভৃতি দেশপ্রেমী কাগজগুলোর লাঞ্ছনা এবং সম্পাদকের নির্যাতন ভুলবার বস্তু নয়। স্বদেশী-আন্দোলন দমন-কার্যে কিংস্‌ফোর্ডের উৎসাহ অন্তহীন। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের 'টিপিক্যাল্' প্রতীক এই ব্যক্তি। তাই বিপ্লবী আদালতের বিচারে কিংস্‌ফোর্ডের প্রাণদণ্ড স্থির হয়ে গেল। বিপ্লবী-মহলে শোনা যায় যে, উক্ত গুপ্ত-বিচারের রায় নাকি শ্রীঅরবিন্দ, চারু দত্ত ও সুবোধ মল্লিক সম্মিলিতভাবে দিয়েছিলেন। এ-তথ্যটি যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' নামক গ্রন্থে (পৃঃ ২৮৪) ব্যক্ত করেছেন।

বোমা-সন্নিবেশিত পুস্তক (Bomb-Book) পাঠিয়ে কিংস্‌ফোর্ডকে ঘায়েল করার চেষ্টা ব্যর্থ হল। ও-বইটি খুলতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরিত হয়ে তাঁকে যমালয়ে পাঠাবার অবকাশ দিল না। কারণ, নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় কিংস্‌ফোর্ড কিছুদিন আপিসে আসেননি এবং বইখানাও

অলক্ষ্যে অন্যান্য বইয়ের স্তূপে পড়ে থাকে।···রাউলাট-কমিটির রিপোর্টে আছে ঃ "Upon search being made, a parcel was found which Mr. Kingsford had received but not opened, thinking it contained a book borrowed from him. The parcel did not contain a book ; but the middle portion of the leaves had been cut away and the volume was thus in effect a spring to cause its explosion if book was opened."

('Sedition Committee, 1918, Report'—P. 32)

জানা গেছে যে, পরেশ মৌলিক নামক এক তরুণকে নাকি কিংস্‌ফোর্ড-হত্যাকল্পে বোমা সন্নিবিষ্ট ঐতিহাসিক বিরাটদেহী ঐ পুস্তকখানা তাঁর গৃহে রেখে আসার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।···

যা হোক, ইতিমধ্যে সাহেব বদলি হয়ে চলে গেলেন বিহার-প্রদেশের মজঃফরপুর শহরে।···

কিন্তু বিপ্লবীর প্রতিজ্ঞা এতে শিথিল হবার কথা নয়। ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্লকুমার চাকি নামক দু'টি তরুণ কিশোরের উপর আদেশ হল মজঃফরপুর গিয়ে কিংস্‌ফোর্ডকে নিধন করার। বোমা ও রিভলবারসহ তাঁরা রওনা হলেন। সেটা ১৯০৮ সালের এপ্রিল মাস। তরুণদ্বয় মজঃফরপুর শহরে একটি ধর্মশালায় আশ্রয় নিলেন। সপ্তাহখানেক কেটে গেল। কিন্তু সাহেবকে বাগে পাওয়া যাচ্ছে না। নিজের কোয়ার্টার থেকে ভয়ে বড় একটা তিনি নড়েন না। কোর্ট-কাছারিতে যাওয়া ছাড়া অন্যত্র তাঁর গতায়াত নেই। কারণ, ইতিমধ্যে তাঁকে হত্যা করা হবে, এই মর্মে বেনামী পত্রাদি তাঁর কাছে এসে গেছে।

সেদিন ৩০শে এপ্রিল। বিপ্লবীদ্বয় খবর পেয়েছেন যে, ক্লাবগৃহে কিংস্‌ফোর্ড-দম্পতি এবং কেনেডি-গৃহিণী ও তাঁর অনূঢ়া কন্যা তাস খেলছেন। *তখন রাত সাড়ে আটটা।…এদিকে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল* চাকি কিংস্‌ফোর্ডের গৃহের সম্মুখে তাঁর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় লুকিয়ে আছেন।

তাস খেলা সাঙ্গ হলে কিংস্‌ফোর্ড-দম্পতি এবং কেনেডি-গৃহিণী ও কন্যা পর-পর দু'খানা গাড়িতে গৃহাভিমুখে রওনা হলেন। কিংস্‌ফোর্ডের বাংলো ছিল ক্লাবঘরের কাছাকাছি, কিন্তু 'কে'নডি'রা থাকতেন মাইল-খানেক দূরে। কেনেডি-গৃহিণীর গাড়ি কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ির পুরোভাগে একটু এগিয়ে যাচ্ছে। প্রথম গাড়ি কিংস্‌ফোর্ডের বাড়ির গেট-বরাবর আসতেই সুদীর্ঘ একটি গাছের আড়াল থেকে সহসা ব্যাঘ্রের মত লম্ফ দিয়ে উক্ত গাড়ির সম্মুখে এসে পড়লেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লকুমার। এসেই প্রচণ্ড বিক্রমে বোমা নিক্ষেপ করলেন গাড়িখানা লক্ষ্য করে। দিগন্ত কাঁপিয়ে বিস্ফোরণ ঘটে গেল। গাড়িখানা শতধা বিচূর্ণ। বিপ্লবীদ্বয় নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে, কিংস্‌ফোর্ড-এর দেহ নিশ্চয়ই ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে।…

কাজ শেষ করে তরুণদ্বয় অন্ধকারে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু উভয়েই পায়ের জুতা ফেলে এসেছেন। ঐ জুতা-ই কাল হল। থানায়-থানায়, স্টেশনে-স্টেশনে পুলিশ খবর পাঠাল যে, হত্যাকারী তরুণদ্বয় খালিপায়ে পালিয়েছে, নগ্নপদের তরুণ যাত্রী বা পথিককে তল্লাশী কর।…জুতাগুলি মামলা চালু হলে 'Exhibit' স্বরূপ আদালতে প্রদর্শিত হয়েছিল।…

কিছুদূর একসঙ্গে পালিয়ে এসে এক স্থানে দু'জনের ছাড়াছাড়ি হল মানুষের সন্দেহ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে। একজন ছুটে চললেন সমস্তিপুরের দিকে, অপরজন ছুটে চললেন রেললাইন ধরে অন্য পথে।…

এদিকে বিপদ-সংকেত পেয়েই পুলিশ-সুপার দু'জন সাব্-

ইন্সপেক্টরকে ট্রেণে পাঠালেন আসামীদের ধরবার জন্যে। তাদের একজন গেল বাঁকিপুরের দিকে,—অপরজন গেল মোকামা অভিমুখে। তাছাড়া পুলিশ ছোট-বড় সকল স্টেশনেই ছড়িয়ে পড়ল। 'উইনি' স্টেশনেও ছ'জন কনস্টেবলকে পাঠান হল। নির্দেশ দেওয়া হল—সন্দেহ হওয়া মাত্র যে-কোন ব্যক্তিকেই গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যেতে হবে। ('Roll of Honour'—P. 163-4)

এদিকে ছুর্ভাগ্যবশতঃ মিসেস কেনেডির গাড়িতেই বোমা পড়েছিল। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল ভেবেছিলেন ওটা কিংস্‌ফোর্ডেরই গাড়ি, কিংস্‌ফোর্ডকে নিয়ে এগিয়ে আসছে।···কেনেডি-গৃহিণী ও তাঁর কন্যার মৃত্যু হয়েছে। নির্দোষ ছ'টি মহিলার মৃত্যুতে সবার অধিক ছুঃখ পেয়েছিলেন ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি। কিন্তু ছুঃখ হয়নি ইতিহাস-বিধাতার। কারণ, এই যুদ্ধের অবতারণা তো কোন ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গে অপর কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়! যুদ্ধ ঘোষণা করেছে একটা জাতি আর একটা জাতির বিরুদ্ধে। ভারতবাসীর সংগ্রাম ইংরেজের সঙ্গে। কারণ, ইংরেজ-জাতি ভারতের স্বাধীনতা হরণ করেছে ; প্রভুর পদে সমাসীন থেকে ভারতবাসীকে সে পদানত করে তুষ্ট। এই যুদ্ধ চালাতে হবে ভারতবাসীকে দীর্ঘকাল ধরে। ১৯০৮ সাল সেই যুদ্ধেরই সূচনা মাত্র। এই যুদ্ধে কত মাতা, কত ভগ্নী, কত বধূর চোখে জল ঝরবে ; কত নরনারী নিহত হবে ; কত রক্তস্রোত ধরণীতল সিক্ত করবে! এই নির্যাতিত বা নিহতদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে নির্দোষ হলেও জাতিগতভাবে তো বিবদমান! সুতরাং মৃত্যুর জন্যে মিসেস কেনেডিদের মত নির্দোষ মানুষদেরও প্রস্তুত থাকতে হবে বৈকি! ক্ষুদিরামের কার্যের জন্য কত নির্দোষ নরনারীর উপর অত্যাচার নির্মম হয়ে নেমে এসেছে—কারণ, তারা বাঙালী, তারা ভারতবাসী। কই, সে-জন্যে তো ইংরেজ-জাতি বিন্দুমাত্র আক্ষেপ করেনি!···

ভাগ্যক্রমে কিংস্‌ফোর্ড বেঁচে গেলেন। বিধাতা তাঁকে বাঁচিয়ে হয়তো বিপ্লবীদের সতর্ক করে দিলেন। হয়তো তাঁদের অধিকতর দক্ষতায় কার্যে অগ্রসর হবার শিক্ষা দান করলেন। কারণ, আমরা দেখি যে, পরের এ্যাক্‌শান্‌গুলো প্রচুর দক্ষতায় তাঁরা সম্পন্ন করেছেন। সফল হতে হ'লে বিফল হবার অভিজ্ঞতাও নিশ্চয়ই প্রয়োজন। 'Failure is the pillar of success'—কথাটা আপ্তবাণী।···

প্রফুল্লকুমার চাকি

প্রফুল্ল চাকি সমস্তিপুর স্টেশনে পেঁছিলেন। মোকামাঘাটের টিকিট কাটলেন ১লা মে তারিখে (১৯০৮)। ইতিমধ্যে নূতন জামা-কাপড় ও জুতা পরে নিয়েছেন। কিন্তু দারোগা নন্দলাল ব্যানার্জির দুষ্ট নজর এড়াতে পারলেন না। সেই লোকটা ছুটির শেষে কাজে যোগ দেবার জন্যে সিংভূমে যাচ্ছিল। তার কোন 'ডিউটি' দেবার তাগিদ ছিল না। তবু স্বভাব যায় না ম'লে—প্রমোশনের লোভও আছে! কর্মতৎপর হয়ে উঠল নন্দলাল। প্রফুল্লর সঙ্গে খাতির জমিয়ে ফেলবার চেষ্টায় সে উঠে-পড়ে লাগল। ধূর্ত মানুষ—অনায়াসে ধরে ফেলল যে, এই তরুণ যথেষ্ট সন্দেহভাজন। প্রফুল্ল কিন্তু নন্দলালের আপ্যায়নে ও বন্ধুত্বস্থাপনের চেষ্টায় বিরক্ত ও বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। নন্দলাল 'তার' করে দিল পুলিশ-কর্তাদের কাছের শহর মজঃফরপুরে। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম এল তরুণকে গ্রেপ্তার করার। পুলিশবাহিনী মোকামাঘাটে তৈরি হয়ে থাকল। ('Roll of Honour'—P. 163)

প্রফুল্ল চাকি ট্রেণ থেকে নামতেই বন্ধুর বেশে নন্দলাল এসে কর্তাদের নির্দেশমত তাঁকে গ্রেপ্তার করাল। বিস্ময়ে প্রফুল্ল শুধু বললেন: "আপনি বাঙালী হয়ে বাঙালীকে ধরিয়ে দিলেন?"···কিন্তু

সংসার-অনভিজ্ঞ তরুণ জানেন না যে, নন্দলালদের জাত আলাদা—তারা বাঙালী নয়, ভারতবাসী নয়, কোন দেশের বা জাতের নয়—তারা আত্মসেবী 'বিভীষণ'।···

প্রফুল্লর দেহে অসীম শক্তি। এক ঝট্‌কায় নিজেকে পুলিশের কবল থেকে মুক্ত করে নিয়ে তিনি দৌড় দিলেন। দু'টো কনস্টেবল তাঁকে অনুসরণ করতেই তিনি গুলি ছুঁড়লেন। গুলি কারো গায়ে লাগল না। কিন্তু সিংহ-শাবক শৃঙ্খলিত হবার অবকাশ দিতে নারাজ। প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে এসে গেছেন। মুহূর্তে রিভলভারের নল ঘুরিয়ে দিলেন নিজের দিকে। প্রচণ্ড শব্দে পর-পর দু'টি গুলি ছুটে এসে তাঁর আত্মবিলয়ন ঘটাল। বন্দী করতে পারল না স্বাধীন মানুষটিকে নন্দলাল বা পুলিশের বাহিনী। অফুরন্ত বীর্যের অধিকারী মহান বীর মৃত্যুকে পরম প্রেমিকের মত বরণ করলেন। তখন অপরাহ্ণ ৬টা। সূর্য অস্তগামী। যাবার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যায় সে ভারতবাসীর স্বপ্ন, শহিদের ত্যাগ-বরণের রঙে রঙ্ মিশিয়ে।···

প্রফুল্ল চাকির আত্মবিলয়ন তুলনাহীন, স্বয়ং-সম্পূর্ণ এক নিখুঁত কীর্তি। সম্মুখ-যুদ্ধে বাঙলার 'প্রথম শহিদ' প্রফুল্লকুমার! ভয়হীন, শক্তিবিধৃত প্রফুল্লকুমার!···

জীবদ্দশায় প্রফুল্ল চাকিকে ধরতে না পারায় সরকার-পক্ষের বিষম আপশোষ হল। নন্দলালকে প্রফুল্ল তাঁর নিজের নাম বলেছিলেন—দীনেশচন্দ্র রায়। 'দীনেশ'ই যে কেনেডি-পত্নী ও কন্যার আততায়ী-দ্বয়ের একজন, তা প্রমাণ করতে হবে। তাই সুসভ্য ইংরেজ-রাজশক্তির আদেশে দীনেশের (প্রফুল্ল চাকি) মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, স্পিরিটে ডুবিয়ে, কলকাতা আনা হল আইডেন্টিফিকেশানের জন্যে। দু'একদিনের মধ্যেই প্রমাণিত হল যে, উক্ত 'দীনেশ'ই রঙপুরের

প্রফুল্ল চাকি এবং কেনেডি-পত্নী ও কন্যার হত্যাকারীদের অন্যতম। ক্রমে জানা গেল যে, প্রচুর দৈহিক-শক্তির অধিকারী এই তরুণ 'রঙপুর জাতীয় বিদ্যালয়ে'র সুপরিচিত ছাত্র। বিপ্লবী নেতা বারীন ঘোষ রঙপুর সফরের সময় এই তরুণের স্বাস্থ্য, বুদ্ধি ও হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে তাঁকে বিপ্লবের পথে টেনে নেন। কিছু পরে ঘটে তাঁর কলকাতায় আগমন এবং মজঃফরপুর যাত্রা। তার অব্যবহিত পরেই অবাক বিস্ময়ে দেশবাসী দেখে শহিদের উত্তরীয় উড়িয়ে তাঁর অমৃতের লোকে অন্তর্ধান।...

ক্ষুদিরাম বসু

প্রফুল্ল চাকিকে ছেড়ে ক্ষুদিরাম ছুটলেন রেললাইন ধরে কোন স্টেশন ধারে-কাছে পাবার প্রত্যাশায়। যে-কোন স্টেশনে পেঁাছলেই গাড়ি চেপে কলকাতা রওনা হবেন। তিনি পেঁাছলেন এসে 'উইনি' স্টেশনে। মজঃফরপুর থেকে ছোট্ট এই স্টেশনটি বিশ মাইল দূরে। কিশোর বিপ্লবীর পায়ে জুতা নেই, পরনের জামা-কাপড় মলিন, রুক্ষ চুল, ক্লান্ত দু'টি নয়ন। এত দূর পথ ছুটে এসে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অবসন্ন তাঁর দেহ। বুভুক্ষু কিশোর স্টেশনের অনতিদূরে বাজারে ঢুকলেন। তখন ভোর ৮টা। তারিখ ১৯০৮ সালের ১লা মে। এক দোকানীর কাছ থেকে চিঁড়ে কিনে খেলেন। তারপর জল খাবার জন্যে এগুতেই পুলিশ এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করল। পুলিশ তাঁকে নানা প্রশ্ন করার কালে এক সময় দুঃসাহসী কিশোর পালাবার চেষ্টা করায় পুলিশ তাঁকে শক্ত করে ধরে রাখল। কিন্তু একফাঁকে ক্ষুদিরাম জামার নিচ থেকে রিভলবার বের করে গুলি ছোঁড়ার ব্যর্থ চেষ্টা করায় তাঁর দেহ তল্লাশী করা হল। তল্লাশী করে পাওয়া গেল দু'টি রিভলবার ও কার্তুজ। শৃঙ্খলিত ক্ষুদিরাম সশস্ত্র পুলিশ-বেষ্টিত হয়ে মজঃফরপুর আনীত হলেন সেদিনই অপরাহ্নে।

মজঃফরপুর স্টেশনে ট্রেণ ঢুকেছে বন্দীবীরকে নিয়ে। স্টেশন লোকে-লোকারণ্য। বিদ্রোহী কিশোরকে দেখার জন্যে সকলে উৎসুক। দাস-জাতির জীবনে কী করে আবির্ভূত হলেন ঐ উল্কা-শিশু দুঃসহ অগ্নিজ্বালা বক্ষে নিয়ে!

ক্ষীণদেহী, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ঐ বালকের মধ্যে কী করে যে অমন দুর্বার বিদ্রোহ-শক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে, তা কারো ধারণায় আসে না। কিন্তু শৃঙ্খলিত-কিশোর পুলিশের গাড়িতে বসে যখন উদাত্তকণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন, তখন সকলে ব্যাকুল কণ্ঠে সেই ধ্বনি ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করতে লাগল। মজঃফরপুরের আকাশ-বাতাস সেই সন্ধ্যায় মাতৃমন্ত্রে পূত হয়ে গেল। ক্ষুদিরাম মুহূর্তে জনমানসে মুক্তি-দূতের স্থান অধিকার করে বসলেন।...

বিচার শুরু হল ২১শে মে। জিলা-কর্তার কাছে ক্ষুদিরাম বললেন: "কিংস্‌ফোর্ডকে আমি হত্যা করতে চেয়েছিলাম। কারণ, এই ব্যক্তি ব্রিটিশ-ভারতের অত্যাচারী শাসকদের অন্যতম। কিংস্‌ফোর্ডের গাড়ি এবং সেই গাড়িতে তিনি আছেন মনে করেই আমি বোমা ছুঁড়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিংস্‌ফোর্ডের পরিবর্তে গাড়িতে ছিলেন দু'টি নিরপরাধ মহিলা। তাঁদের মৃত্যু ঘটেছে শুনে আমি দুঃখিত।"

('Roll of Honour'—P. 166)

অতি প্রশান্তকণ্ঠে ক্ষুদিরাম এইটুকু বলে গেলেন। নির্বিকার, সুদূরের মানুষ ক্ষুদিরাম!...

২৫শে মে 'মজঃফরপুর বোমার মামলা' নামে ক্ষুদিরামের মামলা সেসান কোর্টে নেওয়া হল। সেখানে ক্ষুদিরামের হল ফাঁসির হুকুম। তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই তাঁর। দেহের ওজন ইতিমধ্যে দু' পাউণ্ড বেড়ে

গেছে।···সেসান কোর্টেও তিনি বলেছিলেন ঃ "আমি এ হত্যাকাণ্ডের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি দুঃখিত যে, কিংস্‌ফোর্ড এখনও জীবিত, অথচ দু'জন নিরপরাধ মহিলার মৃত্যু ঘটেছে।"

হাইকোর্টের বিচারে ফাঁসির হুকুম বজায় থাকল।

১৯০৮ সালের ১১ই আগস্টের প্রভাত ৬ ঘটিকায় মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরাম বসু ফাঁসির মঞ্চে সগৌরবে আরোহণ করেছেন।

ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুবরণ করা মাত্রই ক্ষুদিরাম ভারতবাসীর হৃদয়ে অমর আসন লাভ করলেন। বাঙলার শহরে-শহরে, গ্রামে-গ্রামান্তরে কত গান রচিত হল এই কিশোর বীরের উদ্দেশ্যে স্তুতি ও বন্দনা জানিয়ে। কত চারণ গেয়ে গেলেন সে-সব গান। পথের ভিখারীর কণ্ঠে আজও শুনি ঃ "একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।"···

ক্ষুদিরাম মেদিনীপুরের ছেলে। ১৯০৮ সালের ১১ই জুন মামলা চলার সময় তিনি তাঁর উকিলের কাছে বলেছিলেন ঃ "আমি শহর মেদিনীপুরের লোক। আমার বাবা, মা, ভাই, কাকা, মামা কেউ এ-জগতে নেই। বেঁচে আছেন শুধু একটি দিদি। দিদির বড় ছেলেটি আমারই সমবয়সী।" ('Roll of Honour'—P. 165)

দ্বিতীয় শ্রেণী থেকেই পড়া ছেড়ে দিয়ে ক্ষুদিরাম স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন এবং বিপ্লবী দলে ঢুকে পড়েন। ভয়শূন্য এই বালক ইতিমধ্যে পুলিশের সঙ্গে নানা ক্ষেত্রে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। কারণ, শিশুবয়স থেকেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে বালকের যাত্রা। ১৯০৬ সালে পুলিশের সাথে এক সংঘর্ষের ফলে তাঁকে কারারুদ্ধ হতে হয়। কিন্তু বয়স কম বলেই কিছুদিন মামলা চালানোর পর তা প্রত্যাহার করে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হল। তখন তো পুলিশ বা মেদিনীপুরের লোক বোঝেনি যে, শিশু হলেও ক্ষুদিরাম অগ্নিশিশু—একখানি বহ্নি-দীপ্ত তরবারি। বিরাট রাজশক্তিকে পদাঘাতে চূর্ণ করার স্বপ্ন তাঁর চোখে।

দুর্ধর্ষ বিদেশী-শাসককে বিতাড়িত করার সাহস তাঁর বুকে। তখন তারা জানত না যে, দু' বছরের ব্যবধানে এই অমিত-তেজা কিশোরকেই বিপ্লবী নেতারা পাঠাবেন ভয়ঙ্কর বোমা-হস্তে অত্যাচারী কিংস্‌ফোর্ডকে ধ্বংস করার কাজে।…

শহিদ-তীর্থে এই ক্ষুদিরামের অভিযাত্রা সন্দর্শনেই 'দি এম্পায়ার্‌' কাগজ কি লিখল ? লিখল ঃ "Khudiram Bose was executed this morning ; …it is alleged that he mounted the scaffold with his body erect. He was cheerful and smiling." ('Roll of Honour',—P. 166)

[আজ প্রভাতে ক্ষুদিরাম বসুকে নিধন করা হয়েছে। এ-কথা উক্ত হয়েছে যে, শিরদাঁড়া সোজা করে তিনি ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছেন। স্মিতহাস্যে হর্ষোজ্জ্বল ছিল তাঁর মুখ।]

আরো জানা গেছে যে, ফাঁসির পূর্বদিন উকিলের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকালে ক্ষুদিরাম বলেছিলেন ঃ "কিছু ভাবনা নেই। পুরাকালে রাজপুত-রমণীরা নির্ভয়ে জ্বলন্ত চিতায় উঠে আত্মদান করতেন—আমিও সেই ভয়হীনতায় মৃত্যুকে গ্রহণ করবো।" ('Roll of Honour', P. 166)

ভারতের মৃত্যুহীন কিশোরদের এই অগ্রদূত আজ থেকে ষাট বছর পূর্বে যে আলোক-শিখা জ্বালিয়ে গিয়েছিলেন বন্দীর গৌরবে, তা দেশ-কাল-ব্যাপ্তি জুড়ে অম্লান থাকবে—যেমন অম্লান হয়ে আছে ও থাকবে শৃঙ্খলিত প্রমিথিয়ুস্‌-এর মানব-কল্যাণে জ্বালিয়ে-দেওয়া প্রথম অগ্নিশিখা …

এদিকে কিংস্‌ফোর্ড-এর অবস্থা শোচনীয়। বোমার আঘাত তাঁর অঙ্গে না লাগলেও সে-আঘাত তাঁর মানসিক শক্তিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছে। অবসন্ন চিত্তে মৃত্যুভয়-কাতর এই রাজপুরুষটি ৩রা মে তারিখেই সপরিবারে মুসৌরি পালিয়ে গেলেন দীর্ঘ ছুটি নিয়ে।

অতঃপর কিংস্‌ফোর্ডের নাম বড় একটা শোনা যেত না রাজপুরুষদের ভাল-মন্দ কোন কাজে।

নন্দলাল-হত্যা

প্রফুল্ল চাকিকে জীবদ্দশায় ধরতে পারল না নন্দলাল। তাঁর মৃতদেহ থেকে মাথা কেটে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে সনাক্ত করার মহৎ উদ্দেশ্যে—হোক্‌ না অসভ্য, বর্বর ও নৃশংস সেই কাজ! নন্দলালের তাতেও আনন্দ। এবার ছোট দারোগা থেকে বড় দারোগা, তারপর আরও বড়, আরও কত কি!··কিন্তু রুদ্রের কঠিন নির্দেশ বিপ্লবী-কণ্ঠে সঙ্গোপনে উচ্চারিত হল—'হত্যা কর বিভীষণ নন্দলালকে!'

১৯০৮ সালেরই ৯ই নভেম্বরের ভয়ঙ্কর রাত। বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্র পালের হস্তে মৃত্যুদণ্ড লাভ করল সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ-রাজের পুলিশ-কর্মচারী নন্দলাল ব্যানার্জি।

এই তাৎপর্যপূর্ণ বৈপ্লবিক-কর্মটি সংঘটিত হয়েছিল বিপিনবাবুদের 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সঙ্গে ঢাকার হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'মুক্তি-সংঘে'র যোগাযোগে। হেমচন্দ্রের কলকাতাস্থ প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীশচন্দ্র পাল। কলকাতার সার্পেণ্টাইন লেনে শ্রীশচন্দ্রের গুলির আঘাতে দেশদ্রোহী নন্দলাল নিহত হল। এই কর্মে শ্রীশচন্দ্রের সঙ্গী ছিলেন 'আত্মোন্নতি'র রণেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী।

এই সম্পর্কে ঐতিহাসিক উমা মুখার্জি লিখেছেন: ···"At the appointed hour Ranen and Naren (Srish Pal) set out and waited before the old Siva temple cracking and taking ground-nuts, and shortly after finding Nandalal Banerjee coming out of his house they moved forward. It was Naren (Srish Pal) who actually killed Nandalal just at the S. W. corner of St. James Park at about 7 p.m. To be sure of the accomplished murder Ranen also struck the head of

the man with his own revolver." (Two Great Indian Revolutionaries',—P. 231)

[যথাসময়ে সশস্ত্র রণেন (গাঙ্গুলী) এবং শ্রীশ পাল (ওরফে নরেন) সঙ্গোপনে রওনা হয়ে পুরাতন শিবমন্দিরের কাছে এসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। উভয়ে চিনেবাদাম ভেঙে ভেঙে খাচ্ছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই নন্দলাল ব্যানার্জিকে তার গৃহ থেকে বেরুতে দেখে তাঁরাও এগুতে লাগলেন। সেণ্ট জেমস্ স্কোয়ার্ বা পার্কের (সার্পেণ্টাইন লেন) দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে নন্দলাল আসতেই তাকে গুলির আঘাতে হত্যা করলেন শ্রীশ পাল (নরেন)। তখন রাত প্রায় ৭টা। দারোগা নন্দলাল রক্তাক্ত দেহে ভূতলে শায়িত। রণেন (গাঙ্গুলী) অধিকতর নিশ্চিন্ত হবার জন্য মৃত নন্দলালের মাথায় পুনরায় রিভলবার সহযোগে আঘাত করলেন।]

নন্দলালের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে শ্রীশচন্দ্র ও রণেন গাঙ্গুলী ঘটনাস্থল থেকে বেমালুম উধাও হয়ে গেলেন। পুলিশ তো দূরের কথা বিপ্লবীদের অনেকেই কে-বা-কারা এ-কাজ করেছেন, তা জানতে পারলেন না। এ পর্যন্ত বহু বিকৃত ও বিতর্কমূলক কাহিনী নানা-ভাবে প্রচারিত হয়ে এসেছে নন্দলাল-হত্যাকে ঘিরে। কিন্তু ইতিহাস কিছুকাল চাপা থাকলেও চিরকাল চাপা দিয়ে রাখা যায় না। রণেন গাঙ্গুলী আজও জীবিত*। কাজেই, নন্দলাল-হত্যা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস উদ্ধার করার চেষ্টা ব্যর্থ হবার কারণ নেই।

বিপ্লবীদের গর্বের কথা এই যে, মাত্র ছ'মাস আট দিনের ব্যবধানে প্রফুল্ল চাকির গ্রেপ্তারের জন্য দায়ী দেশদ্রোহী নন্দলালকে চরম দণ্ডদান করে বিপ্লবীরা তাঁদের কঠিন সংকল্প রক্ষার কৃতিত্ব প্রমাণ করেছেন। দেশবাসী সানন্দে বুঝে নিল যে, তাদের দেশে 'বিভীষণ'দের আনাগোনা অবৈধ ও ন্যক্কারজনক। তাদের একমাত্র প্রাপ্য পথ-কুক্কুরের মৃত্যু।...

---

*দ্রষ্টব্য—রণেন্দ্রনাথের পত্র ('সবার অলক্ষ্যে', ১ম পর্ব, পৃঃ ২৩৩)

॥ চার ॥

আবার মহারাষ্ট্র

১৮৯৭ সালের জুন মাসে ভারতবর্ষের প্রথম বৈপ্লবিক-কর্ম পুণা শহরে সংঘটিত হয়। ইংরেজ প্রথমটায় হতচকিত হলেও অনতি-বিলম্বে সারা মহারাষ্ট্র জুড়ে কঠোর পুলিশী-শাসন আমদানি করে। বিশেষ করে, ছাত্র, তরুণ এবং জাতীয়তাবাদী মারাঠাদের উপর অত্যাচার ক্রমশ মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে থাকে।···

শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা মনে-প্রাণে বিপ্লবী। কাথিয়াওয়াড়ের লোক তিনি। বছর দুই পূর্বে বিলেত থেকে ফিরে এসেছেন। পুলিশের চোখ এড়িয়ে আবার তিনি ১৮৯৭ সালেই লণ্ডনে চলে গেলেন। লণ্ডন পৌঁছে তিনি ভারতীয়-বিপ্লবের প্রচারকার্যে ব্রতী হলেন। ধীরে ধীরে ভারতীয়দের মধ্যে তাঁর কাজ এগিয়ে চলল। ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হল তাঁর কাগজ—'দি ইণ্ডিয়ান স্যোসিয়োলজিস্ট'। ফেব্রুয়ারি মাসে স্থাপিত হল 'ইণ্ডিয়ান হোম রুল লীগ বা সোসাইটি'। জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হল 'ইণ্ডিয়া হাউস্'—ভারতীয় ছাত্রদের থাকা-খাওয়ার একটি আস্তানা।

শ্যামজি ব্যারিস্টার, শ্যামজি বিপ্লবী। অর্থ তাঁর আছে, কিন্তু তারও বহু গুণ অধিক আছে তাঁর মনের সম্বল। ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি সংস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি দান করলেন দশ হাজার টাকা। সে-সংস্থা চলবে ভারতের রাজনৈতিক কর্মীদের তরফ থেকে। আত্মনিবেদিত-কর্মী তাঁরা—অর্থাৎ, তনু-মনের ধ্যান দিয়ে দেশকে সার-বস্তুরূপে গ্রহণ করেছেন তাঁরা। তাঁদের কাছে দেশের 'স্বাধীনতা' ব্যতীত অন্য কিছুই অগ্রাধিকার পায় না। পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র পরিবারসহ নিজেকে দেশমাতৃকার পদতলে নিবেদিত করেছেন

তাঁরা। ব্রিটিশ-কবল থেকে দেশজননীকে মুক্ত না করা পর্যন্ত তাঁদের তপস্যার বিরাম নেই।

কৃষ্ণবর্মার কার্য-কলাপে ব্রিটিশ কাগজগুলো তটস্থ হল। তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চলল। কৃষ্ণবর্মা সতর্ক হলেন। প্যারি শহরে তিনি আস্তানা সরিয়ে নিলেন। কৃষ্ণবর্মার পাশে এসে জুটেছেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মাদাম কামা এবং আরো কিছু ভারতীয় বিপ্লবী। ভারতবর্ষের বাইরে ভারতীয়-বিপ্লব ঘটানোর চেষ্টা শুরু করবার মূলে মহারাষ্ট্রের অবদান লক্ষণীয়।

আবার একথাও এখানে স্মরণ করার যে, এই মহারাষ্ট্র থেকেই ১৯০৮ সালে 'কাল' নামক পত্রিকায় শ্রীপারাঞ্জপে নামক এক বিপ্লবী লেখকের এক প্রবন্ধে ভারতীয় বিপ্লবীদের ব্রিটিশ-প্রদত্ত 'এ্যানার্কিস্ট্' আখ্যা দেবার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ বের হয়। এবং প্রতিবাদমূলক এই ধারার বৈপ্লবিক-রচনার জন্যে এই প্রথম লেখককে কারারুদ্ধ করা হয়। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারে পারাঞ্জপে দণ্ডিত হন।...

সাভারকর-ভ্রাতৃদ্বয়ের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রে বৈপ্লবিক-সংগঠন 'অভিনব ভারত সোসাইটি' নামে দানা বেঁধেছিল। ১৯০৬ সালে ছোট ভাই বিনায়ক চলে গেলেন বিলেতে। দাদা গণেশ সাভারকর দল-গঠনের নায়কত্বে আসীন থেকে কাজ চালাতে লাগলেন।...

মহারাষ্ট্র যেমন বাঙলাকে বিপ্লব-কর্মে প্রেরণা দান করেছিল, বাঙলাও তেমনি নূতন করে মহারাষ্ট্রকে বৈপ্লবিক-অভিযানে অনুপ্রাণিত করল। চাপেকার-ভ্রাতৃত্রয় এবং প্রফুল্ল-ক্ষুদিরাম-কানাই অবিচ্ছিন্ন একটি সংগ্রামী-আত্মার শাশ্বত জ্যোতিতে জ্যোতির্ময়। সর্বভারতে তামসী-রজনীর গগনে সেই আত্মা যেন আকাশপ্রদীপ।

জ্যাক্‌সন-হত্যা

১৯০৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর নাসিকের জিলা-শাসক জ্যাক্‌সন নিহত হলেন।

জ্যাক্‌সন নাসিক থেকে পুণা বদলি হয়ে যাচ্ছেন। তাঁকে ২১শে ডিসেম্বরই সন্ধ্যায় বিদায়-সংবর্ধনা জানান হচ্ছে। এ সুযোগ বিপ্লবীরা ছেড়ে দিতে পারেন না। কারণ, জ্যাক্‌সন-এর নাম তাঁদের কালো তালিকায় উঠে গেছে। আমরা পুণার শ্রী টি. আর. দেওগিরির 'বিপ্লবী নিকেতনে' প্রেরিত ইংরেজী প্রবন্ধে নিম্নোক্ত তথ্য পাই:

"জ্যাক্‌সন সংবর্ধনা-সভায় ঢুকেছেন। উদ্যোক্তাদের সাদর আহ্বানে তিনি যাচ্ছেন তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট আসনের দিকে। এমন সময়ে ভীষণ গর্জনে সারা হলগৃহ কেঁপে উঠল। প্রথম গুলি ব্যর্থ হলেও বিপ্লবী অনন্তলক্ষ্মণের পিস্তল থেকে দ্বিতীয় গুলি ছুটে এসে জ্যাক্‌সনকে বিদ্ধ করল। জ্যাক্‌সন ভূলুণ্ঠিত। তারপর গুলির পর গুলি এসে জ্যাক্‌সনের মৃতদেহটাকে ঝাঁঝরা করে দিল।

অনন্তলক্ষ্মণ কানহেরে ঘটনাস্থলেই ধরা পড়লেন। তাঁর পকেটে পাওয়া গেলে একখানা চিরকুট, জ্যাক্‌সনকে হত্যা করার কারণ জানিয়ে।

এরপর ধরা পড়লেন কার্ভে ও বিনায়ক দেশপাণ্ডে নামক দু'টি তরুণ। ধরা পড়লেন আরো পাঁচটি মারাঠি যুবক। নাম তাঁদের শংকর, সোমান, নারায়ণ যোশী, গণেশ বৈদ্য ও পাণ্ডুরাম যোশী।··· সকলের বিচার শুরু হল।···

১৯১০ সালের ২৯শে মার্চ হাইকোর্টের রায় বেরুল। অনন্তলক্ষ্মণ কানহেরে, বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডে এবং কৃষ্ণগোপাল কার্ভের ফাঁসির হুকুম হল। বাকি পাঁচজনের মধ্যে শংকর, রামচন্দ্র সোমান, ওয়ামান নারায়ণ যোশী এবং গণেশ (গণু) বি. বৈদ্য পেলেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা। একজন পেলেন দু'বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, তাঁর নাম দত্তাত্রেয় পাণ্ডুরাম যোশী।"···

পুলিশের মতে জ্যাক্‌সন-হত্যার পিস্তলটি নাকি বিনায়ক সাভারকরই প্যারি থেকে পাঠিয়েছিলেন গোপন-পথে। সুতরাং উক্ত হত্যাকার্যের সহায়ক বলে সাভারকরকে বিলেতেই গ্রেপ্তার করা

হয়। বন্দী সাভারকর ভারত-অভিমুখে প্রেরিত হবার কালে মার্সাই বন্দরে (ফ্রান্স) জাহাজ পৌঁছাতেই বাথরুমের গবাক্ষপথে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন। বীর বিপ্লবী সাঁতরে কূলে এসে ওঠেন। কিন্তু হোক্ না 'সাম্য', 'মৈত্রী' ও 'স্বাধীনতা'র ভূমি ফরাসী দেশ, তার সেপাই সাভারকরকে ধরে ফেলে ইংরেজের হাতে সঁপে দেয়। বিপ্লবিণী মাদাম কামা ফরাসী সরকারের কাছে ঐ 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র বাণী উচ্চারণ করে কত না তদ্বির করলেন বিপ্লবী-বন্ধুকে মুক্ত করার আগ্রহে! কিন্তু ভবী ভুলল না!…বিনায়ককে ছেড়ে দেওয়া তো দূরের কথা, ইংরেজ ইতিমধ্যে কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে বিনায়ককে জড়িয়ে দু'জনেরই ব্যারিস্টারির সনদ কেড়ে নিল। সুসভ্য ইংরেজ যে কতদূর অসভ্য হতে পারে তার একটি নমুনা আমরা এখানে পেলাম।…

১৯১০ সালের ১৯শে এপ্রিল। বোম্বাই শহরের আকাশ অরুণালোকে উজ্জ্বল। ভোর সাতটা। ফাঁসির মঞ্চে পর-পর আরোহণ করবেন অনন্তলক্ষ্মণ, কার্ভে ও দেশপাণ্ডে, 'থানা স্পেশাল প্রিজন্'-এর চার দেয়ালের অভ্যন্তরে। বোম্বাই শহরেরই এক প্রান্তে এই কয়েদখানা।

পর-পর তিনটি বীর মৃত্যু-মঞ্চে উঠে এসে দেশজননীর পায়ের শৃঙ্খল উন্মোচিত করার ব্রত উদযাপন করলেন। তাঁদের মৌন-বাণী একান্ত মুখর হয়ে ছড়িয়ে গেল—শুধু মহারাষ্ট্রে নয়, সারা ভারতবর্ষে, অর্থাৎ সারা ভারতবর্ষের নির্যাতিত জনগণের কাছে।

মৃত্যু-যাত্রায় মহারাষ্ট্র ও বাঙলার দুরন্ত প্রতিযোগিতা তৎকালের বিপ্লবের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় বিষয়।

প্রথম নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা

জ্যাক্সন-হত্যার মূলে সুদূরপ্রসারী এক গভীর ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করল বোম্বাই-সরকারের পুলিশ। তাদের হৈ-হুল্লোড় ও জাঁকজমকের অন্ত নেই। মামলার নাম দেওয়া হল 'নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা'। বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হল। এ-মামলায়ই পুলিশ প্রকাশ করল যে, গণেশ ও বিনায়ক সাভারকরদের নেতৃত্বে স্থাপিত 'মিত্রমেলা' এবং তৎপর তার নাম পাল্টে প্রতিষ্ঠিত 'অভিনব ভারত' আদপে বৈপ্লবিক গুপ্তসমিতির আড্ডাকেন্দ্র। এসব সংস্থার বাইরেকার রূপ যাই হোক, এদের ভিতরের রূপ পুলিশের বিচারে সম্পূর্ণ আলাদা। গুপ্ত-সমিতির অগ্নিজ্বালা বক্ষে নিয়ে এসব সংস্থার তরুণদল বিপ্লবের পথে বিচরণ করে। এদের অঙ্কুরে বিনাশ না করলে রাজ্য-শাসন ব্যর্থ হবে। ('Roll of Honour',—P. 200)

তাই হয়তো বিদেশ থেকে বন্দী করে আনীত বিনায়ক সাভারকরকে সাধারণভাবে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের নায়করূপে অভিযুক্ত করা হল। কারণ, তিনি যে প্রকাশ্য সংঘ ঐ 'অভিনব ভারতে'র নেতা! তাঁর বিরুদ্ধে বিপ্লব-কর্মের তেমন কিছু প্রমাণ না-থাকে না-থাক—তাঁকে চিরজীবন বন্দী করে রাখতেই হবে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম! ব্রিটিশের বিচারে ১৯১০ সালের ২৪শে ডিসেম্বর বিনায়ক সাভারকরের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হল। অপর আসামীরা প্রায় সকলেই নানা ক্রমের কারাদণ্ড লাভ করলেন।···

দ্বিতীয় নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা

কয়েক দিনের মধ্যেই 'দ্বিতীয় নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করা হল বিনায়ক সাভারকরকেই 'জ্যাক্সন-হত্যা'-প্ররোচনার দায়ে

অভিযুক্ত করে। এখানেই পুলিশ কিন্তু অভিমত প্রকাশ করেছিল যে, অনন্তলক্ষ্মণের হাতের পিস্তল এই সাভারকরই পাঠিয়েছিলেন প্যারি থেকে। সাত দিনেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কর্মচারীরা বিচার-কার্য সমাপ্ত করল। ৩০শে জানুয়ারি বিনায়ক সাভারকর দ্বিতীয় দফায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড লাভ করলেন!...

বিনায়কের দাদা গণেশ সাভারকর মহারাষ্ট্রে বিপ্লবীদল সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন। একখানা স্বদেশাত্মক কাব্য-পুস্তক লেখার অপরাধে ১৯০৯ সালের ৯ই জুন তাঁকেও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড দিয়ে আন্দামান সেলুলার জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। গণেশ সাভারকরের সে-পুস্তকের নাম ছিল 'লঘু অভিনব ভারত মেলা'।

মহারাষ্ট্রের রাজনীতিক-ইতিহাসে শুধু নয়—সারা ভারতবর্ষের সংগ্রামী-জীবনে সাভারকর-ভ্রাতৃদ্বয়ের অবদান অতুলনীয়। শৌর্যের পূজারী এই বীরদ্বয়ের বন্দী-জীবনও তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁরা কোন কালে পরাধীনতা, অমর্যাদা, অন্যায়, আত্মসেবী-আত্মপ্রসারতা ও কাপুরুষতার সঙ্গে আপোষ করেননি। দু'টি ভাই দীর্ঘকাল আন্দামান সেলুলার জেলে কাটিয়েছেন। বন্ধন-দশা থেকে মুক্তিলাভের বৈপ্লবিক চেষ্টায় তাঁরা অসম্ভব দুঃসাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন। অশান্ত, চির-বিদ্রোহী এই তরুণদ্বয়। কিন্তু তাঁদের হৃদয়ে স্থাপিত ছিল দেশ-জননীর পাদপদ্ম। তাই অন্তরে ছিল তাঁদের প্রশান্তি, গভীরতম আত্মস্থতা।...

বিনায়ক সাভারকর তাঁর জীবনের সায়াহ্নেও যে খাঁটি 'বিদ্রোহী' ছিলেন তার পরিচয় এখানে দেব। আমরা জানি, নেতাজি এই বৃদ্ধ বিদ্রোহীর অক্লান্ত তারুণ্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই তাঁর মতামত জানতে গিয়েছিলেন তিনি দেশ থেকে পালাবার পূর্বে। সাভারকর মন দিয়ে শুনেছিলেন সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাব! দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের সুযোগ নেবার যে-সংকল্প তিনি

করেছিলেন, তা সাভারকরের সাগ্রহ সমর্থন লাভ করেছিল। সাভারকর অনুমোদন না করলেও নেতাজি সে-সুযোগ নিতেন। সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল যে, অতি প্রাচীন সাভারকর এবং অতি তরুণ সুভাষচন্দ্রের চিন্তাধারা একই গতিবেগে তখনো প্রবাহিত ছিল। ১৯০৬ সালের সাভারকর ১৯৪০ সালেও 'ইস্পাতের মত তীক্ষ্ণ' ঝক্‌ঝকে বিদ্রোহী-মনের অধিকারী ছিলেন বলেই তরুণ বিপ্লবী সুভাষ, আগামী কালের বিপ্লবী-মহানায়ক 'নেতাজি' সংগোপনে পরামর্শ চাইতে গেলেন তাঁরই কাছে—ভারতের অপর কোন নেতার কাছে নয়।···

সাভারকর চির-বিদ্রোহী। সাভারকর চিব-তরুণ। ভারতবর্ষের সৌভাগ্যবিধৃত-ললাটে দুলতে থাকা উজ্জ্বল রত্ন এ-দু'টি ভাই।···

॥ পাঁচ ॥

বিপ্লব-তরঙ্গে বিধৌত অন্যান্য প্রদেশ

মাদ্রাজ

১৯০৭ সালে কলকাতার চিফ্. প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্-ফোর্ডের কোর্টে আদালত-অবমাননার দায়ে বিপিনচন্দ্র পালের ছ' মাস কারাদণ্ড লাভের কথা আমরা বলেছি। কিন্তু বলা হয়নি বাঙলা পেরিয়ে সর্বভারতে সর্বভারতীয় এই নেতার দণ্ডলাভে কী আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তার কথা।

এ-অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ এবং জাতীয়তাবাদী কাগজ ও প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর বিক্ষোভ চতুর্দিকে ফেটে পড়ে। কিন্তু সেই বিক্ষোভ বিশেষ করে মাদ্রাজে গুপ্ত-সমিতি গড়ে-ওঠার এবং বিপ্লবী-কর্মকাণ্ডে প্রেরণা দেবার পথে যে (অন্তত পরোক্ষভাবে) কতদূর সহায়ক হয়েছিল, তা অনেকেরই জানা নেই।

মাদ্রাজে বিপিনচন্দ্রের প্রভাব ছিল বিস্তর। কারণ, স্বামী বিবেকানন্দের লীলাভূমি মাদ্রাজ ইতিপূর্বেই প্রগতিশীল মনের অধিকারী হয়ে উঠেছে। বিপিনচন্দ্রের উপর নির্যাতন তাই মাদ্রাজী-যুবশক্তির অন্তরে তীব্র দাহ সৃষ্টি করল। মাদ্রাজের কণ্ঠে বিপিনচন্দ্র 'লায়ন্ অব্ স্বরাজ' (Lion of Swaraj) রূপে অভিহিত হলেন। চিদাম্বরম্ পিলাই, সুব্রহ্মণ্যশিবম্ প্রমুখ ব্যক্তি বিপ্লব-মন্ত্রে কিছু পূর্বেই দীক্ষিত হয়েছিলেন। বিপ্লবী তারক দাসের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন চিদাম্বরম্ পিলাই। তাঁরা বহু সভায় বিপিনচন্দ্রের নির্যাতন লাভের সূত্র ধরে ইংরেজের বিরুদ্ধে অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দিলেন। তাঁরা জানিয়ে দিলেন যে, পূর্ণ স্বরাজ ভারতের একমাত্র কাম্য—সেখানে ইংরেজের ছায়া মাত্র থাকবে না।

ইংরেজের এসব সহ্য হবে কেন ? তাই গ্রেপ্তার হলেন চিদাম্বরম্ ও সুব্রহ্মণ্যশিবম্। ফলে, স্থানে স্থানে আন্দোলন শুরু হল। পুলিশ ক্ষিপ্ত হয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলল। দাঙ্গা বেধে গেল নানা ক্ষেত্রে। ধর-পাকড় এবং জাতীয়তাবাদী কাগজগুলোর উপর নির্যাতন থামার লক্ষণ দেখা গেল না। এদিকে দেশ জুড়ে শুরু হল গোপন-ইস্তাহার ও পত্র-পত্রিকা বিলি করার পালা। তাতে ইংরেজ-শাসন নাশনের জ্বলন্ত আহ্বান আক্ষরিত হতে থাকল।[1] সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবের বাণীকে রূপায়িত করার আগ্রহে গুপ্ত-সমিতি সক্রিয় হয়ে উঠল।

টিউটিকোরিনে এ-আন্দোলন ক্রমে অগ্নিস্রাবী হয়ে দেখা দিল। কৃষ্ণস্বামী বিদ্রোহ প্রচারের দায়ে দণ্ডিত হলেন। চিদাম্বরম্ পিলাই-এর গ্রেপ্তারের জন্য বেজওয়াদায় 'রাজ' নামক পত্রে 'ফিরিঙ্গিরাজের ধ্বংস' কামনা করে এক প্রবন্ধ বের হল। ফলে, উক্ত কাগজের প্রকাশ সরকারী-শাসনে বন্ধ হয়ে গেল।

ব্রিটিশী-সন্ত্রাসবাদের প্রত্যুত্তরে বিপ্লবীদের গুপ্তপথে বিচরণ চেষ্টা বহু দূর এগিয়ে যায়। তাঁদের বিপ্লবী-সংস্থার নাম ছিল 'ভারতমাতা এ্যাসোসিয়েশান্'।

১৯১০ সালে শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার লণ্ডনস্থ 'ইণ্ডিয়া হাউস' থেকে বিপ্লব-প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে আসেন ভি. ভি. এস্. আয়ার। পণ্ডিচারিতে তিনি তরুণদের সঙ্গোপনে রিভল্বার ছুঁড়বার কায়দা শেখাতে থাকেন। এদিকে নীলকান্ত ব্রহ্মচারী ও শঙ্করকৃষ্ণ আয়ার নামক দুই ব্যক্তি দক্ষিণের নানা কেন্দ্রে বিদ্রোহের বাণী ছড়িয়ে যাচ্ছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরে ওয়াঞ্চি আয়ার তাঁদের সঙ্গে জুটে গেলেন। ওয়াঞ্চি ছিলেন শঙ্করকৃষ্ণের আত্মীয় এবং বন-বিভাগীয় একজন সরকারী কর্মচারী। নীলকান্ত ব্রহ্মচারীর কাছে নিয়েছেন তিনি বিদ্রোহের দীক্ষা। ওয়াঞ্চি পণ্ডিচারির খবর পেয়েছেন। তিন মাসের ছুটি নিয়ে চলে এলেন তিনি ভি. ভি. এস্. আয়ারের কাছে। তাঁর সঙ্গে ওয়াঞ্চির সবিশেষ গোপন আলোচনা হয়। ('বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি',—পৃঃ ২৯৫)

অ্যাশ্‌-হত্যা

ওয়াঞ্চিদের গুপ্ত-সমিতি ইতিপূর্বেই স্থির করেছিল যে, টিনেভেলি জিলার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ অ্যাশ্‌কে ইহধাম থেকে সরাতে হবে। অ্যাশ্‌ সাহেবের উদ্দেশ্যে একটি বেনামী-পত্রও পাঠান হয়েছিল। সে-পত্রের মর্ম ছিলঃ 'ভারতমাতা এ্যাসোসিয়েশান্‌-এর সাবধান-বাণী শোনো, জনসাধারণের কোন কাজে তুমি নাক ঢোকাতে এসো না ; আমাদের নিষেধ অমান্য করলে মুহূর্তে তোমার মাথা গুঁড়িয়ে দেব।...'

('Roll of Honour', P. 222)

অ্যাশ্‌ স্বভাবতই এসব ছেলেখেলায় নজর দেননি। তিনি ইংরেজ-শাসনের প্রমত্ত প্রতিভূ। তাঁর কর্তব্য স্বদেশী-কণ্ঠকে নির্বিচারে স্তব্ধ করে দেওয়া। তাঁর কাজ দূর থেকে ছুঁড়ে-মারা কারো হুম্‌কি গ্রাহ্য করা নয়।

সেদিন ১৭ই জুন, ১৯১১ সাল। অ্যাশ্‌-দম্পতি টিনেভেলি থেকে রওনা হয়েছেন ট্রেণে। তাঁরা মানিয়াঞ্চি-জংশনে ট্রেণ বদল করে কোদাইকানালের গাড়ি ধরবেন। ওয়াঞ্চি আয়ার টিনেভেলি থেকেই ট্রেণে তাঁদের সঙ্গ নিলেন অতি গোপনে। জংশনে পৌঁছে কোদাই-কানালের গাড়ির প্রথম শ্রেণীর কামরায় এসে বসলেন অ্যাশ্‌-দম্পতি। ...হঠাৎ গর্জে উঠল মৃত্যু-গর্জনে ওয়াঞ্চি আয়ারের রিভল্‌বার।...দুর্জয় ব্রিটিশ-শাসক মিঃ অ্যাশ্‌ কাদামাটির মূর্তির মত ধূলায় গড়িয়ে পড়লেন। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের সূর্যাস্তবিহীন বিপুল পরিসরেও তাঁর জন্যে আর এতটুকু স্থান রইল না!...

ওয়াঞ্চি আয়ারের আত্মবিলয়ন

অ্যাশ্‌-হন্তারক ওয়াঞ্চি আয়ারও ব্রিটিশের বিচারশালাকে পাত্তা দিতে নারাজ। তিনি ঘটনাস্থল থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে নিজের

রিভল্‌বারের বুলেট চালিয়ে দিলেন নিজের গ্রীবাদেশে। মৃত্যুর সাথে ঘটে গেল অজেয় বীরের মিতালি। ভাবীকাল এই মৃত্যুর মধ্যে 'মৃত্যুহীন'-রূপে তাঁকে বরণ করে নিল।...

এবার পুলিশের তাণ্ডব দেখে কে! তাদের অত্যাচার ভীষণ নগ্ন হয়ে প্রমাণ করে দিল যে, এই মুষ্টিমেয় মৃত্যুহীন-তরুণদল সসাগরা পৃথিবীর মালিকদের কাছেও ভয়াবহ। তার কারণ, তাঁরা একটি 'মতবাদ'কে লালন করে আপন রক্ত দিয়ে তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় তৎপর। সেই মতবাদ বড়ই নিষ্ঠুর, বড়ই যুক্তিপূর্ণ। তাঁরা বলেছেন: 'যে-কোন উপায়ে ইংরেজকে তাড়িয়ে আমরা আমাদের দেশে আমাদের শাসন, আমাদের রাজ্য স্থাপন করব।'...নিজের শাসন স্থাপিত করার সংকল্প যেমন যুক্তিপূর্ণ, ইংরেজকে না তাড়িয়ে সে-শাসন স্থাপন করা যে অসম্ভব, তাও তেমনি যুক্তিপূর্ণ। সুতরাং ইংরেজ অন্তত বোঝে যে, এই 'মতবাদ' সাধারণ বাক্যালাপ নয়; একে জাগ্রত করার ভার যেভাবে এই বিদ্রোহীদল গ্রহণ করেছেন, তাতে বিপদ অসামান্য।

ভেঙ্কটেশ্বর ও ধর্মরাজের আত্মদান

ধর-পাকড় সুরু হয়ে গেল। বহু তরুণ গ্রেপ্তার হলেন। দায়ের হয়ে গেল 'টিনেভেলি ষড়যন্ত্র মামলা'। আসামীদের মধ্যে ভেঙ্কটেশ্বর আয়ার এবং ধর্মরাজ আয়ারও শাসকের দণ্ডগ্রহণের জন্য অপেক্ষা না করে আত্মবিলয়ন ঘটালেন বন্দী অবস্থায়ই। সেটা অক্টোবর মাস, ১৯১১ সাল। বাকি যাঁরা রইলেন তাঁদের নানাক্রমে সাজা হল মাদ্রাজ হাইকোর্টের স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল থেকে।

বিহার-উড়িষ্যা-মধ্যপ্রদেশ-উত্তরপ্রদেশ-বর্মা

বিপ্লবের আহ্বান অল্প-বিস্তর ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। যুগান্তর, অনুশীলন ও চন্দননগর-বিপ্লবীদলের মাধ্যমে এসব প্রদেশে এই যুগে গুপ্ত-সমিতি গড়ে তোলার চেষ্টা দেখা যায়। বাঙলার

প্রচণ্ড বিপ্লব-প্রবাহের ঢেউ এসে লেগেছিল ঐ দেশগুলোর তটে। কিন্তু তার সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী আলোড়ন সকল ভূমিতেই তেমন করে স্বাক্ষরিত হয়নি।

উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে অবশ্য শচীন সান্যালের সংগঠন-ক্ষমতায় এবং রাসবিহারী বসুর অতুলনীয় নেতৃত্বে বৈপ্লবিক-আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়ায়। তবে তার প্রচণ্ড প্রকাশের কাল আরো পরে। যথাস্থানে তা বিবৃত হবে।

বর্মার কাহিনী

বর্মার পথে বহির্ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে ভারতে বিপ্লব সৃষ্টি করার প্ল্যান বিপ্লবীদের মাথায় ছিল। ডাঃ যাদুগোপাল লিখেছেন ঃ "এই উদ্দেশ্যে (ভারতে বিপ্লব সৃষ্টি করার প্ল্যান্ অনুসারে) ক্ষীরোদগোপালকে ১৯০৮ সালে বর্মায় পাঠানো হয়। তিনি প্রথমে রেঙ্গুনে ডেরা বাঁধেন। সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে শ্যামে পাঠানো হয়। ভোলানাথ শ্যামে বিপ্লবী-কেন্দ্র গড়ে তোলেন। কুমুদ মুখোপাধ্যায় নামক উকিল এবং অমর সিং নামক ইঞ্জিনিয়ার 'কাজের' বিশেষ ভারপ্রাপ্ত হন। ভোলানাথ আমায় সাংকেতিক চিঠি লিখতেন। সে-চিঠি আসত বর্মায় ক্ষীরোদগোপালের কাছে। তারপর ক্ষীরোদগোপাল সে-চিঠি আমায় পাঠিয়ে দিতেন।...অবশেষে ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তারিত হয়ে পড়লে ক্ষীরোদগোপাল গ্রেপ্তার হন। মাসিদি খান্-এর মারফৎ কিছু অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে বিপ্লব-প্রচারে তাঁর অংশ ছিল।" ('বিঃ জীঃ স্মৃঃ,'—পৃঃ ৩১০-৩১১)

এছাড়া বর্মায় বিশেষ কিছু কর্মকাণ্ডের ইতিহাস নেই। ১৯১৬ সালে মান্দালয়ে দু'টি ষড়যন্ত্র মামলা হয়। ভারত থেকে তৎকালে বিদেশস্থ ভারতীয়-বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং বিদেশ

থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানির ব্যবস্থা করার তাগিদেই বর্মা-অঞ্চলে সংগঠন স্থাপনের প্রয়োজন ছিল। অধিকন্তু, বর্মীদের মধ্যে বিপ্লবানুগ মানসিকতা ভারতীয় বিপ্লবীরা ভাল করেই অনুভব করেছিলেন।

যাদুগোপাল মুখার্জি আরো জানাচ্ছেন তাঁর জীবনস্মৃতি গ্রন্থে: "জার্মানরা 'গদর' দলের সহযোগে যে কাজ করতে চেয়েছিল, তা অতি ভয়ানক। আমেরিকা-প্রত্যাগত শিখরা শ্যামের কোন স্থানে অস্ত্রশস্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বর্মাদেশ আক্রমণ করবে। সেই সময় সৈন্য ও মিলিটারি পুলিশও বিদ্রোহ করবে। শ্যাম-বর্মার সীমান্ত-রেলে জার্মান ইঞ্জিনিয়ার ও পাঞ্জাবী শ্রমিকেরা কাজ করছিল। বর্মা থেকে ভারত আক্রমণের কথাও ছিল।" (পৃঃ ৩১৪)

বর্মায় সোহনলাল

সোহনলাল পাঠক একজন আদর্শ বিপ্লবী। নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীদের প্ল্যান্—বর্মা আক্রমণ করে, ভারতবর্ষে পৌঁছে, ভারতকে শৃঙ্খল-মুক্ত করার প্ল্যান্—সোহনলালকে স্বপ্নচারী করে তুলল। তিনি স্বদেশে ও বিদেশে ঘুরে ঘুরে পরিশেষে আমেরিকায় এসে বিপ্লব-প্রচারে ব্রতী হলেন। ১৯১৪ সালেও তিনি আমেরিকাবাসী। কিন্তু পুলিশের তাড়নায় তাঁকে আবার শ্যামদেশে ফিরে আসতে হয়। 'গদর পার্টি' তখন কর্ম-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সোহনলাল পুরাতন বন্ধুদের মাধ্যমে গদর পার্টির কর্মসূত্রে জড়িয়ে গেলেন। বিপ্লবের বাণী কণ্ঠে নিয়ে তিনি বর্মায় উপস্থিত হলেন। ইণ্ডো-জার্মান প্ল্যান্ নিজের তরফ থেকেই তাঁকে কার্যকরী করতে হবে। সেটা ১৯১৫ সাল। সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সোহনলালের বৈপ্লবিক প্রচারকার্য এগিয়ে চলল। তাঁর স্বদেশপ্রেম ও আত্মভোলা কর্মনিষ্ঠা সৈন্যদলের কাছে একটি বিস্ময়কর নূতন বস্তু। তাদের মধ্যে তাঁর প্রতি আনুগত্যের ঝোঁক দেখা গেল। সোহনলাল ক্রমশ সৈন্যদের হৃদয়ের মানুষ হয়ে উঠলেন। তিনি তাদের

বলেছেন ঃ "কেন ভাই ইংরেজের জন্যে প্রাণ দেবে? স্বদেশ তোমার পড়ে রইল যে বিধর্মীর অধীনে! মাতৃভূমির জন্যে প্রাণদান বীরেরই কর্তব্য।" ('বিঃ জীঃ স্মৃঃ'—পৃঃ ৩১৪)

কিন্তু 'বিভীষণ' সকল প্রান্তেই ছড়িয়ে আছে। সৈন্যদের মধ্য থেকেই এক বিশ্বাসহন্তা সোহনলালকে গ্রেপ্তার করে বসল। তখন তিনি গোপনে ছাউনির অভ্যন্তরে ঢুকে বিদ্রোহ-বাণী প্রচার করছিলেন। সোহনলালের কাছে দু'টি পিস্তল ও কিছু সন্দেহজনক কাগজপত্র পাওয়া গেল। তাঁকে বন্দী করে পাঠান হল মান্দালয় জেলে।··· সোহনলাল ঐ গ্রেপ্তারকারী জমাদারকে কোন তিরস্কার করেননি। সস্নেহে শান্তকণ্ঠে শুধু বলেছিলেন ঃ "ভাই হয়ে ভাইকে তুমি ধরিয়ে দেবে?"···কিন্তু তথাকথিত ঐ 'ভাই'-এর রক্তে যে তখন লোভাতুর 'বিভীষণ' দাপাদাপি করছে!···

১৯১৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর মান্দালয় জিলা-জজের আদালতে তাঁর বিচার শুরু হয়। পরদিনই তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দান করে পরিতৃপ্ত হলেন ব্রিটিশ-বিচারক।

মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শোনানোর পর বর্মার লাট তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ক্ষমা-ভিক্ষা করার জন্য পরামর্শ দেন। তাতে ফাঁসির দণ্ড হ্রাস করার আশ্বাস ছিল। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ী তরুণ সহাস্যে লাটকে উত্তর দিলেন ঃ "তোমার কাজ তুমি কর, আমার কাজ আমি করে যাই।"···

১৯১৬ সালের জানুয়ারি মাসে পাঞ্জাবের সোহনলাল বর্মাদেশের মান্দালয় জেলে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলেন। ভারতবর্ষের তরুণ বিপ্লবী সারা পৃথিবীর পথে-প্রান্তরে পরাধীনতার ব্যথা-বেদনা ব্যক্ত করে অবশেষে বর্মার ভূমিতে এসে প্রাণ দিয়ে বিপ্লবের 'প্রাণ'কে প্রতিষ্ঠিত করবার গৌরব পেলেন। আমরা জানি, তাঁর সতীর্থদের

সেদিনকার কর্ম ব্যর্থ হয়নি। তাঁরা যদিও তখন জানতেন না, কিন্তু এখন তাঁদের বিদেহী-আত্মার অজানা নেই যে, এই বর্মার কূলেই ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম ও সার্থকতম 'বিপ্লব' সংঘটিত হল ১৯৪১-'৪৫ সাল ধরে। এই বর্মার প্রান্তরেই মহানায়ক রাসবিহারী তাঁর অসমাপ্ত বিপ্লব-চেষ্টাকে সমাপ্তির পথে এনেছিলেন। এখান থেকেই নেতাজির 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' ইম্ফল-রণাঙ্গনে ব্রিটিশের বাহিনীকে আক্রমণ করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-প্রাপ্তি সম্ভব করেছিলেন। সফল হয়েছিল জেম্স্ বল্ডিন্-এর ভাষায় বাইবেলের উক্তি, "God gave Noah the rainbow sign, No more water, the fire next time !"···

পাঞ্জাব

বিদ্রোহীর লীলাভূমি পাঞ্জাব। মহারাষ্ট্রের মত পাঞ্জাবও তার শৌর্য-বীর্য ও অদূর অতীতের কীর্তি-গাথা পরাধীনতার গ্লানিতেও ভুলতে পারেনি। কাজেই বারে বারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ আমলেও পাঞ্জাব বিদ্রোহ করে এসেছে। গুরুগোবিন্দের পাঞ্জাব, রঞ্জিৎ সিংহের পাঞ্জাব আত্মমর্যাদায় ও দুর্জয় পৌরুষে সুন্দর। বিদ্রোহের বাণী তার মজ্জায়। বিপ্লবী-বাঙলার তাই সে চিরসাথী। 'লাল-বাল-পালে'র ভারতবর্ষে পাঞ্জাবকেশরী লাজপৎ রায়ের সংগ্রামী নেতৃত্বে সে-যুগের পাঞ্জাব ক্রমে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠ্ছে।

যাদুগোপাল লিখেছেন ঃ "রাওয়ালপিণ্ডি, শিয়ালকোট, লায়ালপুর, অমৃতসর, ফিরোজপুর, লাহোর প্রভৃতি স্থানে ১৯০৭ সালে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব ও মতপ্রচার দেখা যায়। লাহোরে দু'একবার কয়েকজন ইংরেজকে অপমান করা হয়। সভা-সমিতি বিস্তর হচ্ছিল। পুলিশের লোক ও সৈন্যদের ইংরেজের চাকুরি ছাড়তে উত্তেজিত করা হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রেলের কর্মচারীরা ধর্মঘট করলে তাদের

প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে সভা-সমিতি হতে থাকে। নেতারা তখনই বাহুবলে বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে ইংরেজকে দেশছাড়া করার কথা ভাবছিলেন। ১৯০৭ সালেই ইংরেজ-সরকার লালা লাজপৎ রায় এবং সর্দার অজিত সিংকে বর্মার জেলে দেশান্তরী করেন।”

('বিঃ জীঃ স্মঃ',—পৃষ্ঠা ৩০৪)

১৯০৯ সালে বিদ্রোহ-বহ্নি আরো ছড়িয়ে গেল। অজিত সিং বিদ্রোহ-কর্মে একান্ত নিষ্ঠায় অগ্রণী হওয়াতে তাঁকে কয়েদ করার আয়োজন হচ্ছিল। তিনি তা আঁচ করে পারস্যে পালিয়ে গেলেন। সর্দার কিষণ সিং ও লালচাঁদকে জেলে ঢোকানো হল। ভাই পরমানন্দের কাছে মানিকতলা বোমার ফরম্যুলা এবং লাজপৎ রায়ের রাজদ্রোহমূলক পত্র পাওয়াতে তাঁকে মুচলেকা দিয়ে জেলের বাইরে থাকতে দেওয়া হল। লণ্ডনে অবস্থিত কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে পাঞ্জাবের বিদ্রোহীদের যোগাযোগ লাজপৎ রায়ের পত্র থেকে পুলিশ জানতে পারে।

লর্ড হার্ডিঞ্জ-এর উপর বোমা নিক্ষেপের পর ঐ ১৯১২ সালেরই ৭ই মে লাহোরের পথে একটি বোমা সন্নিবেশিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল গর্ডন নামক রাজপুরুষকে হত্যা করা।

লালা হরদয়াল বিলেতে এসে প্রচণ্ডভাবে ব্রিটিশদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তিনি আমেরিকায় চলে যান এবং 'গদর' দল গঠনে তৎপর হন। গদর দলের কীর্তিকাণ্ড পরে যথাস্থানে বিবৃত হবে।

এদিকে রাসবিহারী বসুর সংস্পর্শে এসে পাঞ্জাবের বিপ্লবী দল এক সর্বভারতীয় বিপ্লব-সূচনায় স্বপ্নচঞ্চল। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে বিপ্লবী-ভারতে যোগ্য স্থান অধিকার করার সাধনায় পাঞ্জাবের বীরগণ স্বদেশে ও বিদেশে সংগোপনে কর্মরত। সে-সব কাহিনীও যথাস্থানে আসবে।

পাঞ্জাবেব বিপ্লবী-সংগ্রামের শেষ ও সার্থক প্রতীক হলেন উধম সিং। ১৯৪০ সালে তিনি বিলেতে পাঞ্জাবের প্রাক্তন গভর্ণর মাইকেল

ও'ডায়ারকে হত্যা করে ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ-হত্যা-কাণ্ডের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন।

অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, নেতাজির নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে-বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল, তা সর্বভারতীয় মহান বিপ্লব। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের সে-বিপ্লবই শেষ ভারতীয় বিপ্লব। সে-বিপ্লবেও পাঞ্জাবের দান গৌরবে ও মহিমায় উদ্ভাসিত। সেখানে ভারতের সকল প্রদেশ, সকল ধর্ম, সকল ভাষা ও সকল বর্ণের মানুষই এক প্রাণ ও এক মন হয়ে কর্মমগ্নতার একটি তীর্থ রচনা করেন। সেই বিপ্লব-তীর্থই 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' জাগ্রত মুক্তিতীর্থ।···

॥ ছয় ॥

বিপ্লবশৌর্যে বাঙলা

শ্রীঅরবিন্দ বঙ্গদেশে বৈপ্লবিক-সংস্থার পত্তন করেন। অভূতপূর্ব মনীষা, অশ্রুতপূর্ব যোগ ও সাধনা, প্রতিভা ও বোধ এবং অম্লান শৌর্য এ-সংস্থার নেতৃত্বে ছিল বলেই এর গতিবেগ অপ্রতিহত হয়ে ওঠে। ১৯০৫ সালের 'স্বদেশী আন্দোলনে'র সদ্ব্যবহার করার ক্ষমতা সংস্থার আয়ত্তে থাকায় সে-আন্দোলনের বিপুল প্রাণ-প্রবাহে তা প্রাণদীপ্ত হয়।

অরবিন্দের পাশে স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা লোকমাতা নিবেদিতা বিপ্লবিনীর বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা নিয়ে কর্মনিযুক্ত। দল-সংগঠনে প্রবুদ্ধ বারীন্দ্রকুমার, যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন মুখার্জি, উল্লাসকর দত্ত, দেবব্রত বসু প্রমুখ আরো কত শক্তিশালী তরুণ-সহায়কের সমাবেশ!

এদিকে শ্রদ্ধেয় পি. মিত্রের 'অনুশীলন সমিতি'ও শারীর-চর্চা এবং চরিত্র-গঠনের কার্যক্রম নিয়ে তরুণদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে আসছিল শুরু থেকেই। মিত্রমহাশয়ের সঙ্গে অরবিন্দের সাংগঠনিক-যোগাযোগ ঐতিহাসিক সত্য। তবে সশস্ত্র-বিপ্লবের চিন্তা মিত্র-মহাশয়ের কর্মকাণ্ডে ছিল না।

অনুশীলন সমিতি একটি পাবলিক প্রতিষ্ঠান। সর্ববাঙলায় এর বিস্তার কামনা করে এর স্রষ্টা ও সর্বাধিনায়ক পি. মিত্র পশ্চিমবঙ্গের সমিতির ভার দেন সতীশচন্দ্র বসুর উপর এবং পূর্ববঙ্গের শাখাটির ভার ন্যস্ত করেন পুলিন দাসের হস্তে। সতীশবাবু ও পুলিনবাবু যথাক্রমে উভয় বঙ্গের অনুশীলন সমিতির সম্পাদকরূপে বৃত হন। পুলিনবাবু তাঁর অতুলনীয় সাংগঠনিক ক্ষমতায় পাবলিক অনুশীলন সমিতিকেই

সংগোপনে দেশব্যাপী বিপ্লবী-সমিতিতে রূপান্তরিত করেন। এই বৈপ্লবিক-প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিনায়ক ছিলেন পুলিনবাবু; মিত্রমহাশয়ের উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ ছিল না।

অরবিন্দের বিপ্লবী দল এবং পুলিনবাবুদের বিপ্লবী দলের প্রেরণা যোগাচ্ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও 'অনুশীলন' গ্রন্থ এবং 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র।

স্বদেশীযুগেই কিংস্‌ফোর্ড ভ্রমে কেনেডিদের নিধন করলেন প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম বসু। সম্মুখ-সংগ্রামে বাঙলায় প্রথম আত্মবিলয়ন করে 'শহিদ' হলেন প্রফুল্ল চাকি। ফাঁসির মঞ্চে প্রথম আরোহণ করে 'শহিদ' হলেন ক্ষুদিরাম বসু। দুই ভাবে এঁরা দু'জনেই বাঙলার প্রথম শহিদ। এঁদেরও পূরযায়ী দু'জন শহিদ বিপ্লবী-বঙ্গে জন্ম নিয়েছিলেন। একজন তরুণ বিপ্লবী পুলিশের হাত থেকে সশস্ত্র অবস্থায় আত্মরক্ষা করেছিলেন চন্দননগরের ধারে-কাছে, চলন্ত ট্রেনের নিচে আত্মদান করে। অপর তরুণ উল্লাসকর দত্তের ফরমুালা অনুসারে তৈরি 'বোমা' পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বোমা-বিস্ফোরণে মৃত্যুবরণ করেছিলেন 'দিঘিরিয়া' পাহাড়ে। সেই তরুণ কিশোরের নাম প্রফুল্ল চক্রবর্তি। বোমা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রফুল্ল গেছেন বৈদ্যনাথে। সেটা ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। দিঘিরিয়া পাহাড়ে সেই বোমা নিক্ষেপ করে পরীক্ষা করার মুহূর্তে ভীষণ কাণ্ড ঘটে গেল। পাহাড়, বন, দিক্‌-দিগন্ত কাঁপিয়ে ফেটে গেল যথাসময়ের পূর্বেই ভীষণ বোমা। প্রফুল্ল নিজেকে সামলাতে পারলেন না, বলি হলেন বিদ্রোহী কিশোর। কর্মনিরত এই কিশোর 'শহিদে'র জ্যোতি ধারণ করে উর্ধ্বলোকে চলে গেলেন। কেউ জানল না, কেউ শুনল না, কি করে একটি বালক-তাপস তাঁর আরব্ধ কর্ম সফল করতে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে আপন হৃৎপিণ্ড শত খণ্ড করে দান করে দেশ-জননীর ঋণ শোধ করলেন! চোখের জলে তাঁর পিতা-মাতা, ভাই-বোন কত নিশি দুয়ার খুলে হয়তো বসে থাকতেন, কারো পদধ্বনি আচমকা

শুনে হয়তো চম্‌কে উঠতেন! কিন্তু পরম স্নেহাস্পদ সন্তান আর ফিরে এলেন না! খবর না দিয়ে যে চলে গেছে, খবর না দিয়েই নিশ্চয়ই তার পুনরাগমন হবে—আকুল কান্নায় তাই ভেবে মা-বাবার সান্ত্বনা। কিন্তু তা তো হবার নয়!···

এখানে মনে রাখতে হবে যে, প্রফুল্ল চক্রবর্তির মৃত্যুর মধ্য দিয়েই উল্লাসকব দত্তের ফরম্যুলার কার্যকারিতা প্রমাণিত হল। এবং মানিকতলা কেন্দ্র থেকে সে-সব ফরম্যুলা অনুযায়ী প্রস্তুত বোমা নিয়েই প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম বসু মাস দুই পরে মজঃফরপুর গিয়েছিলেন এ্যাক্‌শানে।···

অরবিন্দ-নিবেদিতাব তরুণ বাঙলার দুঃসহ পথে ভয়ঙ্কর যাত্রা শুরু হয়েছে সবার অজান্তে। মাঝে মাঝে দারুণ কর্মকাণ্ডে তার চোখ-ঝলসানো রূপ দেখে বিস্মিত দেশবাসীর আত্মপ্রত্যয় জাগে, ব্রিটিশ-শাসন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে সন্ত্রস্ত হয়।···

আলিপুর বোমা-ষড়যন্ত্র মামলা

মজঃফরপুর এ্যাক্‌শানের তারিখ ছিল ৩০শে এপ্রিল, ১৯০৮ সাল। তার একদিন পূর্বে অরবিন্দ তাঁর 'বন্দেমাতরম্‌' কাগজে লিখেছিলেন :

"Revolution, bare and grim, is preparing her battle-field moving down the centres of order which were evolving a new cosmos and building up the materials of a gigantic downfall and a mighty new creation. We could wish it otherwise. But God's will be done!" ('Bandemataram'—29th April, 1908)

[মর্মার্থ হল : কঠিন ও নিরঙ্কুশ 'বিপ্লব' তার প্রলয়ঙ্কর অভিযান রচনায় সক্রিয়। বিপুল পতন এবং তৎস্থলে নূতনতর বিরাট সৃষ্টি

সে-বিপ্লবের পদক্ষেপে। আমরা অন্য রূপ চাইলেও গত্যন্তর নেই। বিধাতার ইচ্ছাই জয়ী হবে।]

বৈদ্যনাথের পাহাড়-শীর্ষে বোমা-বিস্ফোরণে প্রফুল্ল চক্রবর্তির মৃত্যুতেই পুলিশ সচকিত হয়ে উঠেছিল। তাই অরবিন্দের নির্দেশে বৈদ্যনাথের বোমার আড্ডা কলকাতায় সরিয়ে আনা হল। কিন্তু মানিকতলায় ও মুরারিপুকুরের আড্ডায় বারীনবাবু তেমন সতর্ক হলেন না।

এরপর এল মজঃফরপুর এ্যাক্শানের সংবাদ। কিন্তু অরবিন্দের কাছ থেকে পুনঃ পুনঃ নির্দেশ আসা সত্ত্বেও বারীনবাবু অন্যায়ভাবে অসতর্কই থাকলেন। তাঁর অশোভন নিষ্ক্রিয়তার ফলে পুলিশ ২রা মে (১৯০৮) রাত্তিরে মুরারিপুকুরের আড্ডা থেকে বহু অস্ত্রশস্ত্র, বোমা ও সন্দেহজনক কাগজপত্রসহ কতিপয় যুবককে গ্রেপ্তার করে। তাছাড়া এই অসতর্কতার সুযোগে একই রাতে ১৫নং গোপী দত্ত লেন, ১৩৪নং হ্যারিসন রোড, ৩৮-৪নং রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট ইত্যাদি আড্ডাকেন্দ্র থেকেও মালপত্রসহ লোকজন ধরা পড়েন। ধৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা একচল্লিশের মত।

২রা মে তারিখেই রাতে অরবিন্দের গৃহ পুলিশ ঘিরে রাখে এবং ভোর পাঁচটায় অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে। ভারতবর্ষের মহান বিপ্লবী নেতা, ভাবীকালের পৃথিবীখ্যাত 'সুপারম্যান্' শ্রীঅরবিন্দকে পুলিশ-সুপার ক্রেগান হাতে হাত-কড়া পরিয়ে, কোমরে দড়ি বেঁধে বন্দী করে ফেললেন। সেই দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে রইল স্বদেশী একটি হিন্দুস্থানী কনস্টেবল। তারপর শৃঙ্খলিত বন্দীকে হাঁটিয়ে নেওয়া হল সরকারের প্রয়োজন মত দূরত্বে।...

ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ৩৮ জনকে দু'টি দলে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হল। অতঃপর মামলা গেল দায়রায়।

প্রথম দলের মামলা ৪ঠা মে থেকে ১৮ই আগস্ট এবং দ্বিতীয় দলের মামলা ১৪ই অক্টোবর থেকে ৪ঠা মার্চ (১৯০৯) পর্যন্ত চলল।

৬ই মে (১৯০৯) সেসান জজের রায় বেরুল। বারীন ঘোষ ও উল্লাসকরের মৃত্যুদণ্ড এবং অপরদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর থেকে নানা ক্রমের দণ্ড হল। অরবিন্দ বেকসুর খালাস পেলেন।

সেসান জজ মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌ট্‌-এর সঙ্গে দু'জন এ্যাসেসার ছিলেন। তাঁদের নাম গুরুদাস বসু ও কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়। মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌ট্‌ কেমব্রিজে অরবিন্দের সহপাঠী ছিলেন। মিঃ সি. আর. দাশ ছিলেন অরবিন্দের পক্ষে ব্যারিস্টার; মিঃ নর্টন ছিলেন সরকারী পক্ষের কৌঁসুলি।

অতঃপর ২৩শে নভেম্বর (১৯০৯) হাইকোর্টের বিচারও সমাপ্ত হয়ে রায় বেরুল। জানা গেল যে, বারীন ঘোষ ও উল্লাসকর দত্তের মৃত্যুদণ্ড রদ করে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা দেওয়া হয়েছে। অপরদের মধ্যে কতকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বহাল রেখে, পাঁচজন ব্যতীত বাকিদের সাজা দেওয়া হয়েছে নানা ক্রমের। একজন মুক্তি পেলেন। অশোক নন্দী বিচারকালেই কারাকক্ষে দেহত্যাগ করে 'শহিদ' হলেন। পাঁচজনের সম্পর্কে জজেরা একমত না হওয়ায় তৃতীয় জজের কাছে তাঁদের মামলা পাঠান হল। সেই জজের বিচারে তিনজন খালাস পেলেন এবং দু'জনের নিম্ন-আদালতের সাজাই বহাল রইল। শেষের রায়টি দেওয়া হয়েছিল ১৯১০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি।

অরবিন্দের মামলা এবং মুক্তিলাভ পৃথিবীর বিচার-ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে দু'টি কারণে। প্রথমত, এর প্রধান আসামী ছিলেন তৎকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী-নেতা এবং ভাবীকালের পৃথিবীর সর্ববরেণ্য 'সুপারম্যান্' শ্রীঅরবিন্দ। দ্বিতীয়ত, বিনা অর্থে অথচ প্রভূত ধৈর্য, অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও পাণ্ডিত্যে এই তরুণ আসামীটির পক্ষ সমর্থন করেছিলেন তৎকালের তরুণ ব্যারিস্টার মিঃ সি. আর. দাশ, অর্থাৎ ভাবীকালের সর্বোত্তম আইন-জীবীদের অন্যতম ও ভারতীয় জন-নেতাদের অগ্রগণ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

আলিপুর মামলা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংগ্রামী-ইতিহাসের একখানি নিগূঢ় সংকেত। এখানে অফুরন্ত 'দেশপ্রেম' নবীন কৌঁসুলির রূপ ধারণ করে নিগৃহীত 'দেশপ্রেম'কে দম্ভ ও সর্বগ্রাসী পাশবিক শক্তির আক্রমণ থেকে প্রাণ ঢেলে প্রাণদান করেছে। যে মহান বিপ্লবী কারাকক্ষে 'বাসুদেব-দর্শন' লাভ করে এবং পণ্ডিচারিতে ঋষি ও ভগবৎদ্রষ্টার গৌরবে বিশ্ববাসীকে আলোকদান করে বারে বারে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'নমস্কার' পেয়েছিলেন—তাঁরই বিরাট স্বরূপ চিত্তরঞ্জন তাঁর বিপুল হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি আলিপুর মামলাটিকে একখানি অনন্য তপস্যার গৌরবে গ্রহণ করে জয়মাল্য লাভ করতে পেরেছিলেন। এই মামলাকে ঘিরে যে স্বদেশ-প্রেম ও কর্মসাধনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল, তার দৃশ্য ও অদৃশ্য তরঙ্গদোলা দোল দিতে থাকল ভারতবর্ষের সংগ্রামী-মনকে ভাবীকাল পর্যন্ত।

অরবিন্দের কারাবাস এবং তিলকের ছ' বছরের কারাদণ্ড ভোগ ব্যর্থ হল না, ব্যর্থ হল ব্রিটিশের সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা।

১৯০৮ সালের ২৭শে জুন 'কেশরী' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়ায় পত্রিকার সম্পাদক ও লেখকরূপে তিলক অভিযুক্ত হলেন। দীর্ঘ ছ' বছর কাল তাঁকে বর্মার মান্দালয় জেলে অবরুদ্ধ থাকতে হল। লোকমান্য তিলকের কারাদণ্ডে ভারতবর্ষের মানুষ তো বটেই, ইউরোপের ম্যাক্সমুলার প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিতরা পর্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তিলকের কারাদণ্ড এবং অরবিন্দের কারাবাস সমসাময়িক ঘটনা। ইংরেজের রাজ্য-বনিয়াদকে তারই এই হঠকারিতা প্রচণ্ড আঘাত দিল, ভারতবর্ষের সংগ্রামী-চিত্তকে এই হঠকারিতাই অপূর্ব প্রাণশক্তি দান করল।

১৯০৯ সালের মে মাসে অরবিন্দ মুক্তি পেলেন। আগস্ট মাসে ভগিনী নিবেদিতা ছদ্মনামে ও ছদ্মবেশে বোম্বাই জাহাজঘাটে অবতীর্ণ হলেন। কিছুদিনের জন্যে তিনি ইউরোপে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে

ভারতবর্ষে বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল। পুলিশ হয়ত ভারতে ফিরে আসতে দেবে না ভেবেই নিবেদিতা 'মিসেস মার্গারেট' নাম নিয়ে ছদ্মবেশে ভারতে ঢুকলেন। বোম্বাই থেকে সোজা কলকাতা না এসে মাদ্রাজ চলে গেলেন। কিছুদিন পর গোপনে চলে এলেন তিনি কলকাতায় তাঁর বাগবাজারের বাড়িতে। তিন সপ্তাহ বাড়িতে লুকিয়ে রইলেন। পরে আস্তে আস্তে বাড়ির বাইরে যাতায়াত শুরু করলেন। সবাই জানল নিবেদিতা ফিরে এসেছেন।

এ সেই জ্বালাময়ী অগ্নিশিখা যাঁর কণ্ঠে শুনেছি: "In Ireland we have a saying which history has verified, *England yields nothing without bombs*! Every step forward, every reform has always been wrested from the Government, and paid for by a handful of men. But Ireland is proud of its heroes. Where are the heroes produced by your generation?" (The Dedicated', P. 327) [আয়ারল্যাণ্ডে ইতিহাস-স্বীকৃত একটি প্রবাদ আছে যে, বোমার আঘাত ছাড়া ইংলণ্ড বিন্দুমাত্র স্বার্থ ছাড়ে না! এক পা অগ্রসর হতে হলে, একটি 'রিফরম্' আদায় করতে হলে এই গভর্ণমেণ্টের যূপ-কাষ্ঠে একদল তরুণকে আত্মদান করে মূল্য দিতে হয়। কিন্তু আয়ারল্যাণ্ড বীরপ্রসবিনী বলে গৌরবান্বিতা। অথচ তোমাদের বর্তমান কালে কোথায় জন্ম দিতে পেরেছ বীরবৃন্দের?]

এ-উক্তি তিনি করেছিলেন ১৯০৬ সালের কংগ্রেস-সভাপতি নৌরজির মুখকণ্ঠে ইংরেজের কাছে স্বায়ত্বশাসন-প্রার্থনার নীতির বিরুদ্ধে।

এ সেই অগ্নি-কন্যা নিবেদিতা, যাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: "Margot, go ahead always. Some day you will know peace and freedom. A Mother India will know victory"

[মার্গট্, তুমি এগিয়ে যাও—নিরন্তর। একদিন আসবে শান্তি ও মুক্তি তোমার মুঠোয়। ভারতমাতা হবেন বিজয়িনী।]

এহেন নিবেদিতাই তাই ১৯০৯ সালে ব্রহ্মানন্দ স্বামীর 'বিপ্লবের পথ ছাড়' আবেদনের উত্তরে বলতে পেরেছিলেন: "I cannot act otherwise, I am identified with this idea and I would die rather than abandon it." [ভিন্ন পথ অসম্ভব। এ-আদর্শে আমি নিবেদিত। এ আদর্শ বিসর্জন দেবার পূর্বে আমি মৃত্যুবরণে প্রস্তুত থাকব।]

ব্রহ্মানন্দের অনুরোধে নিবেদিতা লিখে দিলেন যে, মঠের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই।

'ফরাসী জীবন-চরিত' গ্রন্থে পাই: "When the return of Nivedita was officially known, Swami Brahmananda published for the second time the declaration of independence of the two parties (Nivedita and the Math-people)—a useful precaution." ('ফরাসী জীবন-চরিত', পৃঃ ৩১৭)

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্গে সঙ্গেই সংবাদপত্রে বিবৃতি দিলেন যে, রামকৃষ্ণ মঠের সাথে সিস্টার নিবেদিতার কোন সম্পর্ক নেই। নিবেদিতার কার্যকলাপ ও চলাফেরার জন্যে তিনি নিজেই দায়ী, মঠ বা সন্ন্যাসীদের কোন দায়িত্ব নেই।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ কাজটি ভালই করেছিলেন। তিনি সাবধান না হলে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পুলিশের অত্যাচারে বিনষ্ট হত।… নিবেদিতা বিবেকানন্দের মানস-কন্যা। অগ্নিস্রাবী-গিরি থেকে নির্গত গলিত-অগ্নির স্রোতোধারা এই বিপ্লবিনী। তাঁর গতিবিধি একটি আশ্রম বা একটি মঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। তিনি সর্বদেশের, সর্বলোকের, সর্বকালের। তাঁর গুরুর মতই তিনি ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষের সকল কাজের প্রাণদাত্রী। তাই তাঁকে দেখা যায় অরবিন্দের পাশে, জগদীশচন্দ্রের পাশে, রবীন্দ্রনাথের পাশে,

অবনীন্দ্রনাথের পাশে। রাজনীতি-বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্প সবকিছুকেই বৈপ্লবিক-দৃষ্টি থেকে ভারতের কল্যাণে নিযুক্ত করে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক জগতে তিনি বিচরণ করেছেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ বারে বারে সাবধান না হলে বিপদেই পড়তেন। কারণ, এ কন্যা শুধু বিপ্লবী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মানস-কন্যাই নন, ইনি আয়ারল্যাণ্ড-এর 'সিন্‌ফিন্‌' আন্দোলন এবং রুশের বিপ্লব ও তার কর্মনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞা এক বিপজ্জনক বিপ্লবিনী। তিনি সাক্ষাৎ চণ্ডী। শত্রুদলনে তাই তিনি এসে অরবিন্দের পাশে দাঁড়ালেন, বিপ্লবী-তরুণদের তেজ ও শক্তি দিলেন, ভারতকে বড় করার সাধনায় সর্বক্ষেত্রের প্রতিভাধরদের প্রেরণা যুগিয়ে গেলেন।···

লোকমাতা নিবেদিতা দেশবন্ধুকেও চিনেছিলেন। অরবিন্দের মুক্তির পর দার্জিলিং-এ প্রথম সাক্ষাৎকারেই তিনি মস্ত একটি লাল গোলাপ স্মিতহাস্যে সি. আর. দাশের কোটের বোতাম-ঘরে গুঁজে দিতে দিতে বলেছিলেন : "I knew you to be great, but I did not know you are so great." [আমি জানতাম তুমি বড়, কিন্তু জানতাম না যে, তুমি এত বড় !]···

আলিপুর মামলা চলার সময় পুলিশের তৎপরতা উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। কারণ, একঝাঁক বিপ্লবী ও তাঁদের নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হলেও এই সময়ই আলিপুর জেলে নিহত হল এ্যাপ্রুভার নরেন গোসাঁই, আলিপুর দায়রা কোর্টের সম্মুখে নিহত হলেন পাবলিক প্রসিকিউটার আশু বিশ্বাস এবং হাইকোর্টে নিহত হলেন পুলিশের ডেপুটি-সুপার সাম্‌সুল আলম্। এঁরা সবাই আলিপুর মামলা অথবা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে নানা মামলার রসদ জোগাচ্ছিলেন সরকারের পক্ষ হয়ে। তাই এঁদের মস্তক লক্ষ্য করে নেমে এল বিপ্লবীর উদ্যত খড়্গ নির্মম সৌন্দর্যে।

পুলিশ মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণ দেখেই চমকে ওঠে। ইংরেজ ক্ষিপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দকে ফাঁসিয়ে 'আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র' মামলা দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। ১৯০৮ সালেরই ডিসেম্বর মাসে বিনা বিচারে, তিন আইনে (Regulation III, 1818) ইংরেজ সরকার বন্দী করল বাঙলার নয়জন বরেণ্য নেতাকে। তাঁদের অধিকাংশই বিপ্লবী ছিলেন না, ছিলেন দেশপ্রেমী-জননেতা বা রাজনীতিক। বন্দী নেতৃবৃন্দের নাম হল : অশ্বিনীকুমার দত্ত, রাজা সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র (সঞ্জীবনী-সম্পাদক), শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জি, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, পুলিনবিহারী দাস ও ভূপেশ নাগ।

নরেন গোসাঁই-এর রাজসাক্ষী হবার কারণ

আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলায় 'ভিলেন্'-এর পার্ট নিয়েছিল নরেন গোসাঁই।

শ্রীরামপুরের জমিদার গোস্বামী-পরিবারের ছেলে ছিল নরেন। তার সম্বন্ধে অরবিন্দ লিখেছেন : গোসাঁই অতিশয় সুপুরুষ—লম্বা, ফর্সা, বলিষ্ঠ, পুষ্টকায়। কিন্তু তাহার চোখের ভাব কুবৃত্তিপ্রকাশক ছিল, কথায়ও বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ পাই নাই। এ বিষয়ে অন্য যুবকদের সঙ্গে তাহার বিশেষ প্রভেদ ছিল।

"গোসাঁইয়ের কথা নির্বোধ লঘুচেতা লোকের কথার ন্যায় হইলেও তেজ ও সাহসপূর্ণ ছিল। এইরূপ লোকই এ্যাপ্রুভার হয়।"

('কারাকাহিনী',—পৃঃ ৩৩-৩৪)

নরেন গোসাঁই প্রথমে ধরা পড়েনি। বারীনবাবু নাকি পুলিশের কাছে প্রদত্ত তাঁর স্বীকারোক্তিতে নরেনের নাম উল্লেখ করেন। ফলে, নরেন ধৃত হয়ে আক্রোশ মেটাবার জন্যে রাজসাক্ষী হয়। বারীনবাবু সকলের নামই উল্লেখ করেছিলেন, কেবল দয়া করে তাঁর 'সেজদা'

অরবিন্দের নামটি উল্লেখ করেননি। নরেন গোসাঁই অরবিন্দের নাম ও বৈপ্লবিক কর্মের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে সে অভাব পূর্ণ করে দিল।

নরেন গোসাঁইয়ের অপরাধ অমার্জনীয়, কিন্তু বারীনবাবুর অপরাধও সামান্য নয়। নরেন ধরা না পড়লে অরবিন্দের নাম এভাবে উদ্ঘাটিত হত না। কারণ, অমন সাফল্যে ভিলেন্‌-এর পার্ট অভিনয় করার সে অবকাশ পেত না। অবশ্য এতে শাপে বর হল। নরেন 'রাজসাক্ষী' হয়েছিল বলেই এই দেশে কানাই-সত্যেনের মত শহিদের অনন্যসুন্দর পদধ্বনি আমরা শুনেছি, কারা-জীবনের প্রসাদে অরবিন্দের 'বাসুদেব-দর্শন' ঘটেছে, দেশবন্ধুর চিত্তে রাজনীতিক-জীবনের প্রেরণা এসেছে, বিপ্লবের রথ গতিবেগে দুর্জয় হতে পেরেছে। ইতিহাসের যাত্রা ঐতিহাসিক কারণে বিরচিত। ইতিহাস-দেবতা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-রথের সারথি। সকলকে তাঁরই নির্দেশে ছুটতে হয়।

বিপ্লবের হোতা বারীন ঘোষ স্বীকারোক্তি করলেন কেন ?

বিপ্লব-কর্মের প্রবর্তক স্বনামধন্য বারীন ঘোষ অমন মারাত্মক স্বীকারোক্তি করলেন কেন? এবং সে-স্বীকারোক্তি দিয়ে নিজের আদর্শ ও স্বপ্নে গড়া দলটির ভরাডুবি ঘটালেন কেন? দল-নেতা (তাঁর আরাধ্য 'সেজদা') অরবিন্দের নির্দেশ প্রতি পদক্ষেপে উপেক্ষা করে তিনি ঐরূপ অন্যায় কাজ করলেন কিসের জোরে? এই ব্যাপারে উল্লাসকর দত্ত ও উপেন বন্দোপাধ্যায় তাঁর সাথী হলেন কেন? হেমচন্দ্র কানুনগোই বা কেন তাঁদের পথে পা বাড়ালেন না? এসব প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে।···অরবিন্দ কিছুই কবুল করলেন না। তিনি বললেন যে, তাঁর কিছুই জানা নেই।···

এ-প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক-প্রবন্ধকার গিরিজাশঙ্কর রায়-চৌধুরীর বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলছেন: "আলিপুর বোমার

মামলার প্রধানত তিনটি বিশেষ রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রথমত, অরবিন্দ বিলকুল তাঁহার অপরাধ অস্বীকার করিয়াছেন এবং যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়াতে (বারীন তাঁর নাম বলেননি) বেকসুর খালাস পাইয়াছেন। (অবশ্য নরেন গোসাঁই সেসান কোর্টে সাক্ষ্য দিতে পারলে অরবিন্দ রেহাই পেতেন না।) হেমচন্দ্রও অপরাধ অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বারীন তাঁহার নাম প্রকাশ করাতে তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ড লাভ করিলেন।...দ্বিতীয়ত, বারীন্দ্র প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় কর্মীরা (অরবিন্দের নিষেধ সত্ত্বেও) সকল অভিযোগ সরলভাবে স্বীকার করিয়া আইনের সর্বোচ্চ শাস্তি ফাঁসি-দ্বীপান্তর গ্রহণ করিয়াছেন।...তৃতীয়ত, নরেন গোসাঁই রাজসাক্ষী (approver) হইয়া অরবিন্দকে জড়াইয়া সকল অপরাধ স্বীকার করায় (এবং মার্জনা ভিক্ষা করায়) জেলের ভিতরেই সত্যেন ও কানাই, এই উভয়ের দ্বারা পিস্তলের গুলিতে খুন হইয়াছে।

"বারীন্দ্র প্রভৃতি অরবিন্দকে বাঁচাইতে গিয়া তাঁহাকে বাদ দিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছেন ; আর নরেন গোসাঁই অরবিন্দকে ধরাইয়া দিতে গিয়া তাঁহাকে জড়াইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছে—তফাৎ এইখানে।

"বারীন্দ্র নিজেই কৃতকর্মের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া তাঁহার আত্ম-কাহিনীতে নানাস্থানে নানাভাবে লিখিয়াছেন যে,—'আমাদের দফা তো এইখানেই রফা হইল, এখন আমরা যে কি করিতেছিলাম তাহা দেশের লোককে বলিয়া যাওয়া দরকার।...এই প্রকারে আত্মকীর্তি রাখিতে গিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়াছি। ইহার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বাহাদুরীর বেশ গাঢ় প্রলেপ আছে।...আমাদিগকে প্রকাশ্য রাজদ্বারে ঘাতকহস্তে স্বেচ্ছায় যাচিয়া জীবন দিতে না দেখিলে, বুঝি এ মরণভীরু জাতি মরিতে শিখিবে না !...খুন চাপিয়া যাওয়ায় সে-সময়ে নরেন গোসাঁই-এর নাম বলা হইয়াছিল।' ধরা পাড়বার পর উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বারীন ঘোষ আরো বলিয়াছিলেন যে,—'My

mission is over—আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে।' কিন্তু উপেন সেই কথার প্রতিধ্বনি নিজের মধ্যে খুঁজিয়া পাইলেন না। দেশের কাজ তো সবই বাকি।" ('শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার স্বদেশীযুগ',—পৃঃ ৭৩৬-৩৯)

এতটা বুঝেও বারীনবাবুর সঙ্গে কিন্তু উপেনবাবু ও উল্লাসকর দত্ত স্বীকারোক্তি করলেন। তাঁরা বারীনবাবুর প্রভাবমুক্ত হতে পারলেন না—যদিও তাঁদের নেতা অরবিন্দ বারে বারে ঐ স্বীকারোক্তি প্রত্যাহারের নির্দেশ দিলেন, সতীর্থ ও বন্ধু হেমচন্দ্র কানুনগো ঐ মিথ্যা 'ব্র্যাভেডো' দেখানোর মোহ থেকে আত্মঘাতী পথ গ্রহণে নিবৃত্ত হতে আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু বারীনবাবুরা কারো কথায় কর্ণপাত করলেন না।···

গিরিজাশঙ্করের মতে ঃ "নরেন গোসাঁইয়ের অপরাধ স্বীকার আর বারীন্দ্রের অপরাধ স্বীকারের মধ্যে দেখা যায় যে,—বারীন্দ্র মরণভীরু জাতিকে মরিতে শিখাইবার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে গিয়াছিলেন, আর নরেন গোসাঁই সবসুদ্ধ দলটিকে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলাইয়া নিজের প্রাণ বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পার্থক্য আছে।"

('শ্রী অ. বা. স্ব.'—পৃঃ ৭৩৫-৩৬)

পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে। নরেন গোসাঁই একটি স্বার্থান্ধ 'বিভীষণ'। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সকলকে রসাতলে পাঠিয়ে নিজে সুখের জীবনে ফিরে যাবে। কিন্তু বারীনবাবু স্বার্থপর নন, 'বিভীষণ'ও নন। সবার সঙ্গে তিনি নিজেও ডুবতে রাজি—কারণ, তাঁর ধারণা হল যে, তাঁদের কাজ শেষ হয়ে গেছে, তাঁদের কীর্তি-কাহিনী তাই দেশকে জানাতে হবে জাতির ক্লৈব্য দূর করার সংকল্পে। এ সংকল্প অটুট। এ-কথা জানাতে গিয়ে আসুক ফাঁসি, আসুক দ্বীপান্তরের দণ্ড। দলেবলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে যে বিভা তাঁরা প্রজ্জ্বলিত করবেন, তাতে ভবিষ্যৎ-জাতির মুখ আলোকিত হবে, পথের অন্ধকার দূর হবে। এহেন আত্মপ্রচারের মোহে আচ্ছন্ন বারীন ঘোষ তাই তাঁর নেতা শ্রীঅরবিন্দের নির্দেশ অমান্য করলেন, সতীর্থ হেমচন্দ্রের উপদেশ প্রত্যাখ্যান করলেন।···

কিন্তু বারীনবাবুদের আত্মনির্যাতন বিন্দুমাত্র ফলপ্রসূ হল কি? দেশের জনসাধারণ এবং সংগ্রামী-ভারত তাঁদের কথা মনে রেখেছে কি? মনে রাখেনি। তারা মনে রেখেছ কানাই, সত্যেন, ক্ষুদিরাম. প্রফুল্ল চাকি, বীরেন দত্তগুপ্ত, চারু বসুকে। তারা মনে রেখেছে কারাকক্ষ থেকে দেশবন্ধু ছিনিয়ে এনেছিলেন যে-অরবিন্দ, তাঁকে।

বিপ্লবীর ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলেন বারীনবাবু। গুপ্ত-সমিতির কথা কোন অজুহাতেই শত্রুর কাছে প্রকাশিত হবে না—এই যে টেক্‌নিক, তা মানলেন না বারীনবাবু। অহিংসার যা টেক্‌নিক, সশস্ত্র-বিপ্লবের তা নয়। অরবিন্দ ও হেমচন্দ্র বিপ্লবের টেক্‌নিক মেনে সকল অভিযোগ অস্বীকার করলেন। কারণ, তাঁরা 'বিপ্লবী'। বারীনবাবুরা অপরাধ স্বীকার করে এবং নেতার নির্দেশে সে-স্বীকৃতি জজের কাছে প্রত্যাহার (retract) না করে তাই বিপ্লব-ধর্ম থেকে বিচ্যুত হলেন। আত্মপ্রসারী ব্যক্তিত্বের এই অহংসৌধে বসে বারীন্দ্রকুমার যে ভুল করলেন তা মারাত্মক। সে ভুল বিপ্লবীর বিধানে অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু তবু বাংলার বিপ্লবীকুল চিরদিন বারীনবাবুকে ক্ষমা করে এসেছেন, শ্রদ্ধাও করেছেন। কারণ, তাঁরা ভুলতে পারেন না যে, বারীন্দ্রকুমার বীর, বারীন্দ্রকুমার বিপ্লব-কর্মের 'পাইওনিয়ার' : তিনি যত অন্যায়ই করে থাকুন, সে অন্যায়ের দণ্ড তিনি মাথায় তুলে নিতেও ভয় পাননি। আন্দামানের দীর্ঘ কারাযন্ত্রণায় তাঁর ক্রটি-বিচ্যুতি ধুয়ে-মুছে গেছে বিপ্লবীর কাছে। তাঁর 'অতীত' বিপ্লবীর বরণীয়, তাঁর 'বর্তমান' বিপ্লবীর বর্জনীয়। বিপ্লবীরা যুক্তিবাদী ও গুণগ্রাহী। তাঁরা জোলো দুধ থেকে জল বাদ দিয়ে শুধু দুধটুকু গ্রহণ করার শিক্ষা পেয়েছিলেন।...

নরেন গোসাঁই নিধন-পর্ব

নরেন গোসাঁইকে নিধন করার ষড়যন্ত্রে আলিপুর মামলার বন্দীরা সঙ্গোপনে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। নেতা বারীন ঘোষ তার কিছুই

জানেন না। তাঁর আচরণে তরুণ বন্ধুরা অসন্তুষ্ট। তাঁকে তাঁরা আর বিশ্বাস করতে নারাজ।

এদিকে বারীনবাবুর মাথায়ও একটি মতলব এসে গেছে! জেল ভেঙে পালাবার মতলব। কোর্টে যাতায়াতের পথে কতিপয় বন্ধুর সঙ্গে জেল-ওয়ার্ডার ও জেল-কর্মচারীদের মাধ্যমে তিনি যোগাযোগ করে টাকার ব্যবস্থা করলেন। বাইরে থেকে অস্ত্র আনাবার চেষ্টা শুরু করলেন। ক্রমে ক্রমে কয়েকটি পিস্তলও জেলে আনা হল। সেই পিস্তল থেকেই দু'টো সত্যেন-কানাইয়ের হাতে গেল।···

নরেন রাজসাক্ষী হচ্ছে। পুলিশ তাকে কি বলতে হবে, তা শিখিয়ে-পড়িয়ে নিচ্ছে। সহবন্দীদের সন্দেহ বদ্ধমূল হতেই নরেনকে পৃথক করে রাখা হল গোরা-ডিগ্রিতে।

হাতে পিস্তল থাকলেই চলে না, যাকে নিধন করা স্থির হয়েছে তাকে তো হাতের কাছে পেতে হবে! কিন্তু সে তো জেলের ভিতরে আর এক জেলে—চতুর্দিকে দেয়াল-ঘেরা, সান্ত্রীবেষ্টিত ঐ গোরা-ডিগ্রিতে। সত্যেন বসু ও কানাই দত্তের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁদের মাথায় বুদ্ধি অফুরন্ত।

অসুস্থতার ভান করে রোগাটে সত্যেন জেল-হাসপাতালে ২৭শে জুলাই (১৯০৮) ভর্তি হলেন। কানাইও ৩০শে আগস্ট কলিক্-পেনে কাতর হবার অভিনয় করে ঐ হাসপাতালেই আশ্রয় নিলেন।

ষড়যন্ত্র পেকে উঠেছে। নরেনকে গোপনে খবর দিয়েছেন সত্যেন বসু যে, তিনিও পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তি করার সংকল্প করেছেন এবং কিভাবে কি বলতে হবে, তা নরেনের সঙ্গে পরামর্শ করতে চান।···নরেনের আনন্দ আর ধরে না!—পুলিশের তো পোয়া-বারো!···

জেল-সুপারকে সব কথা জানিয়ে নরেন অনুমতি পেল সত্যেনের সঙ্গে দেখা করার। ২৯শে আগস্ট নরেনের প্রথম কথাবার্তা হল

সত্যেনের সাথে। স্থির হল যে, ৩০শে আগস্ট সকালবেলা আবার তাঁদের সাক্ষাৎ হবে।...এদিকে কানাই দত্তও হাসপাতালে এসে গেলেন।...

১৯০৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর। নরেন গোসাঁই এসেছে হাসপাতালের ডিস্পেন্সারিতে। কারণ, সত্যেন একটি কয়েদীর মারফৎ গোপনে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার হিগিন্স। ডিস্পেন্সারিতে বসে নরেন খবর পাঠাল সত্যেনকে। কিন্তু সত্যেন একা এলেন না। সঙ্গে এসেছেন কানাইও। কথা শুরু হবার মুহূর্তেই গর্জে উঠল পিস্তল। নরেন গোসাঁইয়ের হাত গুলিবিদ্ধ হতেই ছুটে পালাল সে হিগিন্স-এর আশ্রয়ে। হিগিন্স নরেনকে আগলে দাঁড়াতেই বিপ্লবীর গুলি ছুটে এল। হিগিন্স-এর বুড়ো আঙুল উড়ে গেল। তারপর প্রাণ নিয়ে দৌড়-ঝাঁপ, প্রাণ বাঁচাতে ধস্তাধস্তি। নরেন সহসা এক দৌড়ে হাসপাতালের বাইরে চলে এসে গোরা-ডিগ্রির দিকে এগুতে লাগল। হিগিন্স তার পেছনে। কানাই এবং সত্যেনও তাদের দু'জনের পেছনে দৌড়চ্ছেন। কানাইদের পিস্তল থেকে গুলি বর্ষিত হচ্ছে। যেন শিকারের পেছনে উন্মত্ত ব্যাঘ্রের ছুটে-চলা। হঠাৎ লিণ্টন্ নামে একটি কয়েদী পাশ থেকে সত্যেনের কাছাকাছি এসে অতর্কিতে তাঁকে মাটিতে ফেলে দিল। কানাই তখন মরীয়া। নরেন আহত-জন্তুর মত প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। অথচ, কানাইয়ের পিস্তলে রয়েছে মাত্র একটি গুলি। ঐ কয়েদী লিণ্টনই এসে কানাইকে জাপটে ধরেছে। কানাই পিস্তলের নল দিয়ে তাকে প্রচণ্ড আঘাত করা সত্ত্বেও তার কবল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারলেন না। কিন্তু অমানুষিক শক্তিতে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে নরেন গোসাঁইকে তিনি খুব নিকট নিশানার মধ্যে শেষ বুলেটে বিদ্ধ করলেন। নরেন টাল খেতে খেতে পাশের ড্রেনে পড়ে গেল। আর উঠল না।...ভয়াল মৃত্যুদূতের হস্তে

'বিভীষণ' নিহত হল। জেলের অভ্যন্তরে বন্দী-বিপ্লবীর কবলে 'রাজসাক্ষী'র অমন নিধন-ইতিহাস এই সর্বপ্রথম লিখিত হতে দেখে ভারতবাসীর বুকে সাহস এল, ব্রিটিশের বুকে কাঁপন দেখা দিল। দেশ-বিদেশের দৃষ্টি বিস্ময়ে নিবদ্ধ হল কলকাতার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের পানে।···

এরপর যথারীতি বিচারের পালা। নিম্ন আদালতগুলো পেরিয়ে হাইকোর্টে গেল মামলা। ১৯০৮ সালের ২১শে অক্টোবর হাইকোর্টের রায় বেরুল। কানাই দত্ত ও সত্যেন বসুর ফাঁসির হুকুম বহাল রয়েছে।··

কানাইকে সাতদিন সময় দেওয়া হল আপিলের জন্যে। সেকথা শুনে কানাই বললেন : "There shall be no appeal"—অর্থাৎ, আপিল হবে না।···ডাঃ যাদুগোপাল লিখেছেন যে, তাঁর বন্ধু আশু দাস আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি বলেছিলেন : "কানাই শিখিয়ে গেল হে!···Shall আর Will-এর ব্যবহার করতে কেউ আর ভুল করবে না।"··· ('বিঃ জীঃ স্মৃঃ',—পৃঃ ৩২৯)

সত্যেন বসু ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের লোক। কাজেই, মৃত্যুর পূর্বে সমাজের আচার্যরূপে শিবনাথ শাস্ত্রীকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল জেলে সত্যেনের সঙ্গে দেখা করার। সত্যেন তাঁর আশীর্বাদ লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী সত্যেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে এলে অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, সত্যেনের মত কানাইকেও তিনি আশীর্বাদ করে এলেন না কেন?

উত্তরে শাস্ত্রীমহাশয় বলেছিলেন ঃ "সে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহ! বহু তপস্যা করলে তবে যদি কেউ তাকে আশীর্বাদ করার যোগ্যতা লাভ করতে পারে!" ('বিঃ জীঃ স্মঃ',—পৃঃ ৩২৯)

এসব উক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, তৎকালে শুধু তরুণ-হৃদয় নয়, সকল স্তরের বালক-বৃদ্ধ-প্রবীণ নরনারী ও গুণী-জ্ঞানীর হৃদয়ই এ-দু'টি বীর জয় করে নিয়েছিলেন। মূর্খ ইংরেজ ক্রোধে কম্পমান। যে বীর ফাঁসির রজ্জু সহাস্যে কণ্ঠে ধারণ করবেন দু'দিন পরেই, তাঁর 'বি-এ' ডিগ্রি নাকি কেড়ে নেওয়া হল!…কানাই দত্তের ডিগ্রি কেড়ে নেওয়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের মান বাড়েনি, যেমন মান বাড়েনি ইংলিশ বার্-এর শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা ও বিনায়ক সাভারকরের ব্যারিস্টারির সনদ ছিনিয়ে নেবার নীচতায়।…

আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা শুনেছি যে, মৃত্যুর পরও মানুষকে নাকি খেতাব বা সম্মানসূচক মেডেল ইত্যাদি ঘটা করে দেবার রেওয়াজ আছে। তার নাম নাকি 'পস্থুমাস এওয়ার্ড'-গোছের একটা কিছু। খুব ভাল রেওয়াজ। এতে যাঁকে মৃত্যুর পরও সম্মানিত করা হল, তাঁর কিছু আসে-যায় না। এতে সম্মানিত হন দাতার দল। ডিগ্রি কেড়ে নেবার কথা সত্য হলে আমাদের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি শহিদ কানাই দত্তের উক্ত ডিগ্রি জাতির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে পিতামহদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পারেন না? বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কথাটা ভাবতে পারেন।…

বারীনবাবুর আপশোষ

বিপ্লবের গুরু অরবিন্দ। কিন্তু বিপ্লব-কাণ্ডের তৎকালীন নেতা ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। বিপ্লবীরা তাঁকে চিরকাল এই সূত্রে প্রবর্তক বা 'পাইওনিয়ার'-এর মর্যাদা দিয়ে এসেছেন। এ হেন

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ঘটনা ঘটে যাবার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত জানলেন না সত্যেনের ষড়যন্ত্র, কানাইয়ের চলাফেরা, অথবা, নরেন গোসাঁইয়ের হত্যা সম্পর্কে পূর্বাপর কোন কিছু। ঘটনা সমাপিত হবার পর আর পাঁচজনের মত তিনিও জানলেন যতটুকু তারা জানে।

বারীনবাবু নিজেই লিখেছেন: "...আমি জানতাম না যে, ছেলেদের একদল আমাকে লুকাইয়া আমারই আনা পিস্তল দিয়া নরেনকে জেলের মধ্যেই প্রাণে মারিবার ফন্দি আঁটিয়াছে।...কাঁচা লীডারের যাহা সচরাচর হইয়া থাকে, আমার ধাতটা তদ্রূপই ছিল; বিলক্ষণ কিছু স্বেচ্ছাচারী ও অটোক্র্যাট গোছের। সবাইকে লইয়া কাজ করিতাম বটে, কিন্তু আপন গোঁয়েই করিতাম। জেলে আসিয়া ছেলেদের কাহারও মধ্যে আমার প্রতি একটা বেশ রাগ ও অভিমানের ভাব যে দেখা দিয়াছে, তাহা বুঝিয়াছিলাম। ভাবিয়া উঠিতে পারি নাই যে, আমাকে বাদ দিয়া, অন্তত আমাকে না জানাইয়া তাহারা একটা কিছু করিবে।" ('আঃ কাঃ',—পৃঃ ৮৫-৮৭)

বারীনবাবুর নেতৃত্ব পুলিশের কাছে দেওয়া তাঁর 'স্বীকারোক্তি'র সঙ্গে সঙ্গেই জীর্ণ হয়ে আসছিল। অবিসম্বাদী এই বিপ্লব-নেতা বিপ্লবীদের হৃদয়-সিংহাসন থেকে কোন্ মুহূর্তে বিবর্জিত হয়েছেন, তা তিনি টের পাননি। জেল ভেঙে পালাবার প্রস্তাব দিয়েও বারীনবাবু তরুণদলের মন পেলেন না। কারণ, দল ভাঙবার মন যাঁর হয়েছে, জেল ভাঙবার শক্তি তাঁর থাকতে পারে না। যে বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও নেতৃত্বের স্বীকৃতি তিনি সকলের কাছে তাঁদের সহজাত বোধ থেকেই পেয়েছিলেন, তার সুদৃঢ় ভিৎ আমূল নড়ে গেছে। এখন তার মেরামত কোনমতেই চলে না। বিপ্লবের পথে বিপ্লবীর কাছে জোড়াতালির কারবার নেই। ব্যক্তি যত বৃহৎ, যত মহানই হোন—তিনি আদর্শ ও কর্মপথ থেকে বড় নন। সংস্থা থেকে বরণীয় হতে চাইলেই তাঁকে আপন দম্ভের চাপেই গুঁড়ো হয়ে যেতে হয়। ইতিহাস-বিধাতার এই নির্দেশ স্বয়ং নেপোলিয়নকেও মানতে হয়েছিল। বাঙলাদেশে

বারীনবাবু ছাড়া আরো দু'একজন প্রথমশ্রেণীর নেতাকেও তা মানতে বাধ্য করা হয়নি কি ?···

গোসাঁই-হত্যা ষড়যন্ত্রে

সত্যেনের অবদান

সত্যেন বসুর স্থির-বুদ্ধি ও ষড়যন্ত্র-রচনার কৌশল অতুলনীয়। তাঁর বুদ্ধির প্রখরতায়ই ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সাক্ষ্য দেওয়া সত্ত্বেও নরেন গোসাঁই-এর সে-সাক্ষ্য নাকচ হয়ে যায় এবং অরবিন্দ বেকসুর খালাস পান। অধিকন্তু, নেতা বারীন ঘোষকে না জানিয়ে কানাইয়ের সঙ্গে সফল কর্মব্যবস্থা করা এবং সর্বোপরি নরেন গোসাঁই-এর বিশ্বাসভাজন হয়ে তাকে হাসপাতালে ঘটনাস্থলে টেনে আনা—এসবই সত্যেনের কৃতিত্ব। সত্যেনের অবদান তাই অপূর্ব।

হেমচন্দ্র কানুনগো লিখেছেন : "ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের (মিঃ বার্লি) কোর্টে কিন্তু অতিরিক্ত দেরি হচ্ছে বলে নরেনকে এজাহারের পর জেরা করতে হাকিম দেননি। তাতে আমাদের পক্ষের উকিল অনেক সাধ্য-সাধনায় এই মর্মে একখানি দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিলেন যে,—যেহেতু সাক্ষীকে জেরা করতে দেওয়া হল না, সেই হেতু তার উক্তি তাবৎ প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না, যাবৎ সে আবার যথারীতি সেসান আদালতে সাক্ষ্য দেয় ও জেরা হয়। এই মঞ্জুরিটি না নিলে গোসাঁইকে মারা বৃথা হত, আর অরবিন্দবাবুর মুক্তিও নাকি অসম্ভব হত। তখন বার্লিসাহেবের কোর্টে কোন উকিলই এর আবশ্যকতা বা তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। এ ফন্দিও সত্যেনের উদ্ভাবিত এবং তাঁরই চেষ্টায় হয়েছিল।" ('বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা',—পৃঃ ৩২৭)

সত্যেন বসু আইনজ্ঞ ছিলেন না, কিন্তু আইন বুঝতেন তিনি উকিলের চেয়েও বেশি। কারণ, তাঁর ছিল সাধারণ-বুদ্ধি (যাকে বলে 'Common sense') অতি প্রখর। সাধারণ-বুদ্ধি 'সাধারণে'র কমই থাকে—'Common sense is the rarest sense'! সত্যেন

সেই 'rarest sense'-এর অধিকারী ছিলেন বলেই অরবিন্দকে বাঁচাতে পারলেন, আইনজ্ঞ সি. আর. দাশের সহায়ক হলেন।… জজের (মিঃ বীচ্‌ক্রফ্‌ট্‌) আদালতে বিচার শুরু হবার পূর্বেই নরেন গোসাঁই নিহত হওয়ায় 'রাজসাক্ষী'র সাক্ষ্য ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে জেরা হয়নি বলে নাকচ হয়ে গেল। নাকচ হত না, যদি সত্যেনের বুদ্ধি মত আদালতের উকিল উল্লিখিত দরখাস্তটি পূর্বাহ্ণে মঞ্জুর করিয়ে না নিতেন।…

কানাইলালের ফাঁসি

১৯০৮ সাল। ১০ই নভেম্বর। আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল। তখন ভোর সাতটা।

বাঙলার কারাগারে বিপ্লবীর এই প্রথম ফাঁসি। ক্ষুদিরাম বসুকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে বিহারের মজঃফরপুর জেলে কিছুকাল পূর্বে।…

কানাইলাল প্রশান্তচিত্তে মৃত্যু-মঞ্চে আরোহণ করলেন। সানন্দে কণ্ঠে পরলেন মৃত্যু-রজ্জু। ভারতবর্ষের তরুণদের শোনালেন মৃত্যুভয়-মুক্তির মোহন বার্তা।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "কানাইলালের ফাঁসি হইয়া গেল। ফাঁসির সময় তাহার নির্ভীক, প্রশান্ত ও হাস্যময় মুখশ্রী দেখিয়া জেলের কর্তৃপক্ষ বেশ একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেলেন। তাহার গলায় ফাঁসির দড়ি ঠিকমত দেওয়া হয় নাই, এজন্য প্রহরীকে ডাকিয়া ঠিক করিয়ে দিতে বলিলেন। একজন ইউরোপীয় প্রহরী চুপি চুপি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—'তোমাদের হাতে এরকম ছেলে আর কতগুলি আছে?'…যে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ কালীঘাটের শ্মশানে কানাইলালের চিতার উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে ছুটিয়া আসিল, তাহারাই প্রমাণ করিয়া দিল যে, কানাইলাল মরিয়াও মরে নাই।"

('নিঃ আঃ কঃ,'—পৃঃ ৬৪)

উপেন্দ্রনাথ আরো লিখেছেন: "জীবনে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, কানাই-এর মত অমন প্রশান্ত মুখচ্ছবি আর বড় একটা দেখি নাই। সে-মুখে চিন্তার রেখা নাই, বিপদের ছায়া নাই, চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই—প্রফুল্ল কমলের মত তাহা যেন আপনার আনন্দে আপনিই ফুটিয়া রহিয়াছে।···প্রহরীর কাছে শুনিলাম, ফাঁসির আদেশ শুনিবার পর তাহার ওজন ১৬ পাউণ্ড বাড়িয়া গিয়াছে। ঘুরিয়া ফিরিয়া শুধু এই কথাই মনে হইতে লাগিল যে, চিত্তবৃত্তি নিরোধের এমন পথও আছে যাহা পাতঞ্জলের বাবাও বাহির করিয়া যান নাই।"

('নিঃ আঃ কঃ',—পৃঃ ৯৭)

তরুণ-বাঙলা তথা ভারতবর্ষের মাথার মণি শহিদ কানাই-এর শব জেল-গেটের বাইরে তাঁর আত্মীয়দের হেপাজতে দেওয়া হল। কানাই-সত্যেনের আত্মীয় তখন সারা বাঙলার মানুষ। কানাই-সত্যেনকে কি তখন ঘর বা দলের গণ্ডিতে আটক করে রাখা যায়! শত-সহস্র লোক এসে শবাধার কাঁধে তুলে নিল। সহস্র সহস্র লোক কালীঘাট শ্মশানে জমা হল। শোক-বিহ্বল চিত্তে সবাই চেয়ে দেখল, জাতির দুলাল লেলিহান অগ্নিশিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছেন—প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। স্তূপীকৃত পুষ্প-সম্ভারে সজ্জিত ঐ বরতনু স্তূপীকৃত চন্দনকাঠের সুগন্ধ অগ্নিজ্বালায় ভস্ম হলেও জন-মানসে তার বিদেহী আত্মা অক্ষয় সৌন্দর্যে ও অম্লান সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল। উপস্থিত নরনারীর সেদিন একটু চিতা-ভস্ম বা একটুকরো অস্থি সংগ্রহের কী সে আকুলতা! অশ্রুজলে সিক্ত সে-আকুলতাই পরবর্তী-কালে অগ্নি-আখরে লিখিত হয়ে 'শহিদ-তর্পণে' বারে বারে পরিস্ফুট হতে দেখা যায়।···

সত্যেন্দ্রনাথের ফাঁসি

কানাই 'আপিল' করতে দেননি। বলেছিলেন: "There shall be no appeal!"···

সত্যেনের আপিল হয়েছিল ছোটলাটের দরবারে। কাজেই তাঁর ফাঁসির তারিখ পিছিয়ে গেল।...

কারা-কক্ষে অপেক্ষমাণ সত্যেন। বন্ধু ও সতীর্থ কানাইলাল 'অগ্রজ' হয়ে গেলেন মৃত্যুর পথে। সত্যেনের মহাযাত্রার ক্ষণও সমাগত। পরমের বাণী তিনি শুনেছেন। মৃত্যুহীনের স্পর্শ পেয়ে তিনি আনন্দিত।...

হেমচন্দ্র কানুনগোকে তাঁর এক বন্ধু (শ্রী এস্. সি. রায়) লিখেছিলেনঃ "ফাঁসির দিন অতি প্রত্যুষে আমরা আলিপুর জেলের ফটকে উপস্থিত হইলাম।...ফাঁসি দেওয়া সমাপ্ত হইলে একজন চর্ম-বর্ম-পরিহিত শ্বেত-পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আমার সমীপবর্তী হইয়া বলিলেনঃ 'You can go now. The thing is over. Satyender died bravely!' তদ্দণ্ডেই একজন শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্ট বলিতে লাগিলঃ 'When I went to his cell to get him to the gallows, he was wide awake. When I said, be ready, he answered: Well I am quite ready, and smiled. He walked steadily to the gallows. He mounted it bravely and bore it cheerfully. A brave lad!'..." ('শ্রী অঃ বাঃ স্বঃ,'—পৃঃ ৭৪৮)

['তুমি এখন যেতে পার। কাজ হয়ে গেছে। সত্যেন বীরের মৃত্যু গ্রহণ করেছেন!'...'ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাবার জন্যে আমি তাঁর সেলে গিয়ে দেখলাম, তিনি জেগে আছেন। বললাম, তোয়ের হয়ে নিন। উত্তর দিলেন,—আমি তোয়ের হয়ে আছি; মুখে মধুর হাসি। দৃঢ়-পদক্ষেপে মৃত্যু-মঞ্চের দিকে তিনি এগিয়ে চললেন। তিনি সে-মঞ্চে বীরের মত সানন্দে আরোহণ করলেন।...বীর বালক!'...]

সত্যেন বসুরও ফাঁসি হয়ে গেল। তারিখ,—২১শে নভেম্বর, ১৯০৮ সাল।..

সেই আলিপুর সেণ্ট্রাল জেল। সেই ফাঁসি-মঞ্চ। বাইরের অজস্র জনতা গেটে উপস্থিত। শহিদের শবাধার মাথায় তুলে নেবার আগ্রহে তারা অধীর।...কিন্তু তা হল না। ইতিমধ্যে সরকার নিয়ম জারি করে ফেলেছেন যে,—কোন 'ক্রিমিন্যাল্'-এর মৃতদেহই আর তার আত্মীয়-স্বজনদের হাতে জেলের বাইরে দেওয়া হবে না। কারণ, তাতে অনর্থক হৈ-হুল্লোড় ও জনতার ভিড় হয়।...

তাই সত্যেনের শব জেল-গেটে এল না। ব্যর্থ নমস্কারে ফিরে যেতে হল অপেক্ষমাণ নরনারীকে। সত্যেনের মরদেহ পুড়ে ছাই হয়ে গেল জেলের চিতায়। অলক্ষ্যে উচ্চারিত হলঃ "Whatever goes up must come down!"...ব্রিটিশের অভ্রংলিহ্ অহংকার-সৌধকেও একদিন মাটির ধূলায় টেনে নামাবে ঐ সত্যেন-কানাই-ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকির অনুগামী তরুণ-ভারত।...আবার বলতে হয়, —"No more water, the fire next time!..."

সরকারী-উকিল আশু বিশ্বাস-নিধন

আশুতোষ বিশ্বাস ছিলেন পাব্লিক প্রসিকিউটার্, অর্থাৎ, সরকারের উকিল। তাঁর খ্যাতি ইংরেজের দরবারে প্রচুর। কারণ, স্বদেশী-মামলা সাজাতে তাঁর জুড়ি নেই। কি করে নির্দোষকে দোষী সাব্যস্ত করতে হয়, কি করে সরকারী-সাক্ষী তৈয়ের করা যায়, কি করে মিথ্যা মামলাকে সত্য করে বানিয়ে তরুণ-বাঙলার সাহসীদের শাস্তি দেওয়া চলে—এসব চিন্তায় ও কর্ম-সাধনে তিনি ছিলেন অগ্রণী। সরকারের এতবড় একটি খয়ের খাঁ সুহৃদ সে-যুগেও অধিক ছিল না।...

নির্দেশ এল, আশু বিশ্বাসকে সরিয়ে দাও!...কে এই কর্মের অধিকারী হবেন? কে এর ভার নেবেন? এগিয়ে এলেন সুস্থ-সবলদেহী তরুণদের ঠেলেঠুলে একটি পঙ্গু, ক্ষীণদেহী, বেঁটে, অথচ প্রাণরসে প্রোজ্জ্বল কিশোর। নাম তাঁর চারুচন্দ্র বসু।

চারু বসুর ডান হাতখানা অশক্ত। হাতের পাতা ও আঙুলগুলো জন্মাবধি নেই।...তাঁর স্বরূপ কেউ জানে না। সবাই তাঁকে মনে করে, অতি সাধারণ একটি ছেলে তিনি। তারা জানে না যে,— অন্তরে আছে তাঁর আগুন-ছোঁয়া তপস্যা। প্রেরণা যুগিয়েছিলেন তাঁকে নাকি যতীন মুখার্জি স্বয়ং।...তৎকালে চারু বসু থাকতেন কেদার বসু লেনের ১১নং গৃহে। বিপ্লবী গীষ্পতি রায়চৌধুরী (কাব্যতীর্থ) মহাশয়ের ছিল ঐ গৃহ। চারু বসু কাজ করতেন ১৩৬-বি নং রসা রোডে অবস্থিত 'হিতৈষী প্রেসে।' গীষ্পতিবাবু ও তাঁর অগ্রজ ছিলেন হিতৈষী প্রেসের স্বত্বাধিকারী।*

১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি। চারু বসু বেরিয়েছিলেন তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করার ব্রত নিয়ে। পঙ্গু ডানহাতে শক্ত করে বেঁধে নিয়েছেন একটি রিভল্‌বার। বাঁ-হাত দিয়ে টানবেন ট্রিগার শত্রু-নিধন কালে।...

যথাসময়ে আলিপুর কোর্টের সম্মুখে চারু বসুর পঙ্গু হস্তের রিভল্‌বার বিপুল বিক্রমে গর্জে উঠল। আহত আশু বিশ্বাস মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। মৃত্যু তাঁকে তাঁর সুখের সংসার ও ইংরেজ প্রভুদের আত্মীয়তা থেকে ছিনিয়ে নিল।...

চারু বসুর ফাঁসি

চারু বসু অবশ্য পার্শ্ববর্তী পুলিশদের হাতে ইতিমধ্যে বন্দী হয়েছেন। তৎপরের ইতিহাস একই। অকথ্য অত্যাচার, মারপিট। কিন্তু চারু বসু অনড়, অটল।

---

* শহিদ চারু বসুর আত্মীয় শ্রীপ্রসূন ঘোষের (৭ নং সেবক বৈদ্য স্ট্রীট, কাল-২৯) কাছ থেকে প্রাপ্ত ১৫.১০.৬৮ তারিখের পত্রে জ্ঞাত উল্লিখিত ঠিকানা।—লেখক

দায়রা জজের কাছে চারু বসুকে সোপর্দ করা হল। অতি সহজ সুরে বালক-বীর সেখানেও বললেনঃ "No Sessions, trial, but hang me to-morrow. It was all preordained that Ashu Babu shall be shot by me, and I shall be hanged. I killed him as he was an enemy of the Country." ('Roll of Honour', P.—260)

[সেসানের বিচার অবান্তর। কালই আমার ফাঁসি দেওয়া হোক! সবই ভবিতব্য—আশুবাবু আমার বুলেটে মরবেন এবং আমি ফাঁসির দড়ি গলায় পরব। দেশের শত্রু বলেই তাঁকে আমি নিধন করেছি।]

যথারীতি বিচার-প্রহসন অন্তে হাইকোর্টে থেকেও প্রাণদণ্ড বহাল হয়ে এল। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও লাটের দরবারে আপিল করতে চারু বসু রাজি হলেন না।

১৯০৯ সালের ১৯শে মার্চ। মহাদর্পীর গৌরবে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে সেদিন ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলেন চারুচন্দ্র বসু। প্রশান্ত চিত্তে জীবন থেকে জীবনোর্ধ্বে চলে গেলেন তিনি শহিদের অভ্রান্ত বাণী অলক্ষ্যে ছড়িয়ে রেখে।···

ভারতবাসী করুণ নয়নে তাকিয়ে দেখল অরুণ-রঙে রঞ্জিত সেই মহান 'বিজয়া'।···

সামসুল আলম্-হত্যা

আলিপুর বোমা-ষড়যন্ত্র মামলার তদ্বিরের ভার ছিল সামসুল আলমের উপর। সরকারী কৌঁসুলি মিঃ নর্টনের তিনি ছিলেন দক্ষিণ হস্ত। পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ আলমকে ব্রিটিশ-সরকার চোখের মণি করে রেখেছিলেন। মামলা সাজানো, মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো, মিথ্যা সাক্ষী যোগাড় করে তাকে কাজে লাগানো, রাজবন্দীদের মধ্যে যাঁরা কচি ও কাঁচা তাঁদের দুর্বলতা খুঁজে-পেতে বের করে তা মামলার সুবিধার্থে প্রয়োগ করা, গড়ে-পিটে 'রাজসাক্ষী'

রূপে কাউকে চালিয়ে দেওয়া ইত্যাদি যাবতীয় নিকৃষ্ট কাজে তিনি উৎকৃষ্ট ছিলেন। সাম্‌সুল আলম্ মানে, আলিপুর-মামলার একটি জীবন্ত নথিপত্র। তাঁর অভাব মানে, মামলার খুঁড়িয়ে চলা।···

তাই বিপ্লবীদের কালো-তালিকায় আলম্ সহজে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন। আলিপুর মামলা শুরু হতেই দু-দু'বার তাঁকে তাক্ করা হয়েছিল। কিন্তু বাগে পাওয়া যায়নি।···

এদিকে আশু বিশ্বাস নিহত হয়েছেন।

আলম্ সাহেবের জীবনের মেয়াদও আর বাড়ান চলে না।

য়্যাক্‌শানের দিন-ক্ষণ স্থির হয়ে গেল।···

সেদিন ২৪শে জানুয়ারি, ১৯১০ সাল। সরকারী উকিলদের মামলার কাগজ-পত্র সেদিনকার মত বুঝিয়ে দিয়ে সাম্‌সুল আলম্ হাইকোর্টের উপরতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামছেন। তখন অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা। তাঁর সঙ্গে সশস্ত্র গার্ড রয়েছে। সামান্য তফাতে তিনি দেখলেন একটি যুবককে। মুহূর্তে সেই যুবক মৃত্যুদূতের রূপ ধারণ করে ভীষণ-দর্শন হয়ে উঠলেন। 'দ্রাম্' করে ছুটে এল অব্যর্থ বুলেট্। লুটিয়ে পড়লেন ধরণীর ধূলায় ব্রিটিশের অনুরক্ত সেবক, বলদর্পী সাম্‌সুল আলম্ একান্ত কাঙালের মত। আর উঠলেন না।···

এই য়্যাক্‌শানের পাঁচ দিন পর, ২৯শে জানুয়ারি 'কর্মযোগিন্' কাগজে অরবিন্দ লিখলেনঃ "Boldest of the many bold acts of violence. They (the revolutionaries) prefer public places and crowded buildings—Nasik-London-Calcutta—Goswami in jail—These are remarkable features." ('শ্রী অ. গাঃ স্বঃ',—পৃঃ ৮১৬)

[বহু দুঃসাহসী সশস্ত্র-কাণ্ডের মধ্যেও অধিকতর দুঃসাহসী এই য়্যাক্‌শান। বিপ্লবীরা জনস্থল এবং জনবহুল প্রাসাদগুলোকেই

য়্যাক্শানের স্থানরূপে পছন্দ করেন। তাই তো দেখা যায় নাসিকের প্রেক্ষাগার, বিলেতের সভাস্থল, কলকাতার হাইকোর্ট এঁদের পছন্দসই কর্মভূমি—জেলখানায় গোস্বামী-হত্যা—এ-সবই এঁদের কর্মকাণ্ডের লক্ষণীয় দিক।]

বীরেন দত্তগুপ্ত

সামসুল আলমের মৃত্যুদাতার নাম বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত। বয়স উনিশ পেরোয়নি। বাড়ি ছিল ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণায়।

বিপ্লবীদলের কিশোর-সভ্য বীরেন্দ্রনাথ। অগ্নিজ্বালা বক্ষে ধারণ করে তাঁর পথযাত্রা শুরু হয়েছে। শোনা যায়, যতীন্দ্রনাথের আশীর্বাদধন্য হয়েই তিনি সামসুল-হত্যায় অগ্রণী হয়েছিলেন।

পরম সাহসে হত্যা করলেন তিনি সামসুলকে। তারপর বেরিয়ে এলেন জনাকীর্ণ রাস্তায়। দিনে-দুপুরে দুঃসাহসিক এই কর্ম যত নৈপুণ্যেই সমাপিত হোক, অত ভিড়ের মধ্যে দুঃসাহসী কর্মীকেও ধরা পড়তেই হয় অধিক ক্ষেত্রে। ধরা পড়াটাই স্বাভাবিক, না পড়াটাই ব্যতিক্রম।

বীরেন দত্তগুপ্তও ধরা পড়লেন। তারপর বিচার, নির্যাতন, ফাঁসির হুকুম। যথারীতি সবই হল।

বীরেন কোন উকিল-ব্যারিস্টারের সাহায্য নেননি। বলেছিলেন: "আমি ওকে হত্যা করেছি। ব্যস্, আর কিছু বলার নেই।..."

১৯১০ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। বাঙলার অগ্নিশিশু বীরেন দত্তগুপ্ত মৃত্যু-রজ্জু কণ্ঠে পরে শহিদ হলেন। অরবিন্দ-যুগের শেষ অগ্নি-শিশু অমর জ্যোতি বিকিরণ করে বিলীন হলেন নভোলোকে। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যাঁরা এই দেশে আবার আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের কীর্তি-কাহিনীও ক্রমশ আমরা বলে যাব।

॥ সাত ॥

ভারতের আগুন বিলেতে ছড়াল

শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার লণ্ডনে স্থাপিত 'ইণ্ডিয়া হাউস' বা 'ভারত ভবন' ভারতীয় বিপ্লবীদের এক মস্ত আড্ডা। এখানে বিনায়ক সাভারকর, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, বি. ভি. এস্. আয়ার, হরদয়াল, মাদাম কামা এবং আরো নামী বিপ্লবপন্থীদের আনাগোনা ছিল। কৃষ্ণবর্মার 'দি ইণ্ডিয়ান সোসিয়োলজিস্ট্' কাগজখানা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং বৈপ্লবিক-চেতনা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রচারকার্য শুরু করে দিয়েছে। এই কেন্দ্রে কর্মীদের মধ্যে দেশাত্মবোধ এতই জাগ্রত যে, যে-কোন ভারতীয় ছাত্রেরই এখানে এলে অল্প-বিস্তর মানসিক রূপান্তর ঘটে যায়।

ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে তাই ইংরেজের ভাবনা। এ-সব ছাত্রদের প্রতি লক্ষ্য রাখা সেক্রেটারি-অব্-স্টেটের দায়িত্ব। সুতরাং বিলেতের 'নেটিভ্' ছাত্রদের দেখাশুনা করার জন্যে একটি 'কমিটি' ছিল। সেই কমিটির সভ্যরূপে কার্জন উইলি নামক এক শ্বেতাঙ্গকে সেক্রেটারি-অব্-স্টেট তাঁর প্রতিনিধির কর্তব্যে নিযুক্ত করলেন। কার্জন উইলি ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার এবং সেক্রেটারি-অব্-স্টেটের পলিটিক্যাল এ. ডি সি.। তার বিশেষ কর্তব্য ছিল ভারতীয় ছাত্রদের রাজনীতিক মতবাদ, গোপন কাজ-কর্ম ও চাল-চলনের প্রতি দৃষ্টি রাখা—সাদাসিধে ভাষায়, ভারতবর্ষের ছাত্র ও তরুণদের পেছনে গোয়েন্দাগিরি করা।···

এদিকে কিছুকাল পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষে অগ্ন্যুৎসব শুরু হয়েছে। ১৮৯৭ সালের ২২শে জুন বিপ্লবীর বুলেটের আঘাতে শত্রু-নিপাতের জয়ধ্বনি কর্ণ-গোচর হল প্রথম, মহারাষ্ট্রে। তারপর ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের রুদ্রবার্তা ছড়িয়ে গেল সকল প্রদেশে। ১৯০৮

সালের ৩০শে এপ্রিল মজঃফরপুরে দারুণ শব্দে বিদীর্ণ হল বিপ্লবীর বোমা। ১৯০৮ সালেরই ৩১শে আগস্ট আলিপুর জেলের অভ্যন্তরে নিহত হল এক রাজসাক্ষী। ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি দিনে-দুপুরে পাবলিক্ প্রসিকিউটার বুলেট-বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়লেন কলকাতার রাস্তায়। গত দশ বছরে আত্মদান করলেন অথবা ফাঁসির মঞ্চে জীবন দিয়ে গেলেন দামোদর-বালকৃষ্ণ-বাসুদেব চাপেকাররা তিনটি ভাই-বিনায়ক রাণাডে-প্রফুল্ল চক্রবর্তি-প্রফুল্ল চাকি-ক্ষুদিরাম-কানাইলাল-সত্যেন বসু, চারু বসু প্রমুখ তরুণ-বীরবৃন্দ। এই অগ্ন্যুৎসবের বিভা বিদেশেও ছাড়িয়ে গেল। শিখা থেকে শিখা প্রজ্জ্বলিত হল।

লণ্ডনে প্রথম বহ্ন্যুদিগরণ

(কার্জন উইলি-নিধন)

লণ্ডনের 'ইম্পিরিয়েল ইন্স্টিটিউট্'-এর জাহাঙ্গীর হল্-এ বহু গণ্যমান্য লোক সমাগত। 'ন্যাশন্যাল এ্যাসোসিয়েশান্'-এর বাৎসরিক সভা। তারিখ ১৯০৯ সালের ১লা জুলাই। কার্জন উইলিও এসেছেন সেই সভায়।

গানের পালা সবেমাত্র শেষ হয়েছে! এমন সময় হলঘর কাঁপিয়ে কয়েকটি গুলি ছুটে এল একটি তরুণের রিভল্বার থেকে। উইলির মুখ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছেন ধিংড়া। পঞ্চম গুলি খেয়ে উইলি মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন। একটি পার্সী ভদ্রলোক ছুটে এলেন আহতের সাহায্যে। ষষ্ঠ গুলি তাঁকে বিদ্ধ করল। ভদ্রলোকের নাম লালকাকা। দু'চার দিনের মধ্যেই হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু কার্জন উইলির মৃত্যু ঘটে অনতিবিলম্বে, গুলি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। তাঁর ডান চোখ উড়ে যায়—বীভৎস মুখখানা দেখে তাঁকে চিনবার উপায় ছিল না।

মদনলাল ধরা পড়লেন।

ঘটে গেল অকস্মাৎ অভূতপূর্ব এবং অবিশ্বাস্য এক দুর্জয় ঘটনা। বিশ্ববাসী স্তম্ভিত। ভারতবাসী আত্মশক্তিতে হর্ষ-বিহ্বল। ইংরেজের শঙ্কা অসীমিত।…

ঘটনার চার দিন পর, ৫ই জুলাই লণ্ডনে একটি সভা ডাকা হয়েছে। সভার উদ্দেশ্য, উইলি-হত্যায় শোক প্রকাশ করা এবং আততায়ীর দুষ্কার্যে তীব্র নিন্দা জানানো। দেশী-বিদেশী, কৃষ্ণাঙ্গ-শ্বেতাঙ্গ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত।…

জমজমাট সভা। ধিংড়ার হিংস্রকার্যের নিন্দাসূচক প্রস্তাব উত্থাপিত হল। বহু বক্তা আততায়ীর নিন্দায় মুখর হয়ে প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এমন সময় একটি বেঁটে-গড়নের যুবক উঠে দাঁড়ালেন। বজ্রনির্ঘোষে তিনি বললেন: "আমি বিনায়ক সাভারকর। আমি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করছি।" সাভারকর তাঁর বক্তব্য শেষ না করতেই 'পামার' নামে একটি য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান য্বক ছুটে এসে সাভারকরের মাথায় এমন আঘাত করল যে, তাঁর মাথা ফেটে গেল।…

থিরুমল আচারিয়াও তরুণ বিপ্লবী। দাঁড়িয়ে ছিলেন সাভারকরের পাশে। তিনি সইবেন কেন এই অনাচার? নিশ্চুপে দেখবেন কি করে সতীর্থের রক্তাক্ত মূর্তি? ক্ষিপ্রহস্তে পামারকে তিনি ঘুষি মেরে ধরাশায়ী করে দিলেন।…বি. ভি. এস্. আয়ার তো গোপন রিভল্বার টেনে বের করে পামারকে গুলি করেছিলেন প্রায়! বাধা দিলেন সাভারকর। তিনি অচঞ্চল। প্রশান্তচিত্তে বন্ধুদের সংযত করলেন বীর বিপ্লবী-নেতা।…

পামারদের কার্যকলাপে সভার আবহ পঙ্কিল হয়ে উঠল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ছিলেন সেই সভায় উপস্থিত। ভীরুর মত সাভারকরকে আক্রমণ করার জন্যে প্রতিবাদে তিনি সভাগৃহ ত্যাগ

করলেন। এমন কি, রাজভক্ত আগা খাঁ পর্যন্ত, লাঠি-উঁচিয়ে সাভারকরের দিকে ছুটে আসতে-থাকা অপর রাজভক্ত মিঃ মুন্‌চেরসা ভবনাগ্রির সঙ্গে একমত হতে পারলেন না তাঁর সাগ্রহ প্রস্তাবে। ভবনাগ্রির প্রস্তাব ছিল যে, সাভারকরকে এখনি গ্রেপ্তার করা হোক্! কিন্তু সাভারকরের কোন দোষ ছিল না বলেই লণ্ডনের শ্বেত-পুলিশ তাঁকে ছেড়ে দিল।···

সভা ওখানেই সমাপ্ত। কোনবিধ প্রস্তাবই আর গৃহীত হতে পারল না।

সেই রাত্রেই 'টাইম্‌স' পত্রিকায় সাভারকর একটি পত্র পাঠালেন। পরদিন পত্র-পাঠে জানা গেল সাভারকরের মত ও মন্তব্য। তিনি লিখেছেন: "ধিংড়ার মামলা এখনো কোর্টে বিচারাধীন। সভায় বসে কারোই কোর্টের ক্ষমতা বে-দখল করে ধিংড়ার বিরুদ্ধে রায় দেবার অধিকার নেই। আর, যদি কোন রায় দিতে হয়, তবে ধিংড়ার কথাও তো প্রথম শুনে নিতে হবে!"

বীরেন চট্টোপাধ্যায় আজন্ম-বিপ্লবী। দেশনেত্রী সরোজিনী নাইডুর ভাই। 'টাইম্‌স' পত্রিকায় তিনি লিখলেন:···"ইংরেজ যদি এখনো মনে করে যে, মানব-কল্যাণের জন্যে ভারতবর্ষে তাকে থাকতে হচ্ছে, তবে এ সুখ-কল্পনা তার অচিরেই চুরমার হয়ে যাবে। আগামী দিনের হত্যালীলা দীর্ঘতম হতে বাধ্য। সেই রক্তপাতের জন্যে দায়ী হবে তারাই, যারা ভারতের স্বাধীনতা অস্বীকার করে আত্মস্বার্থে তাকে পদানত রেখেছে।"

শ্যামজি কৃষ্ণবর্মাও ছেড়ে কথা কইলেন না। তিনি লিখলেন: "আমার এই নিধন-কার্যের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। তবু সরল চিত্তে স্বীকার করব যে, এই কাজ আমার সমর্থনযোগ্য। আমি এই নিধন-লীলার যিনি কর্তা, তাঁকে ভারতীয়-স্বাধীনতার বেদীতলে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ 'শহিদ' রূপে বরণ করি। আমি জানি, আমার এই উক্তি অনেকের মনে আঘাত দেবে। কিন্তু এও জানি যে, ইংরেজদের

মধ্যেও এমন সুস্থ-সবল চিত্তের মানুষ আছেন, যাঁরা আমার সঙ্গে একমত। তাঁরাও বলবেন,—রাজনৈতিক কারণে নিধন, সাধারণ হত্যার সামিল নয়।”...

মদনলাল ধিংড়ার ফাঁসি

মদনলালকে ১০ই জুলাই ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে আনা হল। ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে ধিংড়া শুধু বললেন: “একটি কথাই বলব,—আমি ইচ্ছা করে ‘লালকাকা’কে হত্যা করিনি। তিনি ছুটে এসে আমাকে জাপ্‌টে ধরতে চেয়েছিলেন। আমি তাই আত্মরক্ষার জন্যে তাঁকে গুলি করেছি।”

মামলা ক্রমে জজের কোর্টে এল। ধিংড়া কোন উকিল দিলেন না। যা বলার তা নিজেই বললেন। জজের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন: “তুমি ইচ্ছাসুখে বিচার কর, আমার আপত্তি নেই। তোমরা শ্বেতাঙ্গদল এখন ক্ষমতায় বসে আছ, তোমরা আমাকে নিয়ে যা খুশি তা-ই করতে পার। কিন্তু মনে রেখো, দিন আমাদেরও আসবে।”...

বিনায়ক সাভারকর এবং বি. ভি. এস্. আয়ার ব্রিক্‌স্‌টন্-কারাগারে বন্দী ধিংড়াকে দর্শন করতে গেলেন। তাঁরা দেখলেন,—এ তো তাঁদের পরিচিত দৃপ্ত-চঞ্চল কিশোর মদনলাল নন! এ যে আত্মনিবেদিত বীর্যবান এক তরুণ তাপস,—নয়নে তাঁর গীতার ভগবানকে যে-দৃষ্টিতে দেখে অর্জুন কর্মনিযুক্ত হয়েছিলেন, সেই সুগভীর দৃষ্টি!...এই তরুণই মদনলাল ধিংড়া। ম্যাজিস্ট্রেট-কোর্টে এই তরুণেরই কণ্ঠোচ্চারিত উক্তি আজো রক্তে জ্বালিয়ে দেয় আগুনের হল্কা:...“জার্মানদের যেমন ব্রিটেন দখল করার অধিকার নেই, ব্রিটেনেরও তেমনি ভারতবর্ষ দখলের এক্তিয়ার নেই। অতএব যে-ইংরেজ আমার পবিত্র জন্মভূমি ভারতবর্ষকে অপবিত্র করতে চায়, তাকে হত্যা করা আমাদের

কাছে ন্যায়ের নির্দেশ। ইংরেজের কপটতা, অশোভন মিথ্যাচার ও বিদ্রূপ-বর্ষী আচরণ দেখে আমি স্তম্ভিত।"

ধিংড়া ইংরেজ-জাতিকে আরো শুনিয়েছিলেন: "আমি বিশ্বাস করি, বিদেশী ব্যায়নেটের গুঁতোয় যে-জাতিকে দাবিয়ে রাখা হয়েছে,—সে নিয়ত বিবদমান পরিপার্শ্বে অবস্থিত; যুদ্ধ-ডঙ্কা সেখানে অবিরত বেজে যাচ্ছে। কিন্তু অস্ত্রহীন জাতির পক্ষে সম্মুখ-যুদ্ধের কথা অবান্তর, আমি তাই অতর্কিতে আক্রমণ করেছি। বন্দুকের লাইসেন্স আমাকে দেওয়া হয়নি, আমি তাই গোপন পিস্তল শত্রুর বুকে তাক্ করেছি।"

মদনলাল বলেছেন: "আমি 'হিন্দু' হয়ে মনে করি,—আমার দেশজননীর অসম্মান, বিধাতারই অসম্মান। দেশের কাজ, ভগবান রামচন্দ্রেরই কাজ। দেশের সেবা, প্রভু শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা। আমি বিদ্যাহীন, বিত্তহীন, বুদ্ধিহীন,—জননীর পূজাবেদীতলে অর্ঘ্য দেবার মত আমার বুকের রক্তটুকুই শুধু আছে। সেই রক্ত আমি নিবেদন করলাম।"

দেশজননীর পূজায় আত্মনিবেদিত ভয়-ডরহীন এই যুবক আরো বলেছেন: "ভারতবর্ষে একটি মাত্র শিক্ষারই প্রয়োজন,—সে হচ্ছে মৃত্যুবরণের শিক্ষা। সেই শিক্ষাদানের রয়েছে একটি মাত্র পথ—সে হচ্ছে আত্মবলিদানের পথ। তাই আমি মৃত্যুকে বরণ করছি। আমার আত্মনিবেদন জয়যুক্ত হোক্!"

আবার এই স্বেচ্ছামৃত্যুর দ্বারেও তিনি তাঁর একখানি জ্বলন্ত কামনা রেখে গেলেন। কারণ, তাঁর প্রতি রক্তবিন্দুতে দেশমাতৃকার বন্দনা ব্যতীত আর কোন ধ্বনি সঞ্চারিত হত না। শৃঙ্খল-বিভূষিতা পরাধীন মাকে ফেলে যেতেও তাঁর বেদনা। তাই দুঃখিনী দেশজননীর চোখের জলটুকু মুছিয়ে ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলবার পূর্বমুহূর্তে বীর সন্তান এক প্রত্যয়-মধুর প্রার্থনা জানালেন: "বিধাতার কাছে আমার কামনা, আমি যেন বারে বারে আমারই গর্ভধারিণীর বুকে জন্মগ্রহণ

করে বারে বারে দেশোদ্ধারের সাধনায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি, যতকাল না আমার ভারতভূমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে বিশ্বসভায় গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিতা হন।”...

ধিংড়ার জীবনদীপ নির্বাপিত। একখানা জ্বলন্ত-তরবারি মাতৃপূজার উপকরণরূপে নিবেদিত হল। ১৯০৯ সালের ১৭ই আগস্ট লণ্ডনের পেণ্টনভেলি জেলে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করলেন সুদূর পাঞ্জাবের তরুণ বিপ্লবী মদনলাল ধিংড়া।...তিনি যাবার পূর্বে বলে গেলেন,—তাঁর যা কিছু সম্বল ও অর্থকড়ি লণ্ডনে আছে, তা যেন জাতীয় ভাণ্ডারে জমা করে দেওয়া হয়।

অর্থকড়ি কী-ই বা! বিদেশে পাঠরত একটি ‘ইঞ্জিনীয়ারিং’-এর ছাত্র। বাপ অবশ্য ব্যারিস্টার। বড় ভাই দেশে অবস্থান করেন। ইংরেজের খয়ের খাঁ-পরিবার! ভয়ে তাঁরা ঘটনা ঘটবার সাথে সাথেই মদনলালকে ‘ত্যাজ্য’ করেছেন। কিন্তু আর্থিক সম্বল তাঁর যত সামান্যই হোক্, তার পশ্চাতে মনের সম্বল কত বিপুল, কত মহান! হোক্ একটি পয়সা, একখানি জীর্ণ বসন,—তার অধিকারী আর কেউ নয়, অধিকারী হল জাতীয়-ভাণ্ডার!...

আমরা ভাবি,—মদনলালের শিশুকাল থেকেই ‘বিদ্রোহী’, কৈশোরে ‘বিপ্লবী’ এবং যৌবনে মৃত্যুভয়-বিমুখ ‘তাপস’ হবার শক্তি-উৎস কোথায়? চাপেকার-ভাইদের মত তাঁরও কি শক্তিদায়িনীরূপে অন্তরালে ছিলেন গর্ভধারিণী জননী?...আমরা জানি না। জানবার উপায়ও হয়ত নেই।...

ধিংড়ার মৃতদেহ জেলের বাইরে আনতে দেওয়া হয়নি।...কিন্তু তাতে কি হয়? ধিংড়ার শেষ ইচ্ছানুসারে তাঁর শ্রাদ্ধাদি হল লণ্ডনেই। সতীর্থ জ্ঞানচাঁদ বর্মা মাথা মুড়িয়ে সকল অনুষ্ঠান পালন করে বিপ্লবী ভাইটির শেষকৃত্য সম্পন্ন করলেন।...এদিকে কলকাতায়

বসে অরবিন্দ তাঁর 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় লিখে পৃথিবীকে জানিয়ে দিলেন : "Here his country remains behind to bear the consequences of his act." ('Karmayogin',—July 31, 1909.) [এখানে তাঁর দেশ তাঁরই পশ্চাতে রয়েছে তাঁর কৃতকর্মের সকল দায়িত্ব বহন করার সংকল্পে।]

গিরিজাশঙ্করের মতে : "এক অরবিন্দ ভিন্ন এই ঘটনায় এরকম লেখা আর কেহ লিখিতে পারিতেন না।" (শ্রী অ:, বা:, স্ব:',—পৃ: ৬০০)

গিরিজাশঙ্করের উক্তি সর্বৈব সত্য। সে-যুগের ভারতবর্ষে সর্বভয় বিবর্জিত বিপ্লবী ব্যতীত অপরের পক্ষে অমন করে লেখা সম্ভব ছিল না।···

যে-বস্তু বিশ্ববিধানে সত্য, তার স্বীকৃতি বিশ্বের দরবারে। নিজের কিংবা গণ্ডির স্বার্থ থেকে ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্ব-সত্যকে যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তাঁদেরই অন্যতম মিঃ ব্লান্ট্ তাঁর 'মাই ডায়েরিজ্' গ্রন্থে লিখলেন : "কোন ক্রিশ্চিয়ান্ শহিদই ধিংড়ার চেয়ে অধিক নিঃশঙ্কতায় ও মাহাত্ম্যে বিচারকের সম্মুখে দাঁড়াতে পারেননি। ধিংড়ার 'মৃত্যুদিন' আবহমানকাল ভারতভূমিতে শহিদ-তর্পণের সৌন্দর্যে পালিত হবে।"···

মিঃ ব্লান্ট্ ঐ গ্রন্থে আরো লিখেছেন : "People talk about political assassination as defeating its own end, but that is nonsense. It is just the shock needed to convince selfish rulers that selfishness has its limits of imprudence. It is like that other fiction that England never yields to threats. My experience is that when England has her face well slapped, She apologises, not before." ('Blitz'—P. 19 ; 22. 6. 68.) [অনেকের মতে রাজনীতিক-হত্যা বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেয়, কিন্তু তা নির্বোধ উক্তি। এ হচ্ছে শুধুই সেইটুকু আঘাত, যা

স্বার্থপর শাসকদের ধৃষ্টতা সীমিত করার জন্যে প্রয়োজন। এঁদের অভিমত ইংলণ্ডে প্রচলিত আর একটি প্রবাদেরই অনুরূপ,—অর্থাৎ, ইংলণ্ড নাকি ভীতি-প্রদর্শনকে সেলাম ঠোকে না!…কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। আমি জানি,—ইংলণ্ডের গালে কষে চড় বসাতে পারলেই সে ক্ষমা চায়, তৎপূর্বে নয়।]

পৃথিবীখ্যাত রাজনীতিক-নেতা লয়েড্ জর্জ পর্যন্ত চার্চিলের কাছে সেদিন বলেছিলেনঃ "ধিংড়ার কোর্টে-প্রদত্ত উক্তি দেশপ্রেমের শ্রেষ্ঠতম মাধুর্যে উজ্জ্বল। তাঁর তুলনা চলে শুধু 'প্লুটার্ক'-বর্ণিত মৃত্যুঞ্জয়ী বীর্যবানদের সঙ্গে।"

একত্রিশ বছর পর
লণ্ডনে দ্বিতীয় বহ্ন্যুদ্গীরণ
(ও'ডায়ার-নিধন)

ধিংড়ার আত্মদানের পর দশ বছর কেটে গেছে। ভারতবর্ষ তখন অগ্নিগর্ভ। বিদ্রোহী বাঙলা, বিদ্রোহী মহারাষ্ট্র, বিদ্রোহী পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও বিহার, বিদ্রোহী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত। সকল প্রদেশ নিয়ে বিদ্রোহী ভারতবর্ষ।…

এদিকে ইংরেজের সমর-শক্তি বিশেষ করে পাঞ্জাব-নির্ভর। কাজেই অন্তত সেখানকার বিদ্রোহের বাণী সরকারপক্ষের সহ্যাতীত।

১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল তাই ব্রিটিশ-শক্তির মাহাত্ম্য সমঝানর উদ্দেশ্যে সংঘটিত হল জালিয়ানওয়ালাবাগের অমানুষিক হত্যালীলা। পাঞ্জাবের বর্বর লাট মাইকেল ডায়ার তাঁর রাজ্যের শাসনভার তুলে দিলেন সামরিক-বিভাগের হাতে। জেনারেল ডায়ার সদম্ভে গ্রহণ করলেন মিলিটারি শাসনের দায়িত্ব। রক্তপায়ী দস্যু 'রাজা' হয়ে বসল। ডায়ার এবং ডায়ারের কুকীর্তি বিশ্বের মানুষকে স্তম্ভিত

করে দিয়েছিল। নির্বিচারে হাজার হাজার শিশু-তরুণ-বৃদ্ধ নরনারীকে চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রেখে পশুর মত গুলি করে মেরে ফেলেই তাঁরা ক্ষান্ত হলেন না, সারা প্রদেশে মার্শাল্-ল'র নিষ্ঠুর শাসন জারি করে দিনের পর দিন এক ভয়াবহ বিভীষিকা সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে থাকলেন। শহরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। দারুণ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে তৃষ্ণার্ত নগরীর পানীয় জলও বন্ধ করা হল। মানুষকে ঘরের মধ্য থেকে টেনে এনে জোয়ান-বৃদ্ধ নির্বিচারে বেতের ঘায়ে সজুত করা চলল। মানী ও দেশপূজ্য নেতাদের রাজপথে বুকে-হাঁটিয়ে বা ওঠ-বস্ করিয়ে পিশাচের দল হেসে উঠল। নারী-ধর্ষণের লালসায় মত্ত গোরাসৈন্যরা পরম পুলকিত।...

এহেন দানবীয় তাণ্ডবের প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঘৃণায় ইংরেজ-প্রদত্ত 'নাইট্' উপাধি ফিরিয়ে দিয়ে গঙ্গাস্নানের শুচিতা বোধ করলেন।...স্যার শঙ্কর নায়ারের মত ব্রিটিশভক্ত ব্যক্তি পর্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বড়লাটের কাউন্সিল থেকে পদত্যাগের পত্র পাঠিয়ে দিলেন।

শঙ্কর নায়ার একখানা বই লিখলেন,—'গান্ধীজি এণ্ড্ টেররিজম্' নামে। তাতে থাকল গান্ধীজি ও তাঁর অসহযোগ-আন্দোলনের তীব্র নিন্দা। সঙ্গে থাকল ও'ডায়ারী-শাসনের বিরূপ সমালোচনা। এতে ও'ডায়ারের মর্যাদাবোধে ঘা লাগল। তিনি মানহানির মকদ্দমা করে নায়ারের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ বাবদ মোটা অঙ্কের অর্থদণ্ডের রায় বের করালেন। গান্ধীজি দেশবাসীর কাছে নায়ারের ঐ অর্থদণ্ড সাগ্রহে বহন করার জন্যে আবেদন জানালেন। সবটা মিলিয়ে ও'ডায়ার শুধু দস্যু নন, একটি আস্ত 'ভিলেন্'-রূপে ভারতবাসীর কাছে ঘৃণিত পরিচয় লাভ করলেন।

এতেও শান্তি নেই। ও'ডায়ারকে বাধ্য হয়ে ভারতবর্ষ থেকে সরিয়ে নেবার পরও তাঁর শ্বেতাঙ্গ ভাইবোনেরা বিলেতে বসে বিপুল পরিমাণ অর্থ পুরস্কার দিয়ে তাদের বীরপ্রতিম জাঁদরেল শাসককে সম্মানিত করল। সেই অর্থের পরিমাণ ছিল বিশ হাজার পাউণ্ড!

বিজয়গর্বে গর্বী ও'ডায়ার তৎপর লিখলেন একখানা বই। তার নাম 'ইণ্ডিয়া এ্যাজ্ আই নিউ ইট্'। তাতে ভারতবাসীর কুৎসা ছাড়া আর কিছু ছিল না!···

ও'ডায়ার-হত্যা

দীর্ঘ একুশ বছর পার হয়ে গেছে। ও'ডায়ারের যৌবনদীপ্ত জীবনের জলুস এখন আর নেই। ইংলণ্ডের কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। সংগ্রামী ভারতেরও রূপ বদলেছে। অহিংস-আন্দোলনের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মহাত্মা গান্ধী তৎপর। অহিংসার 'সত্য' প্রতিষ্ঠায় দেশের স্বাধীনতা আসবে বলে তাঁর বিশ্বাস। স্বাধীনতার জন্যে 'অহিংসা' নয়। অর্থাৎ, 'অহিংসা'ই চরম, পরম ও নিকট উদ্দেশ্য—স্বাধীনতা গৌণ বস্তু, —'অহিংসা-সত্যে'র পথে সংগ্রাম করলেই স্বাধীনতা এসে যাবে, প্রভু ইংরেজের হৃদয় পরিবর্তিত হয়ে। 'অহিংসা'র এই যে পরীক্ষা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে মহাত্মা একান্ত নিষ্ঠায় শুরু করেছেন, তাতে পৃথিবীর জ্ঞানী-গুণীরা উৎসাহী এবং বিশ্বের নির্যাতিত জাতিগুলো আগ্রহশীল।

কিন্তু বিপ্লবীর পথ শাশ্বত, সনাতন, ক্ষুরধার, খরদীপ্ত। তার পরিবর্তন ঘটবে সেদিন,—যেদিন 'উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে-বাতাসে ধ্বনিবে না', যেদিন 'অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না'। ভারতবর্ষের শতকরা নিরানব্বুই জন বিপ্লবীর স্বাধীনতা লাভের পূর্বে নিদ্রা নেই, আহার নেই, স্বস্তি নেই।···

এদিকে ও'ডায়ার-জাতীয় মানুষগুলোরও পরিবর্তন নেই। জগতে ভিলেন্‌দেরও আনাগোনা অল্প-বিস্তর থাকবেই। নইলে সৃষ্টি অচল হয়ে যায়।···দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে গেছে। জার্মানির উদ্যত অসি সাম্রাজ্যলোভী ব্রিটিশের মাথার উপরে ঝুলছে। এমন সময় মূর্খ ও'ডায়ার যখন শুনলেন যে, কংগ্রেসী-মন্ত্রীরা গান্ধীজির নির্দেশে গদি

ছেড়ে দিয়ে সরকারের দপ্তর থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তখন সানন্দে তৎসম্পর্কে বললেন : "…as good riddance of bad rubbish," —অর্থাৎ, 'নোংরা আবর্জনা থেকে শুভমুক্তি' !…

১৯৪০ সাল। মার্চ মাসের ১৩ তারিখ। 'ক্যাক্সটন হল্'-এর 'টিউডর্রুম'-এ একটি সভা আহূত হয়েছে। 'রয়েল্ সেন্ট্রাল্ এশিয়ান সোসাইটি' এবং 'ইস্ট্ ইণ্ডিয়া এ্যাসোসিয়েশান্'-এর যুগ্ম আবেদনে আহূত এই সভা। জার্মানি এবং সোভিয়েট্ রুশিয়া তখন পরস্পরের সাথী। কাজেই, আফগানিস্তানের রাজনীতি সম্পর্কে ব্রিটিশের বিষম চিন্তা। এই সভা আহ্বানের মূলে সেই চিন্তা। সভার সভাপতি ছিলেন ভারতসচিব লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড।…

ও'ডায়ার যাচ্ছেন উক্ত সভায়। তাঁর কেন্সিংটন্-গৃহ থেকে তিনি বেরুলেন। বাড়ির লোকদের বলে গেলেন যে, ঠিক পাঁচটায় ফিরে এসে তিনি চা খাবেন।…('Blitz', 22. 6. ৫৪)

সভাগৃহের ঘড়িতে সাড়ে চারটা বেজে গেছে। সভাপতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা ভঙ্গ হয়েছে। শ্রোতাদের নড়াচড়া সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এমন সময় হলঘর কাঁপিয়ে বিপুল শব্দে পাঁচ-ছ'টা বুলেট্ ছুটে গেল। দু'টি বুলেট্ ও'ডায়ারকে বিদ্ধ করল। মৃত্যুদূত মুহূর্ত বিলম্ব না করে ভারতবর্ষের মহাশত্রু প্রাক্তন পাঞ্জাব-শাসককে লুফে নিল। মিঃ ও'ডায়ার তাঁর কথা রাখতে পারলেন না। পাঁচটায় বাড়ি ফিরে চা খাওয়া আর এ-যাত্রায় হল না ! ··

ইতিমধ্যে স্বভাবতই ও'ডায়ার-নিধনকারী ভিড়ের মধ্যে ধরা পড়লেন। তাঁর কাছে পাওয়া গেল একটি রিভল্‌বার ও কিছু কার্তুজ। নাম বললেন,—রাম মহম্মদ সিং আজাদ। ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে বা পুলিশের কাছে আর কিছু তিনি বললেন না।

পুলিশ চঞ্চল হয়ে উঠল। লণ্ডনে ও ভারতে তাদের খোঁজ-খবর নিতে হচ্ছে। পরিশেষে তারা জানল যে, আততায়ী তাঁর সঠিক নাম বলেননি,—তাঁর নাম উধম সিং। পাঞ্জাবী শিখ এই বলিষ্ঠদেহী যুবক। দেশে সোস্যালিস্ট পার্টির কর্মীরূপে জেলও খেটেছেন। তাঁর ডায়েরির বহু স্থানে ও'ডায়ারের নাম-ঠিকানা নাকি লিখিত আছে।…

কোর্টে উধম সিং বললেন: "মৃত্যুভয় আমার নেই। মরতে হবেই একদিন। বুড়ো হয়ে মরার চেয়ে যৌবনে মৃত্যুবরণ অনেক শ্রেয়। আমি যৌবনে দেশজননীর মুক্তি-সংগ্রামে মৃত্যুকে গ্রহণ করছি।… ভাল কথা, লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড সাবাড় হয়েছেন তো? তাঁরও তো বাঁচবার কথা নয়? আমি তো তাঁর ঠিক এইস্থানে গুলি করেছি (বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের তলপেট দেখিয়ে দিলেন)।"…

আরো বলেছিলেন ঐ বীর যুবক ভাবগম্ভীর কণ্ঠে: "আমি তো দেখেছি ভারতের অগণিত মানুষকে সাম্রাজ্যলোভী ইংরেজের শাসন-ছায়ায় না খেয়ে মরতে!…আমি তাই আমার সশস্ত্র এই প্রতিবাদে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই। দেশের জন্যে আমি শুধু আমার কর্তব্য পালন করে গেলাম।…"

ওল্ড বেইলি 'সেন্ট্রাল্ ক্রিমিন্যাল্ কোর্টে' বিচারের প্রহসন হয়ে গেল। জজ ও জুরি মিলে উধম সিংকে ফাঁসির হুকুম শোনালেন।

মহাবিক্রমে পাঞ্জাব-শার্দুল উধম সিংকে ইংরেজ 'পেন্টনভেলি জেলে' ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলিয়ে দিল। সেদিন তারিখ ছিল ১৯৪০ সালের ১২ই জুন।…

তখন কিন্তু হিটলার-বাহিনী ফরাসী দেশে ঢুকে গেছে। ইংলণ্ড বোমা-বিধ্বস্ত ও লণ্ডভণ্ড। তবু সাম্রাজ্যবাদী ঢঙ্ পুরোমাত্রায় বজায় রেখে ইংরেজ তার ভারতীয়-জমিদারির খাস প্রজাকে 'অন্যায় ঔদ্ধত্যে'র জন্যে ফাঁসি না দিয়ে পারে না।

বাঙলার চারণ-কবি মুকুন্দদাসের কণ্ঠ কি শ্বেত-প্রভুরা শোনেননি? 'আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড রুদ্র দীপ্তিমান',—এ তো কবির অলস কল্পনা নয়? এযে সাধকের মরমী ভবিষ্যৎ-বাণী!···

একত্রিশ বছর পূর্বে (১৯০৯ সালে) পাঞ্জাবের বিপ্লবী-তরুণ ধিংড়া লণ্ডনের বুকে যে-ইতিহাস রচনা করেছিলেন, তাতে ব্রিটিশের শিক্ষা হয়নি। তাই একত্রিশ বছর পরে (১৯৪০ সালে) পাঞ্জাবেরই আর একটি তরুণকে একই ছন্দে অস্ত্রধারণ করতে হল ইতিহাসের পুনরাবর্তন ঘটাবার জন্যে। এতেও শিক্ষা হল না। কিন্তু তারপর? তারপর জার্মানি ও জাপানের কাছে চরম মার খেয়ে ন্যুব্জদেহী ব্রিটিশ-দস্যু দু'টি গণ্ডে যখন বিষম চপেটাঘাত খেল নেতাজির বিপ্লব-বাহিনী 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজে'র হাতে—তখন তার চৈতন্য হল। সেটা ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের অবিস্মরণীয় ঘটনা।···

ভারতবর্ষ থেকে অবশেষে তল্পি-তল্পা গুটিয়ে ব্রিটিশের সরে পড়ার ইতিহাসের মূলে ঐ ঐতিহাসিক চপেটাঘাত।

দামোদর, ক্ষুদিরাম, যতীন মুখার্জি, রাসবিহারী, আসফাক্উল্লা, ভগৎ সিং, যতীন দাস থেকে শুরু করে সূর্যসেন, প্রীতিলতা, বিনয়, দীনেশ, প্রদ্যোৎ, অনাথ, ভবানী প্রমুখ প্রবর্তিত বিপ্লব-তরঙ্গই ধিংড়া ও উধম সিং লণ্ডনে প্রবাহিত রেখেছিলেন। স্বদেশে ও বিদেশে পঞ্চাশ বছরের ভারতীয়-বিপ্লবের যে অভিযান, তা রূপে-গুণে-সামর্থ্যে-শৌর্যে অপরাজেয় হয়ে উঠল রাসবিহারীর লালনে এবং নেতাজির নেতৃত্বে বাঙলার বাইরে—দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তীরে।···কাজেই, 'আজাদ

হিন্দ্ ফৌজে'র হাতের চপেটাঘাত বড়ই নির্মম ও লাগসই। এহেন আঘাতের স্বরূপ ও ক্ষমতা জেনেই ডব্লু. এস্. ব্লাণ্ট্ বলেছিলেন:
"My experience is that when England has her face well slapped, she apologises, not before."

('Blitz',—22 June, 1968, P.—19)

[আমার অভিজ্ঞতা—ইংলণ্ড তার গণ্ডদেশে বিষম চপেটাঘাত না খেয়ে কখনো নিজের ত্রুটির জন্যে ক্ষমা চায় না।]

শুধু ইংলণ্ড কেন? ছোট-বড় কেউই তার কায়েমী-স্বার্থ বিনা-যুদ্ধে ছেড়ে দেয় না।…

॥ আট ॥

বহ্নিদীপ্ত দিল্লী নগরী

বোমা-বিধ্বস্ত লর্ড হার্ডিঞ্জ

১৯১২ সাল। কলকাতা থেকে ব্রিটিশ-ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করা হল। ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীর দরবার। সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষে ভারতীয় প্রজাগণের প্রতিনিধি ও দেশীয় রাজন্যবর্গ নিয়ে প্রভুর প্রতীক বড়লাটের দরবার। বড়লাট তাই রাজকীয় আড়ম্বরে নূতন রাজধানীতে প্রবেশ করছেন। বিপুল সমারোহ। অপূর্ব জাঁক-জমক ও আলোড়ন। মধ্যযুগীয় স্বর্ণ-ঝলমল রাজ-রাজড়ার পোশাক-পরিহিত দেশীয় নৃপতিবৃন্দ ও মিলিটারি-পুরুষদের বীরদর্পে চলাফেরা। পথঘাট লোকে-লোকারণ্য। দরবার-গৃহ দৃপ্ত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের উপকরণে দর্শনীয়। দেশী-বিদেশী নরনারী, করদ-রাজ্যগুলোর রাজন্যবর্গ ও রাজপুরুষদের সমাবেশে সে-গৃহ গম্‌গম্ করছে।...

দিল্লীর সেন্ট্রাল স্টেশনে বড়লাটের স্পেশাল ট্রেন এসে থেমেছে। বিপুলদন্তী এক রাজহস্তীর পৃষ্ঠে বিরাট এক রৌপ্য-নির্মিত হাওদায় আসীন লর্ড্ হার্ডিঞ্জ ও তাঁর পত্নী। বড়লাট-দম্পতির মাথার উপরে বিচিত্র ছত্র ধরে আছে জমাদার মহাবীর সিং—কোন এক করদ-রাজ্য থেকে আগত এক জঙ্গী জোয়ান।... ('Roll of Honour')

জনাকীর্ণ পথ পেরিয়ে ভাইসরয়ের শোভাযাত্রা গৌরবে ও স্পর্ধায় এগিয়ে চলেছে। বড়লাটের হস্তী 'পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে'র সুমুখে আসতেই বজ্র-নির্ঘোষে ফেটে গেল একটি বোমা। বোমাটি

লাটসাহেবকে লক্ষ্য করেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কর্ণ বধির করা এই বিস্ফোরণে সর্বজন বিহ্বল! বড়লাটের হাওদার পশ্চাৎভাগ চুরমার হয়ে গেছে। বোমার একটা টুকরা (Splinter) লাটসাহেবের পিঠের মাংস ছিঁড়ে কাঁধের উপরে উঠে এসে মস্ত একটি ক্ষত সৃষ্টি করেছে। সেই ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণের বিরাম নেই। ঘাড়ে ও দেহের নানাস্থানে তাঁর প্রচুর আঘাত। সবগুলো মারাত্মক না হলেও ক্রমে ক্রমে তাঁর সম্বিৎ লুপ্ত হয়ে আসে।···

লেডী হার্ডিঞ্জ স্বভাবতই ইতিপূর্বে এত বড় বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েননি। তবু সাহস হারালেন না। তাঁর মনোবল অসামান্য। তাঁরই আহ্বানে সম্মুখগামী হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় রাজপুরুষ (কর্ণেল ম্যাক্সওয়েল্) কাছে ছুটে এলেন। তৎপর অতি কষ্টে ও নৈপুণ্যে মুমূর্ষু বড়লাটকে হস্তীপৃষ্ঠ থেকে নামিয়ে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হল ত্বরিত চিকিৎসা-দানের জন্যে। ('Roll of Honour')

রাজপুরুষ, পুলিশ ও খয়েরখাঁবৃন্দ চোখে সর্ষেফুল দেখলেন। দেশীয় রাজন্যকুলের আর্তনাদ সর্বাধিক।

হাওদার পেছনের লোকটির দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে।···

পুলিশ কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সুদূর দিল্লী পর্যন্ত কি তাহলে বিপ্লবীদের আনাগোনা চলছে? এ যে অকল্পনীয়! বড়লাট—সম্রাটের সর্বোত্তম প্রতিনিধি—ভারতীয়-নেটিভ্‌দের একমাত্র কর্তা। নর-দেহে আবির্ভূত তিনি 'পরম পিতা' বা সরকার-'ব্রহ্ম'! তাঁর সোনার অঙ্গে ছোবল মারবার এ কী দুঃসাহস!···এসব ক্ষেত্রে বাবুর চেয়েও ভৃত্যের ক্রোধ অধিক হতে দেখা যায়। তাই ব্রিটিশ-রাজপুরুষদের চেয়েও অধিকতর ক্রুদ্ধ হলেন স্বদেশী নৃপতিকুল। তাঁরা মুহূর্তে মস্ত এক অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করে দিলেন আততায়ীকে ধরবার জন্যে ··· কিন্তু ব্রিটিশের বাদশাহী চাল বপ্ত হয়ে গেছে। তাই ওসব আহ্লাদেপনার প্রশ্রয় দেওয়া হল না। সরকারপক্ষ সস্নেহে পিঠ চাপড়িয়ে বললেন তাঁদের: "[illegible]ত হয়, সরকারী নানা ফণ্ডে যত ইচ্ছা দিয়ে-থুয়ে ধন্য হও,

—শাসনক্ষেত্রে শিশুর সারল্যেও নাক গলাতে এসো না,—সেখানে কর্তা ও কর্ণধার ব্রিটিশ-রাজ স্বয়ং, যা করবার আমরাই করব।…

সরকারপক্ষ থেকেই একলক্ষ টাকা প্রাপ্তির লোভ দেখিয়ে পুরস্কার ঘোষিত হল আততায়ীদের সন্ধান দেবার বিনিময়ে।…

সন্ধান কিছুই পাওয়া গেল না। দিন কাটে, সপ্তাহ কাটে, মাসও কেটে যায়,—তবু কিছুই সন্ধান পাওয়া যায় না। বিদীর্ণ বোমার খোল ও দাহ্যপদার্থ পরীক্ষা করে পুলিশ শুধু বুঝল যে, ও-সব কলকাতায় প্রাপ্ত বোমাগুলোর সগোত্র।…

কিন্তু পুলিশকে কাজ দেখাতে হবেই। সুতরাং ধর-পাকড় সাড়ম্বরে চলল। তথাপি নানা কায়দা করেও কোন তথ্য আবিষ্কার করা গেল না।…

এতবড় একটা য়্যাক্‌শান্—সমগ্র ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের জীবনে যা অভূতপূর্ব,—যার গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী—তার পশ্চাতের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে পুলিশ কোন হদিসই পেল না।…আই-বি কর্তাদের মাথা হেঁট হয়ে রইল।…

প্রায় পাঁচ মাস কেটে গেছে। সহসা ১৯১৩ সালের ১৭ই মে লাহোরে একটি বোমার বিস্ফোরণ ঘটল। লরেন্স্ বাগে একটি জীবন্ত বোমা রাখা হয়েছিল গর্ডন্ সাহেবের হত্যাকল্পে। কিন্তু গর্ডন্ সে-পথ মাড়াননি। একটি নিরীহ চাপরাসি ঐ-পথে যাচ্ছিল সাইকেলে। বোমা ফেটে মৃত্যু ঘটল তার।

বোমাটি সেখানে রেখেছিলেন বিপ্লবী-তরুণ বসন্ত বিশ্বাস,—রাসবিহারী বসুর বিশ্বস্ত কর্মী।

কে এই গর্ডন্ ? কেনই বা তাঁকে টার্গেট্ করা হয়েছিল ?···এই আই. সি. এস্. রাজপুরুষটি ছিলেন সিলেট জিলার কুখ্যাত জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট। 'অরুণাচল আশ্রম' পুলিশের নজরে পড়েছিল। সিলেটের এই আশ্রমটি অভিমুখে তাই রাজনৈতিক কারণে পুলিশ বাহিনী ধাওয়া করল একদিন। এবং তারা গুলি চালাল আশ্রমবাসীদের লক্ষ্য করে, ঐ গর্ডন্ সাহেবেরই আদেশে। তাতেও তুষ্ট না থেকে গর্ডন্ অরুণাচল আশ্রমকে বে-আইনী সংস্থা বলে ঘোষণা করলেন। এই হঠকারিতার জন্যে বাংলাদেশে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জমে ওঠে। গর্ডন্‌কে তাঁর বাংলোতেই উচিত শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে 'অনুশীলন সমিতি'র কয়েকটি সভ্যসহ যোগেন চক্রবর্তীকে পাঠান হয় বোমা-হস্তে। যথাসময়ের পূর্বেই সেই বোমা ফেটে যায়। ফলে, যোগেন চক্রবর্তীর 'শহীদে'র মৃত্যু ঘটে। গর্ডন্ প্রাণে বেঁচে গেলেও মনের দিক থেকে দুর্বল হন। তাই সরকার ত্রস্তে তাঁকে সুদূর লাহোরে বদলি করে দেয়। ('বাংলায় বিপ্লববাদ',—পৃঃ ১১৫)

কিন্তু সরকারের তখনো জানা ছিল না যে, বিপ্লবীর হাতে বোনা মৃত্যুজাল সেদিন বাঙলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।···বসন্ত বিশ্বাস সিলেট শহরে বিপ্লবীর অসমাপ্ত কর্ম লাহোরে সমাপ্ত করতে গিয়েছিলেন।···আপাতদৃষ্টিতে কাজ হাসিল হল না, বসন্ত বিশ্বাসদের খোঁজও কেউ পেল না।···

লরেন্স্ বাগের ঘটনায় পুলিশ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। গুপ্ত-পথচারীদের খোঁজ পেতেই হবে। কিন্তু বড়ই নিখুঁত তাঁদের গোপন চলাফেরা !

এদিকে দেশময় বড়লাটের আততায়ীদের নিন্দায় বহু সভা-সমিতি মুখর হতে থাকল। এহেন একটি সভা আহূত হয়েছিল দেরাদুনে। সরকারী কর্মচারী তরুণ রাসবিহারী বসু ঐ সভায় জ্বালাময়ী ভাষায় আততায়ীদের নিন্দা করলেন, বড়লাটকে দীর্ঘজীবী হয়ে ভারতের কল্যাণ-ব্রতে নিযুক্ত থাকতে অনুরোধ জানালেন এবং অবিশ্বাস্যরূপে তাঁর প্রাণরক্ষায় হৃদয়ের আনন্দ প্রকাশ করলেন। উপস্থিত অফিসার-বৃন্দ ও তাবৎ খয়েরখাঁকুল তরুণ এই সরকারী বন-বিভাগীয় কর্মচারীটির রাজভক্তি ও বাক্‌শক্তিতে মুগ্ধ হলেন।...

অথচ এই রাসবিহারী বসুই তৎকালে উল্কার বেগে সারা উত্তর-ভারত ও পাঞ্জাব চষে বেড়াচ্ছেন এবং গুপ্ত-সমিতি গড়ে যাচ্ছেন আগামী বিপ্লব-রচনার সংকল্পে। তাঁরই নেতৃত্বে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছে। সেই সংবাদ পুলিশ জানে না। তারা জানে না যে, বাঙলা ও উত্তর-ভারতের বিপ্লবী-সংস্থার মধ্যে যোগা-যোগের সার্থক নেতৃত্ব এই সরকারী কর্মচারীটির উপরই ন্যস্ত ; তারা কল্পনাও করতে পারেনি যে, রাজভক্ত এই কর্মচারীটির মধ্যেই ভবিষ্যতের মহানায়ক 'রাসবিহারী বসু' অধিষ্ঠিত।...

উত্তর-ভারতে বিপ্লবীদের প্রথম মারাত্মক কর্মকাণ্ড সম্পন্ন হয়ে গেল বড়লাটকে বোমার আঘাতে ঘায়েল করে। এই বৈপ্লবিক-য়্যাক্‌শানের 'ইম্‌প্যাক্ট্‌' অসাধারণ। পৃথিবীব্যাপী সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের সর্বপ্রধান জমিদারি হল ভারতবর্ষ। সেই ভারতবর্ষের সর্বজনগ্রাহ্য প্রতিনিধিকে ওই ধারার আক্রমণ করার অর্থ হল, ব্রিটিশের শক্তি, দম্ভ ও প্রজাপালনের অধিকারকে অস্বীকার করার অপ্রতিহত অভিযান। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ-অভিযান মারাত্মক। ব্রিটিশের পক্ষে স্থায়িভাবে অশুভ।

বড়লাটের উপর আক্রমণের পরেই বিপ্লবীদের কর্মব্যস্ততা ক্রমশঃ প্রকট হতে থাকল গোপন ইস্তাহার বিলি করার কাজে। দিল্লী ও উত্তর-ভারতের নানা শহরে এ-সব ইস্তাহার দেয়ালে-দেয়ালে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে লেখা রয়েছে হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের প্রশংসা এবং ব্রিটিশ-বিতাড়নের যুদ্ধে যুব-শক্তিকে ঝাঁপিয়ে পড়ার সরাসরি আহ্বান।···

ইতিমধ্যে লাহোরে বোমা-বিস্ফোরণ ঘটে গেল। এ-বোমাটিও দিল্লীর বোমাটির সমধর্মী। কিন্তু পুলিশ যে কিছুতেই কোন গুপ্ত-সমিতি বা কোন গোপন-ষড়যন্ত্রকারীর খোঁজ পায় না!···

রাসবিহারীর সহায়করূপে জুটেছেন কয়েকজন প্রথমশ্রেণীর কর্মী। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অবোধবিহারী। উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের কর্মনেতৃত্বে তাঁকেই বসিয়েছিলেন সর্বাধিনায়ক রাসবিহারী বসু। তাছাড়া আমীরচাঁদ ছিলেন রাসবিহারীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। পাণ্ডিত্যে, বীর্যে ও আদর্শলালনে তাঁর পরিচয় অনন্যসাধারণ। সহকর্মী বীর বালমুকুন্দ, কর্মপাগল বসন্ত বিশ্বাস, পিংলে ও শচীন সান্যাল প্রমুখের তৎপরতা রাসবিহারীর বিপ্লবী-সংস্থাকে দ্রুত সারা উত্তর-ভারতে প্রচণ্ড সম্ভাবনায় দুর্জয় করে তুলেছিল।

এদিকে বাঙলাদেশে বৈপ্লবিক-য়্যাক্‌শান্ বেড়েই চলেছে। স্বদেশী ডাকাতি, পুলিশের দারোগা বা স্পাই ও ওয়াচার হত্যার জের যেন মিটছে না! নানাস্থানে বোমা ফাটছে, রিভল্‌বারের গুলি ছুটছে, ইস্তাহারে-ইস্তাহারে বিদ্রোহ-বাণী ছড়িয়ে যাচ্ছে।···

কিন্তু দলের শক্ত কাঠামোর মধ্যে কয়েকটি দুর্বল লোক ঢুকে পড়ায় কিছু খবরাখবর পুলিশের কানে গেল। ফলে, ১৯১৩ সালের

নভেম্বর মাসে কলকাতার রাজাবাজারের একটি আস্তানা তল্লাশি হয়। সেখানে অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় দুর্জয় বিপ্লবী অমৃত হাজরা গ্রেপ্তার হন। বোমার মাল-মশলা ইত্যাদি পাওয়া যায়, আরো পাওয়া যায় একটি নামের তালিকা। ঐ তালিকা থেকেই পুলিশ দিল্লীর আমীরচাঁদদের নাম পায়। 'রাজাবাজার বোমা ষড়যন্ত্র' মামলায় বহু লোক গ্রেপ্তার হলেন। তন্মধ্যে 'দীননাথ' নামে এক ব্যক্তি বিচার-কালে রাজসাক্ষী হওয়ার ফলে রাসবিহারী ও বসন্ত বিশ্বাসের নাম বেরিয়ে যায়। আমীরচাঁদের পুত্র সুলতানচাঁদও ভয়ে পিতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। ('বিঃ জীঃ স্মঃ',—পৃঃ ৩৮৩)

পুলিশ অনতিবিলম্বে (১৯১৪ সালের ১৬ই মার্চ) আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী, বসন্ত বিশ্বাস ও বালমুকুন্দকে গ্রেপ্তার করে। ঘটা করে এবার 'দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করা হল। রাসবিহারীকে ধরবার জন্যে সর্বভারতীয় পুলিশের চোখে ঘুম নেই। কিন্তু এই দুর্ধর্ষ নেতা যাদুকরের মত সমগ্র ভারতবর্ষে সবার চোখে ধূলো দিয়ে গোপনে ঘুরে ঘুরে প্রচণ্ড কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি করতে থাকলেন। পুলিশ আভাসে খবর পায়, কিন্তু কার্যত ব্যর্থ হয়। বহু ভাষাবিদ্ এবং ছদ্মবেশ-ধারণে অসীম দক্ষ এই সদা-সতর্ক অনলস মানুষটিকে খুঁজে বার করা কারো সাধ্য ছিল না। সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্রের 'সব্যসাচী'র কল্পনা বাস্তব-রাসবিহারীকে বিন্দুমাত্র ছাড়িয়ে যেতে পারেনি।···

ফাঁসির মঞ্চে চারটি বীর

আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাস। অবিস্মরণীয় নিশ্চয়ই এই চতুষ্টয়ের বৈপ্লবিক-অবদান!···

'দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা'য় অভিযুক্ত হয়েছেন এগারটি যুবক। আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বোমা তৈরি, অস্ত্র-আইনভঙ্গ ও রাজদ্রোহের নানা ধারার অভিযোগ

আনা হয়েছে। অবোধবিহারী ও বসন্ত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আরো আনা হয়েছে লরেন্স্ বাগে চাপরাসি-হত্যার চার্জ।···কিন্তু এত করেও পুলিশের বড় আপশোষ যে, বড়লাটের উপর চড়াও করার দায়ে কাউকে ফাঁসাবার মত এতটুকু তথ্যও কোনদিক থেকে তারা তৈরি করতে পারল না।···

যথারীতি ছোট-বড় সবগুলো কোর্টেই মামলার শুনানী হয়ে গেল। পাঞ্জাব চীফ-কোর্টের রায় বেরুল ১৯১৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি। আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল।

১৯১৫ সালের ১১ই মে। আম্বালা কারাগৃহের মৃত্যু-মঞ্চ। দৃঢ়-পদক্ষেপে পর-পর চারটি বীর সেই মঞ্চে আরোহণ করলেন। মৃত্যু তাঁদের 'পায়ের ভৃত্য'-রূপে এসেছিল। তাঁদের অমর কাহিনী হয়তো অনেকেরই জানা নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের দুরন্ত যৌবন সেদিন সেই বার্তা মনে-প্রাণে জেনেছিল। তাঁদের মত মৃত্যুহীন জীবন থেকে জীবন লাভ করেই ১৯১৫ সালের বিপ্লব-প্রচেষ্টার প্রত্যেকটি পদক্ষেপে এসেছিল প্রেরণা।···

শহিদ বসন্ত বিশ্বাস

রাসবিহারী বসুর নির্দেশেই বসন্ত বিশ্বাস বাংলাদেশ থেকে দিল্লী চলে আসেন বিপ্লব-কর্মে অংশগ্রহণ করতে। তাঁর বাড়ি ছিল নদীয়া জিলার 'পরাগাছা' গ্রামে। রূপ-লাবণ্যে মনোহর ছয়-ছোট্ট এই তরুণ কিশোর।

শোনা যায়, এই কিশোরই নাকি মেয়েদের পরিচ্ছদ পরে বড়লাটের শোভাযাত্রা দর্শনলুব্ধা মহিলাদের সাথে মিশে গিয়ে 'পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক' থেকে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা ছুঁড়েছিলেন রাসবিহারী বসুর প্ল্যান্‌মত। তারপর সকলের আর্ত-কোলাহল ও বিহ্বলতার ফাঁকে

নারীরূপা বসন্ত পালিয়ে যান। তাঁর এই কাণ্ড পুলিশ তো দূরের কথা দলের দু'চারজন ছাড়া অপর কেউ জানলেন না।

('Roll of Honour', P.—236)

কিন্তু হার্ডিঞ্জের উপর সত্যি কে বোমা ফেলেছিলেন, তা দুই কারণে সঠিক জানা যায় না। প্রথমত, তৎকালীন বিপ্লবী-কর্মকর্তাদের দু'চারজনই সঠিক সংবাদ রাখতেন; কিন্তু ওটা 'টপ্ সিক্রেট্' থাকায় দলের অপর কেউ জানতেন না। যাঁরা সরাসরি এই কার্যে যুক্ত ছিলেন তাঁরা বহুদিন হয় দেহরক্ষা করেছেন। কাজেই, আজ ছাপ্পান্ন বছর পর যথার্থ তথ্য নির্ণয় করা কঠিন। বসন্ত বিশ্বাস নারীবেশে বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন,—একথা কাহিনীর মত চলে এসেছে। কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে 'বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী' নামক বাৎসরিক স্মৃতি-সংখ্যার সম্পাদক শ্রীক্ষিতীশ দাস লিখেছেন: "কে নিজহস্তে হার্ডিঞ্জকে বোমা মারিয়াছিলেন সে-সম্বন্ধে তাঁহার (রাসবিহারী বসুর) নিজের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণাঙ্গনে দাঁড়াইয়া 'Our Struggle' বক্তৃতায় তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন: It was about 30 years ago I threw a bomb on Viceroy in Delhi." ('বিঃ মঃ নাঃ রাঃ',—পৃঃ ৭)

রাসবিহারী বসুর ঐতিহাসিক এই উক্তি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, বড়লাটের উপর বোমা তিনিই স্বহস্তে নিক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু সর্বাধিনায়ক এখানে 'I' শব্দটি 'আমার নির্দেশে',—এই অর্থেও প্রয়োগ করতে পারেন কিনা ভেবে দেখা যায়। এবং তাহলে বসন্ত বিশ্বাস সম্পর্কে প্রচারিত কাহিনী অসত্য না-ও হতে পারে।

অবশ্য কে যথার্থই বোমাটি নিক্ষেপ করেছিলেন, তা ঐতিহাসিকদের বিচার-বিশ্লেষণের বস্তু, বিপ্লবীর নয়। বিপ্লবীর কাছে 'আমি' কথাটি বড় ছিল না,—'আমি' শব্দটিকেও 'আমরা' অর্থেই তাঁরা বুঝতেন। একটি বিপ্লবীর কৃতকর্ম মানে সকল বিপ্লবীর কৃত কাজ। ব্যক্তি

সেখানে বড় নয়, কাজের রূপায়ণই সেখানে বড়। সুতরাং উক্ত কর্মের ক্ষেত্রেও বিপ্লবীর কাছে,—যাঁরা ঐ য়্যাক্‌শানে জড়িত থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বস্ব দিয়ে গেলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই সমস্তরের কর্মদূত; তাঁরা প্রত্যেকেই অনন্যসুন্দর, মহৎ ও বরণীয়। বসন্ত-অবোধ-আমীরচাঁদ-বালমুকুন্দ থেকে মুকুন্দ-পত্নী রামরাখী পর্যন্ত প্রত্যেককে নিয়েই রাসবিহারী এবং রাসবিহারীকে নিয়েই তাঁরা সকলে। এঁদের বিচ্ছিন্ন করে কোনক্রমেই 'বিপ্লব-প্রচেষ্টা'কে ভাবা যায় না, যেমন ভাবা যায় না, একটি 'সম্পূর্ণ মানবদেহে'র অস্তিত্ব তার কোন প্রত্যঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে।...

এবারে বসন্তের কথায়ই আমরা ফিরে আসব। বসন্তকেই অবোধবিহারীর সঙ্গে নিযুক্ত করা হয়েছিল লাহোরে গর্ডন্‌-হত্যার জন্যে। কিন্তু হিসেবে তাঁদের ভুল হওয়াতে গর্ডন্ সুস্থ দেহে থাকলেন ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে। বোমা বিস্ফোরণে মরল একটি পথের মানুষ।...

প্রায় দু'বছর তাঁরা অপ্রতিহতগতিতে সারা উত্তর-ভারতে ও পাঞ্জাবে তাঁদের বৈপ্লবিক-কর্ম চালিয়ে গেলেন। সংগঠন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল।

কলকাতার রাজাবাজারস্থ বোমার কারখানার খোঁজ না বেরুলে, সেখানে কর্মীদের নামের তালিকায় আমীরচাঁদ প্রমুখের নাম অযথা না থাকলে এবং ঐ তালিকা অনুসারে গ্রেপ্তার করে আনা 'দীননাথ' নামক যুবককে 'রাজসাক্ষী' না কবতে পারলে 'দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা' খাড়া করা যেত না; বসন্তরা ধরা পড়তেন না, বালমুকুন্দ-বসন্ত-আবোধবিহারী-আমীরচাঁদের ফাঁসি হত না।

কিন্তু বিপ্লবের পথ বন্ধুর, এবড়ো-খেবড়ো; সেখানে নানা বাধা, নানা ব্যর্থতা ডিঙিয়ে ঝর্ণার গতিবেগে চলতে হয়। সেই চলা নদীর বিশালতায় বিপ্লব-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে সার্থকতা লাভ করে।...

বালমুকুন্দের পত্নী
রামরাখী দেবী

চারটি তরুণ-বীর ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে দেশজননীর পায়ে যে প্রণাম নিবেদন করে গেলেন, তার সঙ্গে নিভৃতে জড়িয়ে রইল আর একটি মহীয়সী নারীর আত্মনিবেদিত-প্রাণের প্রণাম। ইতিহাসে এমন একটি প্রণামের কথা বড় একটা শোনা যায় না। এই নারীর নাম রামরাখী দেবী। ('Roll of Honour', P.—239)

বালমুকুন্দ কারাগারে বন্দী। তাঁর প্রেম-বিহ্বলা সহধর্মিণী মনে-প্রাণে তখন থেকেই স্বামীর সহযাত্রিণী। যথাসময়ে পেলেন তিনি তরুণ-স্বামীর ফাঁসির সংবাদ। বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁর বল্লভ। স্ত্রী আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। তাই ত্যাগ করলেন আহার। মৃত্যুর পানে পথ চলতে হবে।

কিন্তু শুধু আহার ত্যাগে ঐ পথের দূরত্ব কমে না। সুতরাং ছেড়ে দিলেন পানীয়। কয়েক দিনের মধ্যেই মৃত্যুদূত এসে মাথায় তুলে নিল মহিয়সী নারীকে। মুহূর্তে মিলন ঘটে গেল স্বামীর আত্মার সঙ্গে তাঁর আত্মার।···

রামরাখী দেবীর অন্তর্ধান অপূর্ব। তাঁর কথা কেউ জানেনি। তাঁর উদ্দেশ্যে কেউ চোখের জল ফেলেনি, কোন জয়ধ্বজা ওড়েনি। তবু বলব, তাঁরই মত জায়া-জননী-ভগ্নীদের অলক্ষ্য অবদান ব্যতীত ভারতের স্বাধীনতা-সৌধ গড়ে উঠত না। তাঁদের স্মৃতির বেদীমূলে তাই ছড়িয়ে থাকবে জাতির অনুচ্চারিত প্রণাম। বিশ্বকবির ছন্দে এখানেও বলা চলে ঃ

"শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ যিনি, যতবার ভুলি কেন নাম,
তবু তাঁরে করেছি প্রণাম।"

॥ নয় ॥

রডা অস্ত্র-লুণ্ঠন

শ্রীশ মিত্র। ডাক-নাম হাবু। বন্ধুরা ডাকেন 'হাবুভাই'। আত্মোন্নতি সমিতির একটি দুরন্ত সভ্য। অনুকূল মুখার্জি মহাশয়ের স্নেহধন্য সতীর্থ। থাকেন তাঁরই অঞ্চলে,—অর্থাৎ সেণ্ট্রাল কলকাতায়। কাজ করেন 'আর. বি. রডা কোম্পানি'র দপ্তরে। সামান্য টালি ক্লার্ক-এর চাকরি। কিন্তু একটি খবর আনলেন বিপ্লবীদের পক্ষে অসামান্য। কাজ করলেন আরো অনেক, অনেক অসামান্য।...

হাবুবাবুর সেই খবরটি হল যে, অস্ত্র-ব্যবসায়ী 'রডা কোম্পানি'র জন্যে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র 'কাস্টম্‌স্ হাউসে' দু'একদিনের মধ্যেই এসে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে তিব্বতের দালাই লামার জন্যে থাকবে 'মাউজার পিস্তল' পঞ্চাশটি, অতিরিক্ত স্প্রিং পঞ্চাশটি এবং পিস্তলের প্রয়োজনীয় 'কেস্'—যে-গুলোর সাহায্যে ওইসব পিস্তল রাইফেল্-এর ঢঙে ব্যবহার করা চলে। এছাড়া থাকবে পঞ্চাশ হাজার রাউণ্ড কার্তুজ।...

হাবু মিত্র খবর সরবরাহ করার পর একদিন বিপ্লবীদের এক বৈঠক বসে গেল বউবাজারের ছাতাওয়ালা গলির এক গোপন আড্ডায়। সেখানে উপস্থিত হলেন 'যুগান্তর', 'আত্মোন্নতি সমিতি' ও 'মুক্তি-সংঘে'র নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি কয়েকজন। ইতিপূর্বে খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মোন্নতি সমিতির নেতাদের সাথে মুক্তিসংঘের (উত্তর-কালের 'বি. ভি.') নেতৃস্থানীয়দের আলোচনা হয়েছিল।

মুক্তিসংঘের নেতা হেমচন্দ্র ঘোষের তৎকালীন প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল ঢাকাতে। তাঁর প্রতিনিধিরূপে কলকাতায় ছিলেন শ্রীশচন্দ্র

পাল। শ্রীশবাবু হাবু মিত্রের কাছে সংবাদ শুনেই ঐ অস্ত্র লুট করার সিদ্ধান্ত নিজের মনে গ্রহণ করলেন। সিদ্ধান্তটিকে কার্যে প্রতিফলিত করার প্ল্যান্‌ও তাঁর মাথায় আসতে দেরি হল না।

ছাতাওয়ালা গলির গোপন-সভায় শ্রীশ পাল বললেন যে, অস্ত্রশস্ত্র সবই জাহাজ থেকে নামান হয়েছে, কাস্টম্‌স্‌-এর ছাড়পত্র নিয়ে 'রডা'র ঘরে সে-মাল তুলবার মাত্র অপেক্ষা। সুতরাং এহেন সুযোগ উপেক্ষা করা অনুচিত। পথ থেকে মাল লুটে নিতে হবে।...

কথাটা খুব সত্যি। স্মাগ্‌লারদের মাধ্যমে অতিরিক্ত মূল্যে মালপত্র সংগ্রহ করে আর বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছে না,—তাই একসঙ্গে এতগুলো ঝক্‌ঝকে আধুনিক অস্ত্র আত্মসাৎ করার সুযোগ ছাড়া অসম্ভব। কিন্তু? কিন্তু দিনে-দুপুরে ডালহৌসির মত জনাকীর্ণ স্থানে গাড়ি-বোঝাই পিস্তল লুট করা যে উদ্ভট স্বপ্নচারীর কল্পনা! রাজি হলেন না কয়েকজন প্রতিনিধি। যাঁরা রাজি হলেন না তাঁরা সাহসে, শক্তি-সামর্থ্যে, কর্মনৈপুণ্যে প্রথমশ্রেণীর বিপ্লবী। তবু এহেন প্ল্যানকে তাঁদের মনে হয়েছিল 'কুইক্সোটিক্,'—অসম্ভব।...তাঁরা সভা ছেড়ে চলে গেলেন।...

শ্রীশচন্দ্র এতে দমলেন না। নিজের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। সেই স্বপ্ন তিনি হাতের মুঠোয় এনে অভ্রান্ত মূর্তির সত্যে উপলব্ধি করে ফেলেছেন। এখন শুধু সেই মূর্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা।· সেদিন যাঁরা শ্রীশচন্দ্রের মধ্যে দুর্ধর্ষ যৌবনের সর্বজয়ী ছায়া দেখেছিলেন, তাঁরা তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন। তাঁরা সবাই মৃত্যু-পাগল তরুণ। তাঁরা শুধু চেয়েছিলেন শ্রীশচন্দ্রের মত এক দুর্জয় রূপকারের নেতৃত্ব।

সভায় যাঁরা উপস্থিত থেকে গেলেন তাঁরা ছিলেন প্রধানতঃ 'আত্মোন্নতি' ও 'মুক্তিসংঘে'র প্রতিনিধিবর্গ। তাঁরা শ্রীশচন্দ্রের উপর

কর্মনেতৃত্ব ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হলেন। বাঙলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লব-ইতিহাসে এত বড় দুঃসাহসিক য়্যাক্‌শানের সফল কল্পনা ইতিপূর্বে কোন দলই করেনি। শুধু অস্ত্র লুট নয়, সেই অস্ত্র হজম করা চারটিখানি কথা নয়! ১৯১৪ সাল বিশ্ব-ইতিহাসে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ভারতীয় বিপ্লব-যুগের ইতিহাসেও তেমনি তাৎপর্যবহুল।...

বিপ্লবী-নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'মুক্তিসংঘে'র (উত্তরকালীন 'বি. ভি.') কলকাতাস্থ প্রতিনিধি শ্রীশচন্দ্র পাল ১৯১৪ সালে বৃহৎ কর্ম-জিজ্ঞাসা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। তখন তাঁকে এমনিতেই পলাতক অবস্থায় থাকতে হচ্ছে। তার কারণ, ১৯১২ সালে জগদ্দল আলেকজান্দার জুট্ মিলস্-এর বিলাতী ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট ও'ব্রায়েন্‌কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে তিনি লিপ্ত ছিলেন বলে পুলিশ জানতে পারায়, তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ছিল। শ্রীশচন্দ্রের পলাতক অবস্থায় নাম ছিল নরেন দত্ত।...কলকাতার বুকে নানা দুঃসাহসী কর্মে শ্রীশবাবুর যোগ্য সতীর্থ ছিলেন হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস। কি কুশল কর্মক্ষমতার পরিচয় যে মুক্তিসংঘের এই বিপ্লবীত্রয় এবং আত্মোন্নতি সমিতির হাবু মিত্র আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর পূর্বে বিপ্লবীর ইতিহাসে স্বাক্ষরিত করে গেছেন, তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করা আজকের দিনে মুস্কিল।

রডা অস্ত্র-সংগ্রহের চূড়ান্ত পরিকল্পনা শ্রীশচন্দ্র স্থির করে ফেলেছিলেন। তাঁর দুর্ধর্ষ কর্মসঙ্গীও তার পাশে এসে জড় হয়েছেন। যতীন মুখার্জি, হেমচন্দ্র ঘোষ, বিপিন গাঙ্গুলি, হরিশ শিকদার প্রমুখ প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের সমর্থনে শ্রীশবাবু যে সুকঠিন কাজে ব্রতী হচ্ছেন, তার ভাল-মন্দের সরাসরি দায়িত্ব তিনি স্বহস্তে তুলে নিলেন। তাঁর

সহযোগীরূপে এগিয়ে এলেন বিপিনবাবুদের বন্ধু বিপ্লবী-নেতা অনুকূল মুখার্জি। বস্তুত, এই দুঃসাহসী কর্মটি সম্পূর্ণ হয়েছিল শ্রীশ পালের নেতৃত্বে, 'আত্মোন্নতি'র সাংগঠনিক সাহায্যে এবং হাবু মিত্র, হরিদাস দত্ত, খগেন দাস প্রমুখ কর্মীদের সর্বনাশা পদক্ষেপে।

ঘটনার পূর্বদিন (২৫শে আগস্ট, ১৯১৪) শ্রীশবাবু ও অনুকূলবাবু স্থির করলেন যে,—অনুকূলবাবু একখানা গরুর গাড়ি যোগাড় করে দেবেন, আর শ্রীশবাবু সংগ্রহ করবেন সেই গাড়ির গাড়োয়ান। এছাড়া এও স্থির হল যে, মালগুলো কাস্টম্‌স্ হাউসের আওতা থেকে রডা-আপিসে আনবার কালে গরুর গাড়িগুলোতে মাল তুলবার ফাঁকে ঐ কাজে ভারপ্রাপ্ত 'রডা'-র কর্মচারী শ্রীশ মিত্র (হাবু মিত্র) মাউজার পিস্তল ও কার্তুজের বাক্সগুলো ছদ্মবেশী (বিপ্লবী) গাড়োয়ানের গাড়িতে তুলে দিয়ে যথাসময়ে সরে পড়বেন এবং গাড়োয়ানকে ঐ গাড়ি-বোঝাই মাল নিয়ে মলাঙ্গা লেনে অনুকূলবাবুর কাছে চলে আসতে হবে। তৎপর মাল গোপন-আস্তানায় সরানর দায়িত্ব অনুকূলবাবুর, অর্থাৎ 'আত্মোন্নতি সমিতি'র।

পরিকল্পনা অনুকূলবাবুর মনঃপূত হতেই হরিদাস দত্তকে নিয়ে শ্রীশবাবু চলে এলেন তাঁর আড্ডায়।···প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা তখন কলেজের ছাত্র। থাকেন মাড়োয়ারী হোস্টেলে। তাঁর উপর শ্রীশবাবুর নির্দেশ হল যে, রাত্রে হরিদাসবাবুকে নিজের কাছে রেখে পরদিন প্রাতে তাঁকে একটি খাঁটি হিন্দুস্থানী-গাড়োয়ানের বেশে রূপান্তরিত করে দিতে হবে।···

প্রভুদয়াল অক্ষরে অক্ষরে সেই নির্দেশ পালন করলেন। কারণ, যথাসময়ে যখন অনুকূলবাবুর সংগৃহীত গরুর গাড়ির চালক হয়ে

হরিদাসবাবু গরুর লেজ মোচড়াতে মোচড়াতে গাড়ি হাঁকিয়ে রাজপথে বেরুলেন, তখন কার সাধ্য যে তাঁকে চিনতে পারে? মাথায় কদম ছাঁট, গায়ে কালো ফতুয়া, গলায় কালো ফিতের সঙ্গে আঁট করে লাগানো পেতলের ধুক্‌ধুকি, পরনে ময়লা আটহাতি কোরা ধুতি।...

পূর্ব-পরিকল্পনা মত গোপন-অস্ত্রে সজ্জিত নেতা শ্রীশচন্দ্র হরিদাসবাবুর গাড়ির সম্মুখভাগে চলছেন পায়ে হেঁটে। খগেন দাসও একটু দূরত্ব বজায় রেখে অনুসরণ করছেন গাড়িখানাকে। তাঁর কোমরেও লুক্কায়িত অস্ত্র। গাড়োয়ানটিও নিরস্ত্র নন।

হাবু মিত্রের বুদ্ধিবলে হরিদাসবাবুর গাড়িখানা 'রডা'র মালবাহী অপর ছ খানা গরুর গাড়ির পেছনে এসে দাঁড়াল। সাতখানা গাড়ি নিয়ে হাবুবাবু মাল খালাস করতে গেলেন। যথারীতি মাল খালাস হল। প্ল্যান্ মত পশ্চাতের গাড়িটায় মাউজার পিস্তল, পিস্তলের কার্তুজ, স্প্রিং, খাপ ইত্যাদি মাউজার পিস্তলের সমগ্র সরঞ্জাম সমেত বাক্সগুলো তোলা হল। বোঝাই সাতটি গাড়ি রডা কোম্পানির দিকে রওনা দিল। সর্ব-পশ্চাতের গাড়িখানার চালক বিপ্লবী বীর হরিদাস দত্ত। ভান্‌সিটার্ট রো'র সম্মুখে এসে পূবগামী ছ'খানা গাড়িই হাবুবাবুর সঙ্গে রডা কোম্পানির উদ্দেশ্যে গলির মধ্যে ঢুকে গেল; এবং হাবুবাবুরই ইঙ্গিতে হরিদাস দত্ত সোজা পূর্বদিকে গাড়ি চালিয়ে দিলেন। তার গাড়ির দু'পাশে সশস্ত্র শ্রীশ পাল ও খগেন দাস রক্ষার গৌরবে চলা শুরু করে দিয়েছেন। গাড়ি 'ম্যাণ্টং কোম্পানি' ও বর্তমান 'কারেন্‌সি আপিসে'র মধ্যবর্তী রাস্তায় (এখনকার মিশন রো) ঢুকতেই হাবুবাবুও এসে গেলেন শ্রীশবাবুদের সাথী হবার জন্যে। মিশন রো হয়ে গাড়ি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া স্ট্রীট, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট পেরিয়ে চাঁদনি চক্-এর পাশ দিয়ে মলাঙ্গা লেন্-এ অনুকূলবাবুর আস্তানায় পৌঁছে গেল।

অনুকূলবাবু অনতিবিলম্বে একান্ত ক্ষিপ্রতায় কালিদাস বসু ও ভুজঙ্গ ধর প্রমুখের সাহায্যে মালপত্র গোপন স্থানে পৌঁছে দিলেন।

হাবু মিত্র (শ্রীশ মিত্র)

হাবুভাইকে সেদিনই শ্রীশ পাল দার্জিলিঙ্ মেলে তুলে নিয়ে চলে এলেন হেমচন্দ্র ঘোষের, অর্থাৎ 'মুক্তিসংঘে'র রঙপুরস্থ এক কেন্দ্রে। এই কেন্দ্র ছিল রঙপুরের কুড়িগ্রাম মহকুমার নাগেশ্বরী থানায়। এই কেন্দ্রের আঞ্চলিক-নেতা ছিলেন ডাক্তার সুরেন বর্ধন। সুরেন বর্ধনকে পূর্বাহ্ণেই নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ জানিয়ে রেখেছিলেন যে, এই প্ল্যান্ অনুসারে কাজ করার পর বহু শেল্টার-এর প্রয়োজন হতে পারে এবং সেই ব্যবস্থার কিছু দায়িত্ব তাঁকেও গ্রহণ করতে হবে।

শ্রীশ পাল অবশ্য হাবু মিত্রকে ডাঃ সুরেন বর্ধনের হাওলা করে দিয়ে পরের গাড়িতেই কলকাতা চলে এলেন।…

হাবু মিত্র বরাবর ছিলেন সুরেন বর্ধনেরই নানা শেল্টারে। ডাক্তার হিসেবে থানার দারোগা-পুলিশও সুরেনবাবুকে সমীহ করত এবং তাঁর অনুগত ছিল। তারাই তাঁকে একদিন গোপনে বলে গেল যে, কলকাতা থেকে আই-বি'র লোক আসছে, বোধহয় সুরেনবাবুর গৃহ তল্লাশি হবে। ইতিমধ্যে হরিদাস দত্ত ধরা পড়ায় শ্রীশ পালও ডাঃ বর্ধনকে জানিয়েছেন, আসামের কোন 'নিরাপদ শেল্টারে' হাবুভাইকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। কাজেই থানার লোকেদের সতর্ক-বাণী শোনা মাত্র সুরেনবাবু সেদিনই বিশ্বস্ত বন্ধু মারফৎ হাবু মিত্রকে আসামের পার্বত্যজাতি 'রাভা'দের আস্তানায় পাঠিয়ে দিলেন। 'রাভা'দের মধ্যে ডাঃ বর্ধনের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কয়েকটি তরুণ 'রাভা' ছিলেন তাঁর গোপন-সংস্থার অনলস কর্মী।

এরপর ১৯১৫ সালে সুরেন বর্ধন আটক হলেন। হেম ঘোষ, শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত, খগেন দাস প্রমুখ কেউ-ই বাইরে নেই। কয়েক বছর পর সুরেনবাবু মুক্তি পেয়ে ফিরে এসে হাবু মিত্রের বহু খোঁজ করলেন। শুধু জানলেন যে, তরুণ 'রাভা'দের মোড়ল (তাঁর বিশ্বস্ত কর্মী ও সতীর্থ) এবং হাবুভাই নাকি একদিন কোথায় উধাও হয়ে গেছেন। দু'জনেই নিখোঁজ। তিন বছর অনেক খোঁজ করেও গ্রামের লোকেরা তাঁদের কোন হদিস পায়নি। কারো কারো ধারণা যে, তাঁরা ফ্রন্টিয়ার পার হয়ে চীনের দিকে যাবেন বলে বেরিয়েছিলেন। পথে মৃত্যু হয়েছে কিনা জানা নেই। মোটের উপর হাবু মিত্রের সঠিক খবর সংসারে সকলেরই অবিদিত। ডাক্তার সুরেন বর্ধন একটি পত্রে আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে লিখেছিলেন ঃ…"হাবু 'রাভা'দের হেপাজতে ছিলেন। আমি আটক-দশা হইতে দীর্ঘদিন পর মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া বহু খোঁজ করিয়াও তাঁহার সম্বন্ধে কোন খবর উদ্ধার করিতে পারি নাই। যেখানে হাবুকে রাখা হইয়াছিল, সেখানে খোঁজ করিয়াও এই মাত্র জানিলাম যে, তিনি এবং তাঁহার সঙ্গী 'রাভা' যুবকটি তথায় নাই। কোথায় গিয়াছেন তাহা কেহ সঠিক বলিতে পারেন না।…হাবুভাইয়ের শেষ-পরিণতি অজ্ঞাত। ফ্রন্টিয়ার পার হইতেও পারেন, অথবা পার হইতে যাইয়া মৃত্যুমুখেও পতিত হইতে পারেন।…আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে, হাবুর মধ্যে এক ধরনের ঝোঁক ছিল, সেই ঝোঁকের বশেই তিনি চলিতেন। অসম্ভব কার্যে হাত দিয়া বিপদগ্রস্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে একটুও অস্বাভাবিক নহে। আমি তাঁহার সঙ্গে একান্তে ও গভীরভাবে মিশিয়া তাঁহাকে যতটা জানিয়াছিলাম, তাহা হইতে আমি নিশ্চয় ধারণা করি যে, হাবুভাই সন্ন্যাসী বা আশ্রমবাসী (অনেকে মনে করেন যে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন ; অবশ্য তাহার কোন ভিত্তি নাই) হইবার লোক নহেন।

মাত্র দুই-তিন বৎসরের মধ্যে এই সিংহশিশু নিরামিষভোজী হইতে পারেন,—ইহা অস্বাভাবিক। অধিকন্তু, হাবুর পক্ষে 'আত্মহত্যা' করাও অকল্পনীয়। আত্মহত্যা করিবার পূর্বে হাবু বরঞ্চ দুই-একটা দেশ-শত্রু খুন করিয়া ফাঁসি যাইতে পারেন বলিয়া ভাবিতে পারি।...হ্যাঁ, এখানে উল্লেখ করিতেছি যে, 'রাভা'রা হাবুভাইকে মহিষ চরাইবার কাজ দিয়াছিল। দুই বন্ধু (হাবু এবং 'রাভা'দের তরুণ সর্দার) মিলিয়া বনে-জঙ্গলে মহিষ লইয়া সারাদিন কাটাইয়া দিতেন। ভয়ডরহীন এই দুইটি যুবক,—একটি সুসভ্য কলিকাতা নগরীর শহুরে-নাগরিক, অপরটি বুনো মানুষ। কিন্তু দুইজনের শিরায় একই 'বিদ্রোহীর' তাজা খুন। ইহার আভাষ আমি পাইয়াছিলাম বলিয়াই আমার স্থির বিশ্বাস যে, উঁহারা কিছু একটা অসম্ভব কাজ করিতে যাইয়াই মৃত্যু-বরণ করিয়াছেন। সেই 'কিছু একটা' যে কাজ, তাহার পশ্চাতে দেশসেবার প্রেরণা নিশ্চয় ছিল। তাই আমার কাছে তাঁহারা দুই-জনেই মহান 'শহিদ'। আমি তাঁহাদের প্রণাম করি।"...*

হাওড়া জেলার 'রসপুর' গ্রাম এখনো আছে। হাবু মিত্র সেখানে নেই।...যদিও হাবু মিত্রের জন্মভূমি ঐ রসপুর গ্রাম, সেখানে গত পঞ্চান্ন বছরের সুদীর্ঘ পরিসরে তাঁর পায়ের ধুলো একবারও পড়েনি। ...ফ্রন্টিয়ার-প্রহরীর গুলির আঘাতেই হোক, বন্যপশুর আক্রমণেই হোক, কিংবা বেঘোরে বা অপঘাতেই হোক, হাবু মিত্র সম্বন্ধে বলা চলে: 'He died in harness',—তাঁর প্রাণ পলাতক অবস্থায় দেশব্রতেই বন্ধুহীন, আত্মীয়হীন, নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিঃশেষিত হয়েছে। হাবু মিত্র বরণীয় 'শহিদ'।...বিশ্বপথিক এ-শহিদের জন্মস্থান তাই পুণ্যস্থান।

---

* গ্রন্থকারের নিকট 'সুভাষগঞ্জ' (পশ্চিম দিনাজপুর) হইতে লিখিত ডাক্তার সুরেন্দ্র বর্ধনের ১৩৭৫ সনের ১১ই ফাল্গুন তারিখের পত্র।

অস্ত্র-লুটের পর

এদিকে একুশ হাজার তু'শ রাউণ্ড বুলেট্ ব্যতীত বাকি বুলেট্ ও পঞ্চাশটি মাউজার পিস্তলই বিপ্লবীদের হাতে চলে গেছে। নানা গ্রুপের মধ্যে অস্ত্র-বণ্টনে কোন পক্ষপাতিত্বের প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি। কারণ, বাঙলায় যত দল বা দলাদলিই থাকুক,—কর্মের ক্ষেত্রে বিপ্লবীরা দলের উর্ধ্বে উঠে যেতেন। মাউজার পিস্তল লুট করা বা লুটের মাল আয়ত্তে রাখার কোন কাজেই অনুশীলন সমিতি শরিক ছিল না। কিন্তু মাল হাতে আসতেই অনুশীলন সমিতিকেও ভাগ দেওয়া হল।

নলিনীকিশোর গুহ লিখেছেন ঃ "...এই হত্যাকাণ্ড (পুলিশ-কর্তা বসন্ত চ্যাটার্জি-হত্যা) ঢাকা (অনুশীলন) সমিতির লোকদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে 'মসা'র পিস্তল ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইতেছে। 'মসা'র পিস্তল কলিকাতায় একটি দল কর্তৃক ('রডা আর্মস্ কেস') অপহৃত হয়। সুতরাং প্রমাণিত হইতেছে,—পিস্তলগুলি বিভিন্ন দলে বণ্টিত হইয়াছিল, অথবা অস্ত্রের লেনদেনের ব্যবস্থা হইয়াছিল।"

(বাংলায় বিপ্লববাদ', —পৃঃ ১১৬-১৭)

নলিনীবাবুর শেষের মন্তব্য বোধহয় ঠিক নয়। কারণ, বিশ্বস্ত-সূত্রেই জানা গিয়েছে যে, 'মাউজার পিস্তল' যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে বাঙলার সকল দলই পান। এই বণ্টন-ব্যাপার ঘটে কর্মের তাগিদে, দলগুলোর 'য়্যাক্‌শান্' করার ক্ষমতাবৃদ্ধির সংকল্পে। এখানে 'লেনদেনে'র প্রশ্ন কারো মনে আসেনি ; কেউ তা ভাবেননি বলেই মনে হয়।

কিন্তু বাঁশতলার গুদামঘর থেকে পঞ্চাশ হাজার রাউণ্ডের মধ্যে একুশ হাজার তু'শ রাউণ্ড বুলেট্ ধরা পড়ে গেল। গুদামঘরের নিরাপত্তার খোঁজে গিয়েই হরিদাস দত্ত পুলিশের বেড়াজালে পড়ে গেলেন।

এদিকে হাবুভাই আপিস থেকে সেদিন অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গেই নিখোঁজ হওয়ায় লোম্যান্-টেগার্ট্ কোম্পানি ভীষণ বিচলিত হলেন। এতগুলো তাজা আধুনিক মাল বিপ্লবীদের হাতে চলে গেল,—তাও এই দুঃসময়ে, যখন ব্রিটিশ-সিংহের পৃষ্ঠে জঙ্গী-জার্মান তীক্ষ্ণ থাবা মেরেছে! ১৯১৪ সাল,—সে এক প্রলয়ঙ্কর কাল!

টেগার্ট্ হন্যে হয়ে হাবুভাইয়ের বন্ধু-বান্ধবদের খুঁজতে গিয়ে গ্রেপ্তার করলেন অনুকূল মুখার্জি, কালিদাস বসু, গিরীন ব্যানার্জি, নরেন ব্যানার্জি, ভুজঙ্গ ধর, বৈদ্যনাথ বিশ্বাস, সতীশ দে, উপেন সেন, প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকা ও আশুতোষ রায়কে। বড়বাজারে বাঁশতলার গুদামঘরের কাছ থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে থাকার সময় হরিদাস দত্তকে ধরতে পেরে টেগার্ট্ তো খুশিতে ডগমগ!···হাজার হলেও স্বাধীন-জাতির মানুষ,—এঁরা শত্রুর বীরত্বে ও দক্ষতার তারিফ করতে জানেন। হরিদাসবাবুকে থানায় হাজির করার পর মিঃ টেগার্ট্ এসে প্রথম-দর্শনেই বলে উঠলেন: "Hallo, Royal Bengal Tiger! Now you are bagged." ও'ব্রায়েন্-হত্যা-ষড়যন্ত্রেও (১৯১২ সাল) হরিদাস দত্তের নাম পুলিশের কর্ণগোচর হয়েছিল বলেই টেগার্ট্ তার স্বরূপ জানতেন।

অতঃপর দায়ের করা হল মামলা,—'বড়া আর্মস্ কন্স্পিরেসি কেস্'। হরিদাস দত্ত, কালিদাস বসু, ভুজঙ্গ ধর ও নরেন ব্যানার্জি ব্যতীত অপর আসামীরা মুক্তি পেলেন। হরিদাসবাবুরা চারজন দু'বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করলেন। হরিদাসবাবুকে 'circumstancial evidence'-এর জোরে, তাঁর হেপাজতেই বাঁশতলার বুলেটগুলো

পাওয়া গেছে,—এই অভিযোগে অতিরিক্ত আরো দু'বছরের সাজা দেওয়া হল। কয়েদকাল শেষ হলে 'তিন আইনে' স্টেট্-প্রিজনার্ করে তাঁকে পাঠান হল হাজারিবাগ সেণ্ট্রাল্ জেলে।

শ্রীশ পাল ও খগেন দাস কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পেরেছিলেন। পরে ধরা পড়ে শ্রীশ পাল স্টেট্-প্রিজনাররূপে নানা জেলে আটক থেকে শেষের দিকে হাজারিবাগ জেলেই আনীত হলেন। খগেন দাস 'ভারতরক্ষা আইনে' গ্রেপ্তার হয়ে কুমিল্লার নানা গ্রামে অন্তরীণ থাকেন।

অস্ত্র-হরণ-ষড়যন্ত্র সম্পর্কে টেগার্ট্

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, 'রডা অস্ত্র-হরণে'র সময় দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন হেমচন্দ্র ঘোষের মুক্তিসংঘের (উত্তরকালের 'বি. ভি.') ও বিপিন গাঙ্গুলির আত্মোন্নতি সমিতির কর্মীবৃন্দ সম্মিলিত হয়ে। এই সম্পর্কে টেগার্ট্ সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঐতিহাসিক উমা মুখার্জি তাঁর গ্রন্থেঃ "Our enquiries showed that the members of Hem Ghose's Party had amalgamated in Calcutta with the remnants of the old Attonnati Samiti." (Tegart's printed note on the revolutionary movement in Rangpur, March 1, 1915; vide—'Two Great Indian Revolutionaries', P.—46-48)
[আমাদের অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, হেম ঘোষের দল পুরাতন আত্মোন্নতি সমিতির ভগ্নাবশেষের সঙ্গে কলকাতায় মিলিত হয়েছে।]

টেগার্ট্ সাহেবের পরের উক্তি হলঃ "The gang responsible for this theft is connected with Hem Ghose's party in Dacca." (I. B. Records, Govt. of West Bengal,—F. No. 1030,—1914)

এর পরের উদ্ধৃতি ঃ

"The conspiracy which culminated in this theft commenced in March, 1914, when we received information from a confidential source to the effect that two prominent members of Hem Ghose's party, named Haridas Dutta and Khagen Das had been sent to Calcutta by Hem Ghose with object of arranging an assassination on behalf of the revolutionary party." (Tegart's printed note; 1.3.15……F. No. 239-15 the I. B. records, Govt. of West Bengal, vide—'Two Great Indian Revolutionaries.')

[১৯১৪ সালের এই অস্ত্র-অপহরণের কার্যের পূর্বে যে বৈপ্লবিক-ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল তার খবর এই সময়ে বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে আমরা জানতে পারি। জানতে পারি যে, হেম ঘোষের দলের দু'জন নামকরা সদস্য হরিদাস দত্ত ও খগেন দাসকে কলকাতায় পাঠান হয়েছিল বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে একটি গুপ্ত-হত্যা সংঘটিত করার জন্যে।]

টেগার্টের উদ্ধৃতিতে যে 'গুপ্ত-হত্যা'র ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে। তৎসম্পর্কে আমরা পূর্বে কিছু উল্লেখ করেছি। রবার্ট্ ও'ব্রায়েন্‌কে নিধন করার সংকল্পেই শ্রীশ পাল (মুক্তিসংঘ) এবং হরিদাস সিকদার (আত্মোন্নতি) মহোদয়দ্বয়ের নির্দেশে হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস তিন মাস কাল নগণ্য কুলির বেশে এবং কাজে আলেকজান্দার জুট্ মিল্‌স-এ (জগদ্দল) নিযুক্ত ছিলেন ও'ব্রায়েনের যাতায়াত ইত্যাদির সঠিক সংবাদ সংগ্রহকল্পে। উক্ত ও'ব্রায়েন্ সাহেব মিলেরই একটি বাঙালী কেরানীকে পদাঘাতে প্রাণে মেরে ফেলেন এবং সে-জন্যে কোর্টে তাঁর মাত্র পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হয়! এ-ব্যাপার নিয়ে সে-যুগে দেশবাসী বিক্ষুব্ধ হন এবং অমৃতবাজার প্রমুখ পত্রিকা বিশেষ আন্দোলন করেন।…… ও'ব্রায়েন্-হত্যার এই ষড়যন্ত্রের কথা পুলিশ অবগত

হয়েছে জেনে বিপ্লবীরা উক্ত ব্যাপার থেকে হাত গুটিয়ে নেন। শুধু হাত গুটিয়ে নেওয়া নয়,—শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস সঙ্গে সঙ্গে পলাতক হন।

উমা মুখার্জি তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন :

"The failure of the O' Brien murder conspiracy (March-May, 1912) was followed by the Rodda's arms theft conspiracy (August, 1914)···The chief actor in the Rodda conspiracy was Srish Pal alias Naren who found valuable collaborators in Haridas Dutta of Mukti Sangha (Later 'B. V'.) as well as in Anukul Mukherjee, Harish Sikdar, Bipin Ganguli, Bhujanga Dhar and Srish Mitra alias Habu of the Attonnati Samiti." ('Two Great Indian Revolutionaries', P.—46-48)

[ও'ব্রায়েন্-হত্যা-ষড়যন্ত্র (১৯১২, মার্চ-মে) ব্যর্থ হবার পর 'রডা অস্ত্র-অপহরণ-ষড়যন্ত্র' (আগস্ট, ১৯১৪) সংঘটিত হয়।···রডা ষড়যন্ত্রের প্রধান কর্ম-নায়ক ছিলেন শ্রীশ পাল। তাঁর ছদ্মনাম ছিল 'নরেন'। তাঁর একান্ত সহায়করূপে এগিয়ে এসেছিলেন মুক্তিসংঘের (উত্তরকালের 'বি. ভি.') হরিদাস দত্ত এবং আত্মোন্নতি সমিতির অনুকূল মুখার্জি, হরিশ সিকদার, বিপিন গাঙ্গুলি, ভুজঙ্গ ধর ও শ্রীশ মিত্র (হাবু) প্রমুখ।]

উমা মুখার্জি আরো লিখেছেন :

"It has to be noted that by 1914 the 'Barisal Party' had come to an understanding with the 'Attonnati Samiti' for joint action. This triple entete bore valuable fruit in connection with The theft of Rodda's arms (Aug. 26, 1914), which though planned

and executed mainly by 'Mukti Sangha' (Later 'B. V.) of Dacca in collaboration with the 'Attonnati Samiti,' yet in the disbursement of the consignments the hands of Jatin Mukherjee's lieutenants and the 'Barisal Party' were conspicuously in evidence. Besides, the Madaripore Group of Purna Das was drawn close to Jatindranath Mukherjee about this time." ('Two Great Indian Revolutionaries', P.—175-176) [দেখা যায়, ১৯১৪ সালের কোন এক সময়ে 'বরিশাল দল'ও 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সঙ্গে কাজের তাগিদে মিলিত হয়। এই তিনটি দল-সমাবেশই (আত্মোন্নতি, মুক্তিসংঘ, বরিশাল দল) ১৯১৪ সালের ২৬শে আগস্ট রডা অস্ত্র-লুটের মূল্যবান সম্পদের অধিকারী হলেও লক্ষ্য করা যায় যে, উক্ত অস্ত্র-লুণ্ঠনের প্ল্যান ও সে-প্ল্যানকে কার্যকর করার সমস্ত দায়িত্ব ঢাকার 'মুক্তিসংঘ' (উত্তরকালের 'বি. ভি.') বহন করা সত্ত্বেও লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্রের বণ্টনভার সন্দেহাতীতরূপে নিয়েছিলেন যতীন মুখার্জির অনুগত বন্ধুগোষ্ঠী ও 'বরিশাল দলের' সভ্যবৃন্দ। এ ছাড়া মাদারীপুরের পূর্ণদাসের দলও এই সময় যতীন মুখার্জির একান্ত সান্নিধ্যে এসেছিল।]

রডা অস্ত্র-লুণ্ঠনের
রাজনৈতিক গুরুত্ব

'রডা অস্ত্র-লুণ্ঠন' একটি বিচ্ছিন্ন লুটতরাজের কাহিনী নয়। বাঙলার বিপ্লবীদের সর্বভারতীয় বিপ্লব-অভ্যুত্থান সংক্রান্ত কার্যক্রমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে ঐ বৈপ্লবিক-কার্য জড়িত।

রাউলাট কমিটির রিপোর্টে আমরা পাই: "The theft of pistol from Rodda & Co., a firm of gunmakers in Calcutta, was an event of the greatest importance in

the development of revolutionary crime in Bengal ...The authorities have reliable information to show that 44 of these pistols (total number of stolen Mouser pistols were 50) were almost at once distributed to 9 different revolutionary groups in Bengal, and it is certain that the pistols so distributed were used in 54 cases of dacoity or murder or attempts at dacoity and murder subsequent to August, 1914 (Rodda action on 26th August, 1914). It may indeed safely be said that few, if any, revolutionary outrages have taken place in Bengal since August, 1914, in which Mouser pistols stolen from Rodda & Co. have not been used." ('Sedition Committee Report', P.—44)

[কলকাতার বন্দুক-ব্যবসায়ী ও বন্দুক-প্রস্তুতকারক 'রডা কোম্পানি' থেকে পিস্তল অপহরণের ঘটনা বাঙলাদেশে বৈপ্লবিক-অপরাধমূলক য়্যাক্‌শান্ বৃদ্ধির দিক থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।...সরকার বিশ্বস্তসূত্রে অবগত যে, অপহৃত ৫০টি মাউজার পিস্তলের মধ্যে ৪৪টি পিস্তলই প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার ৯টি বিভিন্ন বিপ্লবী-সংস্থার উদ্দেশে বিলি হয়ে যায়। বিলি-করা পিস্তলগুলো ৫৪টি য়্যাক্‌শানে—অর্থাৎ, ডাকাতি ও হত্যা সফল করার প্রয়াসে অথবা ডাকাতি ও হত্যা করার চেষ্টায়—১৯১৪ সালের আগস্ট মাসের (রডা-য়্যাক্‌শানের তারিখ ২৬শে আগস্ট, ১৯১৪ সাল) পর থেকে নানা য়্যাক্‌শানে ব্যবহৃত হয়। একথা নির্দ্বন্দ্বে বলা চলে যে, বাঙলাদেশে ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসের পর সংঘটিত যে-কোন য়্যাক্‌শানে (দু'একটি যদি বা বাদ থাকে) 'রডা কোম্পানি' থেকে অপহৃত মাউজার পিস্তলগুলোই কাজে লাগান হয়েছে।]

মহা গুরুত্বপূর্ণ এই কাজটি দু'টি বিপ্লবীদলের কর্মীরা মিলেমিশে করেছিলেন। তৎসম্পর্কে 'রাউলাট্ কমিটি'র রিপোর্ট হল: "Western Bengal party men were also convicted with a man of the Dacca Party in respect of the actual theft of Messrs. Rodda's arms."

[পশ্চিমবঙ্গের বিপ্লবীদলের লোকদের সঙ্গে 'ঢাকা পার্টি'র এক ব্যক্তিও 'রডা কোম্পানি'-র অস্ত্র অপহরণের কার্য হাতে-নাতে করার অপরাধে দণ্ডিত হন।]

এখানে বলা বাহুল্য যে, 'ঢাকা পার্টি' হল হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয় প্রতিষ্ঠিত 'মুক্তিসংঘের'ই পুলিশ-প্রদত্ত নাম; এবং উক্ত পার্টির উল্লিখিত দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিই হলেন রডা-য়্যাক্‌শান্-প্রখ্যাত এবং অধুনা বহুজনবিদিত বয়োবৃদ্ধ বিপ্লবী-নেতা হরিদাস দত্ত।

হরিদাসবাবু লিখেছেন: "...১৯১৪ সাল। মহানায়কদ্বয় (যতীন মুখার্জি ও রাসবিহারী বসু (সমগ্র বিপ্লবীদলগুলো নিয়ে সারা ভারতে একটি সশস্ত্র-বিপ্লবের পরিকল্পনা সুষ্ঠুরূপে গ্রহণের পূর্বক্ষণে কিছু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য তৎপর হয়েছেন। বিদেশে নির্বাসিত বিপ্লবী নেতারা জার্মানির সাথে যোগ-সাজসে ভারতের বিপ্লব সংঘটিত করতে ক্রমশ ব্যস্ত হলেন। ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত হলে জাহাজবোঝাই অস্ত্র আসতে পারে, প্রচুর অর্থও আসতে পারে। কিন্তু তার আগে নিজেদের তো কিছুটা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকা চাই? স্মাগল্-করা রিভল্‌বার-পিস্তলে প্রকৃত লড়াই চলে না। কারণ, অধিক সংখ্যায় তা পাওয়া যায় না, রাজ্যভাণ্ডার খুলে অর্থ দিলেও না। সুতরাং নেতারা অস্ত্র-সংগ্রহের নূতন পথ খোঁজায় তৎপর।...তাই 'রডা'র অস্ত্র-লুটের সম্ভাবনা দেখেই শ্রীশ পালের মত ব্যক্তি চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। লক্ষ বাধা ও আশঙ্কা মুহূর্তে নস্যাৎ করে বীরদর্পে এই মানুষটি যখন কর্মে এগিয়ে গেলেন, তখন আমরাও অনায়াসে এই সুদক্ষ নেতার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম। শ্রীশদার পেছনে দাঁড়ানো

মানে, একটি কংক্রিটের দুর্ভেদ্য প্রাচীরের আড়ালে দাঁড়ানো। তাঁকে আমরা যেভাবে জেনেছিলাম, তা অপরের কাছে দুর্লভ ছিল বলেই তাঁর কর্ম ও চরিত্রের মূল্যায়ন করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব।"

('উল্টোরথ'—অগ্নিযুগ-সংখ্যা, ১৫. ২. ৬৮, পৃঃ ১০-১২)

হরিদাস দত্ত মহাশয়ের উক্তি থেকে এবং তৎকালীন রাজনীতিক অবস্থা পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, ঐতিহাসিক ও বৈপ্লবিক গুরুত্বে রডা-য়্যাক্শান্ বস্তুতই অনন্যসাধারণ। রডার অস্ত্রে সজ্জিত হয়েই বাঙলার বিপ্লবীরা দল ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে বহুক্ষেত্রে তাঁদের বিপ্লব-সংগ্রামকে প্রচণ্ডতর করেছেন। অধিকন্তু, বালেশ্বরের চাষখন্দে বিপ্লব-মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি ও তাঁর দুর্জয় সতীর্থবৃন্দ এই অস্ত্র নিয়েই ঐতিহাসিক যুদ্ধ করে অমর হয়েছেন। 'মাউজার'-গুলোকে রাইফেল-এর মত ব্যবহার করা গিয়েছিল বলেই মাত্র পাঁচটি মানুষ প্রচুর সমরাস্ত্র-সজ্জিত বাহিনীকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতিহত করতে পেরেছিলেন। সুতরাং এই 'মাউজার' ও তার রসদ যোগাড় হয়েছিল যে-য়্যাক্শান্-এ, তার মূল্য বোঝা কষ্টসাধ্য নয়।

॥ দশ ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র

১৯১৪ সাল পৃথিবীর মানচিত্র ওলটপালট করে দিল। এই বছরটি ভারতবর্ষের ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের মুক্তিচেষ্টা পৃথিবীর মহাসমরের কালে প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। প্রচুর সম্ভাবনায় বিপ্লবের গতি অপ্রতিহত হয়।

ইতিপূর্বে বাঙলায়, মহারাষ্ট্রে ও পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের কর্মোদ্যোগের কিছু প্রকাশ নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মাঝে মাঝে দেশের লোক দেখে বিস্মিত হয়েছে। কিন্তু তা সামান্য। ভিতরের প্রস্তুতি ও ব্যাপকতার সংবাদ ঘুণাক্ষরেও কেউ জানেনি। সবার অজ্ঞাতে বিপ্লবের যে আগুন ধূমায়িত ছিল, তার লেলিহান বিকিরণ বালেশ্বরের ভূমিতেই প্রথম দেখেছিল ইংরেজ—দেখেছিল ভারতবর্ষের নরনারী।

ভারতবর্ষের **প্রথম পর্বের** বিপ্লব-ইতিহাসে দেখা যায়—দুঃসাহসী যুবকরা প্রয়োজনে ব্রিটিশের স্বজন ও তাঁবেদার, তথা ভারতের শত্রুদের একটির পর একটি করে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজকে ভীত করা, দেশবাসীকে ভয়হীন করে তোলা, ইংরেজ-শাসনকে না মানা। ১৮৯৭ সালে দামোদর চাপেকারের 'র‍্যাণ্ড্'-নিধন থেকে সুরু করে ১৯১২ সালে রাসবিহারীর নেতৃত্বে ভাইস্‌রয় লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমাবর্ষণ পর্যন্ত সকল য়্যাক্‌শান্‌ই উল্লিখিত কার্যক্রমের অন্তর্গত।

তারপর আসে বিপ্লব-ইতিহাসের **দ্বিতীয় পর্ব**। এই পর্বে বিপ্লবীরা শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মুখ-সমরে আবির্ভূত হন। বালেশ্বরে, বুড়িবালামের অনতিদূরে, চাষখন্দে ভারতীয়-বিপ্লবীদের সম্মুখ-সংঘর্ষের সূত্রপাত।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি বিপ্লবের ইতিহাসেই চারটি স্তর বা ধাপ লক্ষ্য করা যায়ঃ (ক) প্রথম হল, রাষ্ট্র-প্রতীক বা ব্যক্তিবিশেষ নিধন-পর্ব (Stage of Individual murder), (খ) দ্বিতীয় হল, বাধ্যতামূলক সম্মুখ-সংঘর্ষ পর্ব (Forced open fight), (গ) তৃতীয় হল, খণ্ড-অভ্যুত্থান পর্ব (Insurrection), (ঘ) চতুর্থ হল, বিপ্লব (Revolution) বা শেষপর্ব।...

ভারতবর্ষের বিপ্লব-ইতিহাসেও প্রথম পর্ব শেষ হতে না-হতেই এসে পড়ল বিশ্ব-মহাযুদ্ধ। এই যুদ্ধে ইংরেজের প্রতিপক্ষ ছিল জার্মানি। 'শত্রুর শত্রু তোমার মিত্র'—এই তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক-বাণী বিপ্লবীদের অজানা নেই। তাই ভারতের ও বহির্ভারতের ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মানির সঙ্গে বন্ধুত্ব ঘটিয়ে ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। এই বিপ্লবে টেনে আনা হবে ব্রিটিশ-ক্যাম্প থেকে ভারতীয়-সেনাবাহিনীকে ভারতীয় সংগ্রামের পক্ষে। তাদের পরিচালনা করবে বিপ্লবী-ভারতবর্ষ।

কিন্তু বিপ্লবীদের হিসেবে ভুল হল। তাঁরা দু'টি ধাপ বাদ দিয়ে সরাসরি চতুর্থ ধাপে পা দিতে গেলেন। অর্থাৎ, 'ফোর্স্‌ড্ ওপেন্ ফাইট্' ও 'ইনসারেক্‌শান্' পর্বদ্বয় পার না হয়েই শুধুমাত্র সেনাবাহিনী ও বিপ্লবীদের যোগসাজসে যে-বিপ্লব করতে চেয়েছিলেন, জনসাধারণ তার শরিক ছিল না। কারণ, 'ওপেন্ ফাইট্', 'ইনসারেকশান্' ও গণসংযোগ ব্যতীত বিপ্লবের পথে দেশ তৈয়ের হয় না।

এ-সত্য বিপ্লবীদেরও জানা ছিল। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ তো ইচ্ছা করলেই ঘটান যায় না! সুতরাং সুযোগ অবহেলা করা মূর্খের কাজ মনে করেই তাঁরা দু'টো ধাপ ডিঙিয়ে চরম ধাপে পা দিলেন। এই কাজে

দুঃসাহসের অন্ত ছিল না। আপাতত ব্যর্থ হলেন তাঁরা। তাতে ক্ষতি নেই। সানন্দে তাই শুরু করলেন বিপ্লবী দ্বিতীয় পর্বের পথে নূতন করে যাত্রা। অভিজ্ঞতায় ও দুর্জয় সংকল্পে সে-যাত্রা সুন্দরতর হল।

'ইণ্ডো-জার্মান্ ষড়যন্ত্র' ফেঁসে গেছে। দিনের পর দিন অপেক্ষা করে জার্মানির অস্ত্রশস্ত্র আর পাওয়া গেল না। পথে 'বিভীষণে'রা বিশ্বাসঘাতকতা করল। এদিকে ছাউনিতে ছাউনিতে ভারতীয় সৈন্যরা জাতীয়-যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে উন্মুখ থেকেও যুদ্ধের আহ্বান আর শুনল না। বাধ্য হয়ে রাসবিহারী পালিয়ে গেলেন জাপানে। যতীন্দ্রনাথ তাঁর চারটি দুর্জয় সঙ্গীসহ স্থির করলেন,—'ঘরে আর ফিরে যাব না, পালিয়ে পালিয়ে আর ঘুরব না, সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দেব।' ...বাধ্য হয়ে চাষখন্দে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এরই নাম 'ফোর্স্‌ড্ ওপেন্ ফাইট্'। যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবী-ভারতকে **দ্বিতীয় ধাপে** তুলে দিলেন। শুরু হল সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দেবার ইতিহাস। বিপ্লবীদের কানে কানে পৌঁছল এক আদেশ—ধরা যদি পড়, পালাবার প্রয়োজন নেই, যুদ্ধ দান করে শত্রুকে ধ্বংস কর। প্রয়োজনে ধ্বংসের মুখে নিজেও নিঃশেষ হও।...১৯১৫ সালে সংঘটিত 'বালেশ্বর'-যুদ্ধের পর দেখা যায়, ১৯১৮ সালে গৌহাটির 'নবগ্রহ' পাহাড়ে পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ-সংগ্রামে বিপ্লবীদের লিপ্ত হতে। ইতিপূর্বে ১৯১৭ সালে 'তেনজিয়া' গ্রামে সম্মুখ-সংঘর্ষেই গোবিন্দ কর ও নিকুঞ্জ পাল আহত হন। আবার ১৯১৮ সালেই ঢাকার কলতাবাজারে ঐ 'ফোর্স্‌ড্ ওপেন্ ফাইটে'-ই নলিনী বাগচি ও তারিণী মজুমদার শহিদের মৃত্যু বরণ করেন।...

অতঃপর ১৯১৯ সালে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গান্ধীজির পদার্পণ ঘটায় অবস্থার পরিবর্তন হয়। সংগ্রামের ইতিহাসে গান্ধীজির

আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা। মহাত্মার আন্দোলন পুরো দশটি বছর ধরে (অর্থাৎ ১৯৩০ সাল পর্যন্ত) ভারতবর্ষের গণ-চেতনাকে অদ্ভুত সাফল্যে উদ্বুদ্ধ করে যায়। যে-কাজ এতাবৎ বিপ্লবীদের করা সম্ভব হয়নি, তা আরম্ভ ও পূর্ণ করলেন মহাত্মা গান্ধী। বিপ্লবীরা গান্ধীজি-প্রদত্ত সুযোগ উপেক্ষা করেননি। তাঁরাও কংগ্রেস-আন্দোলনকে 'পলিসি' হিসেবে গ্রহণ করে এমনভাবে তার শরিক হলেন যে, বাঙলাদেশে অন্তত তাঁদের বাদ দিয়ে দেশবন্ধু পর্যন্ত পথচলা সম্ভব মনে করেননি। দেশপ্রিয় জে. এম্. সেনগুপ্ত বা দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসুকেও তাঁদেরই সম্পূর্ণ সহায়তায় কাজ করতে হয়েছে। বিপ্লবীরা গণ-সংযোগ পরম নিষ্ঠায় শুরু করেছিলেন বলেই দেখা যায়, যে-জনসাধারণ অজ্ঞতার বশে যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ পঞ্চবীরকে বুড়িবালামের অনতিদূরে চাষখন্দে ধরিয়ে দেবার ফাঁদে পা বাড়িয়েছিল, সেই জনসাধারণই পনের বছর পর, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল অবধি সূর্যসেন ও তাঁর বাহিনীকে কর্ণফুলীর তীরে আশ্রয় ও খাদ্য দিয়ে মায়ের মত লালন করেছিল।...১৯১৯ থেকে '১৯২৯ সাল পর্যন্ত বিপ্লবীদের কর্মচেষ্টা স্তিমিত হয়ে আসে নানা কারণে। তন্মধ্যে প্রধান কারণ হল,—সর্বাগ্রে নূতন করে প্রস্তুতি করতে হবে। নচেৎ একটি ধাপ থেকে আর একটি ধাপ উপরে ওঠা যায় না, আগামী বিপ্লব এগিয়ে আসে না।

বিপ্লবীরা ভাল করেই বুঝেছেন যে, গণ-সংযোগ তাঁদের করতেই হবে। মহাত্মার আন্দোলন তাঁদের সর্বোত্তম প্ল্যাটফর্ম্। তাই তাঁদের একাংশ কংগ্রেসের সঙ্গে আপ্রাণ যুক্ত হলেন। অপরাংশ সংগোপনে আশু সশস্ত্র-বিপ্লবের পথে প্রস্তুত হতে থাকলেন।

এইভাবেই কেটে গেল দশটি বছর।...মাঝে মাঝে অবশ্য বিপ্লবীর শাণিত অস্ত্র চমক দিয়ে গেছে।...সেটা অস্ত্র শানানর মতই আত্ম-শক্তির পরীক্ষা।...

এল ১৯৩০ সাল। এ-বছরেই বিপ্লবের ইতিহাসের **তৃতীয় পর্বের** সূচনা। সূর্যসেন বিপ্লবী-ভারতকে তৃতীয় ধাপে তুলে দিলেন। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ তাঁর নেতৃত্বে সফল 'ইন্‌সারেক্‌শান্‌' সংঘটিত করল। দু'চার দিনের জন্যে চট্টগ্রাম শহর ইংরেজ-শাসনের বাইরে চলে গেল।···তারপর ধলঘাট, কালারপোল ইত্যাদি নানাস্থানে সম্মুখ-সংগ্রামে শৌর্যের ইতিহাস বিরচিত হতে থাকল।

সারা বাঙলায় ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল ব্যেপে এক মহা বীর্যবত্তার ঐতিহ্য বঙ্গীয় তরুণ-তরুণীর রক্তলেখায় লিখিত হয়ে গেল। চট্টগ্রামের যুব-উত্থানের পর মাত্র আট মাসের মধ্যেই দেখা গেল, বিনয় বসুর নেতৃত্বে ডালহৌসী স্কোয়ারে রাইটার্স-বিল্ডিংস্‌ আক্রমণ ও 'বারান্দা-যুদ্ধ'। সেইকালে সমগ্র বাঙলার সশস্ত্র-বিপ্লবীরা ইন্‌সারেক্‌শান্‌-এর মুড্‌-এ ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দিয়েছিলেন।

অতঃপর এল চরম মুহূর্ত। ১৯৪১-'৪৫ সাল। ভারতীয় বিপ্লব-ইতিহাসের ইহাই **চতুর্থ** বা **শেষ পর্ব**। 'বিপ্লবে'র পর্বে তুলে দিলেন বিপ্লবী-ভারতকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র। নেতাজির অভূতপূর্ব নায়কত্বে 'আজাদ হিন্দ্‌ বাহিনী'র আবির্ভাব। তাঁরই প্রভাবে 'বিয়াল্লিশের' আন্দোলন, নৌ-বিদ্রোহ ইত্যাদি সব মিলিয়ে সার্থক 'বিপ্লব' দিল ব্রিটিশকে এমন আঘাত—যার ফলশ্রুতি হল ১৯৪৭ সালে ভারত থেকে ব্রিটিশের বহিষ্কার এবং ভারতের রাষ্ট্রিক-স্বাধীনতাপ্রাপ্তি।···

আমরা এখন ইণ্ডো-জার্মান্‌ ষড়যন্ত্রে 'গদর পার্টি'র স্থান এবং ব্যর্থ ষড়যন্ত্রকে মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ কর্তৃক শৌর্য-সাধনায় রূপান্তরিত করার অপূর্ব কাহিনী ক্রমশ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করব।

গদর পার্টির অবদান

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, পাঞ্জাবের প্রখ্যাত বিপ্লবী হরদয়াল সরকারী-বৃত্তি ও লণ্ডনের পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। একান্ত মেধাবী হরদয়ালের মেধা ব্যারিস্টার বা আই.সি.এস্. হবার বিদ্যা অর্জনে খুশি হতে পারেনি। কারণ, দেশপ্রেম ও বিপ্লব-জিজ্ঞাসায় তাঁর বুদ্ধি ও প্রতিভা নিবিষ্ট ছিল। তিনি লণ্ডনে শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার বিপ্লব-প্রচারের সঙ্গী হলেন এবং বার্লিন-প্যারির ভারতীয় বিপ্লবীদের আস্তানায় আনাগোনা শুরু করলেন। তারপর ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে চলে এলেন আমেরিকায়। এদিকে বিষ্ণু গণেশ পিঙ্লেও এসে গেলেন সেখানে।

ইতিপূর্বে ১৯০৮ সালেই ক্যালিফোর্ণিয়াতে কতিপয় ভারতীয় ছাত্র 'ইণ্ডিয়ান্ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগ্' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বাণী প্রচারকল্পে। উক্ত 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগ্' ক্রমে তারকনাথ দাস, পাণ্ডুরাম খানকোজি এবং কাশীরাম প্রমুখ বিপ্লবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০৯ সালে 'এশিয়াটিক্ ইমিগ্রেশান্ বিল্' পাশ হওয়াতে আমেরিকা ও ক্যানাডার শিখ-বাসিন্দাদের মধ্যে অত্যন্ত অসন্তোষ দেখা দেয়। এই অসন্তোষকে বিপ্লবী-নেতারা কাজে লাগিয়ে 'লীগ্'-এর প্রভাব বিস্তৃত করেন। তাই ১৯১১ সালে আমেরিকায় এসেই হরদয়াল ও পিঙ্লে উক্ত 'লীগ্'-এ তাঁদের আদর্শ কর্মস্থল খুঁজে পেলেন। ফ্রান্সিস্কো শহরে 'লীগ্'-এর বড় আড্ডা।...

হরদয়াল মেধাবী ও উঁচুদরের পণ্ডিত। ইতিহাস ও মানবতত্ত্বে তাঁর অগাধ বিদ্যা। অধিকন্তু, তিনি অদ্ভুত বাগ্মী। কাজেই, বিপ্লবীদের কর্মে ও জিজ্ঞাসায় তিনি নতুন প্রাণ, দৃষ্টিকোণ ও উদ্যম সঞ্চারিত করলেন। অদম্য কর্মী পিঙ্লে তাঁর অভ্রান্ত সহায়ক।...

ইতিমধ্যে ভারতীয় ছাত্রদের শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধিকল্পে

'হিন্দুস্থানী এ্যাসোসিয়েশান্' এবং প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বর্ণ-ধর্ম-*প্রদেশ-নির্বিশেষে ঐকাত্ম্য স্থাপনকল্পে 'ইণ্ডিয়ান্ এ্যাসোসিয়েশান্'* প্রভৃতি সংস্থা স্থাপিত হয়ে গেছে।···কিন্তু বিপ্লবীরা এতেই তুষ্ট থাকলেন না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের কামনায়, সরাসরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাঁরা একটি বিপ্লবীদল প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন বোধ করলেন।···তাই ১৯১৩ সালে স্থাপিত হল 'গদর' দল। 'গদর' মানে বিদ্রোহ। গুরুমুখী ভাষায় দলের একটি মুখপত্রও বেরুল। বুলেটিন্ আকারে তার প্রকাশ। ক্রমে তার উর্দু-হিন্দি-গুজরাটি সংস্করণও প্রকাশিত হতে থাকল। বিপ্লবীদের আস্তানার নাম হল 'যুগান্তর আশ্রম'। আশ্রমে ছিল একটি ছাপাখানা। 'গদর' সেখান থেকেই ছাপা হত। কিছুকালের মধ্যেই ইংরেজি ভাষায় 'গদর' কাগজ প্রকাশিত হতে আরম্ভ করল হরদয়ালের সম্পাদনায়। হরদয়ালের অগ্নি-বর্ষী ভাষা আগুন ছড়িয়ে দিতে লাগল প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে 'সিডিশান্ কমিটি রিপোর্ট' বলেছেঃ "This man (Hardayal) had arrived in San Francisco in 1911, imbued with passionate Anglophobia and determined to inspire with his own spirit as many as possible of his fellow-countrymen. He started a newspaper called 'Ghadar'. With his followers he decided to distribute the 'Ghadar' freely in India. Their press was called the 'Jugantar Asram.' Their paper was printed in more than one Indian Language. It was widely distributed among Indians in America and was forwarded to India."

('Sedition Committee Report', P.—102)

[এই লোক (হরদয়াল) ১৯১১ সালে সানফ্রান্সিস্কোতে আসেন। ব্রিটিশ-বিদ্বেষ ছিল তাঁর মজ্জায়। স্বদেশবাসীকে নিজের মতবাদে

প্রভাবিত করার আবেগে তিনি মত্ত। তিনি ‘গদর’ নামে একটি *কাগজ প্রকাশ করলেন। তিনি ও তাঁর দল কাগজখানা বিনামূল্যে* ভারতবর্ষে বিলি করা স্থির করলেন। আমেরিকায় তাঁদের প্রেসটির নাম দেওয়া হল ‘যুগান্তর আশ্রম’। তাঁদের কাগজ বহু ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হত। আমেরিকায় প্রবাসী-ভারতীয় মহলে এবং ভারতবর্ষে এর বহুল প্রচার ছিল।]

এই কাগজ সম্পর্কে ‘সিডিশান্ কমিটি রিপোর্টে’ আরো আছে ঃ “It was of a violent anti-British nature, playing on every passion which it could possibly excite, preaching murder and mutiny in every sentence and urging all Indians to go to India with the express object of committing murder, causing revolution and expelling the British Government by any and every means.” (‘S. C. Report,’ P.—102)

[এ-কাগজ ছিল ভীষণভাবে ব্রিটিশ-দ্রোহী। এ-কাগজ মানুষের হৃদয়াবেগ ও অনুভূতিকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে চালিত করবার প্রত্যেকটি উপায় গ্রহণ করত। কাগজের প্রত্যেকটি পংক্তিতে থাকত হত্যা ও বিদ্রোহের আহ্বান, থাকত প্রবাসী-ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে অনুরোধ যে, তারা দলে দলে ভারতে ফিরে যাক এবং আসন্ন বিপ্লবের সহায়ক হয়ে যে-কোন প্রকারে ব্রিটিশ-সরকারকে ভারতের ভূমি থেকে উৎখাত করুক।]

‘সিডিশান্ কমিটি রিপোর্ট’ই লিখেছে যে, হরদয়াল এবং তাঁর বন্ধুরা অজস্র সভা-সমিতি ডেকে ভারতীয় বিপ্লবের কথা দ্বিধাহীন কণ্ঠে প্রচার করেছেন। ১৯১৩ সালের ৩১শে ডিসেম্বর স্যাক্রামেন্টো শহরে আহূত সভার উল্লেখে কমিটির উক্তি হল ঃ…“Portraits of famous seditionists and murderers were displayed on the screen and revolutionary mottoes were exhibited.

Finally Hardayal told the audience that Germany was preparing to go to war with England, and that it was time to get ready to go to India for the coming revolution." ('S. C. Report,' P.—102)

[নামকরা রাজদ্রোহী ও ব্রিটিশ-হত্যাকারীদের ছবি এবং বিপ্লবের বাণী লিখিত নানা পোস্টার সভামণ্ডপে প্রদর্শিত হয়েছিল। সর্বশেষে হরদয়াল সমবেত শ্রোতাদের উদ্দেশে বললেন যে, জার্মানি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করবার উদ্যোগ করছে এবং সময় আগত, এখনই আমাদের সকলকে চলে যেতে হবে ভারতবর্ষে আসন্ন বিপ্লবের শরিক হবার জন্যে।]

'সিডিশান্ কমিটি'রই রিপোর্ট যে: "Hardayal was assisted in these operations by various lieutenants, notably by a Hindu named Ram Chandra, who had been editor of two seditious papers in India and by a Mahammedan named Barkatulla."

('S. C. Report', P.—102)

[বিপ্লবের কাজে হরদয়ালের সহায়ক ছিলেন একজন হিন্দু, নাম তাঁর রামচন্দ্র। রামচন্দ্র ভারতে থাকাকালে দু'টি রাজদ্রোহী কাগজ সম্পাদনা করে গেছেন। দ্বিতীয় সহায়ক ছিলেন একজন মুসলমান। নাম তাঁর বরকৎউল্লা।]

হরদয়ালের কার্যকলাপে ব্রিটিশ-সরকারের আতঙ্ক হল। ১৯১৪ সালের ২৩শে মার্চ ব্রিটিশের প্ররোচনায় হরদয়ালকে আমেরিকার পুলিশ গ্রেপ্তার করল।

কিন্তু হরদয়াল জামিনে মুক্তি পেয়েই পালিয়ে গেলেন আমেরিকা থেকে সুইজারল্যাণ্ডে। নইলে আমেরিকা-সরকার তাঁকে ব্রিটিশের হাতে তুলে দিত। তবে যে আগুন তিনি আমেরিকায় ছড়িয়ে

এসেছিলেন প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে, তাকে প্রশমিত করার ক্ষমতা কোন রাষ্ট্রের হাতে ছিল না।

হরদয়ালের কর্মভার রামচন্দ্র ও বরকৎউল্লা তুলে নিলেন নিজেদের হাতে। 'গদর' পত্রিকা ও 'যুগান্তর আশ্রম' সগৌরবে চলতে লাগল। এদিকে হরদয়াল সুইজারল্যাণ্ড থেকে বার্লিনে চলে এলেন। তাঁর পাণ্ডিত্য, দেশপ্রেম, ভয়হীনতা ও বৈপ্লবিক-চিন্তার স্বচ্ছতা তাঁকে 'ভারত-জার্মান' ষড়যন্ত্রের পুরোভাগে স্থান দিয়েছিল। 'গদর' দলের বরকৎউল্লাও কিছুদিন পর আমেরিকা থেকে চলে এসে উক্ত ষড়যন্ত্রের শরিক হন। এদিকে বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লবীরা জার্মান-রাষ্ট্রের সঙ্গে 'ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশনাল্ লীগ্'-এর কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তারক দাস, সুরেন কর, চম্পকরামন্ পিল্লাই, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তি, হেরম্ব গুপ্ত প্রমুখও সেই সঙ্গে জুটে গেছেন। হরদয়ালও এসে জুটে গেলেন। এ-সময়ই সুরেন বসু (পরে 'Bengal Water Proof' প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা) কলকাতা থেকে জাপান হয়ে প্যারিসে এসে বোমা তৈয়ের শিখে 'গদর' দলের বোমা-বিশেষজ্ঞ হয়ে গেছেন।···

হরদয়ালের পর রামচন্দ্র

(সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো-বিচার)

একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মার্কিন মুলুক থেকে গোপনে হরদয়াল চলে আসার সময় 'গদর' দলের নেতৃত্ব রামচন্দ্রের উপর ন্যস্ত হয়। এখানে রামচন্দ্র সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন আছে।

পেশোয়ারবাসী এই তেজস্বী যুবক ভারতবর্ষে থাকাকালেই বিপ্লব-ধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। রূপে-গুণে-পাণ্ডিত্যে তরুণ রামচন্দ্র ছিলেন হরদয়ালেরই যোগ্যতম উত্তরাধিকারী। এই তু'জন বিপ্লব-মুখর বন্ধুর কলম থেকেই এতদিন আগুন ঝরে ঝরে পড়ছিল 'গদর' পত্রিকার মাধ্যমে। তাতে প্রবাসী ভারতবাসী ভারতকে নূতন করে

ভালবাসতে শিখল; আমেরিকার লোকেরা ভারতের বন্ধনদশা সম্পর্কে কিছু কিছু ওয়াকিবহাল হতে থাকল। হরদয়াল চলে আসার পর রামচন্দ্র সানন্দে তুলে নিলেন 'হিন্দুস্থান গদর পত্রিকা' ও নানাবিধ প্যাম্‌ফ্লেট্‌ ইত্যাদি লেখার ও প্রকাশের ভার এবং বিপ্লব-সংস্থাকে প্রসারিত ও শাণিত করে গড়ে তোলার দায়িত্ব। উভয় দায়-দায়িত্বেই রামচন্দ্র নির্ভীক ও একনিষ্ঠ বিপ্লবীর দক্ষতা দেখিয়েছেন।

ক্রমে রামচন্দ্র মার্কিনদেশে একখানি অগ্নিশিখার পরিচয়ে প্রকাশিত হয়ে উঠলেন। আমেরিকাবাসী বিস্ময়ে তাকাল এই তীক্ষ্ণ ইস্পাতখানার ঝলমলে রূপের পানে। ব্রিটিশ-শাসনের নগ্ন চেহারা তিনি তাদের গোচরে তুলে ধরলেন। কিন্তু যুদ্ধকালে এসব প্রচারকার্য ইংরেজ বরদাস্ত করতে পারে না। অথচ ধৈর্য হারালে চলবে কেন? আমেরিকার আশ্রয়পুষ্ট 'দুষ্ট'কে দমন করতে হলে তাড়াহুড়া করার অর্থ হয় না। তাছাড়া আমেরিকার কাগজগুলো রামচন্দ্রের বক্তব্য বড় করে ছাপায়। তারা যেন ওসব বক্তব্যে 'নিউজ ভ্যালু' খুঁজে পায়। লর্ড হার্ডিঞ্জ একবার 'The New York Times' (U.S.A.) নামক কাগজের প্রতিনিধির কাছে আমেরিকায় ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপকে 'এনার্কিস্টিক' বলে অভিহিত করেন। সেই মিথ্যা উক্তির জবাব দিতে রামচন্দ্রের দেরি হল না। রামচন্দ্রের দীর্ঘ প্রত্যুত্তর সমাদরে ছাপলেন 'N. Y. Times'-এর সম্পাদক। লিখেছিলেন বিপ্লবী রামচন্দ্র ঃ…"We are not anarchistic but republicans…Our plan is constructive, first and last. We aim at nothing less than the establishment in India of a republic, a Government of the people, by the people, for the people in India." ('Indian Freedom Movement: Revolutionaries in America', P.—83)

[আমরা নৈরাজ্যবাদী নই। আমরা প্রজাতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। শুরু থেকে শেষ অবধি আমাদের কার্যকলাপ গঠনমূলক। আমাদের

একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতীয় জনগণ দ্বারা, তাঁদের জন্যে, তাঁদেরই আধিপত্যে ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা।]

কিন্তু ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ডাচ্-বিপ্লবী ডেকার্ (Mr. Douwes Dekker) জাতীয় ব্যক্তিদের বিশ্বাসঘাতকতায় 'সান্-ফ্রান্সিস্কো-বিচার' নামক মামলার সূত্রপাত ঘটে ব্রিটিশের তাগিদে, মার্কিন সরকারের সৌকর্যে। মামলাটি পাঁচ মাস ধরে চলে। ১৯১৭ সালের ২২শে নভেম্বর থেকে ১৯১৮ সালের ২৪শে এপ্রিল পর্যন্ত।

এ-মামলায় জাঁক-জমকের অন্ত ছিল না। "The cost to the British Government must have been close to $1,000,000 dollar. The real expense was probably twice that amount. Two hundred members of the British Secret Service were in San Francisco for more than two years working on Indian cases. Witnesses have been summoned from every corner of the globe at a tremendous outlay."

('I. F. M. : R. I. America', P.—78-79)

[ইংরেজ-সরকারের খরচ দশ লক্ষ ডলারের কম হয়নি। যথার্থ খরচ তার দ্বিগুণ হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। দু'বছর ধরে ইংরেজের সিক্রেট পুলিশ ও রাজনৈতিক-বিভাগের দু'শ কর্মচারী সান্‌ফ্রান্সিস্কো নগরীতে নিযুক্ত ছিলেন। পৃথিবীর নানাপ্রান্ত থেকে প্রচুর অর্থব্যয়ে সাক্ষী-সাবুদ আনা হয়েছিল।]

১৯১৭ সালের ৭ই এপ্রিল রামচন্দ্র গ্রেপ্তার হলেন। তখন তিনি 'হিন্দুস্থান গদর' পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক। মামলা শুরু হল নভেম্বরের ২০ তারিখে। ডেকার্ হল রাজসাক্ষী। মামলায় ধৃত ইউরোপের নানাদেশীয় আসামীদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি হয়

দোষ স্বীকার করেছিল, নয়তো রাজসাক্ষীর স্থান নিয়েছিল। বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে কিছু ভারতীয়ও ছিল।

কিন্তু রামচন্দ্র ও তাঁর দেশী-বিদেশী প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ জন সতীর্থ বীরের মত এই বিচার-প্রহসনকে সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। বিচারের শেষের দিকে (২৬. ২. ১৯১৮) রামচন্দ্র বন্দীর কাঠগড়া থেকে বলেছিলেন প্রেসিডেন্ট উইলসনের উদ্দেশে: "India, Ireland, Egypt, Persia, Morocco, Malaya—these are all subject states. They should be represented in the peace conference, not by the Governments which dominate them, but by representatives of their own selection. Let not this war be ended, Mr. President, until their freedom has been achieved."

('I. F. M. : R. I. America', P.—66)

[ভারতবর্ষ, আয়র্লণ্ড, ঈজিপ্ট, পারস্য, মরোক্কো, মালয়—এই সবগুলো দেশই পরাধীন। (মহাযুদ্ধ অন্তে) শান্তি-সভায় এই দেশগুলোর প্রতিনিধিদেরও ডাকতে হবে; তবে তাঁরা বিদেশী শাসকদের প্রতিনিধি হলে চলবে না, তাঁদের নির্বাচিত করবেন দেশের জনসাধারণ। প্রেসিডেন্ট উইলসন্ সাহেবের কাছে আমার আবেদন যে, এই দেশগুলোর স্বাধীনতা অর্জিত না-হবার পূর্বে যেন প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সমাপ্তি না ঘটে।]

বীর্যশালী এই তরুণ-বিপ্লবীর কণ্ঠ সমগ্র আমেরিকাবাসীকে বিস্মিত করল। ভারতবাসীর গর্বের সীমা রইল না।···কিন্তু জাতির পাপ দেড়শ' বছরের পরাধীনতায় পুঞ্জীভূত। এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত জাতিকে আরো বহুকাল করতে হবে বলেই হয়তো মার্কিনের 'গদর'-সংস্থার মধ্যে আত্মকলহ মাথা তুলে দাঁড়াল। কার চাতুর্যে জানা নেই, কর্মীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ঢুকে গেল,—হিন্দু-মুসলমানের আত্মঘাতী বিসম্বাদ নয়, হিন্দু-শিখের আত্মদ্রোহ! এই

কলহ আচম্বিতে কুৎসিত রূপে দেখা দিল ১৯১৮ সালের ২৩শে এপ্রিলের এক বেদনাবহ মুহূর্তে।...কোর্ট তখন লাঞ্চ্-এর জন্যে বিচারকার্য স্থগিত রেখেছে। বিচারক কোর্ট-রুম্ ত্যাগ করে খাস-কামরায় ঢুকে গেছেন। আইনজীবী ও দর্শকরাও বাইরে যাবার জন্যে আসন ছেড়ে উঠেছেন। বন্দী রামচন্দ্রও কাঠগড়া ত্যাগ করে কয়েক পা এগিয়েছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে অপর বন্দী রাম সিং নিজ দেহে লুক্কায়িত রিভল্‌বার টেনে বের করে সতীর্থ রামচন্দ্রকে গুলি করে বসল। রামচন্দ্র টলতে টলতে মাটিতে পড়ে গেলেন। মুহূর্তে মৃত্যু তাঁকে গ্রাস করল।...সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ-কর্তা রাম সিংকে গুলি করে মৃত্যুর দ্বারে পৌঁছে দিলেন।

রাম সিংকে দলের যারাই রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করুক না কেন, তারা সাম্প্রদায়িক-দুর্বুদ্ধি থেকেই যে পরিচালিত হয়েছিল, তা অসত্য নয়। তাই তাদের বংশধর—আজকের ভারতবাসী এই মানুষগুলির অপকীর্তির কথা স্মরণ করে পরম দুঃখ বোধ করে, লজ্জায় নতশির হয়। এ-পাপ শুধু রাম সিং-এর নয়, এ-পাপ পরাধীন জাতির।

রামচন্দ্রের মত শৌর্যবান পুরুষ, সর্বগুণসম্পন্ন তেজস্বী এক তরুণ বিপ্লবী-নেতাকে হত্যা করে রাম সিং-জাতীয় অবোধ ব্যক্তিরা ভারতবর্ষের বিপ্লব-সাধনাকে সেদিন পিছিয়ে দিয়েছিল। যে-পাপ তারা করে গেছে, তার গ্লানি দেশমাতার শৃঙ্খলবন্ধনকে দীর্ঘতর দিনের জন্যে বিলম্বিত করেছিল।

কিন্তু দেশে-বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবী-আত্মা পরের যুগে সাবধানে ও সাগ্রহে লালন করত এই অনন্যসাধারণ মানুষটির স্মৃতি। সংগ্রামী জাতির ব্যাকুল কণ্ঠে সবার অলক্ষ্যে ধ্বনিত হয়ে যেত:

"আজকে তোমার অলিখিত নাম
আমরা বেড়াই খুঁজি—
আগামী প্রাতের শুকতারা সম
নেপথ্যে আছে বুঝি।"…

ভারতবর্ষ আজ স্বাধীন। নেপথ্যে বিরাজিত 'শুকতারা সম' শৌর্যময় রামচন্দ্র। 'শহিদে'র বিভায় আজও কি তাঁকে দেশের মানুষ চিনে নিতে পারবে না ?

'সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো-বিচারের' রায় বেরুল ১৯১৮ সালের ৩০শে এপ্রিল। দণ্ডলাভ করলেন ৩৯ জন আসামী। তাঁদের মধ্যে তারক দাস, ধীরেন সরকার, ইমাম্ দিন্ ও সন্তোখ সিং প্রমুখ অন্যতম।

দণ্ডিত বিপ্লবীদের মধ্যে ১৫ জন ছিলেন ইউরোপীয় এবং ১৯ জন ছিলেন ভারতীয়।

ভারতবর্ষে গদর-কর্মীদের বৈপ্লবিক অনুপ্রবেশ

ক্যানাডার 'ইমিগ্রেশান্-আইনে'র কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ যুগে ক্যানাডায় অন্তত হাজার চারেক পাঞ্জাবী-শ্রমিক 'বাসিন্দা' রূপে বসবাস করতেন। তাঁরা সকলেই চালু-হওয়া আইনটির আঘাতে অসুবিধায় পড়লেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁদের অসন্তোষ এই কারণে যে, ক্যানাডার হঠকারিতার বিরুদ্ধে সে একটি কথাও বলল না। এই অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকল। শিখ তথা পাঞ্জাবীদের এই অসন্তোষ এবং অসুবিধাজনিত উষ্মা গদর-পার্টি 'বিদ্রোহে'র কাজে লাগাতে বিলম্ব করল না। ধীরে ধীরে এঁদের মধ্যে বিদ্রোহ-বীজ ছড়িয়ে দিতে লাগলেন বিপ্লবীরা।…

১৯১৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল একটি ব্যাপার ঘটে গেল।

মালয় ও সিঙ্গাপুরের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী গুরদিৎ সিং। তিনি ঐ তারিখে বাহ্যত ব্যবসায়ের সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে 'কোমাগাটামারু' নামে একটি জাপানী জাহাজ ভাড়া করে শ্রমজীবী শিখদের নিয়ে হংকং থেকে ক্যানাডা যাত্রা করলেন। কিন্তু তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল 'ইমিগ্রেশান্-এ্যাক্ট্'কে চ্যালেঞ্জ করা।

উক্ত জাহাজে যাত্রী ছিলেন ৩৭২ জন পাঞ্জাবী। তাঁদের অধিকাংশই শিখ। জাহাজটি ইয়াকোহামা ও অন্তবর্তী অন্যান্য বন্দরে পৌঁছতেই ভারতীয় বিপ্লবী-কর্মীরা যাত্রীদের মধ্যে 'গদর' পত্রিকা ছড়িয়ে দিতে থাকলেন। বন্দরে-বন্দরে বিদ্রোহের জয়গান তাঁদের কানে আসতে লাগল। মন তাঁদের চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু বিপ্লবের বাণী মর্ম দিয়ে বরণ করার প্রস্তুতি তখনও তাঁদের হয়নি।

মে মাসের শেষাশেষি। কোমাগাটামারু ভ্যাংকোবার বন্দরে এসে পৌঁছল। কিন্তু ক্যানাডার কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের আটকালেন, জাহাজ থেকে কাউকে নামতে দিলেন না। বাধ্য হয়ে জাহাজটি সকল যাত্রী নিয়েই ফিরে চলল। এতে যাত্রীদলের মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ক্যানাডা-সরকারের আচরণ তাঁরা বরদাস্ত করতে পারলেন না। বহু আশায় নিজেদের যথাসর্বস্ব বিক্রয় করে সামান্য সঞ্চয় সহ ঘর ছেড়ে তাঁরা দূর ক্যানাডায় যাচ্ছিলেন শুধু ভাগ্যান্বেষণে। কিন্তু সম্বলহীন ক্ষুধার্ত অবস্থায় জানোয়ারের মত তাঁদের তাড়িয়ে দিলেন নির্দয় ক্যানাডা-কর্তৃপক্ষ। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, মহা বিবেচক বিটিশ-সরকার তার ভারতীয় প্রজাদের লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করবে না। ক্যানাডার জাতি-বিদ্বেষী এই আইন ব্রিটিশ-ধর্মরাজ নিশ্চয়ই অন্যায় বলে স্বীকার

করে তাকে প্রতিহত করবে। কিন্তু কার্যত দেখা গেল, ব্রিটিশ-সিংহ চোখ বুজে রইল। লাঞ্ছিত এই মানুষগুলির ক্রুদ্ধ মনে তখন গদর-পার্টির বিদ্রোহ-বাণী মন্ত্রের শক্তিতে কাজ করল। তাঁদের পেটে ক্ষুধা, চিত্তে অপমানের কষাঘাত। তাই এবার 'গদর' পত্রিকা ও বিদ্রোহাত্মক নানাবিধ প্যাম্‌ফ্লেট্‌-এর প্রত্যেকটি ঠাণ্ডা হরফ তাঁদের কাছে আগুন-ছোঁয়া বারুদের এক-একটি স্তূপের মতো ফেটে পড়বার উপক্রম হল।...

জাহাজ ফিরে এল হংকং বন্দরে। কিন্তু সেখানেও কাউকে নামতে দেওয়া হল না। অভুক্ত যাত্রীদল মরীয়া হয়ে উঠেছেন। গুরদিৎ সিং যাত্রীদের দেহ-মনের এই অবস্থার কথা হংকং-কর্তৃপক্ষকে জানালেন। কিন্তু হংকং-এ অবস্থিত ব্রিটিশ-দূত ওসব কথা শুনে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। যাত্রীদের বন্দরে নামতে দেওয়া তো দূরের কথা, এক ছটাক খাদ্যদ্রব্যও জাহাজে তুলবার অনুমতি পাওয়া গেল না। অবস্থা দ্রুত সংকটজনক হতে লাগল। 'বিদ্রোহ' মূর্তি ধরে দেখা দিতে চায়।

শেষটায় ভারত-সরকারের সুবুদ্ধি দেখা দিল। তার নির্দেশেই কিছু খাদ্যদ্রব্য দিয়ে জাহাজটিকে যাত্রীসহ কলকাতা বন্দরের দিকে পাঠান হল।

যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই ভারতে ফিরে আসতে রাজী ছিলেন না। কারণ, সেখানে ভাগ্যলক্ষ্মী বড়ই কৃপণ। তাঁরা হংকং বা সিঙ্গাপুরে নেমে যাবার জন্যে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু সরকার সে-আবেদনে কর্ণপাত করল না। কাজেই, আরোহীদের উত্তেজনা বেড়েই চলল। ব্রিটিশ-বিদ্বেষী হয়ে উঠল তাঁদের মন। বিদ্রোহীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ এলেই হয়!...

১৯১৪ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর। কলকাতার দক্ষিণে বজ্ বজ্। সেখানে এসে ভিড়েছে কোমাগাটামারু। জাহাজে ৩৭২টি পাঞ্জাবী বীর শৃঙ্খলিত কেশর-ফোলা সিংহের মত উত্তেজিত।

কিন্তু গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য স্থির হয়ে গেছে। যাত্রীদের স্পেশাল্ ট্রেনে তুলে সোজা পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বিশ্বযুদ্ধের অজুহাতে যে-কোন ব্যক্তির গতিবিধি-নিয়ন্ত্রণের আইন চালু হয়ে আছে। সুতরাং পুলিশ সে-আইনের বলে যাত্রীদের পাঞ্জাবগামী ট্রেনে উঠবার জন্যে আদেশ দিল। গুরদিৎ সিং এবং তাঁর সঙ্গীদের সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছে। তাঁরা জাহাজ থেকে নেমে ট্রেনে উঠলেন না। সোজা হাঁটা দিলেন কলকাতার দিকে।...

কলকাতার পুলিশ-কমিশনার স্যার ফ্রেডারিক্ এবং চব্বিশ-পরগণার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডোনাল্ড্ পুলিশ ও সৈন্য নিয়ে পূর্বাহ্ণেই তৈয়ের ছিলেন। তাঁরা দ্বিরুক্তি না করে বাধা দিলেন ক্ষুধায় ও অপমানে ক্রুদ্ধ শার্দুল-বাহিনীকে। সে-বাহিনীর পথচলার স্বাধীনতায় এরূপ হস্তক্ষেপের প্রত্যুত্তরে সংঘর্ষ বেধে গেল। শিখরা নিরস্ত্র ছিলেন না। অনেকের সঙ্গেই ছিল আমেরিকান্ পিস্তল। উভয়পক্ষ চালাল গুলি। বন্দুকে-পিস্তলে চলল অসম লড়াই। তবু ব্রিটিশের ভাড়াটিয়া সৈন্য ও পুলিশ হিমসিম খেয়ে গেল অবন্ধ্য-পথে চলতে চাওয়া পাঞ্জাবী সিংহ-শিশুদের সঙ্গে লড়তে গিয়ে!...

এই সংঘর্ষে স্যার ফ্রেডারিক্ আহত হলেন, হাম্ফ্রির আঘাত গুরুতর হল, লোমেক্স্‌কে বাঁচান গেল না। অধিকন্তু, জখম হয়েছিল কিছু পুলিশ ও সৈন্য।

এদিকে যাত্রীদের মধ্যে নিহত হলেন ১৮ জন। অল্প-বিস্তর আহত হলেন অনেকেই।

যাত্রীদলে ১৭ জন ছিলেন পাঞ্জাবী মুসলমান। তাঁদের সঙ্গে

আরো ৪৩ জন শিখযাত্রীকে জোর করে ট্রেনে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু ২৭২ জন যাত্রীর বাকি সবাই পালিয়ে যান। পরে অনেকে ধরা পড়লেন। তাঁদের মধ্যে ৩১ জনকে অন্তরীণ করা হয়। গুরদিৎ সিং এবং আরো ১৮ জন শিখকে পুলিশ শেষ পর্যন্ত ধরতে পারেনি।

কোমাগাটামারু-সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারেই গুরদিৎ সিং-এর নেতৃত্ব ও সুদক্ষ পরিচালনা বিপ্লবী-ভারতের কাছে বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল। কারণ, আগামী-বিপ্লবের প্রস্তুতি-পর্বে এ-ঘটনার অবদান অসামান্য।

কোমাগাটামারু-সংঘটনা কিন্তু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর গুরুত্ব বিপ্লবের ইতিহাসে প্রচুর। সমস্ত ব্যাপারটির পেছনে গদর-পার্টির অপ্রত্যক্ষ নেতৃত্ব কাজ করেছিল বলেই জাহাজের সাধারণ এবং রাজনীতিজ্ঞান-বর্জিত মানুষগুলো বিদ্রোহীর ভূমিকায় ঐ ঐতিহাসিক সংঘর্ষের অংশীদার হতে পারলেন।

'ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশনাল্ লীগ্' ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্রটিকে সফল করে তোলার কাজে তৎপর। গদর-পার্টি ভারতে ও ভারতের বাইরে তার সবটুকু আয়োজন নিয়ে 'ন্যাশনাল্ লীগ্'-এর নেতৃত্বে বিপ্লব-পরিকল্পনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে! কোমাগাটামারুর যাত্রীদের নিধন-যজ্ঞের আগুন ছড়িয়ে গেছে দেশে-বিদেশে ভারতীয়দের মধ্যে। খেপে গেছে পাঞ্জাব। খেপে গেছে বাঙলা ও বিপ্লবী-ভারত।

১৯১৪ সালের ২৯শে অক্টোবর আরো একটি ঘটনা ঘটে গেল। ঐ তারিখে 'টোসামারু' নামক একটি জাপানী জাহাজ আমেরিকা, মেনিলা, চীন, সাংহাই ও হংকং থেকে বহু ভারতীয়কে বহন করে নিয়ে এল কলকাতায়। আরোহীদের অধিকাংশই ছিলেন শিখ। যাত্রীদের

মধ্যে কিছু বিপ্লবী-কর্মীও ছিলেন। ঠিক ঐ সময়েই 'এস্. এস্. সালামির' নামক অপর একখানি জাহাজে শিখযাত্রীদের সঙ্গে পিঙ্‌লে, সত্যেন সেন প্রমুখ কতিপয় বিশিষ্ট বিপ্লবীও আসেন। সত্যেন সেন কলকাতায় চলে যান। পিঙ্‌লে প্রমুখ বিপ্লবীরা রাসবিহারী বসুর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে উত্তর-ভারতে রওনা হন। এই বিপ্লবীদের মধ্যে অনেকেই আমেরিকা বা বিদেশের নানাস্থানে শিখ-বাসিন্দা ও শিখ-সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ-বাণী প্রচার করার সংকল্প নিয়ে একদা দেশত্যাগ করেছিলেন। কারণ, তাঁরা জেনে গিয়েছিলেন যে, আগামী বিপ্লবে দুর্ধর্ষ শিখজাতির কাছে রাসবিহারী ও যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিপ্লবী-নায়কদের প্রত্যাশা যথেষ্ট।

'টোসামারু'র ১০৭ জন ভারতীয় যাত্রীর মধ্যে ভারত-সরকারের নির্দেশে একশ' জনকেই অন্তরীণ করা হয়। তথাপি বিদেশে অবস্থিত বিপ্লবীরা নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে বহু ভারতীয়কে নানা জাহাজে তুলে স্বদেশে পাঠাতে বিরত হলেন না।···

পাঞ্জাবের শাসকগোষ্ঠী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। কারণ, স্বদেশ-প্রত্যাগত শিখরা মরীয়া হয়ে আছেন। আইন-কানুন মেনে চলার মন ও মর্জি তাঁদের নেই। লাঞ্ছনা ও অপমানের জ্বালা তাঁদের অতিরিক্ত, বিদ্রোহের মন্ত্রে তাঁরা অভিষিক্ত।···

পাঞ্জাবে ব্যাপক ধর-পাকড় শুরু হল। প্রায় দু'হাজার শিখ অল্প দিনের মধ্যেই বন্দী হলেন শুধুমাত্র সন্দেহবশে। ভারত-সরকারের ধারণা : "The majority of these Shikhs had returned expecting to find India in a state of acute unrest and meaning to convert this unrest into revolution."

('Sedition Committee Report', P.—105)

[বিদেশ-প্রত্যাগত অধিকাংশ শিখই এই ধারণা নিয়ে এসেছিলেন যে, ভারতবর্ষে প্রচুর বিদ্রোহ-তাপ ছড়িয়ে আছে, এবং তা জ্বলে উঠবে আসন্ন বিপ্লবে।]

বিপ্লবীদের প্রচার এবং বিদেশ থেকে দলে দলে প্রত্যাগত ভারতীয়দের প্রত্যাশা কোনকালেই ভ্রান্ত ছিল না। 'বিপ্লব' ভারতের দ্বার পর্যন্ত এসেছিল। সেই বিপ্লব-নৃত্য একবার শুরু হলে বিদেশ-প্রত্যাগত এই পাঞ্জাবী বীরগণ অবশ্যই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কিন্তু 'বিপ্লব' দুয়ার থেকেই ফিরে গেল। দু'একটি 'বিভীষণে'র দুষ্কর্মে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হল। জাহাজবোঝাই জার্মান-অস্ত্রশস্ত্র ভারতের কূলে নামান গেল না। ফিরে গেল সে-জাহাজ। ফিরে গেলেন তার সাথে বিপ্লব-দেবতা। বিপ্লব-দেবতার কণ্ঠে উচ্চারিত হল: 'সময় তোমার এখনো হয়নি। আরো ত্যাগ, আরো সাধনা, আরো সংগঠন ও রক্তক্ষয়ের পথে এগিয়ে এস। তোমাদের কর্মে ও উদ্যোগে তপস্যামুখর অনলস চেষ্টা থাকলে একদিন আমি ভারতের দুয়ার ঠেলে আবির্ভূত হবই।'...

আপাতদৃষ্টিতে বিপ্লব ব্যর্থ হল

যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি ও রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা স্থির করেছেন যে, ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে ভারতবর্ষে একটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত করতে হবে। সেই অভ্যুত্থানের পথেই আসবে দেশের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা। রাসবিহারী উত্তর-ভারতে ও পাঞ্জাবে বিপ্লবী-সংস্থাকে অধিকতর সুসংবদ্ধ করার ভার নিলেন। আরো কঠিনতর ভার নিলেন তিনি—ব্রিটিশ-বাহিনীর দেশীয়-সৈন্যদের বিদ্রোহমত্ত করে উক্ত অভ্যুত্থানে টেনে আনার।

এদিকে যতীন্দ্রনাথের উপর ভার পড়ল:

"To organise and put the whole scheme of raising a rebellion with the help of the Germans upon a proper footing, establishing co-operation between

revolutionaries in Siam and other places with Bengal."　　('Sedition Committee Report', P.—82)

[জার্মানদের সহায়তায় সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের সম্পূর্ণ প্ল্যানটিকে কার্যকরী করার জন্যে, সংঘঠনের, এবং সে-জন্যে শ্যাম ও অন্যান্য স্থানের বিপ্লবীদের সঙ্গেও বাঙলার বিপ্লবীদের সংযোগ ঘটিয়ে তা রক্ষা করার ভার পড়ল।]

এই সংঘঠন-পর্বের প্রথমেই প্রয়োজন ছিল কিছু অস্ত্রশস্ত্রের।··· ১৯১৪ সালের ২৬শে আগস্ট 'রডা কোম্পানি'র 'মাউজার' পিস্তল ও বুলেট্ লুট করে প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতা শ্রীশ পালের নেতৃত্বে হাবু মিত্র, হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস প্রমুখ দুঃসাহসীর দল সে-সমস্যার অভূতপূর্ব সমাধান করেছেন।

এবার দ্বিতীয় প্রয়োজন মেটাতে হবে। সেই প্রয়োজন হল অর্থের। তাই যতীন্দ্রনাথের আদেশে দু'টি বৃহৎ অর্থলুটের ব্যবস্থা হল ১৯১৫ সালে। দু'টিই মোটর-যোগে য়্যাক্শান্, বাঙলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লব-ইতিহাসে প্রথম মোটর-যোগে ডাকাতি।·· প্রথমটি সংঘঠিত হল গার্ডেন্ রীচ-এ, ১২ই ফেব্রুয়ারি। দ্বিতীয়টি ঘটে বেলেঘাটায়, ২২শে ফেব্রুয়ারি। 'সিডিশান্ কমিটি'র রিপোর্ট অনুসারে এতে বিপ্লবীদের প্রাপ্তি হয়েছিল মোট হাজার আটত্রিশেক টাকা।

কোমরে পিস্তল, পকেটে অর্থ, সম্মুখে বিরাট অভ্যুত্থানের আহ্বান। শৃঙ্খলিতা দেশজননীর আবাধ্য মুক্তির দিন আগত। বাঙলা তথা ভারতের কতিপয় তরুণ এই স্বপ্নকে মূর্ত করার নেশা পাত্র ভরে পান করেছেন। অসুরের শক্তি তাঁদের দেহে সঞ্চারিত হয়েছে, দেবতার আশীর্বাদ তাঁদের চিত্তে আত্মবিলয়নের সন্ধান জানিয়েছে।···

প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। এবার জার্মানি থেকে প্রার্থিত অস্ত্রবোঝাই জাহাজ কলকাতার পথে এলেই হয়!

আসছে অস্ত্র, আসছে অর্থ কয়েকদিনের মধ্যেই। এসে গেছে বিদেশ থেকে বহু প্রবাসী ভারতবাসী আসন্ন অভ্যুত্থানে যোগ দেবার

জন্যে। ভারতের বুকে বিপ্লবী-জোয়ানদল তো প্রথম থেকেই একপায়ে খাড়া।...

অভ্যুত্থানের দিন স্থির হয়েছে। ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সেই মহান্ লগ্ন।...খাকি প্যাণ্ট, খাকি হাফ্‌শার্ট তৈয়ের হয়েছে প্রচুর।...প্ল্যান্ হচ্ছে, হাতে অস্ত্র এলেই শার্ট-শর্ট্ পরিহিত বিপ্লবী-স্বেচ্ছাসৈনিকরা একই সঙ্গে থানাগুলোকে দখল করে নেবেন। তারপর সারা দেশে ঘটবে সশস্ত্র-অভ্যুত্থান—দেশীয় সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে।

নেতাদের কাছে খবর এল—'ম্যাভারিক্' জাহাজে মাল আসছে। স্থির হয়েছে, রায়মঙ্গলে সে-জাহাজ এসে ভিড়বে। জার্মান্ কন্সাল্-জেনারেল্-এর সঙ্গে ব্যবস্থা করেছেন নরেন ভট্টাচার্য, ওরফে 'মার্টিন' (উত্তরকালের সুপ্রসিদ্ধ মানবেন্দ্রনাথ রায়)। ঐ জাহাজে অন্যান্য মালের সঙ্গে বিপ্লবীদের জন্যে নাকি আসছিল তিরিশ হাজার রাইফেল, প্রত্যেক রাইফেল-এর জন্যে বরাদ্দ চারশ' রাউণ্ড করে বুলেট্ এবং দু'লক্ষ টাকা। মার্টিন, অর্থাৎ নরেন ভট্টাচার্য তখন ব্যাটাভিয়ায় বসে ওখানকার জার্মান-কন্সাল্ হের্ থিয়োডোর হেল্‌ফেরিখ্-এর সঙ্গে সকল ব্যবস্থা করছেন। খবরাখবর সন্দেহাতীত রূপে কলকাতায় পাবার জন্যে হরিকুমার চক্রবর্তিকে একটি ঠিকানা যোগাড়ের ভার দেন নেতা যতীন মুখার্জি। সে-ঠিকানায় শুধু সংবাদ নয়, অর্থ বাবদ ড্রাফ্‌টও আসবে। হরিকুমার চক্রবর্তি একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান—অর্থাৎ, অর্ডার সাপ্লাই-এর আপিস খুলে বসলেন। 'হ্যারি এণ্ড সন্স' তার নাম। নরেন্দ্রনাথ উক্ত 'হ্যারি এণ্ড সন্স'-এর মাধ্যমেই সাংকেতিক ভাষায় খবরাখবর পাঠিয়ে যাচ্ছেন, জার্মান্-সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থও বারে বারে 'ড্রাফ্‌ট' করে পাঠাতে থাকলেন। 'সিডিশান্ কমিটি'র রিপোর্ট হল :

"Meanwhile 'Martin' had telegraphed to 'Harry

& Sons' in Calcutta, a bogus firm kept by a well-known revolutionary, that, 'business was helpful' !" ('S. C. Report', P.– 82)

[ইতিমধ্যে মার্টিন (নরেন ভট্টাচার্য) কলকাতার 'হ্যারি এণ্ড সন্স্' নামক একটি জাল ব্যবসায়-কেন্দ্রে টেলিগ্রাফ করছেন—'ব্যবসা সুবিধেজনক হল'। উক্ত ব্যবসায়-কেন্দ্রটির পরিচালক ছিলেন নামী একজন বিপ্লবী।]

জুন মাসে 'হ্যারি এণ্ড সন্স্' পুনরায় টাকা পাঠাবার জন্যে মার্টিনকে ব্যাটাভিয়ার ঠিকানায় সংবাদ দেয়। তার উত্তরে উক্ত আপিসে মোট টাকার কয়েকটি 'ড্রাফ্ট' ক্রমে ক্রমে আসে ব্যাটাভিয়ার 'হেল্ফেরিখ্'-এর কাছ থেকে। 'হেল্ফেরিখ্' ব্যাটাভিয়া থেকে পাঠিয়েছিলেন মোট তেতাল্লিশ হাজার টাকা। জুন ও আগস্ট মাসের মধ্যে 'হ্যারি এণ্ড সন্স' পেয়ে যায় তেত্রিশ হাজার। কিন্তু পুলিশের সন্দেহ ঘোরালো হতেই দশ হাজার টাকা তারা আটকিয়ে ফেলে এবং খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে।...

মার্টিন ফিরে এসেছিলেন কলকাতায় জুন মাসের মাঝামাঝি। নেতা যতীন্দ্রনাথ সমস্ত বৃত্তান্ত জেনে যাদুগোপাল প্রমুখ সতীর্থদের সঙ্গে একমত হয়ে স্থির করেন যে, পূর্ববঙ্গে (সন্দীপ) হাতিয়া, পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা, উড়িষ্যার বালেশ্বর—এই তিনটি অঞ্চলে জার্মান্-অস্ত্রশস্ত্র বিপ্লবীদের সকল দলের মধ্যে বিতরণ করা হবে। 'সিডিশান্ কমিটি রিপোর্টে' বলেছে :

"They considered that they were numerically strong enough to deal with the troops in Bengal, but they feared re-inforcements from outside. With this idea in view they decided to hold up the three main railways into Bengal by blowing up the principal bridges". ('S. C. Report,' P.—83)

[তাঁরা (বিপ্লবীরা) মনে করেছিলেন যে, জনসংখ্যায় তাঁরা অধিক বলে বাঙলার স্বল্পতর সংখ্যক ব্রিটিশ-সৈন্যদলকে শক্ত হাতে দেখে নিতে পারবেন ; কিন্তু ভয় ছিল বাইরে থেকে সৈন্য আমদানির। তাই স্থির হয়েছিল, প্রধান প্রধান পুলগুলো উড়িয়ে দিয়ে বাঙলা-অভিমুখী তিনটি রেললাইন অকেজো করে দেওয়া।]

বিপ্লবীরা সত্যি বাঙলা-অভিমুখী রেললাইন তিনটিকে অকেজো করে দেবার প্ল্যান্ নিয়েছিলেন। যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং ভার নিলেন বালেশ্বরে অবস্থান করে মাদ্রাজ লাইনটিকে অকেজো করার, ভোলানাথ চ্যাটার্জিকে পাঠান হল চক্রধরপুরে বেঙ্গল-নাগপুর লাইন সামলাবার দায়িত্ব দিয়ে এবং সতীশ চক্রবর্তি গেলেন অজয়ের উপর ইস্ট-ইণ্ডিয়ার রেলের পুল উড়িয়ে দেবার আদেশ নিয়ে।...

এদিকে হাতিয়ায় (সন্দীপ) চলে গেলেন নরেন ঘোষ-চৌধুরী। তাঁর দায়িত্ব ছিল পূর্ববঙ্গে বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণের পরে জিলাগুলো দখল করার প্রস্তুতির জন্যে। বিপিন গাঙ্গুলি ভার নিলেন ফোর্ট উইলিয়াম্ চড়াও করে কলকাতা করায়ত্ত করার। যাদুগোপাল ভার নিলেন রায়মঙ্গলে জার্মান্-অস্ত্র জাহাজ থেকে খালাস করে যথানির্দিষ্ট ঘাঁটিগুলিতে সে-সব সরবরাহ করার।

১৯১৫ সালের ১লা জুলাই-এর মধ্যে সকল দলের সকল বিপ্লবী-তরুণের হাতে-হাতেই অস্ত্র পৌঁছে যাবে বলে আবার আশা করা গেল।

কিন্তু কয়েক মাস পূর্বের কথা।

সকলে প্রস্তুত।...শুভলগ্নের দেরি নেই। আর কয়েকটা দিন। ...এল বলে ঐ একুশে ফেব্রুয়ারি!...

কিন্তু সহসা মাথায় বাজ পড়ল। উত্তর-ভারতের সংবাদে জানা গেল যে, কৃপাল সিং নামক একটি সৈনিক বিপ্লবীদের হাত থেকে

ফস্‌কে গিয়ে গভর্ণমেণ্টের কব্জার মধ্যে চলে গেছে। তার কাছ থেকেই পুলিশ '২১শে' তারিখটির সংবাদ পেয়ে গেল। ··

কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরেই রাসবিহারী গোপনে বিপ্লবী-নেতাদের জানিয়ে দিলেন যে, তারিখটি পাল্টে দেওয়া হল—সৈন্য-বিদ্রোহ ঘটবে ১৯শে ফেব্রুয়ারি।···কিন্তু কৃপাল সিং পরিবর্তিত তারিখটির সংবাদ সযত্নে পুলিশের কানে তুলে দিল।···

কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতা অবশ্য বিপ্লবীরা ক্ষমা করেননি। প্রায় পঁচিশ বছর পর তাকে এই দুষ্কার্যের জন্যে প্রাণ দিতে হয়েছিল।* কিন্তু একদিন প্রাণের বিনিময়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হলেও 'বিভীষণ' সেদিন যে ক্ষতি করেছিল, তা অপূরণীয়। এই বিশ্বাসঘাতকের কাছে খবর পেয়ে মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঐ দিনই পাঞ্জাব-গভর্ণমেণ্ট সৈন্যদের স্থানান্তরিত করা শুরু করল। পাঞ্জাব জুড়ে দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে ধর-পাকড় চলল। রাসবিহারী প্রমাদ গণলেন। তিনি লাহোর ছেড়ে বিনায়ক কাপ্‌লেকে সঙ্গে নিয়ে কাশীর দিকে চলে এলেন। শচীন সান্যাল ও কৈলাসপতিকে পাঠিয়ে দিলেন বাঙলায়।

রাসবিহারী ১৯১৫ সালের মার্চ মাসে এসেছিলেন কাশীর কেন্দ্রে; তারপর চলে এলেন কলকাতা। তাঁকে খুঁজে বার করার জন্যে ব্রিটিশ-সরকার জান্ কবুল করেছে। কিন্তু নানা ছদ্মবেশে এদেশ-ওদেশ, এজেলা-ওজেলা, এশহর-ওশহর, এবাড়ি-ওবাড়ি, এগলি-সেগলি ঘুরে বেড়ালেন বহুভাষী বিপ্লবী-যাদুকর রাসবিহারী। তাঁকে কেউ ধরতে পারল না। অবশেষে পালিয়ে গেলেন তিনি জাপানে, 'শানুকি-মারু' নামক জাপানী-জাহাজে উঠে। তারিখটি ছিল ১২ই মে। ঠাকুর-পরিবারের পি. এন. ঠাকুর এই ছদ্ম-পরিচয়ে ছিলেন তিনি ঐ জাপানগামী জাহাজের যাত্রী।···

* 'বাঙলায় বিপ্লববাদ' (পৃঃ ১৪৫)—দ্রষ্টব্য।

রাসবিহারীর অন্তর্ধান একটি চমকপ্রদ ঐতিহাসিক ঘটনা। যে-কাজ অসমাপ্ত রেখে তাঁর জাপান-যাত্রা সেদিন ঘটেছিল, তাকে সম্পূর্ণ করার চেষ্টায় ও সাধনায় তিনি সমস্ত জীবন কাটিয়ে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের সময় তাকে সত্যি সম্পূর্ণ করেছিলেন। নেতাজির হস্তে আপন কর্মভার তুলে দিয়ে মৃত্যুর পূর্বে কী তাঁর তৃপ্তিবোধ! যে-নদী পাহাড় কেটে আজন্মের শ্রমে ও তপস্যায় তিনি প্রবাহিত করেছিলেন, তার মহোত্তম মিলন ঘটল যেন বিপুল সমুদ্রকল্লোলে।

১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভারতে যেমন সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করা হয়, তেমনই কাবুলেও একটি বিদ্রোহ-ষড়যন্ত্র হয়। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, সুফী অম্বাপ্রসাদ, অজিত সিং প্রমুখ বিপ্লবী-নেতৃবৃন্দ কাবুলে একটি অস্থায়ী 'স্বাধীন ভারত সরকার' যে স্থাপিত করেছিলেন, তা ভারতের বিপ্লবীদের ভাল করেই জানা ছিল। উক্ত অস্থায়ী ভারত-গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকেও স্থির হয়েছিল যে, ১৯শে ফেব্রুয়ারি (প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারিই সম্ভবত) ভারতের সিপাহীরা বিদ্রোহ-ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পথে ব্রিটিশকে তাঁরাও সদলবলে আক্রমণ করবেন। কিন্তু ভারতের বিদ্রোহ-চেষ্টা অঙ্কুরেই ব্যর্থ হবার সংবাদ কাবুলেও পৌঁছে গেল। কাবুলের আমীর সে-সংবাদ পেয়েই প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করা স্থির করলেন। ব্যাপারটা আঁচ করে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও অজিত সিং কাবুল থেকে পালিয়ে যান। সুফী অম্বাপ্রসাদ ধরা পড়েন। কাবুলের কারাগারেই এই তেজোদীপ্ত পুরুষের মৃত্যু হয়। যে-দেশের জন্যে নানা দুঃখ ও নির্যাতন সয়ে এই বিপ্লবী-বীর একদিন বন্ধু-আত্মীয়বিহীন বিদেশী জেলের কঠিন ভূমিশয্যায় শুয়ে মৃত্যুকে বরণ করে শহিদ হলেন, সেই দেশ কোনকালে তাঁর কথা মনে করেছে কি ? সে-দেশের মানুষ স্বাধীনতালাভের পরে অন্তত কোন একদিন

কাবুলের সেই সেল্-এ ঢুকে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতায় তাঁর স্মরণে একটি প্রণাম রেখে এসেছে কি ?···

এদিকে কর্তার সিং ও হরনাম সিং রাসবিহারীর কাশীবাস কালেই তাঁর নির্দেশ মত কাবুলের দিকে যাচ্ছিলেন রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে যোগাযোগের আশায়। কিন্তু সীমান্ত অতিক্রম করার পূর্বেই কোন এক সেপাই-এর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে তাঁরাও ধরা পড়েন। কর্তার সিং-এর গ্রেপ্তারের পর পিঙ্লে লাহোর থেকে কাশী চলে আসার সময় মীরাটে অবতরণ করেন। উদ্দেশ্য ছিল সৈন্যদলের হালচাল বোঝা। সৈন্য-শিবিরে প্রবেশ করে তিনি বিপ্লবের বীজ ছড়াতে লাগলেন। কিন্তু একটি বিশ্বাসঘাতক সৈনিক তাঁকে আদর করে নিজেদের ব্যাপারে ডেকে এনে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এক বাক্স মারাত্মক বোমাসহ মহারাষ্ট্রীয় বীর বিষ্ণু গণেশ পিঙ্লে বন্দী হন। সেই অশুভ দিনটি হল ১৯১৫ সালের ২৩শে মার্চ।···

বহু বিশ্বস্ত কর্মী গ্রেপ্তার হলেন।···লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সূচনা এইখানে।···

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

কয়েকজন হিন্দু-মুসলমান সিপাহী বিশ্বাসঘাতকতা করায় শুধু কর্তার সিং, হরনাম সিং বা পিঙ্লেই ধরা পড়লেন না, পুলিশ তড়িংবেগে প্রায় ৬৪ জনকে গ্রেপ্তার করে ফেলল। অভূতপূর্ব এক বিরাট ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হল লাহোর সেন্ট্রাল জেলে। তারিখটা ছিল ১৯১৫ সালের ২৭শে এপ্রিল। মামলার আসামীদের সংখ্যা দাঁড়াল ৮০ জন। তন্মধ্যে ১৬ জন তখনও পলাতক। যুদ্ধকালীন মামলা,—সুতরাং ক্রিমিন্যাল্ কোড্-এর হেন ধারা নেই যাতে আসামীদের অভিযুক্ত না-করা হয়েছে। অবশ্য তন্মধ্যে সর্বপ্রধান

হল, ভারতবাসীদেরই কল্যাণে আইনসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠিত মহামান্য ব্রিটিশ-সম্রাটের সাম্রাজ্য উৎখাতকল্পে যুদ্ধ-প্রয়াস!

মামলা শুরু হল স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের কাছে। ১৩ই সেপ্টেম্বর রায় বেরুল। মহামান্য ব্রিটিশ-সরকারের বিচারকগণ ২৪ জনকে দিলেন ফাঁসির হুকুম এবং ২৬ জন পেলেন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ। বাকি যাঁরা রইলেন, তাঁদের তু'একজন মুক্তি পেলেও অধিকাংশই নানা ক্রমের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

বড়লাটের কাছে দরবার করা হল। তাঁর হুকুমে ১৭ জনের ফাঁসির দণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন দীপান্তরের সাজা মঞ্জুর হয়। যাঁরা সানন্দে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করার দণ্ড বরণ করে নিলেন তাঁদের নাম হল, —বিষ্ণু গণেশ পিঙ্‌লে, হরনাম সিং, কর্তার সিং, বক্সিশ সিং, সুরান সিং, সুরান সিং (দ্বিতীয়) এবং জগৎ সিং।

১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর এই সপ্তবীর লাহোর সেন্ট্রাল জেলের মৃত্যু-মঞ্চে শহিদ-তীর্থ রচনা করলেন। নিষ্ঠুর 'মৃত্যু' এই বীর্যবানদের তপস্যাস্নিগ্ধ দেশপ্রেমের বিভায় মৃত্যুহীন মাধুর্যে রূপায়িত হল।···যাঁরা আন্দামান বা ভারতের অন্যান্য কারাকক্ষের নির্মম বন্ধনে জীবন-যৌবন সমর্পণ করে নিজেদের নিঃশেষে বিলিয়ে দিচ্ছিলেন—তাঁদের আত্মদান সংগ্রামী-ভারতকে সেদিন নানা ব্যর্থতার মধ্যেও প্রচুর প্রত্যয় ও প্রেরণা যুগিয়েছিল।···

'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায়'ও রাসবিহারী বসুকে ফাঁসাবার আপ্রাণ চেষ্টা হয়েছিল। তাঁকে খুঁজে বার করার জন্যে সমগ্র ব্রিটিশ-শক্তি একান্ত তৎপর। কিন্তু বলা হয়েছে যে, ঐ একটি মানুষই সংঘবদ্ধ

বিরাট সাম্রাজ্য-শক্তির চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন সুদূর জাপানে।···

১৯১৫ সালের ১২ই মে ব্রিটিশ-গুপ্তচর-বিভাগের যে কঠিন পরাজয় ঘটেছিল তার পুনর্ঘটন হয়েছিল আর একবার, ছাব্বিশ বছর পরে, ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারি।···প্রথমবার ব্রিটিশ-রাজকে পরাজিত করেছিলেন মহানায়ক রাসবিহারী বসু ; দ্বিতীয়বার পরাজিত করলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। প্রথম-বিপ্লবের হোতা সংগ্রাম-মুখর জীবনের সায়াহ্নে দ্বিতীয়-বিপ্লবের নেতার হস্তে নিজের কর্মফল তুলে দিলেন বর্মার কূলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পটভূমে। পঞ্চাশ বছরের কর্মপ্রবাহ মহানায়ক রাসবিহারীর লালনে এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নায়কত্বে যে উত্তাল বন্যায় ভারতবর্ষকে আলোড়িত করেছিল ১৯৪১-'৪৫ সালে, তারই ফলশ্রুতি ইংরেজ-বিতাড়ন এবং ভারতের স্বাধীনতা-লাভ।

বিপ্লব থেকে বিপ্লবে ভারতবর্ষের উত্তরণ ১৯১৪-'১৫ সালের বিপ্লবী-নায়কদের কল্পনায় ছিল বলেই সেদিন যতীন্দ্রনাথ প্রাণ দিলেন, রাসবিহারী পলাতক হলেন।···

ব্যর্থ বিপ্লব সার্থক হল।

বালেশ্বর-যুদ্ধ

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বাঙলার বিপ্লবীরা প্রস্তুত। শুধু অস্ত্র-বোঝাই জার্মান্ জাহাজের আসার অপেক্ষা। যাঁরা রায়মঙ্গলের কূলে বসে আছেন, তাঁদের মানস-চোখে নীল-সমুদ্রের অগুণতি উচ্ছল ঢেউ। তারা ভাবছেন, ঐ বুঝি 'ম্যাভারিক্' জাহাজের মাস্তুল দেখা যায়!···

৩রা জুলাই ব্যাংকক্-আগত কুমুদনাথ মুখার্জি নামক এক ভদ্রলোক গদর-দলের প্রখ্যাত বিপ্লবী আত্মারামের কাছ থেকে একটি সংবাদ যাদুবাবুদের পৌঁছে দেন। সংবাদ হল যে, শ্যামের জার্মান্-কন্সাল্ হেল্ফেরিখ্ আপাতত একটি 'বোটে' পাঁচ হাজার রাইফেল্,

প্রয়োজনীয় বুলেট্ ও একলক্ষ টাকা রায়মঙ্গলে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু বিপ্লবীরা কুমুদনাথকে ব্যাটাভিয়া পৌঁছে জার্মান্-কন্সাল্‌কে পূর্ব ব্যবস্থা মত অধিকতর পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র এবং টাকা পাঠাবার জন্যে অনুরোধ করতে বলে দিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে কুমুদনাথ (সম্ভবতঃ তিনি ব্যাংককে ওকালতি করতেন) যথাস্থানে পৌঁছে যাবার পথেই জানতে পারলেন যে, জাভার কাছে 'ম্যাভারিক' জাহাজ ধরা পড়ে গেছে। সেটা জুলাই মাসের শেষের দিক। সংবাদটি তিনি যাদুবাবুর কাছে কোনভাবে পাঠিয়ে দিলেন।···এ-সংবাদ থেকে বোঝা গেল যে, পুলিশ ষড়যন্ত্রের খবর জেনে গেছে। তাই যাদুবাবুদের বন্ধু ও বিশ্বস্ত বিপ্লবী ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় জার্মান্-কন্সাল্ হেল্‌ফেরিখকে ১৩ই আগস্ট জাভার ঠিকানায় টেলিগ্রাম করে সাবধান-বাণী পাঠালেন। ১৫ই আগস্ট নরেন ভট্টাচার্য নিজে চলে গেলেন ব্যাটাভিয়ায় কন্সাল্-এর সঙ্গে যথাকর্তব্য স্থির করতে। যতীন্দ্রনাথ আরও কিছু বিশদ সন্ধান নেবার জন্যে ভূপতি মজুমদারকে পাঠালেন। কিন্তু সিঙ্গাপুরে জাহাজ পৌঁছলে জাহাজেই মজুমদার মহাশয় গ্রেপ্তার হন। ভূপতিবাবুর উক্তি: "ষড়যন্ত্রের কথা ব্রিটিশ-সরকার সবই জেনেছিল, এবং জাল বিছিয়ে রেখেছিল। আমরা গিয়ে সেই জালে ধরা পড়েছি মাত্র।"

পুলিশ অনেক কিছু খবরই জেনে ফেলেছে। জেনে ফেলেছে যে, ঐ 'হ্যারি এণ্ড্ সন্স্' মোটেই ব্যবসা-সংক্রান্ত আপিস নয়, ওটা বিপ্লবীদের 'পোস্ট্ বক্স্'—বিদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে দেশের বিপ্লবীদের যোগাযোগ রক্ষার কেন্দ্র মাত্র। 'সিডিশান্ কমিটি'র রিপোর্ট হল:

"On the 7th August the police, on information received, searched the premises of 'Harry & Sons' and effected some arrests." ('S. C. Report', P.—83)

[৭ই আগস্ট পুলিশ খবর পেয়ে 'হ্যারি এণ্ড সন্স্' তল্লাশি করে কতিপয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে।]

'হ্যারি এণ্ড সন্স্'-এর মালিক প্রখ্যাত বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্তি। তল্লাশি করে পুলিশ হরিবাবু ও তাঁর ভাইকে আটক করল। সেখানে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়ের নামে একখানা চিঠি (কারো মতে চেক্) এবং আরও কিছু কাগজপত্র পুলিশ খুঁজে পায়। এসব কাগজপত্রের উপর নির্ভর করেই পুলিশ বালেশ্বরে 'ইউনিভার্স্যাল্ এম্পোরিয়াম্‌টি' আবিষ্কার করে। 'সিডিশান্ কমিটি'র রিপোর্টে পাওয়া যায় :

"On the 4th of September the 'Universal Emporium' at Balasore, a branch of 'Harry & Sons' was searched, as also a revolutionary retreat at Kaptipada 20 miles distant, where a map of Sunderbans was found together with a cutting from Penang paper about the 'Maverick'. Eventually a gang of five Bengalis was rounded up, and in the fight which ensued Jatin Mukherji, the leader, and Chittapriya Roy-Chowdhuri, the murderer of Inspector Suresh Chandra Mukherji, were killed."

('S. C. Report', P.—83)

[৪ঠা সেপ্টেম্বর 'হ্যারি এণ্ড্ সন্স্'-এর শাখা-আপিস বালেশ্বরের 'ইউনিভার্স্যাল এম্পোরিয়াম্' সার্চ করা হয়। তাছাড়া (বালেশ্বর শহর থেকে) ২০ মাইল দূরে 'কপ্তিপদা' গ্রামে বিপ্লবীদের একটি আস্তানা তল্লাশি করে একখানা সুন্দরবন-অঞ্চলের মানচিত্র এবং পেনাঙ্-এর একটি সংবাদপত্রের কাটিং পাওয়া যায়। এই 'কাটিং'-এ 'ম্যাভারিক্' সম্পর্কে সংবাদ ছিল। এসব সূত্র ধরেই পরিশেষে দলবদ্ধ পাঁচটি বাঙালীকে ঘেরাও করা হলে একটি সংঘর্ষ বাধে। সেই সংঘর্ষে তাদের নেতা যতীন মুখার্জি ও চিত্তপ্রিয় রায়-চৌধুরীর মৃত্যু হয়। চিত্তপ্রিয় ইতিপূর্বে কলকাতায় পুলিশ-ইন্সপেক্টর সুরেশচন্দ্র মুখার্জিকে হত্যা করে এসেছেন।]

'ইউনিভার্স্যাল এম্পোরিয়াম্' তল্লাশিকালেই 'কপ্তিপদা'র আস্তানা পুলিশের খোঁজে এল। সুতরাং ও-আস্তানা পুলিশ ঘেরাও করল। এদিকে বিপ্লবীরাও পূর্বাহ্ণেই পুলিশের গন্ধ পেয়েছেন। পুলিশ তাই কাউকে সেখানে দেখল না। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সতীর্থগণ পলায়ন করেছেন।···

যতীন্দ্রনাথও ভবিষ্যতে সফলতর বিপ্লব ঘটানর জন্যে পালিয়ে অপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি দেখলেন, বিপ্লব আপাতত ব্যর্থ হয়েছে। বিরাট ষড়যন্ত্র সকলের অজ্ঞাতে সংঘটিত হয়ে সহসা ফেঁসে গেছে। জাতির সম্মুখে তুলে ধরার মত আদর্শ ও প্রত্যয় কিছু না রেখে গেলে এই ব্যর্থতা দেশকে বহুদূর পিছিয়ে দেবে, বিপ্লবীদের মনে অবসন্নতা আসবে। কতিপয় লোকের নীচতা ও দুর্বল রুচি এই বিশ্বাসঘাতকতার মূলে। বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত এ-বিপ্লব ব্যর্থ হত না। কাজেই, জাতির এই কলঙ্ক অতিক্রম করে এক বলিষ্ঠ কীর্তি স্থাপন করা চাই, যাতে সকল নিরাশা দূর হবে।···

চিত্তপ্রিয় রায়-চৌধুরী, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল সহ যতীন্দ্রনাথ বুড়াবালামের তীরে গোবিন্দপুর গাঁয়ে এসেছেন। ভাদ্র মাসের ভরা নদী পার হয়ে বনের দিকে পথ চলতেই গাঁয়ের লোকেরা সন্দেহ করল। কারণ, দেশে দেশে, শহরে ও গ্রামে পুলিশ ঢোল সহযোগে জানিয়ে দিয়েছে যে, কতগুলো জার্মান্ ও দেশী ডাকাত গোপনে ঘুরে বেড়াচ্ছে গৃহস্থদের ঘরে ডাকাতি বা রাহাজানি করার মতলবে।···

গ্রামের লোকেরা যতীন্দ্রনাথদের পেছন নিল। তারা নানা প্রশ্ন করে বিপ্লবীদের বিরক্ত করে তুলল। ভিড় ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। তাদের মধ্যে পুলিশের লোকও জুটে গেছে। বিপ্লবীরা তবু জোর কদমে পথ চলছেন। ছদ্মবেশী পুলিশের লোকদের প্ররোচনায় কিছু

লোক বিপ্লবীদের ধাওয়া করাতে তাঁরা গুলি ছুঁড়লেন। লোকগুলো তখন পালাল।

চাষখন্দের কাছে বিপ্লবীরা সাঁতরে আবার নদী পার হলেন। একটা উইয়ের ঢিবির পাশে এসে তাঁরা পাঁচজনে বসেছেন। ক্ষুধায় ও পথ-চলার শ্রান্তিতে সবাই কাতর।

ইতিমধ্যে টেগার্ট্ প্রমুখ পুলিশ-কর্তাদের নেতৃত্বে জনতা সহ পুলিশ-বাহিনী তাঁদের দু'দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। তারপর শুরু হয়ে গেল সংঘর্ষ। অমিত বীর্যে পঞ্চবীর ঘণ্টার পর ঘণ্টা অসম-যুদ্ধ করে গেলেন। তারিখ হল ১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর। ভারতের শৌর্য বুড়ীবালামের তীরে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হল। চিত্তপ্রিয় রায়-চৌধুরী সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। যতীন্দ্রনাথ মারাত্মক জখম হলেন। শ্বেত-পতাকা দেখালেন বীরবৃন্দ। যুদ্ধবন্দী হলেন তাঁরা। পরদিন ১০ই সেপ্টেম্বর ভোর ৫টায় মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ দেহরক্ষা করলেন বালেশ্বর হাসপাতালে।...

অতঃপর যথারীতি বিচার করে ব্রিটিশ-সরকার মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন দাশগুপ্তের ফাঁসির হুকুম দিল, এবং জ্যোতিষ পালকে ১৪ বছরের জন্যে আন্দামান পাঠাবার ব্যবস্থা করল।

বালেশ্বর জেলে ১৯১৫ সালের ২২শে নভেম্বর মনোরঞ্জন ও নীরেন স্মিতহাস্যে ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করলেন।

জ্যোতিষ কিছুদিন আন্দামান বাসের পর অসুস্থতার জন্যে বহরমপুর জেলে আনীত হন। জেলের দুঃখে-কষ্টে ও অ-চিকিৎসায় নির্জন সেলে জ্যোতিষও শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন, ১৯২৪ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর।

বাঙলার পঞ্চবীরের শৌর্যময় জীবন এইভাবে দেশমাতৃকার পূজা-বেদীতলে অর্পিত হল।...শহিদ-তীর্থ বুড়ীবালামের তীর। সেই

তীর্থের মহা-তীর্থঙ্কর যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাথী-চতুষ্টয়। তাঁদের কীর্তির তুলনা নেই।

বিশ্বাসঘাতকতা

কে বা কা'রা করেছে ?

এবার প্রশ্ন হল 'ভারত-জার্মান্ ষড়যন্ত্র' ফাঁস হল কি করে ? লাহোরে কৃপাল সিংকে আমরা পাচ্ছি একনম্বর 'বিভীষণ' রূপে। অবশ্য সে যতটুকু জানত তাতে পাঞ্জাবের সিপাইদের বিদ্রোহের তারিখ ফাঁস হতে পারে—কিন্তু 'ম্যাভারিক্' জাহাজ ধরা পড়া, 'হ্যারি এণ্ড সন্স্' তল্লাশি করা ইত্যাদি ব্যাপারে তার কোন সাহায্য পুলিশ পেতে পারে না। কারণ, সামান্য সিপাহী কৃপাল সিং—ষড়যন্ত্রের গোপন কথা কতটুকুই-বা তার জানা সম্ভব ?

এখানে যাতুগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উক্তি উল্লেখ করা চলে : "ওদিকে আমেরিকায় চেকোশ্লোভাকিয়ার দেশপ্রেমিকরা ভারতীয় দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ফেলেছিল। স্বাধীনতাকামী পরদেশীদের পরস্পরে ভাব হওয়া স্বাভাবিক। তারা কোনক্রমে ঘুণাক্ষরে জানতে পারে ভারতে সশস্ত্র-অভ্যুত্থান হবে। তারা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য ফরাসী ও রুশের মুখাপেক্ষী ছিল। অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি তাদের তখন দাবিয়ে রেখেছিল। তারা ফরাসী বৈদেশিক গুপ্তচর-বিভাগকে খবরটা পেঁাছে দেয়। ফরাসীরা সেই খবর বিলেতের গুপ্তচর-বিভাগকে জানায়। এরা তো বন্ধু, এবং একই পাপের পাপী ! সাম্রাজ্যবাদী।" ('বিঃ জীঃ স্মঃ',—পৃঃ ৩৮৮-৮৯)

যাতুবাবুর লেখা থেকে বোঝা গেল মূল গলদ কোথায়। ভারতীয়-বিপ্লবীদের সঙ্গে চেকোশ্লোভাকিয়ার বিপ্লবীদের ঐকাত্ম্যবোধ স্বাভাবিক। কারণ, উভয়ের স্বদেশই পরাধীন এবং পরনির্যাতনে বিপন্ন। কিন্তু ভারতের মিত্র এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার মিত্র আবার পরস্পরের শত্রু। সে-ক্ষেত্রে ভারতীয়-বিপ্লবীদের কেউ যদি চেকোশ্লোভাকিয়ান্

কোন বিপ্লবীকে অধিক বিশ্বাস করে সত্যি কোন গুহ্য কথা প্রকাশ করে থাকেন, তবে সেটা বৈপ্লবিক-নীতি অনুসারে মারাত্মক ভুল হয়েছে। অধিকন্তু, কোন চেকোশ্লোভাকিয়ান্ বিপ্লবী যদি ফরাসী গুপ্ত-পুলিশের কানে সেই গুহ্য কথা তুলে থাকেন, তবে তাঁর পক্ষে সেটা হয়েছে অজ্ঞাতে বিশ্বাসঘাতকতা। ফরাসীর কাছ থেকে ভারত-জার্মান্ ষড়যন্ত্রের সংবাদ পেয়েই শুধু ইংরেজ নয়, সমগ্র মিত্রশক্তিই একত্রিত হয়ে উক্ত ষড়যন্ত্র-উদ্ঘাটনে লেগে গেল। ফলে শ্যাম, চীন এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় জার্মানির 'ইণ্ডো-জার্মান্' ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাওয়ার প্ল্যান্ বা চেষ্টা ব্যর্থ হল।

এছাড়া আর একটি ব্যক্তি কুমুদনাথ মুখার্জি। ব্যাংকক থেকে ছুটে এসে তিনি যাদুবাবুদের কাছে গুপ্ত সংবাদ পরিবেশন করেছিলেন, এবং ব্যাংককে ফিরে যাবার সময় পথ থেকেই 'ম্যাভারিক্'-এর ধরা পড়ার কথাও তাঁদের জানিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে নলিনীকিশোর গুহ মহাশয় লিখেছেন ঃ "এই কুমুদনাথই ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষকে জাহাজ সম্পর্কিত যাবতীয় সংবাদ সরবরাহ করেন। এই জুলাই মাসেই (কুমুদ ৩রা জুলাই যাদুবাবুদের সঙ্গে দেখা করেন) গভর্ণমেণ্ট জার্মান্-অস্ত্র গ্রহণের উদ্যমের বিষয়ে সব জানিতে পারেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করিয়া ফেলেন।"···

('বাংলায় বিপ্লববাদ',—পৃঃ ১৫১)

আরো এক ব্যক্তির কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর নাম অবনী মুখার্জি। বিদেশে প্রবাসী বিপ্লবীদের মধ্যে তাঁর খ্যাতিও সামান্য নয়। আবার অখ্যাতিও আছে প্রচুর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি জাপানে ছিলেন। ইণ্ডো-জার্মান্ ষড়যন্ত্রে (রাসবিহারী বসুর জাপানে পালিয়ে যাবার ব্যাপারে) তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯১৫ সালে রেঙ্গুনে তাঁকে আটক করে পরে সিঙ্গাপুরে পাঠান হয়। প্রখ্যাত বিপ্লবী ভূপতি মজুমদারও তৎকালে সিঙ্গাপুরে বন্দী। তাঁর বিবৃতি থেকে পাওয়া যায় ঃ "অবনী জার্মানি থেকে ঘুরে এসে বৃন্দাবনে

প্রেম মহাবিদ্যালয়ে চাকরি নেয়। লড়াইয়ের সময় (১৯১৪-'১৮) সে জাপানে ছিল, এবং 'Indo-German Conspiracy'-তে রাসবিহারী বসুর ট্যাগোর টাচ্-টা থাকায় সংশ্লিষ্ট হয়। রেঙ্গুনে আটক হয়ে পরে সিঙ্গাপুর যায় ১৯১৫ সালে। সেখানে স্বীকারোক্তি করে ও 'on parole prisoner' হিসাবে কুমুদ মুখুজ্যের সঙ্গে ফোর্ট-এর এক ঘরে থাকত। ১৯১৬ সালের গোড়ায় আমার মকদ্দমার তদন্তের সময় পুলিশ-সাহায্যে আমাকে 'পাম্প' করবার জন্যে সে আহূত হয়।"

('বি: জীঃ স্মঃ',—পৃঃ ৪৬৬)

ইণ্ডো-জার্মান্ ষড়যন্ত্র-সৌধের সুদৃঢ় প্রাচীর থেকে কয়েকখানা প্রস্তর 'বিভীষণ'দের মাধ্যমে ব্রিটিশ-শক্তি খুলে ফেলল। তাই গোপন কক্ষে যে-সব তথ্য লুকিয়ে ছিল তা দিনের আলোয় প্রকাশিত হল। সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল।···

বালেশ্বর-যুদ্ধের পর

বিপ্লব ব্যর্থ হলেও যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ পঞ্চবীরের অপূর্ব সাহসে দীপ্ত যুদ্ধদান এবং যতীন-চিত্তপ্রিয়-নীরেন-মনোরঞ্জনের আত্মবিলয়ন ও জ্যোতিষচন্দ্রের আন্দামান সেলুলার জেলে অকথ্য নির্যাতনে ক্লিষ্ট বন্দী-জীবন দেশবাসীর মনের রঙ্‌কে শৌর্যের রঙে রঙিন করে দিল। তাঁরা এখন সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দানের স্বপ্নে বিভোর।

বালেশ্বর-যুদ্ধ সমাপ্ত। ম্যাভারিক্ জাহাজের অস্ত্রশস্ত্র নিখোঁজ। বহু বন্ধু-বান্ধব ও একনিষ্ঠ সতীর্থ বাঙলায়, ভারতে ও বিদেশে বন্দী। বহু বিপ্লবী ফাঁসি বা কোর্টমার্শালের অপেক্ষায় কাল গুণছেন। কিন্তু তথাপি যাঁরা তখনো বাইরে আছেন, তাঁদের চেষ্টার বিরাম নেই।···

এদিকে নরেন্দ্রনাথের (মার্টিন) খোঁজ কেউ পাচ্ছেন না। ভোলানাথ চ্যাটার্জি (ওরফে বি. চ্যাটারটন্) গোয়া থেকে ২৭শে

ডিসেম্বর (১৯১৫) মার্টিনকে (নরেন্দ্রনাথ) তাঁর ব্যাটাভিয়ার ঠিকানায় একটি তার করেন : "How doing—no news, very anxious. B. Chatterton." ('S. C. R.' P.—83)

[কেমন আছ—কোন সংবাদ নেই; বড়ই চিন্তিত। বি. চ্যাটারটন্।]

পুলিশ উক্ত টেলিগ্রামখানা হস্তগত করেই গোয়াতে খোঁজখবর নিয়ে দু'জন বাঙালী যুবককে গ্রেপ্তার করে। তাঁদেরই একজন হলেন ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়। 'সিডিশান্ কমিটি'র রিপোর্টে আছে : "This led to enquiries in Goa and two Bengalis were found, one of whom proved to be Bholanath Chatterji. He committed suicide in the Poona Jail on the 27th January, 1916." ('S. C. R.' P.—83-84)

ভোলানাথ পুণা জেলে ১৯১৬ সালের ২৭শে জানুয়ারি আত্মহত্যা করলেন। পুলিশের রিপোর্ট তাই। আজ থেকে ৫৩ বছর পূর্বেকার ব্রিটিশ-জেল—তাও তার অবস্থান বাঙলাদেশ থেকে বহু দূরে। সেখানকার কারাকক্ষের অন্তরালে আত্মীয়বন্ধুহীন একটি বাঙালী তরুণের কিভাবে মৃত্যু হতে পারে, তা অনুমান করা কঠিন নয়। তাঁর মৃত্যুর কারণ দেশবাসী জানে না। জানবার উপায়ও নেই। রোগে বা নির্যাতনে, পুলিশের 'থার্ড্ ডিগ্রি' মেথড্-এ বাঙলা, আন্দামান বা ভারতের নানা জেলে বন্দীর মৃত্যু কোন আকস্মিক ঘটনা নয়।··· প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতা ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত অধুনালুপ্ত 'স্বাধীনতা' সাপ্তাহিকের ২৬শে ডিসেম্বরের (১৯২৯) সংখ্যায় লিখেছিলেন : "এই পুলিশ-কর্মচারীটি (উক্ত ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বোম্বাই-এর জনৈক পুলিশ-কর্মচারী) অনুমান করে যে, ভোলানাথের উপর অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছিল এবং পাছে অত্যাচারে ভাঙিয়া পড়ার ফলে

দেশের কোনরূপ অনিষ্ট সাধন তাঁহার দ্বারা হয়, ইহাই ভাবিয়া তিনি পরিধেয় বস্ত্র গলায় লাগাইয়া আত্মহত্যা করেন।···যাহা হউক, সে-গবেষণা করিয়া আজ আর লাভ নাই। বিপ্লবীর এই জীবন, বিপ্লবীর এই মৃত্যু।" ('স্বাধীনতা', সাপ্তাহিক, ২৬. ১২. ২৯)

বিপ্লবীর পক্ষে সে-গবেষণা করার সত্যি প্রয়োজন নেই। কিন্তু দেশবাসী নিশ্চয়ই সে-গবেষণা করবে। ভোলানাথ চ্যাটার্জির মত শক্ত মানুষ, আদর্শ বিপ্লবী 'আত্মহত্যা' করেছেন বলে দেশবাসী সহজে মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। পুলিশ-কর্মচারীটির প্রত্যক্ষদর্শন থেকে জানা যায় যে, ভোলানাথের উপর দস্যুর জিঘাংসায় অত্যাচার করা হয়; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ অফিসারটির কল্পনাপ্রসূত। দেশের মানুষ তাই যুক্তিসঙ্গতভাবেই স্থির করবে যে, ইংরেজের পুলিশ বেটন্-এর দাপটে তাঁকে মৃত্যুর দ্বার পর্যন্ত পেঁাছে দিয়েছিল। তারপর এক লহমায় মৃত্যুদূত এসে তাঁকে মৃত্যুহীন জগতে তুলে নিয়েছিলেন। এ মৃত্যু তাই আত্মহত্যা নয়, ইংরেজ-শাসক প্রদত্ত মৃত্যু। এ মৃত্যুতে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় শহিদের বিভায় বিভান্বিত।···

'ম্যাভারিক্' জাহাজটি প্রকৃতপক্ষে কোন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসেনি। ওটা আদপে ছিল 'স্ট্যাণ্ডার্ড্ অয়েল কোম্পানি'র একটি তৈলবাহী জাহাজ। একটি জার্মান্ ফার্ম ওটা কিনে নেয়। জাহাজটি কোন মালপত্র না-নিয়েই রওনা হয়। জাহাজের নাবিক ছিল অধিকাংশই ভারতীয়। তাছাড়া বিপ্লবী হরি সিং এবং গদর-দলের আরো লোক বহু বিদ্রোহাত্মক প্যাম্ফ্লেট্ সহ জাহাজের যাত্রী ছিলেন। কথা ছিল 'ম্যাভারিক্' যথানির্দিষ্ট স্থানে 'এ্যানোলার্সেন' নামক জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র তুলে নেবে। কিন্তু উক্ত জাহাজটির সঙ্গে 'ম্যাভারিক্'-এর কোথাও দেখা হল না। 'ম্যাভারিক্' এইভাবে কয়েক সপ্তাহ ঘুরে-ফিরে জাভা এসে উপস্থিত হয়। 'ম্যাভারিক্'-এ মালপত্র কিছু না

থাকলেও তার অভিসন্ধি মিত্রশক্তি জেনেছিল। সুতরাং জার্মান্-কন্সাল্ হেল্‌ফেরিখ্ ভারতীয় নাবিকদের ব্রিটিশের হাত থেকে বাঁচাবার অভিপ্রায়ে জাহাজটিকে আমেরিকার হাতে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। 'ম্যাভারিক্' আমেরিকায় ফিরে চলল। হরি সিং-এর নাম নিয়ে মার্টিন (নরেন ভট্টাচার্য) ঐ জাহাজের যাত্রী হন। হরি সিং ব্যাটাভিয়ায় থেকে যান। নরেন্দ্রনাথ অবশ্য আমেরিকায় পৌঁছলে পর গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। পরে খালাস পেয়ে একসময়ে 'মানবেন্দ্রনাথ' নামটি গ্রহণ করেন। তাঁর এই নামকরণের মূলে নাকি প্রখ্যাত লেখক ও বিপ্লবী ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়। মানবেন্দ্রনাথই উত্তরকালের পৃথিবীবিদিত মিঃ এম্. এন্. রায়।

আর একটি জাহাজের নাম 'হেন্‌রি এস্'। ম্যানিলা থেকে জার্মান্ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এ-জাহাজের সাংহাই অভিমুখে যাত্রা করার কথা ছিল। গদর-দলের হেরম্ব গুপ্ত শিকাগো থেকে ম্যানিলায় খবর পাঠালেন বোহেম্ নামক এক ব্যক্তিকে 'হেন্‌রি এস্' জাহাজে আরোহী হবার জন্যে। বোহেম্ ও ওয়েদি ছিলেন জার্মান্-আমেরিকান্। ম্যানিলার জার্মান্-কন্সাল্‌ও বোহেম্‌কে নির্দেশ দেন ৫০০টি রিভল্‌বার ব্যাংককে নামিয়ে দিয়ে, বাকি ৪,৫০০টি (রিভল্‌বার) চট্টগ্রামে নিয়ে যেতে। এ-রিভল্‌বারগুলো আদপে ছিল 'মাউজার' পিস্তল। কারণ, রাইফেল্-এর মত ব্যবহার করার সরঞ্জাম ওদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বোহেম্-এর উপর আরো একটি দায়িত্ব ছিল যে, শ্যাম-ব্রহ্ম সীমান্তে ভারত-আক্রমণের জন্যে তিনি বিদ্রোহীদের অস্ত্রশিক্ষা দেবেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ব্যাটাভিয়া যাবার পথেই সিঙাপুরে বোহেম্ ধরা পড়েন। ধরা পড়েন জাহাজের আরো কিছু ব্যক্তি। তাঁদের শিকাগো শহরে নিয়ে যাওয়া হয়। বোহেম্, ওয়েদি ও হেরম্বলাল গুপ্ত 'জার্মান্-ভারত ষড়যন্ত্রে'র দায়ে শিকাগো-আদালতে অভিযুক্ত হয়ে কারাদণ্ড লাভ করেন।...

'ম্যাভারিক্' ও 'হেন্‌রি এস্' নামক জাহাজদ্বয়ের মাধ্যমে জার্মান্-অস্ত্র আনার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, বিপ্লবের নায়ক যতীন্দ্রনাথ মৃত্যুবরণ করেছেন, ফাঁসির মঞ্চে ও কারা-কক্ষে বহু বিপ্লবীর কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়েছে —তবু যাঁরা বাইরে আছেন তাঁদের কর্ম-চেষ্টা শান্ত হয়নি, জার্মান-কন্সাল্ হেল্‌ফেরিখ্-এর সাহায্যে অস্ত্র-প্রেরণের চেষ্টাও থেমে যায়নি।

'ম্যাভারিক্'-বিপর্যয়ের পর হেল্‌ফেরিখ্-এর মাধ্যমে বাঙলায় অস্ত্র-প্রেরণের আরো চেষ্টা দেখা যায়। ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরের শেষাশেষি একখানা জাহাজ সাংহাই থেকে বরাবর 'হাতিয়া' (সন্দীপ) এসে পৌঁছবে বলে কথা হয়। আরো কথা হয় যে, ডাচ্-বন্দর থেকে একটি মালবাহী জাহাজও বাঙলায় আসবে। অধিকন্তু, একটি জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র-বোঝাই হয়ে আন্দামানের দিকে এসে পোর্টব্লেয়ার আক্রমণ করবে। আক্রমণকালে বিপ্লবীরা জেল ভেঙে কয়েদীদের মুক্ত করে তাদেরসহ রেঙ্গুন পৌঁছে শহর অবরোধ করবেন—এরূপ প্ল্যানও নেওয়া হয়েছিল।...

মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯১৫ সালের মে মাসেই রাসবিহারী বসু জাপানে অবতরণ করেন। সাংহাইতে তিনি জুন-জুলাই মাস থাকেন। তৎকালে শ্যাম ও বর্মা ফ্রন্টের ভারতীয়-বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। অক্টোবর মাসেই সাংহাই-পুলিশ দু'জন চীনাকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছে পাওয়া যায় ১২৯টি পিস্তল এবং ২০,৮৩০ রাউণ্ড কার্তুজ। পুলিশ উক্ত চীনাদের কাছ থেকেই উদ্ধার করল যে, এসব কাজের জন্যে তারা 'নিল্‌সেন' নামক এক জার্মান কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছে। নিল্‌সেনের ঠিকানাও তারা দিল। তাদের কাছ থেকে আরো জানা গেল যে, কলকাতায় অমরেন্দ্র চ্যাটার্জি, শ্রমজীবী-সংঘ—এই ঠিকানায় অস্ত্রশস্ত্র পৌঁছে দেবার নির্দেশ তাদের রয়েছে। 'অমরেন্দ্র' হলেন বাঙলার প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতা অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তৎকালে তিনি চন্দননগরে পলাতক ছিলেন।

এদিকে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই অবনী মুখার্জি জাপান থেকে ভারতের পথে সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর কাছে পাওয়া গেল একটি সর্বনাশা নোটবুক।···

এখানে 'সিডিশান্ কমিটি'র রিপোর্টের উক্তি লক্ষণীয় ঃ

"There is reason to believe that this or a similar plot was hatched in consultation with Rash Behari Basu, who was then living in Nielsen's house, for pistols which Rash Behari wished to send to India were obtained by a Chinaman from the Mai Tah dispensary, 108, Chao Tung Road (Shanghai), which was one of Nielsen's addresses recorded in the note-book. Another revolutionary who lived in the same house was Abinash Roy. He had been concerned in Shanghai in German Schemes for sending arms to India and asked Abani to give a message to Mati Lal Roy at Chandannagore, saying everything was all right and they must devise some means by which Roy could be got safely into India. Abani's note-book contained the addresses of Mati Lal Roy and several other known revolutionaries of Chandannagore, Calcutta, Dacca and Comilla. Among other addresses was that of Amar Singh, engineer, Pakoh, Siam, the place in which it had been arranged that some of the arms on the 'Henry S' should be concealed. Amar Singh was sentenced to death at Mandalay and hanged."

('Sedition Committee Report,' P.—85)

[উল্লিখিত পিস্তল-পাঠানর ষড়যন্ত্র অথবা অনুরূপ কোন ষড়যন্ত্র রাসবিহারী বসুর সঙ্গে পরামর্শ করেই যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা বিশ্বাস করার কারণ আছে। রাসবিহারী তৎকালে নিল্‌সেন্‌-এর গৃহে বাস করতেন। রাসবিহারীর ইচ্ছানুসারে যে-সব পিস্তল ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেগুলো একটি চীনার মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। সংগ্রহের স্থল ছিল 'মাই টা ডিস্পেন্সারি'। তার ঠিকানা—১০৮ নং চাও টুঙ্‌ রোড্‌, সাংহাই। নিল্‌সেন্‌-এর কয়েকটি ঠিকানার মধ্যে এই ঠিকানাটিও অবনী মুখার্জির নোটবুকে লেখা ছিল। ঐ একই গৃহে অবিনাশ রায় নামে একজন বিপ্লবীও থাকতেন। সাংহাই থেকে জার্মান্‌-অস্ত্রশস্ত্র ভারতে পাঠানর ব্যাপারের সঙ্গে রাসবিহারী যুক্ত ছিলেন। অবনী মুখার্জির মারফৎ চন্দননগরের মতিলাল রায়কে তিনি কিছু গোপন সংবাদ এবং অবিনাশকে নিরাপদে গ্রহণ করার নির্দেশ প্রেরণ করেন। অবনীর নোটখাতায় মতিলাল রায় এবং চন্দননগর, কলকাতা, ঢাকা ও কুমিল্লার কিছু পুলিশ-জানিত বিপ্লবীর ঠিকানা ছিল। আরো একটি ঠিকানা ছিল অমর সিং-এর। অমর সিং ছিলেন 'পাকো' অঞ্চলের (শ্যাম) ইঞ্জিনিয়ার। কথা ছিল 'হেন্‌রি এস্‌' জাহাজে ভারতের জন্যে আনীত অস্ত্রশস্ত্র থেকে কিছু অস্ত্র এই 'পাকো'তেই আলাদা করে লুকিয়ে রাখার। অমর সিং (পরিশেষে) মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁকে মান্দালয় জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়।]

সুতরাং বিপ্লব সর্বদিক থেকে ব্যর্থ হতে থাকলেও রাসবিহারী এবং অন্যান্য বিপ্লবীরা প্রবাসে ও স্বদেশে শেষ অবধি একটা কিছু করার আবেগে সনিষ্ঠায় কর্মব্যাপৃত ছিলেন। রাসবিহারী বসু সাংহাই থেকে ভারতে অস্ত্র-প্রেরণের যে চেষ্টা করেছিলেন, অবনী মুখার্জিকে এই উদ্দেশ্যে যাবতীয় নির্দেশ ও যথা-প্রয়োজন ঠিকানাপত্র দিয়ে তিনি যে পাঠিয়েছিলেন, এবং এইসব প্রসঙ্গে জার্মান্‌-সরকারের সঙ্গেও তিনি যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন, তা অনুধাবন করা কষ্টকর নয়। কিন্তু অবনী মুখার্জির সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার এবং তাঁর কাছে প্রাপ্ত

ঐ সর্বনাশা নোটবুকই সমস্ত পণ্ড করে দিল। জার্মান্-অস্ত্র আমদানি করে ভারতবর্ষে বিপ্লব ঘটাবার দ্বিতীয়বারের চেষ্টা স্বপ্নালীন হয়ে রইল।

"দিন সূর্য অস্ত গেল
সন্ধ্যার চিতায়!"...

কিন্তু তথাকথিত 'ইন্‌করিজিবল্‌' বিপ্লবীর তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। অন্ধকার 'ডান্‌জেন্‌'-এ বসেও তাঁরা প্রভাত-সূর্যের স্বপ্ন দেখেন। তাঁরা পরম প্রত্যয়ে শুধান ঃ

"রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?"...

এই অনাহত প্রত্যয়ের পশ্চাতে রয়েছে '**অমর সিং**'দের মত শহিদ। যাঁরা দেশে ও দেশান্তরে মৃত্যু দিয়ে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার বাণী ছড়িয়ে গেছেন। শহিদ-বাণী মর্মতলে ধারণ করেই বিপ্লবী আবার শুধান ঃ

"মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?"...

॥ এগার ॥

দেশ-বিদেশে কতিপয় মহিয়সী বিপ্লবিনী ও মহান বিপ্লবী-নায়ক

মহীয়সী বিপ্লবিনী

ভারতবর্ষের বিপ্লব-কাণ্ড কোনকালেই শুধু ভারতভূমিতে সীমাবদ্ধ ছিল না। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতীয়-বিপ্লবের ইতিহাস ছড়িয়ে ছিল ইউরোপ-আমেরিকা-মিডল্‌ইস্ট্‌-আফগানিস্তান এবং চীন-জাপান-বর্মা তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানাস্থানে। নির্বাসিত বিপ্লবী ও প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের বিপ্লব-কর্মের অবদান অবিস্মরণীয়। এই বিপ্লবী-গোষ্ঠীর সঙ্গে দেশে এবং বিশেষ করে বিদেশে যুক্ত ছিলেন যে-সব বিদেশিনী ও স্বদেশবাসিনী, তাঁরা সংখ্যায় সামান্য হলেও কর্মকাণ্ড তাঁদের অসামান্য। এই বিপ্লবিনীদের পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের দু'একজনের কথা আমাদের উল্লেখ করতে হবে।

ভগ্নী নিবেদিতা

ভারতবর্ষে বিপ্লব-যুগের প্রবর্তকদের অন্যতমা ভগ্নী নিবেদিতা। জন্মসূত্রে তিনি বিদেশিনী হলেও ভারতবর্ষ তাঁর কর্মভূমি ও ধ্যানভূমি। কবিগুরুর ভাষায় তিনি ভারতবর্ষের 'লোকমাতা'। স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা এই সন্ন্যাসিনী-বিপ্লবিনী ভারতবর্ষের সর্বাত্মক কল্যাণে সর্বস্ব পণ করেছিলেন। ভারতের বৈপ্লবিক-জাগরণের ইতিহাসে তাঁর কথা 'অমৃত সমান'। সে-কথার শেষ নেই। মায়ের মমতা, আচার্যার উপলব্ধি, রাজনীতিকের কূটবুদ্ধি এবং সেনাধ্যক্ষার নির্মম নিয়মানু-বর্তিতায় কোমলে-কঠিনে এই মহিয়সী নারী বাঙলার বিপ্লব ও বিপ্লবীদের সুখে-দুঃখে লালন করেছেন। অরবিন্দের বৈপ্লবিক-জীবন

ও তাঁর বৈপ্লবিক-নেতৃত্বের পশ্চাতে এই নারী ছিলেন বন্ধু, তাত্ত্বিক ও পরিচালিকার দায়িত্বে অনন্যা। তাই আলিপুর-ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেয়ে প্রেসিডেন্সি জেল হতে খালাস হবার কিছুদিন পর অরবিন্দকে পুনরায় গ্রেপ্তার করার গুজব শুনে বন্ধুরা যখন তাঁকে চন্দননগরে পালিয়ে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন: "...if Nivedita continues the work I shall leave"!

[যদি নিবেদিতা 'কাজ' চালিয়ে যান, তবে আমি পালাতে পারি।]

কি কাজ ?...অরবিন্দ তৎকালে 'কর্মযোগিন' পত্রিকা নিয়ে ব্যস্ত। এ-পত্রিকা বিপ্লবীর মুখপত্র, অরবিন্দের জীবনাদর্শ প্রচারের পত্র। এর 'কাজ' বা ভার তিনি দিতে পারেন একমাত্র নিবেদিতাকে। কারণ, পাণ্ডিত্যে, সাধনায়, বোধে, বীর্যে, বিপ্লব-জিজ্ঞাসায় ও দেশপ্রেমে নিবেদিতা সর্বশ্রেষ্ঠা ও অতুলনীয়া।

নিবেদিতাকে অরবিন্দের উক্তি জানান হলে তিনি বললেন: "Tell your chief to hide and the hidden chief through intermediary shall do many things."

('শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশী যুগ',—পৃঃ ৮৩৫)

[তোমাদের নেতাকে বলো পালিয়ে যেতে। পলাতক-নেতা অপরের মাধ্যমে অনেক কাজ করতে পারবেন।]

অরবিন্দ শুনে বললেন: "All right, arrange."

[ঠিক আছে, ব্যবস্থা করো।]

তারপরে তিনি আরো বলেছিলেন: "Mother Kali through Sister Nivedita ordered me to hide."

('শ্রীঅঃ বাঃ স্বঃ',—পৃঃ ৮৩৬)

[নিবেদিতার মাধ্যমে মা কালী আমাকে পলাতক হবার আদেশ দিয়েছেন।]

নিবেদিতা বিদেশিনী। কিন্তু ভারতবর্ষকে স্বদেশ করে নিয়ে এখানেই তিনি তাঁর বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড বিরচিত করেছেন। তবে বিদেশে ভারতীয়-বিপ্লবের প্রচারে এবং তৎসম্পর্কিত গোপন কার্য-কলাপে তাঁর সক্রিয় সহায়তাও সামান্য ছিল না।···

বিদেশিনী

অ্যাগ্‌নেস্ স্মেডলি

বিদেশিনী হয়েও অ্যাগ্‌নেস্ স্মেডলি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে স্বদেশীয় মুক্তিযুদ্ধের পর্যায়ে গ্রহণ করেছিলেন। জীবন-যৌবন তাঁর সংগ্রামী-ভারতের কর্মসাধনায় নিযুক্ত হয়। তিনি জন্মেছিলেন শ্রমিককুলে, সুদূর আমেরিকায়। কিন্তু তাঁর প্রাণ ও মন নিবেদিত ছিল ভারতমাতার পাদপদ্মে। তিনিও তাই অন্তর থেকে ছিলেন ভারতবাসিনী।

সেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল। বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপ তীব্রতর হয়ে উঠেছে। আমেরিকা ১৯১৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকায় ভারতীয় বিপ্লবীরা বিনা বাধায় মার্কিন-মুলুকে তাঁদের প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তারক দাস, শৈলেন ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্মিলিত হন অ্যাগ্‌নেস্ স্মেডলি। ক্রমে তাঁর অপূর্ব ভারতপ্রেম, সাহস, ধৈর্য ও আত্মত্যাগের পরিচয় পেয়ে ভারতীয় বিপ্লবীরা মুগ্ধ হতে থাকেন। অচিরে অ্যাগ্‌নেস্ স্মেডলি তাঁদেরই একজন হয়ে গেলেন। আত্মার আত্মীয়তায় ফাঁক রইল না এতটুকুও।

১৯১৭ সালে আমেরিকা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলে ভারতীয় বিপ্লবীদের অবস্থা সেখানে সংকটপূর্ণ হয়ে ওঠে। ইংরেজ-পুলিশের দাপট স্বভাবতই বৃদ্ধি পেয়ে যায়। মানবেন্দ্র রায়, হেরম্ব গুপ্ত প্রমুখ

অনেকে মেক্সিকোতে পালিয়ে যান। শৈলেন ঘোষ তাঁদের সঙ্গে গেলেও পুনরায় গোপনে আমেরিকায় ফিরে আসেন। তৎপর আমেরিকায়ই তারক দাস ও অ্যাগ্‌নেস্ স্মেডলির সঙ্গে তিনিও একটি ষড়যন্ত্র মামলায় ফেঁসে যান। তাঁদের প্রত্যেকেই চার বছর করে কারাদণ্ড লাভ করেন। তবে দু'বছর অন্তর ১৯১৯ সালেই তাঁরা বন্ধন-মুক্ত হন। ভারতবর্ষের বিপ্লব-ইতিহাসে বিদেশিনী বিপ্লবিনীর সম্ভবত ইহাই প্রথম কারাদণ্ডভোগ।

স্মেডলি ছিলেন সাংবাদিক। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'মডার্ণ রিভ্যু' পত্রিকায় তিনি লেখা পাঠাতেন এবং সাদরে তা ছাপা হত। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে 'স্টেনো'র কাজও তাঁকে করতে হত। ছন্নছাড়া নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীদের খাওয়া-পরার অর্থ সকল সময় জুটত না। স্মেডলি নিজে অতিরিক্ত খেটে-খুটে অর্থোপার্জন করে অনেক সময় তাঁদের খরচপত্র চালিয়ে নিতেন।

১৯১৯ সালে কারা-মুক্ত হবার পর তারক দাস, স্মেডলি, সুরেন কর, শৈলেন ঘোষ প্রমুখের উদ্যমে আমেরিকায় 'ফ্রেণ্ডস অব্ ইণ্ডিয়া' নামক একটি সংস্থা স্থাপিত হয়। তাঁরা উহার একটি সাপ্তাহিক মুখপত্রও প্রকাশিত করেন। তখন ডি. ভ্যালেরা প্রমুখ আইরিশ বিপ্লবীরা আমেরিকায় প্রবাসী ছিলেন। ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রচেষ্টায় তাঁরা স্বভাবতই সহানুভূতি জানালেন। সেই সহানুভূতি তাঁদের মুখপত্র 'গেলিক্ আমেরিকান্' পত্রে আক্ষরিত হতে থাকল।

১৯২০ সালে স্মেডলি চলে আসেন বার্লিনে। ডাঃ ভূপেন দত্তের সঙ্গে তাঁর বহু আলাপ হয়। আলাপের প্রধান প্রসঙ্গ হল—বর্তমান ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের সহায়ক হবার ক্ষমতা জার্মানির নেই। অথচ ভারতীয় স্বাধীনতা আপাতদৃষ্টিতে সুদূর হলেও বিপ্লবীদের এগিয়ে চলতেই হবে। কিন্তু কোন্ রাষ্ট্র দেবে সাহায্য ? রুশের দিকে মানবেন্দ্র

প্রমুখ বিপ্লবীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। মহাবিপ্লবের জয়গান উঠেছে রুশের কণ্ঠে। মুক্তি চাইছে তারা নিপীড়িত জনগণের এবং যুগ-যুগান্তের অবহেলিত নরনারীর—এ মুক্তি দু'চারজন ভাগ্যবানের মুক্তি নয়, এ মুক্তি সারা বিশ্বের 'শতকরা নিরানব্বুই জনে'র। কাজেই, মানবেন্দ্র রুশের আহ্বানে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। তিনি চান ভারতবর্ষ কম্যুনিস্ট-মতবাদ গ্রহণ করে বিশ্বমজদুর-বিপ্লবের শরিক হয়ে যাক। তাঁর মতে বিশ্বের জনগণের মুক্তির সাথে সাথে তাঁদের সহযাত্রী ভারতীয় জনগণও মুক্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু স্মেডলির বিচার-বুদ্ধি অন্য খাতে বইছে। তিনি চাইছিলেন জাতীয়-স্বাধীনতালাভের যুদ্ধ হবে প্রথম। স্বোপার্জিত রাষ্ট্রিক-স্বাধীনতা ব্যতীত অপরের সংগ্রামের লেজুড় হবারও অধিকার জন্মায় না। স্বাধীনতা পাবার পর স্বাধীন-ভারতই ঘটাবে দ্বিতীয় বিপ্লব—যার উদ্দেশ্য হবে দেশের 'শতকরা নিরানব্বুই জনে'র সর্বাঙ্গীণ মুক্তি।

স্মেডলির চিন্তাধারার সঙ্গে বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের চিন্তাধারার মিল পাওয়া গেল। মিল পাওয়া গেল ভূপেন দত্তের চিন্তাধারার সঙ্গেও। ১৯২১ সালে বীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং স্মেডলি চলে গেলেন মস্কো শহরে। পারস্পরিক সুদৃঢ় মতের মিলের উপর তাঁরা স্থির করে নিয়েছেন তাঁদের কর্মপন্থা। ভারতীয় বিপ্লবীদের একাংশ বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও স্মেডলিদের 'জাতীয় স্বাধীনতাবাদ' গ্রহণ করলেন, অপরাংশ মানবেন্দ্র প্রমুখের 'বিশ্ব-বিপ্লবের' পথে বিচরণ করার সংকল্প নিলেন।

অ্যাগ্‌নেস্ স্মেডলি শেষ পর্যন্ত বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও ডক্টর ভূপেন্দ্র দত্তের সঙ্গে ভারতের কল্যাণ-কামনায় বিপ্লবের পথে কাজ করে গেছেন। পরস্বাপহারী-ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষ তাঁর কথায় ও কাজে প্রকাশিত হত। কারণ, ভারতবর্ষে ইংরেজের এই অনধিকার প্রবেশ

সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার উপাসিকা ঐ মার্কিন মহিলা কোন মুহূর্তে বরদাস্ত করতে পারতেন না।

স্মেডলির অবদান ভারতবাসীর কিছুই জানা নেই। অথচ ভারতবাসী ও তাদের দৈনন্দিন সমস্যা তাঁর জানা ছিল। তা নিয়েই কেটে যেত তাঁর কর্মময় দিন ও নিদ্রাহীন রাত। তিনি ছিলেন খাঁটি বিশ্ববাসিনী—তাই খাঁটি ভারতবাসিনীও। বিপ্লবের রথে চড়ে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল আমেরিকায় ও ইউরোপে ভারতীয় নির্বাসিত বিপ্লবীদের পাশে, ভারতবর্ষেরই সংগ্রাম-মুখর যুগে। সে-আবির্ভাবে কিছুমাত্র ফাঁকি ছিল না—যেমন ফাঁকি থাকে না, অগণিত সন্তানকে বিপদ-মুক্ত করার ব্যাকুলতায় জগৎপালিনীর আবির্ভাবে।

মাদাম ভিকাজি রুস্তম কামা

মাদাম কামার জন্ম বোম্বাই-এর বর্ধিষ্ণু এক পার্সী পরিবারে। পার্সীরা সংখ্যায় সামান্য, কিন্তু অর্থে-সামর্থ্যে, শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে ও দেশপ্রেমে অগ্রগণ্য। ভারতবর্ষের জাতীয়-জীবনে দাদাভাই নৌরজি বা ফিরোজ শা মেটা থেকে বহু পার্সী নরনারী রাজনীতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন। মাদাম কামা তাঁদের সমাজেরই এক অবিস্মরণীয়া কন্যা। তিনি শুধু পার্সী-সমাজ কেন, সমগ্র ভারতীয়-সমাজেরই বরণীয়া মহিলা, যাঁকে ভুলে যাবার উপায় নেই। তাঁর অতুলনীয় দেশপ্রেম, স্বাধীনতালাভের প্রত্যাশায় অক্লান্ত সংগ্রাম ও অসাধারণ ত্যাগবরণ বিদেশে নির্বাসিতদের প্রাণে দিয়েছে প্রেরণা, মনে দিয়েছে সাহস, কর্মে দিয়েছে নিষ্ঠা।

কাথিওয়াড়ের শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা প্রখ্যাত বিপ্লবী। তাঁর নেতৃত্বে বিলেতে 'ইণ্ডিয়া হাউস' স্থাপিত হবার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। উক্ত 'ইণ্ডিয়া হাউস' ছিল বিপ্লবীদের মস্ত আড্ডা। সেখানে মাদাম কামার বিশেষ গতায়াত ছিল। বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও বিনায়ক সাভারকরের মত তিনিও ঐ প্রতিষ্ঠানের অগ্নিমন্ত্রে ছিলেন উদ্বুদ্ধা।

লণ্ডনের আস্তানা পুলিশের নজরে পড়ায় শ্যামজি কৃষ্ণবর্মা প্যারিসে চলে আসেন। ধিংড়ার আত্মদান কাগজে-কলমে সমর্থন করেছেন শ্যামজি-বীরেন্দ্রনাথ-সাভারকর। তারপরও তাঁদের ব্রিটিশ-পুলিশ সহ্য করবে কি করে? সুতরাং ক্রমে ক্রমে বীরেন চট্টোপাধ্যায় এবং মাদাম কামাও ফ্রান্সে আশ্রয় নিলেন।

১৯০৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর নাসিক শহরে জ্যাক্‌সন নিহত হন। পুলিশের সন্দেহ যে, বিনায়ক সাভারকরের প্রেরিত পিস্তলই আততায়ীরা ব্যবহার করেছিলেন। ফেব্রুয়ারি মাসেই অবশ্য গোপনে সাভারকর প্যারি থেকে কুড়িটি পিস্তল পাঠিয়েছিলেন। বিনায়কের জ্যেষ্ঠভ্রাতা গণেশ সাভারকরকে গ্রেপ্তার করার সময় তাঁর গৃহ তল্লাশি করে একটি কাগজ পাওয়া যায়—তাতে মানিকতলা বাগানে (কলকাতায়) প্রাপ্ত বোমার ফরমুলার অনুরূপ একটি ফরমুলা লেখা ছিল। ভারতের পুলিশ তাই বিনায়ককে ছেড়ে দিতে পারে না। তাদের অনুরোধে লণ্ডন-পুলিশ ১৯১০ সালের ১৩ই মার্চ বিনায়ক সাভারকরকে ধরে ভারত অভিমুখে পাঠিয়ে দেয়। পথে মার্সাই বন্দরে জাহাজ পৌঁছলে তাঁর পালাবার চেষ্টা এবং ফরাসী-পুলিশ কর্তৃক তাঁর গ্রেপ্তারের কথা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সময়ে মাদাম কামার কর্মব্যস্ততা, গভীর সতীর্থ-প্রীতি ও দেশপ্রেমের কথা বারে বারে উল্লেখ করেও শেষ করা যায় না। তিনি প্রচুর দৌড়-ঝাঁপ করলেন বিপ্লবী-সতীর্থকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ভূমি এই ফ্রান্স—কি করে সেই দেশের সরকার সাম্রাজ্যবাদী-শাসকের হাতে তুলে দেবেন এই তরুণকে, যাঁর একমাত্র অপরাধ দেশপ্রেম এবং আত্মসম্মানে সুন্দর একটি স্বাজাত্যবোধ? এবম্বিধ নানা যুক্তি দেখিয়ে মাদাম কামা সেদিন সাভারকরকে ব্যাঘ্রের কবল থেকে ছাড়িয়ে আনবার যথেষ্ট চেষ্টা করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

সাভারকরের মুক্তিলাভ বড় কথা নয়, বড় কথা তাঁর মুক্তির জন্যে মাদাম কামার সংগ্রাম। বৈপ্লবিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাভারকরের

গ্রেপ্তার একটি বড় ঘটনা ; তাঁকে মুক্ত করার চেষ্টাও একটি বড় ঘটনা —তাঁর মুক্তি পাওয়া বা না-পাওয়া বড় ঘটনা নয়। কাজেই, বন্ধনপিষ্ট সাভারকরের পানে যেমন দেশের ও বিদেশের মানুষ সেদিন বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল, সতীর্থের বন্ধন ঘোচানর সংগ্রামে অধীর মাদাম কামার পানেও বিশ্বের লোক তেমনি নয়ন তুলে তাকিয়ে ছিল।…

প্যারি শহরে প্রতিষ্ঠিত তাঁর 'বন্দেমাতরম্' কাগজকে ঘিরে একটি বিপ্লবীগোষ্ঠী তৈয়ের হয়েছিল। তাঁদের কাছে আনাগোনা চলত সারা ইউরোপের নির্বাসিত ভারতীয়দের। বীরেন চট্টোপাধ্যায় ১৯০৯ সালে বিলেত থেকে পালিয়ে চলে এসেছিলেন মাদাম কামার কাছে, 'বন্দেমাতরম্ গোষ্ঠী'র সঙ্গে কাজ করার সংকল্পে।

মাদাম কামার 'বন্দেমাতরম্' অগ্নি-বাণী ছড়িয়ে যাচ্ছে সারা ইউরোপে। গোপনে সে-সব স্ফুলিঙ্গ সাগর পার হয়ে ভারতবর্ষে পৌঁছয়। ভারতবর্ষের তরুণ তার অক্ষরে অক্ষরে শাণিত কৃপাণের চমক দেখে।…

১৯১১ সালের ১৭ই জুন টিনেভেলির জিলা-শাসক মিঃ অ্যাশ্‌কে ওয়াঞ্চি আয়ার হত্যা করলেন। সে-ঘটনা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ; কিন্তু উল্লেখ করা হয়নি মাদাম কামার কাগজ 'বন্দেমাতরম্'-এর পাতায় তৎপূর্বে কি বেরিয়েছিল। প্যারি থেকে 'বন্দেমাতরম্' প্রকাশিত করল একটি প্রবন্ধ, উক্ত ঘটনার প্রায় দু'মাস আগে, এপ্রিল মাসে :

"In a meeting or in a bunglow, on the railway or in a carriage, in a shop or in a church, in a garden or at a fair, wherever an opportunity comes, Englishmen ought to be killed. No distinction should be made between officers and private people. The great Nana Sahib understood this, and our friends the Bengalis

have also begun to understand. Blest be their efforts, long be their arm, now indeed we may say to the Englishmen : Don't shout till you are out of the wood." ('Sedition Committee Report', P.—117)

[সুযোগ পেলেই যে-কোন সভামণ্ডপে বা বাঙ্লোয়, রেলের পথে বা কামরায়, হাটে-বাজারে-দোকানে-উদ্যানে বা মেলায় ইংরেজকে নিধন করা কর্তব্য। ইংরেজ-রাজপুরুষ বা ইংরেজ-সাধারণের মধ্যে কোন পার্থক্য টানার প্রয়োজন নেই। 'প্রয়োজন নেই'—এ-সত্য মহান্ নানাসাহেব বুঝেছিলেন, আর আজ বুঝতে পারছেন আমাদের বাঙালী বন্ধুগণ। এই বন্ধুদের কার্যক্রম সাফল্যে শোভিত হোক, তাঁদের সাংগঠনিক অভিযান সুদূরপ্রসারী হোক! আজ আমরা ইংরেজকে সত্যি বলতে পারি—'তোমাদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করা সাঙ্গ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চুপে থাকো।']…

সোজা ভাষায় সহজ এই কথাগুলো মাদাম কামার 'বন্দেমাতরম্'-এ বেরিয়ে গেল ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে। লেখাগুলো যেন জ্বলন্ত চাবুক। লক্‌লক্ করছে লেলিহান জিহ্বায়। ভারতবর্ষের তরুণ আকণ্ঠ পান করতে চায় সেই অনল-সুধা।… তারা সাড়া দিল।… এপ্রিলের পর মে, মে'র পর জুন। ১৭ই জুন টিনেভেলিতে ঘটল অ্যাশ্-নিধন এবং ১৯শে মৈমনসিংহে ঘটল রাজকুমার-হত্যা। রাজকুমার রায় ছিল সি. আই. ডি. পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর, ইংরেজের কেনা গোলাম, দেশকর্মীদের পরম শত্রু।

জুলাই মাসে বহ্নিদীপ্তা-বিপ্লবিনী মাদাম কামা তাঁর 'বন্দেমাতরম্' কাগজে অগ্নি-অক্ষরে লিখলেন :

"When the gilded slaves from Hindusthan were parading the streets of London as performers in the royal circus and were prostrating themselves like so many cows at the feet of the King of England, two

young and brave countrymen of ours proved by their daring deeds at Tinnevelly and at Mymensingh that Hindusthan is not sleeping." ('S. C. Report,' P.—117)

[যখন ভারত থেকে আনীত মিথ্যার-মানে-গিল্টিকরা গোলামের দল লণ্ডনের পথে পথে রাজকীয় সার্কাসের সঙ্ সেজে কুচকাওয়াজে মত্ত এবং ইংলণ্ডেশ্বরের পদপ্রান্তে একপাল গো-বৎসের মত সাষ্টাঙ্গ-প্রণামে পুলকিত—ঠিক তখনই টিনেভেলি ও মৈমনসিংহের পথে আমাদের স্বদেশবাসী দু'টি বীর্যবান তরুণ তাঁদের দুঃসাহসী কর্মে প্রমাণ করে দিলেন যে, ভারত আর ঘুমিয়ে নেই।]

ভারতবর্ষের আগুন বিদেশে ছড়িয়ে যায়। বিদেশের অগ্নি-তাপ ভারতবর্ষে লাগে। বিপ্লবীর উষ্ণ প্রাণধারা দেশে ও দেশান্তরে এমনি করেই সংগ্রামী-যুগে বহমান ছিল। মুক্তির দূত রূপে ভারতবর্ষের বাইরে যাঁরা জাতীয়-বাণীকে বুকের রক্তে লালন করে বিশ্ববাসীর কানে পৌঁছে দিয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতমা এই মাদাম কামা। সারা জীবন তিনি সাংবাদিক রূপে, সংগঠক রূপে, আপোষহীন বিপ্লবিনী রূপে তাঁর জন্মভূমি ও স্বজাতিকে মুক্তি-সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করে গেছেন। দুঃসাহসিকা এই বিপ্লবিনীর আবির্ভাবে তাই ভারতবর্ষ ও তার মানুষ গৌরবান্বিত।

১৯৩৫ সালে ভারতবর্ষের মাটিতেই তিনি দেহরক্ষা করেন।

বিদেশিনী মিস্ এলিস্

(বনাম মিসেস্ জাফর আলী বনাম সাবিত্রী দেবী)

১৯২৮-'৩২ সাল। বাঙলার সঙ্গে তাল রেখে পথচলার আবেগে পাঞ্জাব ও উত্তর-প্রদেশের তরুণদল মত্ত হয়ে উঠেছে। ফলে, স্যাণ্ডার্স্ হত হলেন, এ্যাসেম্ব্লিতে বোমা পড়ল, ভাইস্‌রয়ের স্পেশাল্ ট্রেনটি

উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হল। এ-সব কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতি 'লাহোর ষড়যন্ত্র' এবং 'ভাইস্‌রয়ের গাড়ি ওড়ানর ষড়যন্ত্র' সম্পর্কিত মামলা। পুলিশ ভকৎসিং-বটুকেশ্বরদত্ত-যতীনদাস প্রমুখ বহু বিপ্লবীকে বন্দী করেছে। খুঁজছে আরো অনেককে। তন্মধ্যে চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগবতীচরণ এবং যশপালও রয়েছেন।

যশপালের বিরুদ্ধে ভীষণ অভিযোগ। তিন-তিনটি কর্মকাণ্ডের সঙ্গেই তাঁকে জড়ান হয়েছে। যশপাল পলাতক।···

কৃষ্ণশঙ্কর শ্রীবাস্তব এলাহাবাদের লোক। বিপ্লবীদলের একনিষ্ঠ কর্মী। দল থেকে তাঁর কাছে নির্দেশ এসেছে যে, পলাতক যশপালকে এলাহাবাদে আশ্রয় দিতে হবে।

যথাসময়ে যশপাল এলাহাবাদ স্টেশানে এসে নেমেছেন। কৃষ্ণশঙ্কর তাঁকে সঙ্গোপনে নিয়ে এলেন একটি গৃহে। সে-গৃহের মালিক একজন বিদেশিনী। বিপ্লবীদের বন্ধু ও সহায়িকা এই অদ্ভুত নারী। শুভ্রকেশা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, বয়োঃবৃদ্ধা, মহিমময়ী এক তাপসী।···

এলাহাবাদের বিপ্লবীদের সঙ্গে মিসেস্ জাফর আলীর পরিচয় ১৯২৮ সাল থেকে। যৌবনে ব্যারিস্টার মিঃ জাফর আলীকে বিয়ে করে মিস্ এলিস্ ভারতবর্ষে এসেছিলেন ঘর বাঁধবার জন্যে। কিন্তু সংসার-ধর্ম পালন করা তাঁর সম্ভব হয়নি। কারণ, আইরিশ-দুহিতা মিস্ এলিস্ শুধু আয়র্লণ্ডবাসিনী নন, তিনি ছিলেন আইরিশ-বিদ্রোহের কন্যা—প্রচণ্ড বিপ্লব-জিজ্ঞাসায় অগ্নিগর্ভা। সংসার-ধর্মেও হয়তো তিনি সংগ্রামী ভারতকে খুঁজে পেতে চেয়েছিলেন। তা সম্ভবত মনের রঙে রঙিন করে পাননি। তাই মিসেস্ জাফর আলী স্বামীর সান্নিধ্য ত্যাগ করে এলাহাবাদে একান্তে কাটিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁর দিনগুলি। এই নিভৃত জীবনে তিনি ছিলেন হিন্দু-দর্শন ও পৃথিবীর নানা রাজনীতিক-গ্রন্থের

একনিষ্ঠ পাঠিকা। তাঁর গৃহে আসবাবপত্রের বাহুল্য ছিল না, ছিল শুধু এ-সব পুস্তক-সংগ্রহ নিয়ে একটি মূল্যবান লাইব্রেরী।

নূতন করে শুরু হয়েছে তাঁর জীবনযাত্রা বেশ কিছুকাল থেকেই, কৃচ্ছ্রসাধনে ও হিন্দু-দর্শন পাঠে। নূতন নামকরণ হয়েছে তাঁর— 'সাবিত্রী দেবী'। বিদুষী এই তপস্বিনীর মধ্যে এলাহাবাদের তরুণ বিপ্লবীদল আবিষ্কার করলেন আইরিশ-অগ্নিহোত্রীর গৃহে সঞ্চিত অগ্নির উত্তাপ।...

মিস্ এলিস্ বনাম মিসেস্ জাফর আলী বনাম সাবিত্রী দেবী অনায়াসে ঘরছাড়া বিপ্লবীদের জননীর আসন গ্রহণ করলেন।...

সাবিত্রী দেবীর গৃহেই যশপালকে আশ্রয় দেওয়া হল। অন্যান্য পলাতক-বিপ্লবীও ঘুরে-ফিরে এখানে আনাগোনা করতেন। মাতৃদর্শন-লোভী এ-সব দুর্দান্ত তরুণ। এঁদের স্বহস্তে খাইয়ে-দাইয়ে সাবিত্রী দেবীর তৃপ্তিবোধ হত।...

গৃহহারা যশপাল বন্ধুর পথে সহসা তাই একাধারে পেলেন গৃহ এবং জননীর সান্নিধ্য।...

১৯৩২ সালের ২২শে জানুয়ারি। ভোর ৪টা। হাড়-কাঁপানো শীত। হঠাৎ সাবিত্রী দেবীর গৃহদ্বারে প্রচণ্ড করাঘাত, ব্যাটনের গুঁতো। সাবিত্রী দেবী থাকতেন বাড়ির দোতলায়। আলগোছে জানালা ফাঁক করতেই তিনি দেখলেন—গৃহের চতুর্দিকে, রাস্তায় সশস্ত্র পুলিশ!... যশপালেরও ঘুম ভেঙে গেছে। কিন্তু পালাবার পথ নেই।...

মুহূর্তের জন্যে সবাই বিহ্বল।... ইতিমধ্যে পুলিশ উঠে এসেছে সিঁড়ি বেয়ে।...পুলিশ-সুপার মিঃ ডি. পিল্‌ডিচ্ চেঁচিয়ে বলছেন

সাবিত্রী দেবীর ঘরের কাছে এসেঃ "Please open the door, Madam !"

দোর খুলতেই হল।···

বন্দী হলেন যশপাল। সাবিত্রী দেবীকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করল। পলাতককে আশ্রয়দান তৎকালে মস্ত অপরাধ। যশপালের সঙ্গে বিচারে এই বিদেশিনী মহিলারও দীর্ঘ চার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড লাভ হয়।

সাবিত্রী দেবী বয়সে বৃদ্ধা হলেও প্রচুর তারুণ্য ছিল তাঁর মনে। রক্তে ছিল তাঁর বিপ্লবিনীর স্বাক্ষর। আইরিশ মহিলা, আইরিশ-বিদ্রোহের কন্যা। এসেছিলেন ভারতবর্ষে। ভারতকে ভালবেসেছিলেন আপন চিত্তের মাধুরী দিয়ে। ভারতীয়-দর্শন তাঁর অন্তরকে গভীর রসের সন্ধান দিয়েছিল। মহিমান্বিত ভারতের রূপ সুপ্রতিষ্ঠিত দেখবার ব্যাকুলতায়ই তাঁর মন সংগ্রামী-ভারতের পাশে এসে দাঁড়াল। সাংসারিক জীবনের দুঃখদাহে নিজের অন্তরকে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত করেছিলেন বলেই তিনি ভরাতবর্ষকে খুঁজে পেলেন সাবিত্রী দেবী হয়ে, ভারতবর্ষের সংগ্রামে জড়িত হলেন তিনি তাঁর মধ্যেকার বিদ্রোহিনী 'মিস্ এলিস্'কে প্রসারিত করে।···

কৈশোরের অগ্নিজ্বালা বার্ধক্যেও বিন্দুমাত্র স্তিমিত হয়নি সাবিত্রী দেবীর। গ্রেপ্তারের পর এলাহাবাদের ইউরোপীয় পুলিশ-হাজতে থাকাকালে তাঁর দু'টি অনুগামী বিপ্লব-সতীর্থ কৃষ্ণশঙ্কর শ্রীবাস্তব ও কাশীনাথ পাণ্ডে গোপনে দেখা করে তাঁকে যখন বলেছিলেনঃ "Mother, be firm"—তখন তিনি কী উত্তর দিয়েছিলেন ?

দৃপ্তকণ্ঠে তিনি উত্তর দিয়েছিলেনঃ "What do you mean by 'be firm' ?···I was born in Irish Jail and brought

up in Irish Jail!"···বলার সময় চোখ দু'টি জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু মুখে ছিল প্রশান্ত প্রত্যয়ের স্পর্শ।···

সাবিত্রী দেবীর উপর নির্যাতন কম হয়নি। কিন্তু একটি কথাও পুলিশ পেল না তাঁর কাছ থেকে।···কি করে পাবে? ভুলে গেলে চলবে কেন তাঁর উক্তি? "শক্ত হবার কথা কি বলছ?···আমি যে জন্ম নিয়েছিলাম আইরিশ-কারাগৃহে, আমি যে আইরিশ-কারাগৃহেরই লালিতা কন্যা!"···

চার বছরের সাজা দিয়ে তাঁকে পাঠান হল দেরাদুন জেলে। 'আইরিশ-বিদ্রোহে'র কন্যা এবং 'ভারতীয়-বিপ্লবে'র জননী রূপে নিরন্ধ্র কারাকক্ষে বিশ্বের সর্বহারাদের স্বাধিকার-কামনায় তপস্যানিযুক্ত থাকলেন তিনি ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত।···

তারপর এল তাঁর মুক্তি জেলের বন্ধন থেকে। জরাজীর্ণ দেহে ফিরে এলেন সাবিত্রী দেবী বাইরে। কিন্তু সম্বলহীনা—অর্থাভাবে তিনি বড়ই বিব্রত।···বিপ্লবীরাও দরিদ্র। কাজেই, দারিদ্র্যকে ভাগ করে নিয়ে সকলকে চালাতে হচ্ছে জীবনযাত্রা। অবশ্য পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন্ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই সাবিত্রী দেবীর সাহায্যে খানিকটা এগিয়ে এসেছিলেন।···

বেশিদিন কাটল না। পরম পরিতাপের কথা যে, এত বড় একটি প্রাণ, এত বড় একটি বিদ্রোহ-সত্তা সবার অলক্ষ্যে ও অনাদরে ঝরে পড়ল।·কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ বা ক্ষোভ তাঁর ছিল না। কারণ, তিনি তো শুধু দেবার জন্যে এসেছিলেন—নেবার জন্যে নয়!·

সাবিত্রী দেবীকে দেশ বাঁচিয়ে রাখতে পারল না। কিন্তু বাঁচিয়ে রেখেছে তাঁকে বিপ্লবের ইতিহাস।···

তিনি মৃত্যুহীনা।·· তিনি কালজয়িনী।··

নির্বাসিত বিপ্লবী-নায়কদের দু'একজন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিদ্রোহী তরুণদের বিদেশে যাতায়াত শুরু হয়। লণ্ডন, প্যারি, জার্মানি, মার্কিন্‌দেশ, চীন ও জাপানে স্বাধীনতার মুক্ত-বায়ু গ্রহণ করার আগ্রহে যাঁরা আনাগোনা করেন, তাঁদের অনেকেই ক্রমশ দেশে ও বিদেশে গোপন বিপ্লবী-সংস্থা সংগঠনে মন দিলেন। এই সংস্থাগুলোর সমবেত চেষ্টা ও উদ্দেশ্য ছিল ভারতব্যাপী একটি সশস্ত্র-বিপ্লব সংগঠিত করে দেশের রাজনৈতিক-স্বাধীনতা ইংরেজের হাত থেকে ছিনিয়ে আনা। সে-কাজ সুসম্পন্ন করার জন্যে বিদেশে ভারতবর্ষের দাবী প্রচারের এবং বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর সক্রিয় সহযোগিতা আদায়ের চেষ্টাই ছিল বিপ্লবীদের প্রধান কার্যক্রম।…

উল্লিখিত বৈপ্লবিক চিন্তা ও স্বপ্নকে সার্থক করার উদ্দেশ্যে যাঁরা স্বেচ্ছায় অথবা ব্রিটিশ কর্তৃক নির্বাসিত হয়ে বিদেশে যান, তাঁদের কথা ভুললে চলবে না। তাঁদের অবদান সামান্য নয়। তাঁদের মধ্যে যাঁরা পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতবর্ষের স্থান-করে-নেবার শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁদের কিছু নাম উদ্ধৃত হল।…

১৯০৫ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে জাপান, মিশর, তুরস্ক, কাবুল, লণ্ডন, প্যারি, বার্লিন, ভিয়েনা, নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্ণিয়া, সানফ্রান্সিস্‌কো প্রভৃতি দেশে বিপ্লবী-চারণ রূপে পাওয়া যায়—শ্যামাজি কৃষ্ণবর্মা (কাথিওয়াড়), মাদাম কামা (বোম্বাই), সর্দার সিংজি রাণা (কাথিওয়াড়), বীরেন চট্টোপাধ্যায় (সরোজিনী নাইডুর ছোটভাই, হায়দ্রাবাদ-প্রবাসী বাঙালী), বিনায়ক সাভারকর (বোম্বাই), ওবেদুল্লা (যুক্তপ্রদেশ), ভূপেন দত্ত, (স্বামী বিবেকানন্দের ছোটভাই, বাঙলা), রামচন্দ্র (পাঞ্জাব), হরদয়াল (পাঞ্জাব), তারক দাস (বাঙলা),

বরকৎউল্লা (যুক্তপ্রদেশ), সুধীন বসু (বাঙলা), মীর্জা আব্বাস (বিহার), পাণ্ডুরং কান্‌কোজি, খগেন দাস (বাঙলা), অধর নস্কর (বাঙলা), ভি. ভি. এস্‌. আয়ার (মাদ্রাজ) এবং আরো অনেককে।

অতঃপর ১৯১১ সাল থেকে ১৯১৮ সাল এবং তৎপরও স্বাধীনতা-প্রাপ্তির কাল পর্যন্ত যাঁরা বিদেশে বিপ্লবের বাণী প্রচার করেছেন এবং ১৯১৪ সাল থেকে কতিপয় বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাধীনতাকামী ভারতের কূটনৈতিক সম্বন্ধ রক্ষা করে বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে সার্থক করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন—বীরেন চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ বিষ্ণু সুখতনকর (মহারাষ্ট্র), ধীরেন সরকার (বিনয় সরকারের ছোটভাই, বাঙলা), অজিত সিং (পাঞ্জাব), প্রমথ দত্ত (বাঙলা), ডাঃ ভূপেন দত্ত, পাণ্ডুরং কান্‌কোজি, বরকৎউল্লা, খানচাঁদ বর্মা (যুক্তপ্রদেশ), রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ (যুক্তপ্রদেশ). লালা লাজপৎ রায় (পাঞ্জাব), শিবপ্রসাদ গুপ্ত (যুক্ত-প্রদেশ), জাফর আলী খাঁ (যুক্তপ্রদেশ), হৃষীকেশ লট্টো (পাঞ্জাব), ডাঃ হাফিজ (যুক্তপ্রদেশ), হোরমনজি ফারশাপ (বোম্বাই), তারক দাস (বাঙলা), রজবলী (পাঞ্জাব), হেরম্ব গুপ্ত (বাঙলা), নন্দনকার (বোম্বাই), বীরেন দাশগুপ্ত (বাঙলা), চঞ্চুয়া (মাদ্রাজ), রাসবিহারী বসু (বাঙলা), মানবেন্দ্র রায় (বাঙলা), হেমেন্দ্রকিশোর রক্ষিত (বাঙলা), ধনগোপাল মুখার্জি (বাঙলা), শৈলেন ঘোষ (বাঙলা), সুরেন কর (বাঙলা), আবদুল ওয়াহেদ (বিহার), পিঙ্‌লে (মহারাষ্ট্র), সত্যেন সেন (বাঙলা), জিতেন লাহিড়ী (বাঙলা), হরনাম সিং (পাঞ্জাব), সুরেন বসু (বাঙলা), ডাঃ মনসুর (যুক্তপ্রদেশ), চম্বকরাম পিল্লাই (ত্রিবাঙ্কুর), রামচন্দ্রাজি, ভগবান সিং (পাঞ্জাব), হরদয়াল (পাঞ্জাব), সরদার ওমরাও সিং (পাঞ্জাব), অবনী মুখার্জি (বাঙলা), সুধীর বসু (বাঙলা)।

এছাড়া লণ্ডনের বুকে 'শহিদ' হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের অবিস্মরণীয় নাম হল—**মদনলাল ধিংড়া** এবং **উধম সিং**। মদনলাল নিধন করলেন কার্জন উইলিকে ১৯০৯ সালে; উধম সিং যমালয়ে পাঠালেন

কুখ্যাত ও'ডায়ারকে ১৯৪০ সালে। প্রত্যুত্তরে ইংরেজ তাঁদের ফাঁসি দিল। ফাঁসির মঞ্চে মৃত্যুকে চুম্বন করে তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়ী হলেন।...

এসব কাহিনী পূর্বেই বলা হয়েছে।

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

চিরবিপ্লবী, দুর্ধর্ষ নায়ক বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ডক্টর অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র এবং ভারতবর্ষের কবি ও মহীয়সী নেত্রী সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা এই বীরেন্দ্রনাথ। ১৯০৩ সালে ভারত থেকে বি-এ ডিগ্রি নিয়ে বিলেতে যান পড়াশুনা করার জন্যে। কিন্তু তাঁর রক্তকণায় বিদ্রোহ-বহ্নি; তাঁর তনু-মনের একটি মাত্র ধ্যান স্বদেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করা। তাই বিলেতে এসে জুটে গেলেন তিনি বিপ্লবী-নায়ক শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে। তাঁর পড়াশুনা 'ছাত্রে'র পড়াশুনায় আবদ্ধ থাকল না, 'বিপ্লবের জিজ্ঞাসা'য় রূপ নিতে থাকল। ক্রমশ তাঁর কার্যকলাপ ইংরেজের অপছন্দ হল। ১৯০৯ সালে উইলি-নিধনের জন্য মদনলাল ধিংড়াকে তিনি 'টাইমস্' পত্রিকায় সমর্থন জানিয়ে ব্রিটিশের বিশেষ বিরাগভাজন হয়ে পড়েন। ১৯১০ সালে তাঁকে 'মিডল্ টেম্পল্ ইনস্ অব্ কোর্ট্' (বিলাতের বিদ্যালয়) থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। তখন তিনি মুক্ত পুরুষ, বিদ্রোহী বীর। বিপ্লবী-নায়ক শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার 'দি ইণ্ডিয়ান্ সোসিয়লজিস্ট' কাগজের সহায়ক-সম্পাদক রূপে কাজ শুরু করে দিলেন।

তারপর উল্কার বেগে বিপ্লবের পথে পথচলা রচিত হতে থাকল। জার্মানি, পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের নানাস্থানে তিনি ঘুরে বেড়ালেন বিপ্লবী-সংস্থার নানা কার্যক্রমকে সফল করে তোলার আগ্রহে। বিশ্ব-সাম্যবাদী সভাগুলোয় তাঁর উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ-বিরোধী কাগজপত্রে ভারতীয়-বিপ্লব সংক্রান্ত তাঁর লেখাগুলো অবিস্মরণীয়। পৃথিবীর নব-জাগরণের ইতিহাসে তাঁর চিন্তার ধারা তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করে

দিয়েছিল। ১৯০৮ সালে তিনি আয়র্লণ্ডে গিয়ে আইরিশ-বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগস্থাপন করেছিলেন। ১৯০৯ সালে প্যারিতে এসে মাদাম কামার 'বন্দেমাতরম্'-গোষ্ঠীর সঙ্গে নূতন করে তিনি যুক্ত হলেন। ১৯১০ সাল থেকে 'তলওয়ার' নামক ব্রিটিশ-বিরোধী পত্রের নিয়মিত লেখকের স্থান নিলেন।···আয়র্লণ্ড, রাশিয়া, মরোক্কো এবং কামালের তুর্কির সঙ্গে বৈপ্লবিক-যোগাযোগ রক্ষায় তাঁর ব্যস্ততা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে লাগল।···

এরপর এলো ১৯১৪ সালের বিশ্বযুদ্ধ। জার্মানিতে বীরেন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে এসে গেছেন। স্থাপিত হয়ে গেছে ভারতীয়-বিপ্লবীদের 'বার্লিন কমিটি'। দেশে যতীন্দ্রনাথ ও রাসবিহারীর নেতৃত্বে সাড়ম্বরে সশস্ত্র-অভ্যুত্থান সংগঠিত করার কল্পনা। বিদেশে বার্লিন-কমিটি জার্মানির সঙ্গে 'ইণ্ডো-জার্মান্ ষড়যন্ত্রে' ব্যস্ত। এখান থেকে জাহাজ-বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্থ পাঠান হবে জার্মান্ বার্লিন কমিটির মাধ্যমে। ভারত-জার্মান্ ষড়যন্ত্রের ধারক ও বাহকদের অন্যতম এই বীরেন্দ্রনাথ। বার্লিন কমিটির তিনি সেক্রেটারি। ভারতবর্ষের কামনা ও স্বপ্ন বিশ্ববাসীকে জানানর ব্রতে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ প্রবাসী ভারতীয়-বিপ্লবী। তাঁরা জাপানে-ইউরোপে-মধ্যপ্রাচ্যে ও আমেরিকায় নির্বাসিত। তরুণ-নায়ক বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁদেরই সতীর্থ। তাঁর হিন্দী-উর্দু-ইংরেজি ভাষায় প্রচারিত পত্র-পত্রিকা ও বুলেটিন্গুলো সেই যুগে বিশ্বের বিদ্রোহীদের ভারতপ্রেমী করে তুলেছিল।··

কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতে সশস্ত্র-অভ্যুত্থানের চেষ্টা ব্যর্থ হল। অনিদ্রা, অনাহার ও দারিদ্র্যে ভ্রূক্ষেপ না করেই নির্বাসিতের দল তাঁদের প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন। ব্যর্থতা বিপ্লবীদের

পথচলায় ক্লান্তি আনে না, সুযোগ চলে গেলেও দ্বিতীয় সুযোগের অপেক্ষায় তাঁরা কাল গণেন।…

১৯১৯ সাল। পৃথিবীর চেহারা বদলে গেছে। জার্মানি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। অথচ তার মধ্যেই পুনরায় তার পায়ে দাঁড়ানর কী অদম্য চেষ্টা! জার্মান্ জাতটাকে দেখে দেখে বীরেন্দ্রনাথদের প্রাণে সাহস জাগে, মন শক্ত হয়, কর্মে নিষ্ঠা আসে। এর বেশি কিছু জার্মানির কাছে পাবার আশা বর্তমানে আর নেই। আমেরিকা তো ইংরেজের দলভুক্ত। তার কাছে কী-ই বা পাওয়া সম্ভব? কিন্তু বিপ্লবীরা তাকালেন পূর্ব-ইউরোপের পানে। সেখানে উদ্ভাসিত আশার আলোক। সেখানে নব-বিপ্লবের সূচনা। পৃথিবীর জনগণের মুক্তির কথা ভেসে আসছে সেখানে। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্য-রাজ বিলীয়মান—সেখানে শূদ্র-রাজের পদধ্বনি। যার ইঙ্গিত পরিষ্কার ভাষায় স্বামী বিবেকানন্দ দিয়ে গেছেন বহু বছর পূর্বে। বিশ্ব-বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে তরুণ-রুশ। সে-বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নাকি ভারতের মুক্তিও আসবে—আলাদাভাবে নয়। মানবেন্দ্র রায় প্রমুখ ভারতীয়-বিপ্লবীদের তাই বিশ্বাস। কিন্তু বীরেন্দ্রনাথ সে-বিশ্বাসে মুগ্ধ হতে পারেন না—যেমন পারেন না তিনি তাঁর স্বনামধন্যা ভগ্নী সরোজিনী নাইডুর রাষ্ট্রগুরু গান্ধীজির বিশ্বাসে। গান্ধীজি সবেমাত্র আফ্রিকার কর্মস্থল ছেড়ে ভারতবর্ষে এসেছেন। তিনি সমগ্র ভারত তথা বিশ্বকে অহিংস-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে চান। তিনি নাকি সাম্রাজ্যলিপ্সু ইংরেজকে কৌপিন পরিয়ে ছাড়বেন, হৃদয় দিয়ে তার হৃদয়কে জয় করবেন, ভারতের রাষ্ট্রিক-স্বাধীনতা নাকি সেই পথেই আসবে।

বিশ্ব-বিপ্লব বীরেন্দ্রনাথকে আশান্বিত করল না, হৃদয় দিয়ে হৃদয় জয় করে ইংরেজের শুভবুদ্ধির আশ্রয়ে ভারতের মুক্তির প্রোগ্রামও তাঁর মনে ধরল না। তিনি তাই চাইছেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধে

দলমত নির্বিশেষে সংগ্রামী-ভারতকে একত্রিত করতে—সেখানে বিদেশীরা নাক গলাবে না, ভারতের প্রয়োজনে তারা সাহায্য করবে শুধুই ভারতীয়-নেতৃত্বের নির্দেশে। ভারতের যুদ্ধ ভারতীয়রাই করবে —সেটা হবে 'ন্যাশন্যাল ফাইট্'—জাতীয় যুদ্ধ, জাতীয় বিপ্লব। সে-বিপ্লবে ভারতের রাজনৈতিক-স্বাধীনতা এলে পর দেখা যাবে সর্বাঙ্গীণ জনমুক্তির জন্যে কোন্ পথ গ্রহণযোগ্য!

বীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে জুটলেন বিপ্লবিনী অ্যাগ্‌নেস্ স্মেডলি। উভয়ে একমত হয়ে চলে গেলেন রুশে। সেটা ১৯২২ সাল। চলল তাঁদের পথচলা। ভারতীয়-বিপ্লবীরা স্পষ্টভাবে দু'টি শিবিরে স্থান নিলেন। বীরেন্দ্রনাথ, অ্যাগ্‌নেস্ স্মেডলি, ডাঃ ভূপেন দত্ত প্রমুখ প্রথম শিবিরে —অর্থাৎ, জাতীয়-বিপ্লব যাঁরা প্রথম ঘটাতে চান তাঁদের শিবিরে।...

কিন্তু এর পরের ইতিহাস অতি বেদনার, অতি সংক্ষিপ্ত।... কিছুকাল পরেই দেশবাসী শুনল যে, মনের দিক থেকে রোগে ও দারিদ্র্যে অপরাভূত বীর বিপ্লব-নায়ক পরাজিত হয়েছেন মৃত্যুরাজের কাছে। এর বেশি সংবাদ তাঁর দেশবাসী জানল না। জানল না এই দেশের নরনারী যে, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কর্মকাণ্ড, ত্যাগ ও সাধনা ভাবতজননীকে কী পরিমাণ গর্বোজ্জ্বল করে রেখেছে!

"অকুণ্ঠ তব অবদান
কালের নিভৃতে লিখা—
কিছু দাওনি জানিতে
তবু মৃত্যুহীন জ্বলে তার শিখা।..."

মৌলানা বরকৎউল্লা

মৌলানা বরকৎউল্লা ১৯২৮ সালে জার্মানিতে দেহরক্ষা করেন। তাঁর মৃত্যু স্বাধীনতা-সংগ্রামের আজন্ম-বিপ্লবী সৈনিকের মৃত্যু, নির্বাসিত নেতার গৌরবে মৃত্যু। সেই যে একদিন তরুণ-হৃদয়ের প্রচণ্ড

সংকল্প নিয়ে দেশান্তরিত-বিদ্রোহী ঘর ছেড়েছিলেন—তিনি আর কোনকালে দেশে বা ঘরে ফিরে আসতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর উনিশ বছর পর তাঁর ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল।...

'মৃত্যু' দিয়েই বরকৎউল্লার কথা শুরু করা হল। কারণ ঐ মৃত্যুই তাঁর অমর-হয়ে থাকার পরিচয়। যে-তপস্যা তাঁর সকল সত্ত্বাকে ব্যাপৃত রাখত, যে-সাধনা তাঁর সকল অস্তিত্বে বিধৃত ছিল—সেই তপস্যাশুদ্ধ কর্মপীঠেই কর্ম-তপস্বী বরকৎউল্লা সমাধিস্থ হয়েছেন। কাজেই, তাঁর 'মৃত্যু' একটি তীর্থকল্পনা—সে-তীর্থের তীর্থঙ্কর বলা চলে এই দেশপ্রেমী, মানবধর্মী বিপ্লবী-নায়ককে।...

বরকৎউল্লা ভূপালের লোক। কৈশোরে পড়তে যান বিলেতে। বিলেতে গিয়ে 'সাহেব' হলেন না—হলেন দেশপ্রেমে মত্ত, স্বাধীনতা-লোভী এক কর্মচঞ্চল স্বপ্নচারী। ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। খুঁজে বার করলেন বাঙলার বিপ্লবীদের। তখন বঙ্গবিচ্ছেদ-বিরোধী তীব্র আন্দোলনের বাণী বরকৎউল্লার মর্মে ছোঁয়া দিল। তিনি তার গভীরে প্রবেশ করলেন। সেখানে শুনলেন বিপ্লবের আহ্বান। রক্তে তাঁর লাগল সর্বনাশের নেশা।

বরকৎউল্লা ফিরে এলেন ভূপালে। ভূপাল একটি করদরাজ্য। কাজ শুরু করে দিলেন নিজের রাজ্যে, বিশেষ করে মুসলমানদের মধ্যে। তাঁর বক্তব্য ছিল—হিন্দু-মুসলমান একজাতি ও একপ্রাণ; বিভেদ যারা আনতে চায়, তারা হিন্দু-মুসলমানের দুশমন, ইংরেজের বন্ধু; এক-প্রাণ হয়ে হিন্দু-মুসলমান-শিখ-পার্সী-খ্রীষ্টান ভারতবাসীকে 'জাতীয়তা-বাদ' প্রচার করতে হবে ভারতবর্ষ জুড়ে; কাজ করতে হবে সেই পথ ধরে, যে-পথে দেশপ্রেম-আদর্শবাদ-নিষ্ঠা বিপ্লবের রঙে রঙিন, যেখান থেকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ঘোষণা করা হবে 'জিহাদ', যার ফলে ভারতবর্ষ হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম-শক্তির অধিকারী।

তারপর অতি সংগোপনে একদিন তাঁকে চলে যেতে হয় জাপানে।

জাপান তখন 'এশিয়ার আলো'। আলোক-শিখা বিকিরণ করছে ঐটুকু দ্বীপের মুষ্টিমেয় মানুষ, সমগ্র এশিয়াবাসীকে তাদের বন্ধুর পথের অন্ধকারে!...

জাপানে বরকৎউল্লার অবকাশ নেই। শিক্ষাব্রতীরূপে বাহ্যত তাঁর দিন কাটে। কিন্তু অন্তরে তাঁর বিপ্লবের ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি। বের করলেন 'নয়া ইসলাম্' নাম দিয়ে একখানা কাগজ। কিন্তু পুলিশ তাঁর পেছনে লাগল। কাজেই, জাপান তাঁকে ছাড়তে হবে। সুযোগ এলো। চলে গেলেন তিনি মার্কিন-মুলুকে। সেখানে ভারতীয়-বিপ্লবীদের আড্ডা খুঁজে পেতে তাঁর বিলম্ব হল না। তৎকালে নির্বাসিত-বিপ্লবীরা প্রথম মহাযুদ্ধের সুযোগ নেবার চেষ্টায় আমেরিকা ও জার্মানিতে কর্মমুখর।

১৯১৫ সালে 'ইণ্ডো-জার্মান্-টার্কিশ মিশন্' যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের ইসলাম্-ধর্মী দেশগুলোর সঙ্গে ব্রিটিশ-বিরোধী সমঝোতা করতে। বরকৎউল্লাকে বিপ্লবীরা পাঠিয়ে দিলেন ভারতীয়-বিপ্লবীদের প্রতিনিধি-রূপে উক্ত মিশন্-এর শরিক হতে।

বরকৎউল্লা ১৯১৫ সালেই ইস্তাম্বুলে এসে উক্ত মিশন্-এ যোগ দেন। সেখান থেকে মিশনের অপর সভ্যদের সঙ্গে তিনি চলে যান কাবুল শহরে। কাবুলে ঐ মিশনের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল একটি 'আজাদ সরকার'। কিন্তু ব্রিটিশের প্ররোচনায় ব্রিটিশ-ঘেঁষা আমীর বিপ্লবীদের 'আজাদ সরকারে'র চাল-চলন অপছন্দ করলেন। ফলে, আফগান-সরকার বিরূপ হলেন। বরকৎউল্লা কাবুল থেকে তাই জার্মানিতে ফিরে এলেন। ফিরে এসে বার্লিনস্থ 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল্ পার্টি'র সভ্যপদে সাদরে অধিষ্ঠিত হলেন। তাঁর কাজ শুরু হল যুদ্ধ-বন্দী ভারতীয়-সৈন্যদের মধ্যে। বন্দী-সৈনিকদের ব্রিটিশের পক্ষ

ত্যাগ করে স্বদেশের পক্ষে, বিপ্লবী-ভারতের পক্ষে চলে আসায় উৎসুক করাতে হবে।…

বিপ্লবী-নায়ক বরকৎউল্লার অবদান অসামান্য। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ভারতীয়-অভ্যুত্থান ব্যর্থ হলেও আগামী দিনে তাকে সফল করে তোলার চেষ্টায় তিনি পিছিয়ে পড়লেন না। পিছিয়ে না-পড়ার কারণ —তিনি জাত-বিপ্লবী, তিনি অশান্ত থাকবেনই যতদিন পর্যন্ত কার্যোদ্ধার না হয়।

যুদ্ধ ক্ষান্ত হলে বরকৎউল্লা ইউরোপের নানা দেশ ঘুরে ভারতীয়-স্বাধীনতার কথা প্রচার করে চললেন। সে-প্রচারের বিরাম ছিল না। ১৯২১ সালে গেলেন রুশে। খুশি হলেন না সে-সব বন্ধুদের চিন্তাধারায়, যাঁরা ভারতীয়-বিপ্লবী হয়েও ভারতের স্বাধীনতার উপরে বিশ্বমজদুর-স্বাধীনতার স্থান দিতে চান।…১৯২২ সালে ফিরে এলেন জার্মানিতে। নূতন করে বের করলেন তিনি 'আল্-ইসলাম্' নাম দিয়ে একখানা কাগজ। কাগজ চলল কিছুদিন। তাঁর বক্তব্যগুলো জাতীয়তাবাদের যুক্তিতে বলিষ্ঠ।

১৯২৭ সাল অবধি বরকৎউল্লা পূর্ণ উদ্যমে বিদেশে বাস করে দেশসেবা করে গেলেন। ব্রুসেলস্-এ 'সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কংগ্রেসে'র অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণটি স্মরণীয় হয়ে আছে। যুক্তিতে অকাট্য এবং হৃদয়ের আবেদনে প্রাণবন্ত ছিল সেই ভাবণ। সেখানে বিশ্বের পরাধীন দেশগুলোর রাষ্ট্রিক-মুক্তি দাবি করে সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটানর আহ্বান তিনি জানিয়েছেন।…

বছরও গেল না। নিভে গেল বহ্নিশিখা। স্তব্ধ হল রুদ্র বীণা।…

মৌলানা বরকৎউল্লা তাঁর দেশের স্বাধীনতা দেখে যাননি, কিন্তু আপন প্রাণ নিঃশেষে নিবেদন করে গেছেন ঐ স্বাধীনতালাভের সংগ্রামে। তাই তাঁর রক্তধারা আজও উষ্ণ-প্রবাহে ভারতবাসীর রক্তে সঞ্চালিত। ভারতবাসীর কাছে তিনি মৃত্যুহীন।...

রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ

রূপকথার রাজপুত্রের মত বিপ্লবের কাহিনীতে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ একটি রোমান্টিক চরিত্র। রাজার দুলাল সমস্ত সুখসম্পদ, ব্রিটিশের দেওয়া সম্মান ও আদরের স্বপ্ন ধূলায় ধূসরিত করে দাঁড়ালেন এসে ভারতবর্ষের পদদলিত জনসাধারণের পাশে। আজীবন দেশ থেকে দেশান্তরে ছুটে বেড়ালেন তিনি ব্রিটিশের ক্রুদ্ধ শাসন অমান্য করে, ব্রিটিশের পুলিশকে ধিক্কৃত করে বিপ্লবীর সুমহান কর্তব্যে। এই মানুষটি দরিদ্র নন, মধ্যবিত্ত নন, প্রচুর বিত্তশালী শুধু নন—তিনি ভারতের রাজন্যবর্গের সগোত্র। অথচ কাঁটার মুকুট পরে আদর্শ-লাঞ্ছিত পথে দুঃখ-নির্যাতন ভোগ করায় যারা শঙ্কিত নন, তাঁদেরই অনুগামী হয়ে তিনি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন। কোথায় ছিল তাঁর জ্বালা ? সেই জ্বালা কি এতই তীব্রদাহ সৃষ্টি করেছিল যে, তা প্রশমিত করার তাগিদে তাঁকে বিপ্লব-সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল ?...

উত্তরপ্রদেশের আলিগড় জিলায় 'মুরসাল' নামক জনপদ। মোগল বাদশাহের আমলে ঐ জনপদে মহেন্দ্রপ্রতাপের পূর্বপুরুষেরা 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁদের শেষ বংশধর ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় পৈত্রিক রাজ্য হারালেন। কিন্তু খেতাবটি তাঁর বংশ-পরম্পরায় রয়ে গেল। জীবনধারণের জন্য পরাজিত রাজাকে

দেওয়া হল ছু'শ গ্রাম। ঐ বংশে ১৮৮৬ সালের ১লা ডিসেম্বর মহেন্দ্রপ্রতাপ জন্মগ্রহণ করলেন। পরবর্তী যুগে সেই শিশুই দেশখ্যাত বিপ্লবী-নায়ক রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ নামে পরিচিত হলেন। তিনি ছিলেন পিতার তৃতীয় পুত্র।

মহেন্দ্রকে তাঁর তিন বছর বয়সে হাথ্‌রাসের রাজা দত্তক-পুত্র রূপে গ্রহণ করলেন। হাথ্‌রাসের রাজার ছুইটি রাণী। কিন্তু কারো সন্তান ছিল না। মহেন্দ্রকে উভয় রাণীই পরম বাৎসল্যে বুকে তুলে নিলেন। এই মাতৃদ্বয়ার আকর্ষণেই তিনি তাঁদের কাছে বৃন্দাবনে ঘুরে-ফিরে চলে যেতেন।···

হাথ্‌রাস-বংশও ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করে 'রাজ্য' হারিয়ে জমিদার-শ্রেণীতে পরিণত হয়। কাজেই, জ্ঞান হবার শুরুতেই রক্ত তাঁর ব্রিটিশদ্রোহিতায় টগ্‌বগ্‌ করছিল।···

১৯০৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশন দেখতে মহেন্দ্রপ্রতাপ কলকাতা এলেন। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে। দাদাভাই নৌরজি কংগ্রেস অধিবেশনের নির্বাচিত সভাপতি। কিন্তু অরবিন্দ-বিপিনচন্দ্র-তিলক প্রমুখ গরমপন্থী-নেতাদের শাণিত-বিরোধ-আশঙ্কায় ভীত নরমপন্থী সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ। নরম-গরমের সম্ভাবিত এ-লড়াই ভারতবর্ষের দূর-দূরান্ত থেকে তরুণ বিদ্রোহীদের কলকাতায় টেনে এনেছে। তাছাড়া বক্তৃতার মঞ্চ ছেড়ে ব্যাপক লড়াই-এর তূর্য বেজে উঠেছে মাঠে-ময়দানে, রাস্তায়-ঘাটে। বেজে উঠেছে বাঙালীর ঘরে ঘরে। রাজার বিদ্রোহী মন সে-আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেল। তিনি স্বদেশী-গ্রহণ এবং বিদেশী-বর্জনের প্রতিজ্ঞায় প্রবুদ্ধ হলেন।···বিবাহসূত্রেও তিনি নাভার রাজাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন। নাভা-নৃপতিও কোন কারণে ইংরেজের চক্ষুঃশূল হওয়ায় গদিচ্যুত হন। কাজেই, রাজার সকল দিকের আত্মীয়বর্গই

ইংরেজ-বিরোধী হওয়ায় রাজার বিদ্রোহী-চিত্তকে প্রশমিত করার চেষ্টা কোন সূত্র থেকেই হয়নি। খাপ্-খোলা তলোয়ার—কোষবদ্ধ হয়ে থাকার জন্যে তাকে সৃষ্টি করেননি বিধাতা।···

ইতিপূর্বে রাজা ভারতবর্ষ ভাল করে ঘুরে দেখেছেন। ১৯০২ সালে তিনি চীন ও জাপান ঘুরে এসে স্থাপন করলেন 'প্রেম মহাবিদ্যালয়'। সেখানে বিনাব্যয়ে ছাত্রদের কারিগরি-বিদ্যা শেখানর ব্যবস্থা হল।

রাজা বিপ্লবী। রাজা মানুষের মধ্যে ছোট-বড়, ভেদ-বিভেদ বরদাস্ত করতে পারেন না। রাজা তাই মেথরমুর্দাফরাস টেনে এনে সভা করে তাদের হাতে জল খেলেন, 'জাত-পাত-তোড়ক' আন্দোলন শুরু করে দিলেন। এতে আচারনিষ্ঠদের বিরাগভাজন হলেও বিপ্লবীর ধর্ম থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। কাজে ও প্রচারে তিনি বিবেকানন্দের অনুগামী, গান্ধীজির পুরোযায়ী। তিনি জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধতা তীব্রবেগে করে চললেন। প্রকাশিত হল তাঁর 'প্রেম' নামে একটি কাগজ। প্রচুর টাকা দান করলেন 'প্রেম মহাবিদ্যালয়' ও তাঁর গ্রামের শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে। তারপর ১৯১৪ সালে দেরাদুনে বসে বের করলেন তিনি 'নির্মল সেবক'। এ-কাগজেই যুদ্ধকালে জার্মান্দের পক্ষে কিছু বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজ-শাসক তা সহ্য করেননি। কাগজখানার অর্থদণ্ড হয়।···

১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে প্রথম মহাযুদ্ধ বেধেছিল। স্বচক্ষে যুদ্ধপরিস্থিতি দেখে তা বুঝবার আগ্রহে রাজা চলে যান ইউরোপে। ইতিমধ্যে তাঁর 'প্রেম মহাবিদ্যালয়'ও পুলিশের কু-নজরে পড়ে গেছে।···

রাজা চলে এলেন জেনেভায়। শ্যামজি কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাঁর প্রেম মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক—প্রখ্যাত বিপ্লবী সুরেন কর ইতিমধ্যে আমেরিকায় চলে এসেছেন। রাজা সুইজার্ল্যাণ্ডে এসে বিপ্লবী-নেতা যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নিরালম্ব স্বামীর) স্নেহধন্য সতীর্থ পাঞ্জাবের দুর্জয় বিপ্লবী লালা হরদয়ালের সঙ্গে মিলিত হন। তৎপর কাইজার-এর সঙ্গে ভারত সম্পর্কে কথাবার্তা বলার তাগিদে তিনি বার্লিন শহরে এসে গেলেন। সেটা ১৯১৫ সাল। ভারতীয়-বিপ্লবীদের 'ইণ্ডিয়া কমিটি' সাদরে রাজাকে গ্রহণ করলেন। কাইজার-এর সঙ্গে রাজার দেখা হল। জার্মান্-দপ্তর থেকে আফগানিস্তানের আমীরের কাছে তাঁকে পরিচয়-পত্র দেওয়া হল, আর দেওয়া হল তাঁকে 'রেড্ ঈগল্' নামক জার্মান্-সেনাবিভাগের সম্মানসূচক পদক।

জার্মানি থেকে সে-বছরই কাবুল যাত্রা করলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ। সঙ্গে রইলেন একজন জার্মান্-রাষ্ট্রপ্রতিনিধি ও বিপ্লবী বরকৎউল্লা। কন্সটান্‌টিনোপল্ হয়ে তুর্কির যুদ্ধমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে রাজা এলেন কাবুলে।

তুর্কি তৎকালে জার্মানির পক্ষে লড়ছে। আফগানিস্তানের আমীর হাবিবউল্লাকে ইংরেজের বিরুদ্ধে ঠেলে দেবার চেষ্টায়ই রাজাকে কাবুলে পাঠান হয়েছে। কাবুলে তখন ইংরেজের অনুরোধে কিছু ছাত্র, যুবক ও মৌলানা ওবেদুল্লাকে আফগান-সরকার কারা-বন্দী করে রেখেছে। রাজার অনুরোধে হাবিবউল্লা তাঁদের মুক্তি দিলেন।

রাজার সঙ্গে ভারতীয় সমস্যা নিয়ে আমীরের পৃথকভাবে আলোচনা হতে থাকে। সশস্ত্র-বিপ্লবে ব্রিটিশের হাত থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবার চেষ্টায় আমীরের সাহায্য

চাইলেন মহেন্দ্রপ্রতাপ। জার্মানির মত তাঁর দেশকেও এ-ব্যাপারে এগিয়ে আসার আবেদন জানান হল। এশিয়াবাসীর মুক্তির জন্যে এশিয়াবাসীর কর্তব্য সম্পর্কে এই আবেদন ব্যর্থ হল না। অবস্থা অনুকূল বুঝেই স্বাধীনতা-সংগ্রামকে পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে ১৯১৫ সালের ১লা ডিসেম্বর কাবুলে স্থাপিত হল স্বাধীন-ভারতের 'ইণ্টারিম্ গভর্ণমেণ্ট'—অর্থাৎ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ হলেন সেই সরকার তথা ভারত-প্রজাতন্ত্র-রাষ্ট্রের প্রথম সভাপতি। বরকৎউল্লা হলেন তার স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী। আরো কতিপয়কে নানা বিভাগীয় সচিবের পদে বৃত করা হল। তন্মধ্যে মহম্মদ আলি, আল্লা নেওয়াজ প্রমুখের নাম পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের অন্তর্বর্তীকালীন এই সরকারকে স্বীকার করে নেয় জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গারি, তুর্কি প্রভৃতি স্বাধীন রাষ্ট্র। মহেন্দ্রপ্রতাপ এবং তাঁর 'ইণ্টারিম্ ভারত-সরকার' জোর কদমে আন্তর্জাতিক-ডিপ্লোমেসির ক্ষেত্রে বিচরণ করতে থাকেন।...

এদিকে ১৯১৭ সালে তুর্কির পরাজয় ঘটল। আফগান-আমীর তখন ভয়ে ইংরেজ-ঘেঁষা হতে থাকলেন। মহেন্দ্রপ্রতাপ তাই বাধ্য হয়ে কাবুল ত্যাগের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। বন্ধুদের সাহায্যে কিছু পরে সোভিয়েট-সরকার তাঁকে রুশরাজ্যে ঢুকবার অনুমতি দিল। রুশে ট্রট্স্কি প্রমুখ উচ্চাঙ্গের নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিনি জার্মানিতে চলে এলেন।

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মত মহেন্দ্রপ্রতাপও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক-স্বাধীনতাই চাইলেন সর্বাগ্রে। বিশ্বমজদুর-স্বাধীনতার নৌকায় উঠে মাঝপথে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের স্বপ্নে তিনি বিশ্বাস করতে

পারলেন না। কাজেই, রুশে অবস্থানকালেই মানবেন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ঘটেছিল।

দ্রষ্টব্য: এ-অধ্যায়ের তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে নিম্নোক্ত গ্রন্থ ও ব্যক্তি-বিশেষের কাছ থেকে: 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলায় স্বদেশীযুগ', 'বাঙলায় বিপ্লববাদ', 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি', 'সবার অলক্ষ্যে', 'Sedition Committee Report,' 'Young India' (Lajpat Rai), 'Roll of Honour', হিন্দী সাপ্তাহিক 'জনতা', এবং বিপ্লবী-নেতা বি. এন. আগরওয়াল (জৌনপুর)।

॥ বার ॥

বাধ্যতামূলক খণ্ডযুদ্ধ

যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর-যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষের বিপ্লবধারাকে প্রথম পর্ব থেকে দ্বিতীয় পর্বে তুলে দিলেন। পঞ্চ-বীরের সম্মুখ-সমরে জীবনদান বিপ্লবীদের কানে কানে এক নূতন বার্তা শুনিয়ে গেল। তাঁরা জানলেন যে, আক্রান্ত হলে যুদ্ধ করে মরতে হবে—তা শত্রুর সংখ্যা হোক না অসম।

১৯১৫ সালের বালেশ্বর-যুদ্ধের পর তাই বাঙলাদেশে আরো খণ্ডযুদ্ধের সূচনা দেখা গেল। এগুলো সবই বাধ্যতামূলক যুদ্ধ—যাকে বলে 'ফোর্স্‌ড্ ফাইটিং'।

সিরাজগঞ্জে সংঘর্ষ

পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমা। উক্ত মহকুমার আটঘরিয়া থানার একটি গণ্ডগ্রাম। নাম তার 'তেনিজনা'।·· সেই গ্রামে অনুশীলন-সমিতির একটি আশ্রয়কেন্দ্র ছিল পলাতক বিপ্লবীদের জন্যে।···

সেটা ১৯১৭ সাল। উক্ত আশ্রয়কেন্দ্রে তখন অবস্থান করছিলেন অনুশীলনেরই পলাতক-কর্মী নিকুঞ্জ পাল ও গোবিন্দ কর। যেভাবেই হোক পুলিশের কানে এ-আস্তানার সংবাদ পৌঁছে গেছে। তাই সহসা এক গভীর রাতে ছুটে এল এক ইউরোপীয় পুলিশ-কর্তা সদলবলে। ঘেরাও করল 'তেনিজনা'র শেল্টারটি। উভয়পক্ষের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠল। উভয়পক্ষেই কেউ কেউ আহত হলেন। গোবিন্দ করের দেহে সাত-সাতটি গুলি ঢুকে গেছে, নিকুঞ্জ পালও অনাহত নন।

গোবিন্দ কর চলৎশক্তিরহিত—কাজেই ধৃত হলেন। নিকুঞ্জ পাল পাট ক্ষেতে নেমে পালাবার চেষ্টা করেও পরিশেষে গ্রেপ্তার হন।··· বিচারে নিকুঞ্জ পালের বার বছর এবং গোবিন্দ করের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ হয়।···এই গোবিন্দ করই উত্তরকালে 'কাকোরী-ষড়যন্ত্র মামলা'য় অভিযুক্ত প্রখ্যাত বিপ্লবীদের অন্যতম রূপে বিশ বছর দ্বীপান্তরের সাজা পেয়েছিলেন।···

গৌহাটির যুদ্ধ

গৌহাটির আটগাঁও-আশ্রয়কেন্দ্রটি অনুশীলন-সমিতির পলাতক কর্মীদের গোপন আস্তানা। উক্ত সমিতির গৌহাটি শহরেই ফাঁসিবাজার-বাড়িতে ছিল আরো একটি আশ্রয়স্থল। উভয় কেন্দ্রেই তৎকালে নামী বিপ্লবীরা পলাতক হয়ে অবস্থান করছেন।

প্রথম আশ্রয়কেন্দ্রে আছেন 'দলন্দা-হাউস' থেকে পালিয়ে-আসা বিপ্লবীদ্বয় নলিনীকান্ত ঘোষ ও প্রবোধ দাশগুপ্ত, আছেন প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (উত্তরকালে পাকিস্তানের মন্ত্রী), এবং মণীন্দ্র রায় (অধুনা বিশ্বভারতীর হিসাব-রক্ষক)। এঁরা সকলেই ছিলেন অনুশীলন-সমিতির সভ্য। এঁদেরই সঙ্গে ছিলেন যুগান্তর-দলের নামকরা সভ্য পলাতক অমর চট্টোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় আশ্রয়কেন্দ্র ফাঁসিবাজার-বাড়িতে ছিলেন অনুশীলনের নলিনী বাগ্‌চি ও তারাপ্রসন্ন দে এবং যুগান্তরের নরেন ব্যানার্জি।

যুগান্তর ও অনুশীলনের মধ্যে যত দলাদলিই থাক, যুদ্ধকালে বা আপদে-বিপদে তাদের মিলন ঘটেছে। এমনি সুরেই উভয়দলের কর্মীরা যুদ্ধ-বীণায় তার বেঁধে দুর্গম পথে একত্রে কদম বাড়িয়েছেন।···

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, গৌহাটি আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থিত পলাতকেরা উভয় দলেরই প্রখ্যাত বিপ্লবী, পুলিশের হিসেবে ভয়ঙ্কর লোক।··· অমর চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে তাঁর সহ-পলাতক বিপ্লবী মণীন্দ্র রায়ের কাছ থেকে জানা যায় যে, আটগাঁও-আশ্রয়কেন্দ্রে অমরেন্দ্র

চ্যাটার্জিকে 'পাদ্রী'র ছদ্মবেশে রাখা হয়েছিল। কারণ, তিনি ছিলেন দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ এবং সুগৌর সুপুরুষ। মুখের চেহারা গাম্ভীর্যপূর্ণ। হাজার মানুষের মধ্য থেকে তাঁকে এক পলকে আলাদা করা যায়। পরনে পাদ্রীর আলখাল্লা এবং বুকে ক্রুশ-চিহ্ন—সত্যি তাঁকে একজন শ্বেতাঙ্গ ধর্মযাজকের মতই দেখাত।...মণীন্দ্রবাবু আরো জানালেন যে, যুগান্তর-দলের সতীশ চক্রবর্তিও ছদ্মবেশেই সেখানে ছিলেন। তবে গৌহাটি-সংঘর্ষের অনতিপূর্বেই অন্যত্র সরে যান বলে উক্ত সংঘর্ষে তিনি শরিক হতে পারেননি।...

আটগাঁও-কেন্দ্রে চব্বিশ ঘণ্টাই বিপ্লবীরা পালা করে পাহারা দিতেন। ঘটনার দিন—অর্থাৎ ১৯১৮ সালের ৭ই জানুয়ারি—রাত প্রায় আড়াইটায় মণীন্দ্র রায় পাহারা দিচ্ছেন। এমন সময় দুয়ারে আওয়াজ হল 'ঠক্, ঠক্, ঠক্!' মণীন্দ্রবাবু ফাঁক-ফোকর দিয়ে লক্ষ্য করে বুঝলেন যে, গৃহটি সশস্ত্র পুলিশদল ঘিরে ফেলেছে।...

পুলিশবাহিনীর অধিকর্তা মিঃ ফেয়ার্‌ওয়েদার। তিনি দরজায় আঘাত করছেন আর বলছেন: 'খোলো, খোলো!'...

ইতিমধ্যে নলিনীকান্ত ঘোষের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা 'ফল্ ইন্' করছেন। তাঁরা স্থিরপ্রতিজ্ঞ—সম্মুখ-যুদ্ধে মৃত্যুকে বরণ করবেন।...

ফেয়ার্‌ওয়েদার আবার চিৎকার করে উঠলেন: 'Open, please.'

নলিনী ঘোষ উত্তর দিলেন: 'It is open. Enter and be killed.'

এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গেই দুয়ার খুলে গেল, প্রথম গুলিবর্ষণ করলেন নলিনীবাবু। শুরু হল উভয়পক্ষে গুলি-বিনিময়। পুলিশ এজন্যে তৈয়ের ছিল না। তারা জানে না যে, বিপ্লবীদের টেক্‌নিক্ বদলে গেছে। তাঁরা পুলিশ এলেই যে যুদ্ধ করবেন, তা ফেয়ার্‌ওয়েদার আঁচ করতে পারেননি। কাজেই, অসম্পূর্ণ তাঁর আয়োজন বলে তাঁকে হটতে হল। তিনি দলবল নিয়ে সরে পড়লেন।

বিপ্লবীরা ৭ই জানুয়ারির (১৯১৮) এই সংঘর্ষে জয়ী হলেন। এ-জয় সংকল্পদৃঢ় শৌর্যের জয়।···

বিপ্লবীরা জানতেন যে, পুলিশ অধিক-সংখ্যক সেপাই নিয়ে আবার আসবে। সুতরাং এ-স্থান ত্যাগ করে নিকটস্থ 'নবগ্রহ' পাহাড়ে উঠে যেতে হবে। ওখান থেকে যুদ্ধ করা সহজতর।

বাড়ির উত্তর দিকে একটি খাসিয়া-বৃদ্ধার গৃহ। সে-গৃহের মধ্য দিয়ে সকলে পালিয়ে গেলেন। অমরেন্দ্রবাবুকে নিরাপদে গৌহাটির বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হল।···

রাতের যুদ্ধে পুলিশের অন্তত জনদশেক ঘায়েল হয়েছে বলে সংঘর্ষের নেতা নলিনীকান্ত ঘোষের ধারণা। ইতিমধ্যে স্থির হয়েছিল যে, ৯ই জানুয়ারি নবগ্রহ পাহাড়ের নিকট দু'টি আস্তানার পলাতক-দলই মিলিত হবেন।···মিলিত হয়েছিলেনও তাঁরা।···পুলিশ তিন দিক থেকে পাহাড়টি ঘেরাও করেছে। নলিনীকান্ত হুঙ্কার দিয়ে বন্ধুদের বললেন : 'এবার আমি পুলিশদের আটকাব— তোমরা সেই ফাঁকে পালিয়ে যাও।'·· বন্ধুরা আপত্তি জানালে নেতা তাঁদের চলে যাবার হুকুম দিলেন।···

নলিনীবাবু অনন্যচিত্তে পুলিশদলকে লক্ষ্য করে একক গুলি চালাতে থাকলেন।···

প্রবোধ দাশগুপ্ত, নলিনী বাগ্‌চি, তারাপ্রসন্ন দে, মণীন্দ্র রায়, প্রভাস লাহিড়ী ও নরেন ব্যানার্জি পালাতে লাগলেন। একটা বিলের পাশ দিয়ে কয়েকজন ছুটছেন। পুলিশও ধাওয়া করেছে তাঁদের। নরেন্দ্রকে ধরে ফেলল পুলিশ। তারাপ্রসন্ন ছুটতে-থাকার কালে একবার পেছনে তাকাতেই পুলিশের গুলি এসে লাগল তাঁর গায়ে।

পড়ে গেলেন বিলের জলে তরুণ কিশোর। পুলিশ তাঁকেও গ্রেপ্তার করল। মণীন্দ্র রায়ের পায়ে যুদ্ধকালেই গুলির আঘাত লেগেছিল। একটি শ্মশানে বিশ্রাম নেবার কালে ঐ জখম দেখেই পুলিশ তাঁকে পাকড়াও করে বসল। ১০ই জানুয়ারি ছিল সেই দিনটির তারিখ।··· প্রভাস লাহিড়ীও গুলিবিদ্ধ অবস্থায় কামাখ্যা-মন্দিরে ধৃত হন। শুধু মাত্র প্রবোধ দাশগুপ্ত ও নলিনী বাগ্‌চি পলায়নে সমর্থ হলেন। পুলিশ তাঁদের খোঁজ পেল না।···

এদিকে নলিনী ঘোষ সার্থক নেতার গৌরবে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধদান করে পুলিশকে বিব্রত করতে থাকেন। সকলে সরে যাবার পর গুরুতরভাবে অজস্র জখমে জর্জরিত হয়ে নলিনীকান্ত ঘোষ অবশেষে বন্দী হলেন। তাঁর হাতে তখনো ছিল ৩৮০ বোর্-এর একটি রিভল্‌বার। গুলি ফুরিয়ে গেছে।···

বন্দীদের বিরুদ্ধে যথারীতি মামলা হল। সাজা হল সবারই। সাত বছর থেকে তিন বছর কালের মধ্যে নানা ক্রমে বিভিন্ন জনের ঘটল দণ্ডভোগ। মামলার সময় পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, গৌহাটি খণ্ডযুদ্ধে তাদের (পুলিশদের) আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল তিরিশ।···

কলতাবাজারের (ঢাকা) লড়াই

ঢাকা শহরের একটি অপ্রশস্ত গলি। নাম তার কলতাবাজারের গলি। সাধারণ মুসলমানদের পাড়া। কাজেই, আই-বি পুলিশের সন্দেহ-মুক্ত স্থান। এই গলিতে ছোট্ট একটি বাড়ি ভাড়া নিয়েছেন হরিচৈতন্য দে। হরিচৈতন্যের বাড়ি বরিশাল। তিনি অনুশীলন-সমিতির তৎকালীন গৃহী-সদস্য। তাঁর শেল্টারেই বাস করছেন গৌহাটি-যুদ্ধ-প্রত্যাগত নলিনী বাগ্‌চি এবং অনেক দিনের পলাতক তারিণী মজুমদার। তারিণী কুমিল্লার লোক, নলিনীর বাড়ি মুর্শিদাবাদ।···

যেভাবেই হোক পুলিশ এ-আস্তানারও খোঁজ পেয়ে গেল। সেদিনটি ১৯১৮ সালের ১৫ই জুন—শেষরাতে কলতাবাজারের বাড়ি ঘেরাও করেছে পুলিশবাহিনী। পুলিশ-সুপার স্বয়ং হাজির। বিপ্লবীরা পালাবার চেষ্টা করলেন না। কারণ, তাঁরা এখন যুদ্ধ করে মৃত্যু-বরণের ব্রত উদ্‌যাপন করবেন।

শুরু হল উভয়পক্ষের লড়াই। অসম যুদ্ধ। কিছুক্ষণ গুলি চলার পর বিপ্লবীদের রিভল্‌বার স্তব্ধ হয়ে গেল। পুলিশ নির্ভয়ে তখন গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল। ঘরে ঢুকে তারা দেখল যে, পুলিশের গুলির আঘাতে দু'টি যুবক অর্ধমৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁদের দেহ, তাঁদের বেশবাস, ঘরের মেঝে। সম্মুখে পড়ে আছে আগ্নেয়াস্ত্র।...

পুলিশ তরুণদ্বয়ের পরিচয় জানে না। মৃত্যুর পূর্বে সেটুকু জেনে নেওয়া তাদের প্রয়োজন। তাই অর্ধচেতন দু'টি মানুষের কানের কাছে মুখ নিয়ে পুলিশের কী চেষ্টা তাঁদের কাছ থেকে কথা পাবার! আহতদের সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত, রক্তক্ষরণে অবসন্ন সকল সত্তা—তবু পুলিশের প্রশ্নের বিরাম নেই, নির্যাতনের শেষ নেই। উত্যক্ত বিপ্লবীদ্বয় মৃত্যুক্ষণে শুধু শেষকথা বললেন: 'শান্তিতে মরতে দাও!'...

পরম শান্তি নেমে এল মহান্ মৃত্যুর সঙ্গীতে। 'শহিদে'র বর্ণাঢ্য বিদায় ঊর্ধ্বলোকে চলে গেলেন নলিনীকান্ত বাগ্‌চি ও তারিণীপ্রসন্ন মজুমদার। ভারতবর্ষের শহিদ-তীর্থে আরো দু'টি বীরের ইতিহাস লিখিত হল।...

এ-খণ্ডযুদ্ধে পুলিশের পদস্থ কর্মচারী বসন্ত মুখার্জি গুরুতররূপে আহত হন। তাছাড়া আরো কিছু সেপাই-সান্ত্রীও প্রাণ দেয়, এবং জখম হয়।

হরিচৈতন্যবাবুও বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করেছিলেন।

উনিশ শত-আঠার সালের পর

১৯১৮ সালের পর বিপ্লবের ইতিহাস 'য়্যাক্‌শান্‌'-বিহীন থাকে কিছুদিন।

১৯১৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ থেমে গেছে। ফাঁসি, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, গুলির মুখে মৃত্যু এবং দীর্ঘকালীন কারাদণ্ড ও বিনাবিচারে বন্ধন ইত্যাদির চাপে ভারতবর্ষের যৌবন পিষ্ট। যে ক'জন বিপ্লবী দেশের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে পলাতকের দুঃসাহসে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তাঁরাও নানা খণ্ডযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছেন। সুতরাং ব্রিটিশের হিসেবে বিপ্লব-আন্দোলন পরাভূত, এবং দেশে শান্তি পুনর্স্থাপিত।...

যুদ্ধ থেমে যাবার সাথে সাথে সরকারী রেওয়াজ মত ব্রিটিশ-সম্রাটও 'এ্যাম্‌নেস্টি' ঘোষণা করলেন। অনেক কয়েদী মুক্ত হল, অনেকের কয়েদকাল কমান হল কিছু কিছু 'রেমিশান্‌' দিয়ে।

এদিকে রাজনীতিকক্ষেত্রেও যুদ্ধজয়ের আনন্দে ভারতীয় প্রজাদের কিছু উপঢৌকন দেবার ইচ্ছা হল ইংরেজ-শাসকদের। অনেক জল্পনা-কল্পনা করে 'মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড্‌ রিফর্ম' জারি করে দিলেন ভারত-সম্রাট। রিফর্ম্‌ জারি হবার সাথে সাথেই রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদানের হিড়িক লেগে গেল। বিনাবিচারে আবদ্ধ হয়ে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা প্রথমে বেরুতে লাগলেন। ১৯২১ সালের মধ্যেই বিপ্লবী-নেতারা ঘরে ফিরে এসে দেখলেন, ভারতবর্ষের চেহারাও ফিরে গেছে। রাজনৈতিক-গগনে তখন আবির্ভূত হয়েছেন একটি পুরুষ—যাঁর বাণী স্বতন্ত্র, যাঁর পথ স্বতন্ত্র, যাঁর আহ্বান স্বতন্ত্রসুরে আসমুদ্র-হিমাচল প্রত্যেকটি নরনারীর কানে ধ্বনিত।...

সদ্যমুক্ত-বিপ্লবী বিস্মিত নয়নে রাজনৈতিক-গগনে উদ্ভাসিত এই নবারুণের কিরণ-বিস্তার লক্ষ্য করে চললেন।

॥ তের ॥

উদ্যোগ পর্ব

[বিপ্লবের তৃতীয় স্তরে উত্তরণের পূর্বে]

১৯২১ সালের মধ্যে ভারতবর্ষের জেলগুলো রাজবন্দী-মুক্ত হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন কারা-যন্ত্রণা ভোগ করে আসার পর বিপ্লবীরা নূতন সমস্যা ও নূতন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁদের বয়স বেড়ে গেছে, অভিজ্ঞতাও বেড়েছে, রাজনৈতিক প্রজ্ঞাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁরা দেখছেন, এযাবৎ জনসাধারণের কাছে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করা হয়নি, তাঁদের সকল কাজ গোপনে মুষ্টিমেয় তরুণগোষ্ঠীর রাজ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। একদা এর সার্থকতা অবশ্যই ছিল। কিন্তু সে-যুগ পেরিয়ে বিপ্লবের 'দ্বিতীয় যুগে' দেশকে তুলে ধরেছিলেন যতীন্দ্রনাথ। উক্ত 'দ্বিতীয় যুগ'ও আজ অপগত। এখন জনগণ সক্রিয় অংশীদার না হলে বিপ্লব-যজ্ঞের বহ্নি-দীপ্তি যে বিচ্ছুরিত হবে না, সে-কথা বিপ্লবী-নেতাদের অজানা নয়। অথচ কোথায় তাঁদের সংগঠন? কোথায় তাঁদের ক্ষমতাবিধৃত হবার সুযোগ? পুলিশের কাছে নেতারা একান্ত জানিত, অধিকাংশ কর্মীও। সংগঠন করার অবকাশ তাঁদের কে দেবে? গোপন-প্রস্তুতি এ-সব দলের পক্ষে অসম্ভব।...

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-গগনে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ঘটে গেছে। স্বাধীনতা-যুদ্ধের টেক্‌নিক, পটভূমি ও রূপ বদলে গিয়ে অভাবিত জীবন-স্রোতে বহমান সংগ্রাম সূচিত হয়েছে সারা ভারতবর্ষে। দীনদরিদ্র-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত নরনারী, শিশু-বৃদ্ধ এ-যুদ্ধের সামিল হয়েছে। কী সে মত্ততা, কী সে ত্যাগবরণ-স্পৃহা, কী উদ্দাম ও অপূর্ব আবেগ! অবাক নয়নে সকলে তাকিয়ে

দেখল, দু'দিন পূর্বেও পর্দার আড়ালে বসে যে-সমাজের নারীরা সভা-সমিতিতে যোগদান করতেন—তাঁরাই পর্দা ছিঁড়ে ফেলে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছেন, পথের মিছিলে বেরিয়ে পড়েছেন!···

বিপ্লবী-নেতারা ধীর-মস্তিষ্কে দেশের নাড়ী স্পর্শ করতে চাইলেন। কিন্তু সশ্রদ্ধায় মহাত্মার অবদান স্বীকার করেও তাঁরা তাঁর মত ও পথ গ্রহণ করতে পারলেন না। হৃদয় দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীর হৃদয় জয় করা যেতে পারে, এ তো বিপ্লবীর কাছে বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়! যিশুখ্রীষ্ট রোমীয়-সাম্রাজ্যের কর্ণধারদের হৃদয় জয় করতে পারেননি, গান্ধীজি যিশুকে অতিক্রম করে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ধুরন্ধরদের হৃদয় স্পর্শ করবেন, এ আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র।

অথচ বিপ্লবীরা আসমুদ্র-হিমাচলের এই অপূর্ব জন-জাগরণকে উপেক্ষা করতেও পারেন না। তাঁরা হৃদয়ঙ্গম করলেন যে, একদিক থেকে এই অহিংস-আন্দোলন তাঁদের কর্মে সহায়ক হতে পারে। এই অহিংস-বাস পরিধান করে, অহিংস-বর্ণ অঙ্গে মেখে ছদ্মরূপে তাঁরা অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবেন। পুলিশকে ধোঁকা দেবার এ এক সহজ উপায়। অহিংস-আন্দোলনকে 'ক্যামোফ্লাজ' করে দল বেঁধে ওতে ঝাঁপিয়ে পড়া তাই মন্দ নয়। বিপ্লবের ক্যাডার্ তৈরি করার এ এক অঘটনীয় সুযোগ।···

মহাত্মা গান্ধী চতুর রাজনীতিক। বাঙলাদেশ ঘুরে এবং বাঙালীর মন পরখ করে তিনি বুঝেছিলেন যে, এখানকার মাটিতে বিপ্লবীদের বাদ দিয়ে কোন সংস্থা, মতবাদ বা আন্দোলন গড়ে তোলা অসম্ভব।···

এদিকে মহাত্মার আবেদনে বাঙলার অবিসম্বাদী নেতা চিত্তরঞ্জন অভূতপূর্ব সাড়া দিলেন। এককথায় রাজার ঐশ্বর্য ধূলায় ছড়িয়ে দিয়ে তিনি পথে নেমে এলেন দেশমাতৃকার মুক্তি-কামনায়। সংগ্রামের পুরোভাগে পত্নী-কন্যা-পুত্রের হাত ধরে তিনি দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলেছেন। সে কী আলোড়ন বাঙালীর রক্তে! এই চিত্তরঞ্জনই

তাঁর তারুণ্যে কুশলী ব্যারিষ্টাররূপে ভারতবর্ষের বিপ্লব-গুরু শ্রীঅরবিন্দকে কারা-মুক্ত করার সাধনায় অসাধ্যসাধন করেছিলেন। আজ ১৯২১ সালে তিনিই আবার তাঁর ধনমানসম্পদ, এমন কি 'ব্যারিষ্টারি' পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে মহাভিক্ষুকের অমিত বীর্যে দেশজননীর শৃঙ্খলমোচনের সাধনায় অসাধ্যসাধনে ব্রতী হয়েছেন।···মুহূর্তে দেশ তাঁকে 'বন্ধুর' আসনে গ্রহণ করল। 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' সকলের প্রাণের মানুষ হয়ে গেলেন।···দেশবন্ধুর ছিল অসাধারণ সাংগঠনিক-প্রতিভা। তিনি বুঝেছেন যে, বিরাট দল গড়া হল তাঁর প্রথম কাজ। কিন্তু কি করে তা সম্ভব? কে নেবে এই দায়িত্ব?···তাকিয়ে দেখলেন—যাঁদের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং ভগবানও এই বাঙলাদেশে এক পা এগুতে পারেন না, তাঁরাই রয়েছেন দূরে সরে। তাঁরা কে? তাঁরা হলেন বাঙলার বিপ্লবীগোষ্ঠী। বাঙলার তারুণ্য-শক্তি তাঁদেরই আদর্শে প্রভাবিত। দেশবন্ধু জানেন যে, এই বিপ্লবীদের টেনে না আনলে তাঁর সকল আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যাবে, গান্ধীজির সর্বভারতীয় আন্দোলনও বাঙলার অবদান বিহনে অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠবে।···

দেশবন্ধুর আহ্বান বিপ্লবী-দলও উপেক্ষা করতে পারেননি।··· তিনি যা বলেছিলেন, তার মর্ম এইঃ "তোমাদের অস্ত্র এবার তূণে ঢুকিয়ে আমাদের চলার পথে নেমে পড়; এতে তোমরা সর্বজনবিদিত হবে, বিশালতর পটভূমে তোমাদেরই প্রভাব বিকিরিত হবে, তারপর এ-পথে গন্তব্যে না পেঁছাতে পারলে তোমাদের পথেই তোমরা আরো শক্তিমান হয়ে সারা দেশকে সঙ্গী করে এগিয়ে যেয়ো; আখেরে লাভ হবে তোমাদেরই। কারণ, তোমরা আপোষহীন বিপ্লবী।"··· প্রত্যুত্তরে বিপ্লবীরা নিষ্ক্রিয় থাকলেন না।···

আবার বুদ্ধিমান গান্ধীজিও সশস্ত্র-বিপ্লবে বিশ্বাসীদের উদ্দেশে বললেনঃ "Had India sword, I would have asked her to draw it. But she had no sword—I ask her to adopt Non-Violent Non-Co-operation."

[ভারতবাসীর কটিদেশে তরবারি থাকলে তা কোষমুক্ত করতে বলতাম। কিন্তু তা নেই। তাই তাদের বলছি অহিংস-অসহযোগের পন্থা গ্রহণ করতে।]

গান্ধীজি আরো পরিষ্কার করে বললেন : "Non-Violence may be accepted as creed or policy. I am out to destroy this Satanic Government."

[অহিংসাকে বিশ্বাস বা কর্মপদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। আমি এই শয়তান গভর্ণমেণ্টকে ধ্বংস করার জন্যে বদ্ধপরিকর।]

বিপ্লবী-নেতারা অধিকাংশই ক্রমে স্থির করলেন যে, কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তাঁরা গণসংযোগ করবেন। বন্ধুদের বললেন গুপ্ত-সমিতি পুনর্গঠনের কাজ সংগোপনে দ্রুততালে চালিয়ে যেতে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আপাতত কোন সশস্ত্র-য়্যাক্‌শান্ যেন না হয়। দেশব্যাপী বিরাট সংগঠন ঐ কংগ্রেসের মাধ্যমে গড়ে তুলে একদিন সশস্ত্র-বিপ্লবের ডাক তাঁরা দেবেন; ইতিপূর্বে কারো প্ররোচনায়ই কোনবিধ য়্যাক্‌শান্ নয়।···

পরম উৎসাহে নেতারা এগিয়ে চললেন নূতন পথে, নূতনতর একটি এক্সপেরিমেণ্ট করার ধৈর্য নিয়ে। কিন্তু আগুন নিয়ে যাঁদের খেলা, বারুদের স্তূপে বসে যাঁদের কাজ, তাঁদের সহস্র চোখ না থাকলে উপায় নেই। বিপ্লবী-নেতাদের বোধহয় সহস্র চোখ ছিল না। কাজেই, অতি গোপনে, তাঁদেরই অনুগত তরুণবন্ধুদের কতিপয়ের চিত্তে যে তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অবিশ্বাস ধূমায়িত হয়ে উঠছিল, তা তাঁরা লক্ষ্য করেননি। লক্ষ্য হল সর্বপ্রথম ১৯২৩ সালে, যখন নেতা বিপিন গাঙ্গুলিকে উপেক্ষা করে তাঁর অনুগামী তরুণ-বিপ্লবী সন্তোষ মিত্র 'শাঁখারীটোলা পোস্ট-আপিস লুট' করার ব্যবস্থা করলেন। টাকা কিছুই পাওয়া গেল না, কিন্তু পোস্টমাস্টার নিহত হলেন। বরেন ঘোষ নামক এক তরুণের এ-ব্যাপারে বিশ বছরের সাজা হল। এখানে

উল্লেখযোগ্য যে, পোস্টমাস্টারের শোক-সন্তপ্তা বিধবা পত্নীই সরকারকে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন যে, বরেনের যেন ফাঁসি না হয়। কারণ, তাঁর স্বামীর অভাব কারো মৃত্যু দিয়ে পূরণ করা যাবে না।…ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট এই সহৃদয়া নারীর আবেদনেই বরেন ঘোষের ফাঁসির দণ্ড হ্রাস করেননি নিশ্চয়ই, তবে এ থেকে বাঙলার নারীর একটি অনিন্দ্য রূপ সহজে ধরা পড়ে।…

অতঃপর আরো দু'চারটি ছোটখাট য়্যাক্‌শান্ ঘটে গেল। ফলে, প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ও বহু নামী বিপ্লবী-কর্মী পুনরায় কারারুদ্ধ হলেন। ভাবী বিপ্লবের সংগঠন-স্বপ্ন চূর্ণ হয়ে গেল।

কৃপাণ ঝঞ্চনা

অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বিপ্লবীরা কারারুদ্ধ। তরুণদলের একাংশ প্রবীণদের সঙ্গে একমত ছিলেন না। তাঁদের ধারণায় প্রবীণেরা বিপ্লবের পথ থেকে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে দূরে সরে যাচ্ছিলেন। সেই ধারণা থেকেই তাঁদের বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহের প্রথম স্বাক্ষর জাঁকজমকে প্রকাশিত হল শাঁখারীটোলা য়্যাক্‌শানে। তারপরই ১৯২৪ সালে ঘটল এক দুঃসাহসী ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। 'Action begets action'—১৯২৪ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত তাই নেতাদের অবর্তমানেও শুনি তরুণ বিপ্লবীদের কৃপাণ ঝঞ্চনা।…

ডে'সাহেব-হত্যা

দুর্জয় শক্তির উপাসক যুগান্তরের তরুণ গোপীনাথ সাহা। ১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারি সকালবেলায় চৌরঙ্গীর বুকে গর্জে উঠল তাঁর হাতের আগ্নেয়াস্ত্র। স্যার চার্লস্ টেগার্ট্ ভ্রমে গুলি করেছেন তিনি একটি ইউরোপীয়কে। তাঁর নাম মিঃ ডে। টেগার্ট্ তৎকালে ছিলেন কলকাতার পুলিশ-কমিশনার। অতি বুদ্ধিমান ও দক্ষ ব্রিটিশ-

রাজপুরুষ। ইংরেজের অত বড় মিত্র এবং বিপ্লববাদের অত বড় সুদক্ষ শত্রু তেমন একটা দেখা যায় না।

এহেন টেগার্ট্‌কে খতম করার সংকল্পে গোপীনাথের আবির্ভাব ঘটলেও টেগার্ট্‌ কিন্তু রইলেন অক্ষত। রক্ত-ক্ষয়ে নিঃশেষিত হয়ে ব্রিটিশের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত করলেন মিঃ ডে। গোপীনাথ নির্বিকার। পরম স্থৈর্যে তিনি গ্রহণ করলেন ফাঁসির দণ্ড। শুধু বলেছিলেনঃ "ডে'র মৃত্যুতে আমি দুঃখিত। আমার আপসোস যে, টেগার্ট্‌ বেঁচে গেলেন। আমার আশা যে, আমার আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করার লোক পিছিয়ে নেই।"···

গোপীনাথের কর্মে আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থতার দুঃখ আছে। কিন্তু তাঁর মৃত্যু একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এ-মৃত্যু দেশবাসীর কাছে যেন শৌর্য-সাধনার ঝঙ্কার, শত্রুর বিরুদ্ধে উদ্যত অসির ঝলক। তারা কান পেতে শুনল মৃত্যুঞ্জয় বীরের শেষ-বাণীঃ "ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে আমার প্রত্যেকটি রক্ত-বিন্দু ছড়িয়ে দিক স্বাধীনতার বীজ!"

১৯২৪ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্সি জেলে বীর গোপীনাথের কণ্ঠ ফাঁসির বন্ধনে চিরতরে রুদ্ধ হ'ল। কিন্তু তাঁর অকথিত-বাণী গৌরবময় একটি বেদনার ছন্দে বাঙলার চিত্তে লালিত হতে থাকল।···

সেদিন প্রভাতে তরুণ সুভাষ গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলের গেটে। দাঁড়িয়েছিলেন বহুক্ষণ বাইরে। ফাঁসির পর চেয়ে আনলেন গোপীনাথের গায়ের চাদরখানা জেল-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে। মাথায় জড়িয়ে নিলেন সে-উত্তরীয়।···

সুভাষ সেকালে কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মসচিব। জেল-গেট থেকে তিনি একা আপিস-ঘরে ফিরে এসেছেন। দরজা ভেজান।

আপিস-কর্মীরা কেউ কেউ কাজ থাকা সত্ত্বেও ঘরে ঢুকতে সাহস পাচ্ছেন না। অনেক পরে একজন বন্ধু-স্থানীয় কর্মচারী দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন।···বেরিয়ে এলেন তিনি সসম্ভ্রমে, একটুও শব্দ না করে। তিনি দেখেছিলেন—দেয়ালে টাঙানো প্রকাণ্ড একটি ভারতবর্ষের মানচিত্রের সম্মুখে প্রায় ধ্যানস্থ মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন সুভাষচন্দ্র !···তাঁর কণ্ঠ থেকে গুন্‌গুনিয়ে গান বেরুচ্ছে :

> 'তোমার পতাকা যারে দাও
> তারে বহিবারে দাও শকতি।'

নয়ন অশ্রুসিক্ত।···বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত।···

গোপীনাথের ফাঁসি রাজনৈতিক তাৎপর্যে পূর্ণ। কেমন করে, সে-কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থে আমরা পাই : "তখন বাঙলার 'কংগ্রেস' বিপ্লবীদের হাতে এসে গেছে। তাছাড়া বিরাট পুরুষ দেশবন্ধু সিন্ধুসম হৃদয় নিয়ে কংগ্রেস-কর্মীদের শীর্ষে বসে আছেন। তাই কর্মীদের চেষ্টা ব্যর্থ হল না। সিরাজগঞ্জ প্রাদেশিক কংগ্রেস-সম্মেলনে পথ ও মতের অমিল থাকা সত্ত্বেও গোপীনাথের আত্মবলিদান ও বীরত্বের প্রশংসা করে তাঁরা একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অনুরূপ প্রস্তাব কংগ্রেস-শাসিত কলকাতা কর্পোরেশনেও নেওয়া হয়। এতে বিপ্লবীদের বীরচরিত্র প্রকাশ্যে প্রশংসা লাভ করে। দেশবাসী খুশি হয়, কিন্তু ইংরেজ চটে যায়। ততোধিক চটে যান মহাত্মা গান্ধী। তিনি দেখলেন যে, 'হিতে বিপরীত' হচ্ছে। কোথায় তাঁর অহিংসা-মন্ত্র গ্রাস করবে সহিংস-মতকে, তা না হয়ে সহিংস-পথই গিলে ফেলতে চাচ্ছে অহিংসার বাণীকে! গান্ধীজি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁকে তুষ্ট করার জন্যে অবশেষে কর্পোরেশন তাঁদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।"

('সবার অলক্ষ্যে', প্রথম পর্ব,—পৃঃ ৩২)

কিন্তু ১৯২৪ সালে যে-গান্ধী 'গোপীনাথ-প্রস্তাব' নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড করলেন, সেই গান্ধীকেই ১৯৩০ সালে ভগৎ সিংয়ের আত্মত্যাগের মর্যাদা দিতে হল জনমতের চাপে। গোপীনাথ হলেন ভগৎ সিংদের অগ্রদূত। সিরাজগঞ্জে গোপীনাথ-সম্পর্কিত প্রস্তাব লাহোরে গান্ধীজির কণ্ঠোচ্চারিত ভগৎ সিংদের শৌর্য-স্বীকৃতির সূচনা। গোপীনাথের ফাঁসি তাই রাজনৈতিক-তাৎপর্যে পরিপূর্ণ।...

কাকোরী স্টেশানে ট্রেন লুট

১৯২৫ সালে বাঙলার বাইরে ঘটল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শচীন সান্যাল, যোগেশ চক্রবর্তি প্রমুখের নেতৃত্বে উত্তর-ভারতে বিপ্লবী-সংস্থা পুনর্জীবিত ও সুদৃঢ় হয়ে উঠেছে। শচীনবাবুরাও প্রধান নেতাদের মত মান্য করতে পারেননি। হঠাৎ ৯ই আগস্ট (১৯২৫) রাত্রিতে কাকোরী রেল্ স্টেশানে ট্রেন আটকিয়ে গার্ড-এর কাছ থেকে টাকা-ভর্তি সিন্দুক ছিনিয়ে নেন এই সংস্থার কর্মীরা। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন পনের-ষোল জন। দুঃসাহসী এ-কাজ। মানুষ বিস্মিত হয়। বিপ্লব-শক্তির ক্ষণে ক্ষণে এরূপ স্ফুরণ ইংরেজকে বারে বারে চম্‌কে দেয়।

সচকিত পুলিশ খুঁজে-পেতে বহু ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে প্রসিদ্ধ 'কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করে। এ-মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে রাজেন লাহিড়ী, আসফাক্‌উল্লা, রামপ্রসাদ বিস্‌মিল, ঠাকুর রোশন সিং প্রমুখ বীরচতুষ্টয়ের ফাঁসির হুকুম হয়। রাজেন লাহিড়ী গোণ্ডা জেলে ১৯২৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন। ১৯শে ডিসেম্বর আসফাক্‌উল্লাকে ফয়জাবাদ জেলে, এবং রামপ্রসাদ বিস্‌মিলকে গোরখপুর জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়। আর রোশন সিং-এর ফাঁসি হয় নাইনি জেলে, ১৯২৭ সালেরই ২১শে ডিসেম্বর।

চারটি বীরের মৃত্যু-যাত্রা নির্ভীকতায় সুন্দর, ত্যাগবরণে মহনীয়। কিন্তু এ-প্রসঙ্গে কথিত একটি জননীর বীরত্ব-কাহিনী ভারতবর্ষের

শৌর্যময় ইতিহাসের এক অক্ষয় সম্পদ। তিনি হলেন রামপ্রসাদ বিস্‌মিলের মাতৃদেবী। পুত্রের ফাঁসির সংবাদ পেয়ে পূর্বদিন পিতামাতা এসেছেন তাঁর সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করতে। বীর রামপ্রসাদ—ভয়ডরহীন মৃত্যুযাত্রী রামপ্রসাদ—জননীর বেদনা কল্পনা করে সজল চোখে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু সজল চোখের অভ্যর্থনা মা'র ভাল লাগেনি। বললেন তিনি পুত্রকে প্রশান্ত নয়ন দু'টি তুলে : "তুমি কি ভয় পেয়েছ, বৎস? মৃত্যুকে সর্বোত্তম আনন্দে এবং সর্বাধিক সাহসে বরণ করার মুহূর্তে তুমি কি ভয় পেয়েছ?"

('Roll of Honour', P.—387)

পুত্র তখন বললেন : "তোমার দুঃখে আমার চোখ ভিজে গিয়েছে মা—আমার দুঃখে নয়। আমি পরমানন্দে 'শহিদ' হতে যাচ্ছি।"···

মা'র চোখে-মুখে তখন গর্বের দ্যুতি। বীর-জননী বীর-পুত্রের সান্নিধ্যে তখন ধারণ করলেন বিশ্বপালিনীর মূর্তি!···

'কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায়'ই গোবিন্দ কর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর লাভ করেন।···এ-মামলারই অন্যতম বিপ্লবী-আসামী ছিলেন **চন্দ্রশেখর আজাদ**। ১৯৩১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি এলাহাবাদের এ্যালফ্রেড পার্কে চন্দ্রশেখর আজাদ পুলিশ কর্তৃক আক্রান্ত হলেন। সশস্ত্র-সংগ্রামে তিনি মহান বীরের মাধুর্যে প্রাণ দান করে বালেশ্বর-যুদ্ধেব ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। কাকোরী-ষড়যন্ত্র সংশ্লিষ্ট এই পঞ্চ-শহিদের মূর্তি সে-যুগে মানুষের হৃদয়পটে প্রতিফলিত ছিল।··

আলিপুর জেলে আর একটি হত্যা

(ভূপেন চ্যাটার্জি)

১৯২৬ সালের ২৮শে মে একটি দুঃসাহসী ঘটনা ঘটে আলিপুর সেণ্ট্রাল্‌ জেলে।···১৯২৫ সালের শেষের দিকে দক্ষিণেশ্বরে একটি বোমার কেন্দ্র আবিষ্কার করে পুলিশ। এ-সূত্রে ধরা পড়েন যুগান্তর ও অনুশীলনেরই কতিপয় বিদ্রোহী তরুণ। তাঁদেরই অন্যতম

অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরি। তাঁরা সবাই আলিপুর জেলে বন্দী ছিলেন।

রায়বাহাদুর ভূপেন চ্যাটার্জি 'আই-বি'র স্পেশাল্ এস্. পি.। তাঁর কাজ ছিল প্রায়ই জেলে আসা, এবং বিপ্লবীদের মধ্যে মনের দিক থেকেই যাঁরা একটু কাঁচা, তাঁদের মনোবল ভাঙবার চেষ্টা করা। অতি ধুরন্ধর এই ব্যক্তি। ভূপেন চ্যাটার্জি যখনই আসেন, তিনি জেলখানায় বহুক্ষণ ধরে থাকেন। পরম ধৈর্যে বিপ্লবীদের সবার সঙ্গে মেশার চেষ্টা করেন। যাঁদের দুর্বল ভাবেন, তাঁদের আলাদা আলাদাভাবে আপিস-ঘরে ডাকিয়ে এনে নানা স্তোকবাক্যে ও প্রলোভন দেখিয়ে পুলিশের উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হন।

অবরুদ্ধ বিপ্লবীরা চোখের সুমুখে এসব কাণ্ড দেখতে রাজি নন। তাঁদের হাতের কাছে অস্ত্র নেই। তাঁরা অসহায় কয়েদী। তাঁদের পায়ে শৃঙ্খল। তাঁদের আছে শুধু অটুট মনোবল। এদিকে জেলের বাইরে বিপ্লবী-সংগঠনও স্তব্ধ হয়ে গেছে, বন্ধুগোষ্ঠী প্রায়ই নানা জেলে বন্দী। সুতরাং কিছু করতে হলে জেলের অভ্যন্তরেই করতে হবে।...

বিপ্লবীর সংকল্প অনমনীয়। বুদ্ধি তাঁদের থম্‌কে থাকে না। তাঁরা স্থির করেছেন, এই বাহাদুর পুলিশ-অফিসারকে ইহজগৎ থেকে সরাবেনই। সরালেনও তাই।...

জেলে জেনারেল্ 'লক্-আপ্' হয়ে গেছে। তখন বিকেলবেলা। ভূপেন চ্যাটার্জি চলেছেন বক্স্-ইয়ার্ডের দিকে তাঁর নিত্য-কর্ম পালন করার তাগিদে। হঠাৎ কোত্থেকে কি হল! প্রচণ্ড ডাণ্ডার ঘায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন প্রভুর-প্রসাদে-বীর পুলিশসাহেব। সাঙ্গ হল তাঁর ভবলীলা। কি করে যেন বন্দীরা যোগাড় করেছিলেন একটি শাবল; দুপুরবেলায় হয়ত কোন সাধারণ কয়েদী ঐসব শাবল-খোন্তা নিয়ে জেল্-ইয়ার্ডে মেরামতী-কাজ করছিল। ওটা তাদের কাছ থেকে বাগিয়ে নেওয়াও সম্ভব নয় সেপাই-মেট্‌দের সাহায্য ছাড়া।...

যা হোক, ঘটনা ঘটতেই হুলস্থূল পড়ে গেল জেলখানায়। পাগলা-ঘন্টি বেজে চলল আকাশ-বাতাস ও জেলের চতুষ্পার্শ্বকে পাগল করে দিয়ে।...পুলিশ-দপ্তরে কারো চোখে ঘুম নেই। এ কি অঘটন!...

যথাসময়ে বিচার শুরু হল দশজন বিপ্লবী-বন্দীর বিরুদ্ধে। কিন্তু সাক্ষী-সাবুদ পাওয়া যাচ্ছে না। সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে একজন শুধু ঘটনা ঘটতে দেখেছিল। তার নাম মতি। খুনের দায়ে বিশ বছরের সাজা ভোগ করছে সে। কিন্তু বহু প্রলোভন, নির্যাতন ও ভয় দেখিয়েও তাকে সরকার-পক্ষের সাক্ষী করা গেল না। অদ্ভুত ও মিষ্টি ছিল এই মানুষটি। পরবর্তীকালে 'মতি' যে-কোন স্বদেশী-বন্দীর কাছেই বন্ধুর মর্যাদা পেয়ে এসেছে। কয়েদী-জগতে বিপ্লবীদের সাহায্যদানের ব্যাপারে মতির অবদান অপূর্ব।...মতি তো সাক্ষী হলই না, এমনকি ইউরোপীয় ওয়ার্ডার যাঁরা একটু দূরে ডিউটিতে ছিলেন এবং চাক্ষুষ ব্যাপারটা ঘটতে না দেখলেও ঘটে যাবার সাথে সাথেই ঘটনাস্থলে এসেছিলেন, তাঁদের দিয়েও পুলিশ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াতে পারেনি। এই সার্জেন্টদের মধ্যে দু'জনের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন মিঃ ক্রম্‌ফিল্ড ও মিঃ লাভ্‌রি। প্রমোশন ও নানাবিধ প্রলোভন এই দু'টি এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্ যুবককে তখনকার দিনেও প্রলুব্ধ করেনি। রাজনৈতিক-বন্দীদের কাছে মতির মত ঐ দু'টি সার্জেন্টও চিরকাল শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছেন। সুভাষচন্দ্র জেলে থাকা কালে বহুবার এই সার্জেন্ট (ইউরোপীয়ান্ ওয়ার্ডার) দু'টিকে বলেছেন যে, 'স্বদেশী' বন্দীদের সাহায্য করতে গিয়ে তাঁদের চাকুরি গেলেও ভয় পাবার কিছু নেই, তিনি অবিলম্বে তাঁদের কলকাতা কর্পোরেশনে ঢুকিয়ে দেবেন। তাঁরা এতে রাজনৈতিক বন্দীদের অবশ্য অধিক আত্মীয় মনে করতেন। কিন্তু কাজ যেটুকু করতেন তা মনের টানে, কর্পোরেশনের হবু-চাকুরির টানে নয়।

সাক্ষী পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু তাতে সরকারী-রথ থম্‌কে দাঁড়াবে কেন? কতগুলো বাইরের কয়েদী এবং দু'জন ফিরিঙ্গী-কয়েদীর সাক্ষ্যে সকলের শাস্তি হয়ে গেল। ঐ কয়েদীগুলো কিছুই দেখেনি। কারণ, ঘটনার পূর্বেই তারা জেনারেল্‌ 'লক্‌-আপ্‌' হবার সাথে সাথে তাদের নিজস্ব ব্যারাক্‌ বা সেল্‌-এ তালাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবু ন্যায্য বিচার তাতে ব্যাহত হয় না! পুলিশের সাজান কথা কয়েদীগুলো হুবহু বলে গেল। ফলে, তাদের মেয়াদকাল কমিয়ে দিল ব্রিটিশ-ভারতের ন্যায়নিষ্ঠ সরকার।...

হাইকোর্টের রায় বেরুতেও দেরি হল না। অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরি ফাঁসির আদেশ পেলেন। রাখাল দে, ধ্রুবেশ চ্যাটার্জি ও অনন্ত চক্রবর্তির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হল। বাকি পাঁচজনকে এ-মামলায় আটকান গেল না।..

১৯২৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রত্যূষে আলিপুর সেণ্ট্রাল্‌ জেলে অনন্তহরি ও প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসি হয়ে গেল। সারা জেল 'বন্দেমাতরম্‌'-ধ্বনিতে মৃত্যুবিজয়ীদের ঔর্ধ্বলৌকিক পদযাত্রায় বন্দনা জানাল। সেই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকল গঙ্গার এ তীর-ও তীর দুই তীরের মানুষদেরই কণ্ঠে।...

॥ চৌদ্দ ॥

উদ্যোগ পর্ব

[শেষার্ধ]

কারাগৃহে বন্দী মন

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ১৯২৩ সালেই বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা অনেকে বিনাবিচারে অবরুদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা জেলে আবদ্ধ থাকলেও দেশের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকার চেষ্টা করতেন, নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্ম ও কার্যক্রম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। দেশ-বিদেশের ইতিহাস, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁদের অনেকেই সুপণ্ডিত ছিলেন।

ক্রমে একসময়ে বাঙলার বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ মেদিনীপুর জেলে একত্রিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তখন তাঁরা স্থির করেছিলেন যে, এ-যাত্রা জেল থেকে বাইরে গেলে তাঁরা মিলেমিশে একটি 'দল' হয়ে কাজ করবেন—অনুশীলন-যুগান্তরের পৃথক অস্তিত্ব থাকবে না। সর্বভারতীয়-বিপ্লব ঘটানর জন্যে পূর্ব-অভিজ্ঞতা আশ্রয় করে তাঁরা তেমন সংগঠনই গড়ে তুলবেন, যার ক্ষমতায় এবারকার অভ্যুত্থান নিশ্চয় অব্যর্থ হবে। যুগান্তর ও অনুশীলনের প্রধানদের বৈঠকে উভয় সংস্থাকে একটি দল তথা 'পার্টি' করে কাজ করার প্রস্তাব গৃহীত হল।

কিন্তু পূর্বোক্ত বিদ্রোহভাবাপন্ন তরুণ-কর্মীরা জেলখানায় বিভিন্ন দলের এই মিলন প্রয়াসে উৎসাহ দেখাননি। কারণ, তাঁরা স্থিরনিশ্চয় হয়েছিলেন যে, নেতারা আদপে কিছু কাজই করবেন না—বড় রকমের একটা কিছু করার গালগল্প করে গ্রুপ্‌গুলোকে হাতের মুঠোয় রাখার চেষ্টা করছেন মাত্র। নেতাদের এসব 'ভাঁওতা' তাঁদের অসহ্য। সুতরাং

সমস্ত গ্রুপ্‌গুলো থেকেই কর্মলোভী কর্মীদের টেনে আনবেন তাঁরা তাঁদের 'এ্যাড্‌ভান্স গ্রুপে'।

রিভোল্টিং গ্রুপ

১৯২৭ সালের শেষে বিপ্লবী-বন্দীরা আবার মুক্তি পেলেন। জেলের ঐকমত্য ও কর্মনীতি অনুসারে কারামুক্তির পর তাঁরা মিলিতভাবে কাজ শুরু করলেন।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশন। বিভিন্ন বিপ্লবী-দল একত্রে কাজে নেমে পড়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উক্ত অধিবেশনের কর্মভার নিয়ে দলগুলোর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিল। দলগত প্রাধান্য ও দলীয় স্বার্থবোধ নূতন করে মাথা চাড়া দেওয়ায় মিলন-প্রয়াস অঙ্কুরেই ব্যর্থ হল।

নেতাদের এ-ব্যর্থতায় 'এ্যাড্‌ভান্স গ্রুপে'র মধ্যেই বিদ্রোহীরা উপদল গড়ায় ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। শ্লোগান্ একটি—"দাদারা কিছু করবেন না, আমরাই নূতন নেতৃত্ব গড়ে 'বিপ্লব' করব।"

বিভিন্ন গ্রুপে বিদ্রোহীদের নায়ক ও কর্মীরূপে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'আত্মোন্নতি-সমিতি'র সন্তোষ মিত্র প্রমুখের সঙ্গে অনুশীলন-সমিতির সতীশচন্দ্র পাকড়াশি, নিরঞ্জন সেন, প্রতুল ভট্টাচার্য, যতীন দাস ও বিনয় রায়; চট্টগ্রামের জুলু সেন ও গণেশ ঘোষ: মাদারীপুরের পঞ্চানন চক্রবর্তি, যতীন ভট্টাচার্য, অমলেন্দু দাশগুপ্ত ও ফণী মজুমদার; যুগান্তরের রাখাল দাস এবং আরো অনেকের নাম করা যায়। এসব বিদ্রোহীরা ১৯২৯ সালে সত্যি আলাদা হয়ে গেলেন। তাঁদের দলটির নাম দিলেন বাঙলার প্রবীণ বিপ্লবী-নেতারা —'রিভোল্টিং গ্রুপ'। উক্ত 'রিভোল্টিং গ্রুপে'র প্রধান প্রেরণা ছিল দুঃসহ কর্মে বিপ্লবী-বাঙলা তথা বিপ্লবী-ভারতকে 'Alternate leadership' দান করা।

এই দলটির যথার্থ কিছু করার আগ্রহ থাকলেও উহাকে নির্ভর-যোগ্য একটি সংস্থায় কোনদিনই গড়ে তোলা যায়নি। সতেরো দলের সতেরো রকমের লোক নিয়ে প্ল্যাটফর্ম্-পলিটিক্স করা চলে, গুপ্ত-সমিতির কাজ চলে না। কাজেই, ১৯২৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর মেছুয়াবাজারের আড্ডা সার্চ্ হবার ফলে সতীশ পাকড়াশি, নিরঞ্জন সেন প্রমুখ ধরা পড়লেন, ঐ 'মন্ত্রগুপ্তি'-রক্ষায় স্বভাবতই ত্রুটি ছিল বলে।·····মেছুয়াবাজার-ষড়যন্ত্র মামলার সঙ্গে সঙ্গে 'রিভোল্টিং গ্রুপে'র একটি দুর্ধর্ষ বিপ্লবী-দল হয়ে উঠে 'অল্টারনেট্ লীডারশিপ্' দেবার সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে গেল। বলা বাহুল্য, ইতিপূর্বে ১৯২৯ সালেই সূর্যসেন কলকাতা এসে গণেশ ঘোষকে 'রিভোল্টিং গ্রুপে'র আওতা থেকে সরিয়ে চট্টগ্রাম নিয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া জুলু সেনকেও তিনি উক্ত গ্রুপ সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে ভুলে যাননি।···

এখানে আরো বলা প্রয়োজন যে, 'রিভোল্টিং গ্রুপে'র সঙ্গে 'বি. ভি.'-রও যোগাযোগ ছিল। সেই সম্পর্কটি রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মেজর সত্য গুপ্তের উপর। সম্পর্ক রক্ষার কালে সত্যবাবুকে প্রতিদিনকার রিপোর্ট দাখিল করতে হত 'বি. ভি.'-র নেতৃস্থানীয়দের কাছে।·"এ সম্পর্কটুকু রাখার কারণ ছিল। 'বি. ভি.' তৎকালে সশস্ত্র-বিপ্লবের উদ্যোগে যে-কেহ সনিষ্ঠায় যে-কোনভাবে এগিয়ে এলেই নিজের বৈপ্লবিক-সত্ত্বা অটুট রেখে তার সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত ছিল। এবং এ সম্পর্কে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও মেজর গুপ্ত যে দলনেতা ও দলগোষ্ঠীর যথারীতি সমর্থন নিয়ে অগ্রসর হতেন, তা বিশেষ করে বলার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মেছুয়াবাজারের ঘটনার পর 'রিভোল্টিং গ্রুপে'র সঙ্গে 'বি. ভি.'-র যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয়। সত্যবাবু এ-ফ্রন্ট্ থেকে সরে আসেন।"

('সবার অলক্ষ্যে,' ১ম পর্ব—পৃঃ ১১৬)

এ্যাড্‌ভান্স গ্রুপ সম্পর্কে জনৈক বিপ্লবী-নেতার উক্তি

"১৯২৩-'২৪ সাল থেকেই দেশে যুব-আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন, কৃষক ও শ্রমিক-আন্দোলনের আভাস লক্ষিত হয়। বিপ্লবী-দলের কর্মীদের কিছু কিছুও ও-সব আন্দোলনে দলের 'পলিসি' অনুসারেই যোগ দেওয়া শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল উক্ত আন্দোলনগুলোকে বৈপ্লবিক-কার্যের বাহনরূপে ব্যবহার করা। ও-সব আন্দোলনে যে-সব ছাত্র বা তরুণ যুক্ত হতেন, তাঁদের উপর তথাকথিত 'রিভোল্টিং গ্রুপে'র মানসিক-প্রভাব উপেক্ষা করার মত ছিল না। ১৯২৯ সালেই অবশ্য 'অল্টারনেট্‌ লিডারশিপে'র শ্লোগান্‌ দিয়ে সতীশ পাকড়াশি প্রমুখ বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে বাঙলার বিভিন্ন দলের কিছু কিছু কর্মীসহ এই নূতন দলটি গড়ে ওঠে। এই দলটি (আলাদা হবার পূর্বে) বিপ্লবী-দলগুলোর মধ্যে অবস্থান করেই সংগঠনের দায়িত্ব নেয়। তখন বিদ্রোহীদের বক্তব্য ছিল যে, তাঁরা আলাদা হয়ে দল গড়ছেন না। তাঁদের মতে পুরাতন দলগুলো ব্যক্তিক এবং দলীয় প্রাধান্য রাখতে গিয়ে একটি 'দলে' পরিণত হতে পারল না ; উক্ত দলগুলোর নেতারা বিপ্লবের দুঃসাহসী পথ বর্জন করে ভাঁওতা দিয়ে নেতৃত্ব বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং তাঁরা সমস্ত দলগুলোর যথার্থ বিপ্লবী-সভ্যদের একত্র করে নেতাদের পূর্ব উক্তি মতই গ্রুপইজম্‌-এর সমাধি 'অল্টারনেট্‌ লিডারশিপ'-এ দিতে যাচ্ছেন। এখানে কারো বিরুদ্ধে কেউ 'রিভোল্ট্‌' করছেন না—এখানে বিপ্লব-বিমুখ নেতৃত্বের জীর্ণ খোলস থেকে বিপ্লব-মুখী নেতৃত্বের মুক্তি ঘটানর চেষ্টা হচ্ছে মাত্র...

"ঐ সময়ে রংপুর-প্রাদেশিক-সম্মেলনে এ-সব বিদ্রোহীদের কিছু নেতা মিলিত হয়ে স্থির করেন যে, বাঙলাদেশের তিনটি জিলায় অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করা হবে। ঢাকা ও কলকাতার ছোট ছোট শত্রু-ঘাঁটি

একই দিনে এবং একই সময়ে আক্রমণ করার সিদ্ধান্তও তাঁরা নিলেন। তাঁরা এ-ও আশা করলেন যে, যথার্থই কিছু করতে পারলে পুরাতন নেতারাও এই সংগ্রামে যোগ না দিয়ে 'দল' ও মান রক্ষা করতে পারবেন না। এ-সব প্ল্যান্ মাথায় নিয়ে সতীশ পাকড়াশি প্রমুখ নেতারা কলকাতায় মেছুয়াবাজারের আড্ডায় এসে জড় হলেন। অস্ত্রের অভাব প্রচুর, অর্থের অভাব আরো, সংগঠন নেই বললেই চলে। তবু উদ্যম, উৎসাহ ও বিশ্বাস অপ্রতিহত। ১৯২৯ সালেরই নভেম্বর মাসে বাঙলার নানাস্থানে বিদ্রোহীদের গোপন ইস্তাহার বিলি হয়ে গেছে। তাতে যুবক-যুবতীদের আহ্বান জানান হয়েছে আসন্ন বিদ্রোহে শরিক হবার জন্যে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বিদ্রোহীদের সংগঠন অতি নগণ্য, প্রস্তুতি বলতে কিছুই করা হয়নি— তাছাড়া নানা গ্রুপের নানা লোকের কোন এক আড্ডা থেকে বিপ্লবের বড় বড় কথা বলা চললেও 'মন্ত্রগুপ্তি'-রক্ষা হয় না, বিপ্লবের কাজ তো দূরের কথা। সুতরাং মেছুয়াবাজারের বাড়ির উপর পুলিশের নজর পড়ল সহজেই। ১৮ই ডিসেম্বর (১৯২৯) রাতে পুলিশ বাড়ি ঘেরাও করে নিদ্রিত বিপ্লবীদের ঘরে ঢুকে পড়ল। কাগজপত্র, ঠিকানা, লাল ইস্তাহার এবং বোমা তৈরির ফরমুলাসহ সতীশ পাকড়াশি, নিরঞ্জন সেন এবং রমেন প্রমুখ ধরা পড়েন। পূর্ব-নির্দেশ মত অতি প্রত্যূষে সুধাংশু দাশগুপ্ত বোমা ও রিভল্বার নিয়ে মেছুয়াবাজারের আড্ডায় এসে উপস্থিত হতেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। ঐ গৃহে প্রাপ্ত ঠিকানাগুলোর সাহায্যে পুলিশ অনেক গৃহ তল্লাশি করে বোমা তৈরির সরঞ্জাম, বোমার খোল ইত্যাদি সহ অনেক যুবককে থানায় নিয়ে আসে। এইভাবেই বরিশালের পান্নালাল দাশগুপ্ত, মুকুল সেন, শচীন কর, জগদীশ চ্যাটার্জি, খুলনার নির্মল দাস প্রমুখ অনেক কিশোর বন্দী হন। বিভিন্ন জিলা থেকে ধৃত বন্দীর সংখ্যা ছিল বত্রিশ জন। তাঁদের নিয়ে 'মেছুয়াবাজার-বোমা-ষড়যন্ত্র' মামলা দায়ের করা হয়। বিচারে সতীশবাবু ও নিরঞ্জনবাবু ৭ বছর, সুধাংশু ও রমেন

বিশ্বাস ৫ বছর সশ্রম কারাদণ্ড লাভ করেন। অপর কয়েকজনের স্বল্পতর সাজা হয়।

'রিভোল্টিং গ্রুপের' এখানেই মৃত্যু। 'অল্টারনেট্ লিডারশিপ্'-এর (প্রস্তুতি বিহনে) অবাস্তব কল্পনার এখানেই সমাধি।"

রিভোল্টিং গ্রুপের কি কিছুই সার্থকতা ছিল না ?

কোন একটি 'রিভোল্টিং গ্রুপ'-এর মৃত্যু ঘটলেও বিদ্রোহের মৃত্যু নেই। যথাসময়ে 'অল্টারনেট্' নেতৃত্বেরও আবির্ভাব ঘটতে বাধ্য। এ না হলে বিদ্রোহের বাণী থেমে যায়, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হয় না।···

মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সার্থক বিদ্রোহী সেই অন্যায়কে দমন করে ন্যায়ের মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। কিন্তু উক্ত ন্যায়ের রাজত্বও চিরকাল বেঁচে থাকে না—অন্যায় তাকে পুনরায় কবলিত করে। তখন আবার বেজে ওঠে বিদ্রোহের ডঙ্কা। জীবনের বহমানতার মধ্যেই ডুব দিয়ে থাকে বিদ্রোহ-শক্তি, সে-বহমানতা স্তিমিত হতে চাইলেই বিদ্রোহ-শক্তির বিকাশ ঘটে।

১৯২৩ সাল থেকে বাঙলার বিপ্লবী-তরুণদের একাংশের মধ্যে যে বিদ্রোহী-মনোভাব দেখা দিচ্ছিল, তা অকারণে নয়। বিপ্লবী-দলের নেতৃবৃন্দের দু'টি বৃহৎ ত্রুটিই এজন্যে দায়ী। প্রথমত, তাঁরা 'গ্রুপইজম' বর্জন করার সংকল্প নিয়েও দলাদলির ঊর্ধ্বে উঠতে পারলেন না। তরুণ উৎসাহীরা তাই এ-সংকীর্ণতার প্রাচীর ভেঙে নানা দলের মানুষ নিয়ে একত্রে পথচলার আয়োজনে চেষ্টিত হলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে-সব দুর্বলতার জন্যে নেতারা দলের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেনি, সে-সব দুর্বলতা থেকে তরুণ-দলও মুক্ত ছিলেন না।···দ্বিতীয়ত, তাঁরা অতীত অভিজ্ঞতা এবং বয়োবৃদ্ধির চাপে একটু সংযত পদক্ষেপের প্রয়াসী হয়ে ওঠায় তরুণ-বিপ্লবীদের দুঃসাহসী মন থেকে দূরে সরে গেলেন।

অধিকন্তু, কার্যত তাঁরা তরুণ-বন্ধুদের বিশ্বাস অর্জন করার চেষ্টা না করে তাঁদের উপেক্ষা করার পথই বেছে নিলেন।

নেতাদেরও বিশেষ দোষ নেই। 'গ্রুপইজম্' দূর করতে চাইলেই তা করা যায় না। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এ-বস্তু দূর করা আরো মুস্কিল এই কারণে যে, দলের নিম্নতম স্তর থেকেই কর্মীদের মজ্জায় মজ্জায় গোষ্ঠীপ্রীতি নিহিত। নেতাদের সদিচ্ছা থাকলেও কর্মীদের দৈনন্দিন আচার-আচরণে সে-ইচ্ছাকে অক্ষত রাখা সহজ হতে পারে না। অথচ বিপদকালে সংগ্রামের মুখে অনায়াসে ছোট-বড় সকল বিপ্লবীর পক্ষেই গণ্ডির বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব হয়নি। দেখা গেছে, বিরাট বৈপ্লবিক-কর্মপ্রবাহ সৃষ্টি করতে পারলেই 'গ্রুপইজম্' অনায়াসে তলিয়ে যায়। সুতরাং এ-সত্যকে স্বীকার করেই বৈপ্লবিক-সংগঠনক্ষেত্রেও চলা বিধেয়। নেতারা চেয়েছিলেন সারা বাঙলা জুড়ে প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবের আয়োজন করতে। আয়োজন-পর্বে তাঁরা চেয়েছিলেন যাবতীয় সশস্ত্র-য়্যাক্‌শান্ বন্ধ রাখতে। এবং চেয়েছিলেন কংগ্রেসের মত জন-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কাজ করে ধীরে-সুস্থে সময়মত বিপ্লবের প্রচার করতে। সংগঠন মজবুত ও ব্যাপক করে গড়ে তুলতে হলে কর্মীদেরসহ নেতৃবৃন্দের জেলের বাইরে থেকে কাজ করা প্রয়োজন। কিন্তু তাঁদের বাইরে থাকা অসম্ভব, যদি দেশে কোন সশস্ত্র-সংঘটনা অনুষ্ঠিত হয়।

পুলিশ-চিহ্নিত বিপ্লবীদের অবস্থা ক্রমশ শোচনীয় হয়ে উঠছিল। কোথাও অতর্কিতে দু'একটি য়্যাক্‌শান্ হলেই দলসুদ্ধ এসব বিপ্লবীকে দীর্ঘকালের জন্যে কারাগারে ঢুকিয়ে দেওয়া হত। ফলে, তাঁরা না পারতেন কোন কাজ করতে, না বাইরে এসে ফিরে পেতেন তাঁদের দলকে সংহত অবস্থায়। সুতরাং এমন পরিস্থিতিতে 'বিপ্লব' ঘটান অসম্ভব। নেতাদের সংযত-গতির স্বপক্ষে যুক্তি ছিল তাই সামান্য নয়।

অথচ ব্রিটিশ-শাসনচক্রের কঠোর ও নিখুঁত বিরুদ্ধতার মুখে বিপ্লবী-নেতাদের 'সংযত' পথচলা কখনো বিপ্লবের রূপ ধারণ করতে

পারে না বলে যদি তৎকালে বিদ্রোহীদের ধারণা হয়ে থাকে—তবে তাতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই। কারণ, কংগ্রেসকে 'ক্যামোফ্লাজ্' রূপে ব্যবহার করে পুলিশের চোখে ধুলো দেওয়া আর কারো পক্ষে সম্ভব হলেও দল বেঁধে বিপ্লবী-নেতাদের পক্ষে সম্ভব হবার নয়। পুলিশ ও কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের কাছে সফল আত্মগোপনের চেষ্টায় অচিরে নিজেদের বিপ্লবী-চরিত্রকে হারিয়ে ফেলার আশঙ্কা ছিল প্রচুর।

সুতরাং 'রিভোল্টিং গ্রুপ'-এর আঘাত অপ্রয়োজনে আসেনি। এর ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল অনস্বীকার্য।···বিপ্লবী-নেতারা এর চাপে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। 'রিভোল্টিং গ্রুপ' স্বয়ং ব্যর্থ হয়েও আশু বিপ্লব-কর্মে তাঁদের অনেককে মনের দিক থেকে সক্রিয় হতে বাধ্য করল। · কিন্তু তাঁরা (বিশেষ করে যুগান্তর দলের নেতারা) কার্যত সক্রিয় হলেন তাঁদেরই দু'টি সহযোগী দলের কর্ম-চাপে। এই দল দু'টি 'বিপ্লব'কে 'তৃতীয়' স্তরে তুলে দিতে পেরেছিল শুধু গোপনে তাদের প্রস্তুতি-পর্ব সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল বলে।

চট্টগ্রাম বিপ্লবী-দল ও 'বি. ভি.'-পার্টি

১৯২১ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত বৈপ্লবিক-সংস্থার নিখুঁত টেক্‌নিক অনুসারে সংগোপনে প্রস্তুতি-পর্ব সমাপিত করেছে বাঙলা দেশের দু'টি দল। একটির নাম 'চট্টগ্রাম ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান্ আর্মি', অপরটি 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' অর্থাৎ 'বি. ভি.'-পার্টি।

এই দল দু'টির মন্ত্রগুপ্তি-রক্ষার ক্ষমতা ছিল ত্রুটিহীন। পুলিশের চোখে ধুলো দেবার ব্যাপারেও তাদের পারদর্শিতা ছিল অসামান্য। শুধু পুলিশের নয়, অন্যান্য বিপ্লবী-দলগুলোরও অজ্ঞাতে এই দু'টি দল আগামী যুদ্ধের জন্য তৈয়ের হয়েছিল। তাই কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তাদের গতিবিধি বা মনোবাঞ্ছা ছিল সবার অজ্ঞাত। এই অসাধারণ প্রস্তুতির কৃতিত্ব চট্টগ্রামের সর্বাধিনায়ক

সূর্যসেন এবং 'বি. ভি.'-র সর্বময় নেতা হেমচন্দ্র ঘোষের প্রাপ্য। ইতিহাস একথা স্বীকার করতে বাধ্য।

'চট্টগ্রামবিপ্লবী-দল' বা 'বি. ভি.'-পার্টি কারো বিরুদ্ধে 'রিভোল্ট' না করেই নিজেদের প্রস্তুতি সংগোপনে সম্পূর্ণ করেছিল। তাই তারা পেয়েছিল যথার্থ কর্মকাণ্ড রচনার সুযোগ। তাদের ব্যাপক ও দুঃসহ কর্মপ্রবাহে অপরাপর দলগুলো অল্প-বিস্তর যুক্ত হয়ে ১৯৩০-'৩৫ সালের বাঙলায় বিপ্লব-যুগকে অধিকতর দুর্বার করে দিয়েছিল। সে-যুগের তথা বিপ্লবের 'তৃতীয় স্তরে' উঠে-আসার ইতিহাস বিস্তৃত-ভাবে যথাসময়ে বিবৃত হবে।

বাঙলার বাইরের বিদ্রোহী-মন

পূর্বেই বলা হয়েছে, 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলনে'র মূল নেতৃত্ব নানা কারণে স্থির করেছিল যে, আপাতত কোন য়্যাক্‌শান্ করা হবে না। আগামী বিপ্লবকে সার্থক ও সফল করে তোলার জন্যে তাঁদের প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু তরুণ-মন প্রধান নেতাদের শান্ত যুক্তি গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত। বাঙলাদেশে তথাকথিত 'রিভোল্টিং গ্রুপ' কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করতে না পারলেও নেতাদের উপর যে যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছিল, তা উল্লেখ করা হয়েছে। বাঙলার বাইরের কথা বলা হয়নি। পাঞ্জাবে ও উত্তরপ্রদেশের তরুণ-দল শুধু চাপ সৃষ্টি নয়, গুরুত্বপূর্ণ য়্যাক্‌শানও সংঘটিত করলেন কম নয়। এখানে বস্তুতই নূতন 'লিডারশিপ্' অদ্ভুত কাজ দেখিয়েছিল। এই তরুণ-দলও প্রবীণ নেতাদের কাছে এসেছিলেন তাঁদের নেতৃত্ব কামনায়। শুনলেন তাঁদের অভিমত। নেতাদের যুক্তি কার্যকরী হল না। তরুণ-বিদ্রোহী দল সশ্রদ্ধায় বিদ্রোহ করলেন। এ-প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতা ত্রৈলোক্য চক্রবর্তি লিখেছেন: "ভগৎসিং ও পণ্ডিত রামশরণ দাস ১৯২৮ সালে (কলিকাতা কংগ্রেসের সময়) আমাদের নিকট কিছু বোমা ও পিস্তল চাহিল। আমরা ১৯২০ সালের পর হিংসাত্মক কর্মানুষ্ঠান ছাড়িয়া

দিয়াছি। আমাদের মতে দেশ জাগিয়াছে, এখন লোক-দেখান কিছু (demonstration) করার প্রয়োজন নাই, এখন প্রয়োজন গণ-আন্দোলনের মারফৎ জনগণের বৈপ্লবিক-চেতনা জাগান। ব্যাপক সংগ্রামের জন্যই সংগঠন প্রয়োজন। দল সবল না হইলে, সন্ত্রাসবাদ-মূলক কাজ আরম্ভ করিলে, গভর্ণমেণ্টের দিক হইতে যে চাপ আসিবে, সেই চাপ দল সহ্য করিতে পারিবে না, অল্পদিনের মধ্যেই দল ভাঙিয়া যাইবে।" ('জেলে ত্রিশ বছর',—পৃঃ ১৩৬)

স্বভাবতই ভগৎসিং-শ্রেণীর দুর্ধর্ষ তরুণ-বিপ্লবী ত্রৈলোক্যবাবুদের এ-সব যুক্তিতে খুশি হতে পারেন না। 'লোক-দেখান কিছু করা' অথবা 'সন্ত্রাসবাদমূলক কাজ আরম্ভ করা' প্রভৃতি কথা তাঁদের কানে যেমন অসুন্দর মনে হয়েছে, তেমনি মনে হয়েছে কনট্রাডিক্টারি। ত্রৈলোক্য-বাবুদের মুখে অন্তত বৈপ্লবিক সশস্ত্র-য়্যাক্‌শান্‌কে 'সন্ত্রাসবাদমূলক' কার্যরূপে আখ্যাত হতে শুনবার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। যে অপবাদ ইংরেজ বা তাদের তাঁবেদারদের কণ্ঠে শোভা পায়, সে-অপবাদ প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের কণ্ঠে শুনে স্বভাবতই তরুণ-বিপ্লবী তাঁদের নেতৃত্ব সম্পর্কে ভাবিত হবেন। তবু ভগৎসিং বললেন: "পাঞ্জাব অনেক পিছনে পড়িয়া আছে, পাঞ্জাবকে জাগাইতে হইবে, পাঞ্জাবের লোক ভাবপ্রবণ, জমকালো কোন কাজ দেখিলেই তাহারা লাফাইয়া উঠিবে, ঝাঁপাইয়া পড়িবে।" ('জেলে ত্রিশ বছর',—পৃঃ ১৩৬)

উত্তরে ত্রৈলোক্যবাবু বলেছিলেন: "এখন কোন সন্ত্রাসবাদমূলক কাজ হইলে ধর-পাকড় শুরু হইবে, এপ্রুভার হইবে, দল ভাঙিয়া যাইবে,—ইহা আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা।" ('জেঃ ত্রিঃ বঃ',—পৃঃ ১৩৭)

ত্রৈলোক্যবাবুর কথায় যুক্তি আছে। 'যুগান্তর' বা 'অনুশীলন' দল ঘটনাচক্রে তৎকালে 'গুপ্ত-সমিতি'র পথে বিচরণ করার ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছিল। পুলিশের নখদর্পণে ছিল নেতৃবৃন্দ ও নামী কর্মীদের গতিবিধি। মুহূর্তের জন্যেও তাঁদের পেছন ছাড়ত না পুলিশের ওয়াচার্‌শ্রেণী। তাছাড়া দলের কর্মীদের মধ্যেও অনেক

ক্ষেত্রে পুলিশ নিজেদের লোক ঢুকিয়ে দিয়েছিল। বিপ্লবীরা কিছু না করলেও 'এজেন্ট্ প্রভোকেটর্'রা কিছু য়্যাক্শান্ করে কখনো কখনো তাঁদের বিপদে ফেলবার চেষ্টা যে না করেছে, তা-ও নয়। মোটের উপর মন্ত্রগুপ্তি-রক্ষা করার সামর্থ্য এ-সব দলের অতি দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তাই হিংসাত্মক কার্য প্রত্যাহারের প্রচার ও গণ-আন্দোলন রূপ 'ক্যামোফ্লাজ্' ব্যতীত বিপ্লবী-দল বাঁচিয়ে রাখাই অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এবং এইজন্যে ১৯১৫-'১৭ সালের পর থেকে অনুশীলন-যুগান্তরের মূল নেতৃত্ব কোন বৈপ্লবিক-য়্যাক্শানের প্রোগ্রামই গ্রহণ করতে পারেনি। উক্ত নেতৃত্বের অজান্তে সংঘটিত ছু'একটি য়্যাক্শানের জের টানতে হয়েছে নেতাদের কারাগৃহের অন্তরালে বারে বারে বন্দী হয়ে। ফলে, দল গেছে ভেঙেচুরে, বাইরে এসে নূতন করে দল সংগঠনের সূত্রপাতেই আবার এসেছে জেলের ডাক।...

কিন্তু যাঁদের নয়নে বহ্নিশিখা, বাহুতে অমিত শক্তি, হৃদয়ে আত্ম-বিলয়নেব আবেদন, রক্তে সর্বনাশের নেশা তাঁরা ও-সব কথা শুনতে নারাজ। তাঁরা বুঝে নিয়েছেন যে, প্রবীণদের পালা শেষ হয়ে এসেছে। প্রবীণ-দল কংগ্রেসে আত্মগোপন করে একদিন সুযোগ সৃষ্টি করে বিপ্লবের রক্তক্ষরা পথে বেরিয়ে আসবেন—এ-আশ্বাসবাণী অবিশ্বাস্য। 'কংগ্রেস' তাঁদের গিলে ফেলবে—তাছাড়া পুলিশকে ঠকাতে গিয়ে দেখতে পাবেন যে, তার বহু পূর্বে তাঁরা নিজেদেরই ঠকিয়েছেন সম্পূর্ণভাবে। অতএব চাই 'alternate leadership', চাই টাট্‌কা তরুণ-রক্তের অর্ঘ্য-নিবেদন—এখানে 'কনফিউশান্' সৃষ্টি মানে বিপ্লবকে 'বিট্রে' করা।...বিনীতকণ্ঠে পাঞ্জাবের সিংহশিশু ত্রৈলোক্যবাবুকে বললেন: "আমাদের এমন সব যুবক আছে, তাহাদিগকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিলেও 'টু' শব্দ করিবে না।" ('জেঃ ত্রিঃ বঃ',—পৃঃ ১৩৭)

ত্রৈলোক্যবাবু লিখেছেন: "ভগৎসিং-এর কথার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম।...আমরা ভগৎসিংকে খুশি করার জন্য কয়েকটা পিস্তল

ও বোমা দিলাম। আমি পরে পণ্ডিত রামশরণকে বলিলাম, এখন এই পিস্তল ও বোমা ব্যবহার করিবেন না।" ('জেঃ ত্রিঃ বঃ',—পৃঃ ১৩৭)

ভগৎসিং কিছু অস্ত্রশস্ত্র হাতে পেয়ে সানন্দে প্রবীণ-নেতাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। চলে এলেন লাহোর। যতীন দাস প্রমুখের সঙ্গে কানে কানে ভগৎসিংদের কি কথা হয়েছিল তা প্রবীণেরা জানলেন না। তরুণদের পথ তখন আলাদা। 'স্থবিরের শাসন' সেখানে অগ্রাহ্য। কাজেই, রামশরণজিকে প্রদত্ত ত্রৈলোক্যবাবুর উপদেশ-বাণীও অগ্রাহ্য হল। লাহোরে পিস্তল ছুটল, দিল্লীতে বোমা ফাটল। প্রবীণেরা পিছিয়ে রইলেন, তরুণদের অগ্রগতি অনাহত ছন্দে লক্ষিত হল। তাঁরা আবির্ভূত হলেন 'ইতিহাস' রচনায়। সে-ইতিহাস ভারতবর্ষের বিপ্লব-যাত্রাকে অব্যাহত করেছে, খরস্রোতা নদীর বেগে ভীষণ-সুন্দর করেছে।···

॥ পনের ॥

বাঙলার বাইরে তরুণ-বিপ্লবীদের কীর্তি

বাঙলার বাইরে তরুণ-বিপ্লবীদের উদ্যোগ-পর্ব সম্পূর্ণ। তাঁদের সহায়তায় রয়েছেন শচীন সান্যাল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবাসী বিপ্লবী-নেতৃবৃন্দও।

ভগৎসিং বাগাড়ম্বর করেননি। ত্রৈলোক্যবাবুর (মহারাজ) উপদেশমত 'লাহোর কংগ্রেসে' বিরাট এক স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে সুদূর বিপ্লবের তৈয়েরী না করলেও, তাঁরা একটি গোপন বাহিনী গড়েছিলেন। তার নাম দিলেন 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট্ রিপাব্লিকান্ আর্মি'—বিপ্লবী-দলের নাম 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট্ রিপাব্লিকান্ পার্টি'। উদ্দেশ্য, বিপ্লবের সশস্ত্র ধ্বনি এখুনি উচ্চারিত করা। এ-যজ্ঞের হোতারূপে এগিয়ে এসেছেন যে-সব কিশোর-তরুণ, তাঁদের নিষ্ঠা-নিয়মানুবর্তিতা-শৌর্য-বীর্যের বুঝি তুলনা নেই। ত্রৈলোক্যবাবুর কাছে ভগৎসিং-এর উক্তি ছিল : "আমাদের এমন সব যুবক আছে, তাহাদিগকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিলেও 'টু' শব্দ করিবে না।" এ-উক্তি যে কতদূর সত্য, তা প্রমাণিত হয়েছে 'এইচ্. এস্. রিপাব্লিকান্ পার্টি'র ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডে। শুধু সোনার টুকরো কর্মী নয়, এই দল সারা পাঞ্জাব-যুক্তপ্রদেশ-বিহারে ঐ অল্প সময়ে সংগঠন-ব্যবস্থাও করেছিল কার্যকরী। ঝড়ের বেগে উত্তর-ভারতকে আলোড়িত করে যেতে পারলেন তরুণ-বিপ্লবী দল। অল্পকালেই স্তব্ধ হয়ে যেতে হল অবশ্য তাঁদের ; কিন্তু সেই অল্প-পরিসরেই কোমর ভেঙে দিয়ে গেলেন তাঁরা ব্রিটিশ-সিংহের।—আগামী মহাবিপ্লবের পথ তাতে যে সুগম হতে পেরেছিল, সে-কথা ঐতিহাসিককে স্বীকার করতে হবে।...

স্যাণ্ডার্স-নিধন

১৯২৮ সাল। বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষকে শান্ত করার নীতি ব্রিটিশ-মন্ত্রিসভা গ্রহণ করেছে। তাই ভারতবর্ষে এসেছে 'সাইমন্ কমিশন্'। তারা সরেজমিনে দেশের অবস্থা জেনে-শুনে একটি রিপোর্ট দাখিল করার দায়িত্ব নিয়ে এসেছেন। উক্ত রিপোর্ট-নির্ভর কিছু রাজনীতিক সুযোগ-সুবিধা ভারতবাসীর ভাগ্যে বরাদ্দ হবে।

কংগ্রেস এই কমিশন্‌কে সম্পূর্ণ বয়কট করেছে। কমিশনের চেয়ারম্যান্ মিঃ সাইমন্। দেশের লোক কালো পতাকা দেখিয়ে পথে-ঘাটে চিৎকার করে বলছে ঃ 'সাইমন্, ফিরে যাও!' 'Go back, Simon!'···

৩০শে অক্টোবর (১৯২৮)—'সাইমন্ কমিশন্' এসেছে লাহোর শহরে। বিরাট জনতার হাতে হাতে কালো পতাকা। তারা মিছিল করে চলছে সাইমন্‌কে ফিরে যাবার কথা জানাতে। তাদের পুরোভাগে লালা লাজপত রায় এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ। পুলিশ লাঠি চালাল শান্ত জনতার উপর অশান্ত দৈত্যের নিষ্ঠুরতায়। লাজপত রায়ের বুকে লাগল লাঠির আঘাত, চোখে-মুখে দানবের ঘুষি। দেশ-বরেণ্য মহান নেতা অন্যায়ভাবে জখম হলেন। হাসপাতালে নেওয়া হল তাঁকে। ১৭ই নভেম্বর তাঁর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। দুঃখে-শোকে মুহ্যমান গোটা ভারতবর্ষ। ক্ষোভে-ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত তরুণ-চিত্ত। পাঞ্জাবের বিপ্লবী-দল 'শহিদে'র-বর্ণে-শোভিত দেশনায়কের মৃত্যুর প্রত্যুত্তর দেবার কাল গুনছেন প্রশান্ত চিত্তে।···

ইতিমধ্যে ভগৎসিং ও তাঁর সতীর্থদের বিপ্লবী-সংগঠন দানা বেঁধেছে। আয়তনে ক্ষুদ্র, কিন্তু কর্মক্ষমতায় প্রচণ্ড। কারণ,

সংগোপনে গড়ে-তোলা এই দলটি গুপ্ত-সমিতির সর্বগুণবিধৃত। দলের নাম 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট্ রিপাব্লিকান্ পার্টি'।

তাঁদের প্রধান কর্তব্য হল লাজপত রায়ের মৃত্যুর জন্যে দায়ী পুলিশ-কর্তা মিঃ স্কট্‌কে উড়িয়ে দেওয়া। এ না-হওয়া পর্যন্ত পাঞ্জাবের লোকের মনোবল ফিরে আসবে না।

একমাস কেটে গেছে। ১৯২৮ সালেরই ১৬ই ডিসেম্বর। ভগৎ সিং, রাজগুরু প্রমুখ বীর সশস্ত্র অবস্থায় পুলিশ-কর্তার দপ্তরের কাছে অপেক্ষা করছেন।…অপরাহ্ণ ৪টা ৩৭ মিনিট—দপ্তর থেকে বেরিয়ে এসেছেন এক ইউরোপীয় অফিসার। মোটর সাইকেলে উঠতে যাবেন। স্কট্ ভ্রমে তাঁকেই গুলি করলেন রাজগুরু। আহত পুলিশ-অফিসারের নাম স্যাণ্ডার্স্। একজন ইউরোপীয় সার্জেণ্ট সবেগে দপ্তর থেকে বেরিয়ে এলো। সে-ব্যক্তি এবং স্যাণ্ডার্স্-এর গার্ড (চন্দন সিং) তাড়া করল আততায়ীকে। ভগৎসিং অদূরে সাহায্যার্থে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি শায়িত স্যাণ্ডার্স্-এর রক্তাপ্লুত দেহে পর পর ক'টি গুলি করলেন। তাঁদেরই একজন সার্জেণ্টকে তাক্ করা সত্ত্বেও সে অক্ষত রইল। কিন্তু চন্দ্রশেখর আজাদের লক্ষ্য অব্যর্থ—চন্দন সিং নিহত হল।

আক্রমণকারী বিপ্লবীরা কাজ সমাপ্ত হতেই পালিয়ে গেলেন। কেউ তাঁদের পাত্তা পেল না।

২১শে ডিসেম্বর লাহোর ও শালিমার গেটে বিপ্লবীদের ইস্তাহার শোভা পাচ্ছে। তাতে ইংরেজ-বিতাড়নের যুদ্ধে তরুণ-রক্ত ঢেলে অর্ঘ্যদানের আহ্বান। শহরে দেয়ালে-দেয়ালে আরো ইস্তাহার—তাতে ঘোষণা করা হয়েছে, 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট্ রিপাব্লিকান্ পার্টি'র সামরিক অধিকর্তার তরফ থেকে অর্থ-পুরস্কার, বিপ্লবী কর্মকর্তাদের ধরবার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে!…

দিল্লীর এ্যাসেম্‌ব্লি-গৃহে বোমা নিক্ষেপ

১৯২৯ সালের ৮ই এপ্রিল। দিল্লীর এ্যাসেম্‌ব্লি। সাইমন্‌ সাহেবও বিশিষ্ট দর্শকদের স্থানে উপবিষ্ট। দর্শকদের গ্যালারিতে লোক ধরে না। কতকগুলো জরুরী 'বিল্‌' নিয়ে আলোচনা হবে। বিঠলভাই প্যাটেল্‌ স্পীকার-এর আসন অলঙ্কৃত করেছেন।···

"এমন সময় আচম্বিতে ঘটল বিপ্লবী ভগৎসিং ও বটুকেশ্বর দত্তের আবির্ভাব। তাঁরা ছড়িয়ে দিলেন দর্শকদের গ্যালারি থেকে 'রেড্‌-প্যাম্‌ফ্লেট'। তারপর গর্জে উঠল বিপুল শব্দে জীবন্ত 'বম্ব্‌'! সে এক বিষয়ের বস্তু! ততোধিক বিস্ময়ের বস্তু হল যে, তাঁদের অস্ত্র কোন ইংরেজকে ঘায়েল করল না—এমন কি, 'গো ব্যাক্‌, সাইমন্‌'-কেও না! শান্ত হয়ে গেল রুদ্রের অস্ত্র কেবলমাত্র ইংরেজের কন্‌স্টিটিউশন্যাল্‌ ভণ্ডামীর পীঠস্থান ও তার মাহাত্ম্যের বিরুদ্ধে গগনভেদী অট্টহাসির সূচনা করে। বিপ্লবীর 'বম্ব্‌' যে-ভাষায় সেদিন কথা বলেছিল, তা-ই হল একমাত্র বোধগম্য ভাষা সাম্রাজ্য-বাদীর কাছে।" ('সবার অলক্ষ্যে', ২য় পর্ব,—পৃঃ ৩০৮)

ভগৎসিং ও বটুকেশ্বর দত্তের ইস্তাহার অকুণ্ঠ কণ্ঠে জানিয়েছিল ঃ "'It takes a loud voice to make the deaf hear.'—Let the Government know that while protesting against the public safety and the Trade Disputes Bills and callous Murder of Lala Lajpat Rai, on behalf of the helpless Indian mass, we want to emphasise the lesson often repeated by history that it is easy to kill individuals but you cannot kill ideas. Great empires crumbled while ideas survive!···We are sorry to

admit that, we attach great sanctity to human life. But the sacrifice of individuals at the altar of great Revolution, that will bring freedom to all rendering exploitation of man by man impossible, is inevitable. Long live Revolution."

('History of Freedom Movement',—Vol. III, P.—516)

['বধিরকে শোনানর জন্যে প্রচণ্ড কণ্ঠস্বরের প্রয়োজন'—সরকার-পক্ষও শুনে রাখুন যে, তাঁদের 'পাব্‌লিক সেফ্‌টি বিল্‌' বা 'ট্রেড্‌ ডিস্‌পুট্‌ বিল্‌' কিংবা তাঁদের কৃত লালা লাজপত রায়ের হত্যার প্রচণ্ড প্রতিবাদ আমরা করে যাচ্ছি ভারতের অসহায় জনসাধারণের পক্ষ থেকে। আমরা আরো জোরের সহিত বলছি যে, অজস্র ব্যক্তি-বিশেষকে হত্যা করা সহজ, অথচ 'আদর্শে'র হত্যা-সাধন অসম্ভব। বিশাল সাম্রাজ্য ধূলায় গড়িয়ে পড়ে, কিন্তু আদর্শের মৃত্যু ঘটে না। মানুষের জীবনকে আমরা পবিত্র মনে করি। কিন্তু যে মহান 'বিপ্লব' দেশের সেই মুক্তি এনে দেবে, যে-মুক্তির আবির্ভাবে মানুষকে মানুষ আর শোষণ করতে পারবে না—সে-বিপ্লবের বেদীমূলে বহু ব্যক্তিকে উৎসর্গ করতেই হবে। তা অনিবার্য।···বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক !]

('সবার অলক্ষ্যে', ২য় পর্ব,—পৃঃ ৩০৯)

তরুণ-বিদ্রোহীদের 'রেড্‌ প্যাম্‌ফ্লেটে'র অগ্নিস্রাবী ভাষায় ভারতবর্ষের মানুষ শৌর্যময় এক যুগে আবির্ভূত হল। পরাধীনতার অবসাদ, দৈন্য ও দুর্বলতা যেন নিমেষে ঘুচে গেল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সুযোগ্য ভ্রাতা ব্রিটিশ-সরকারের প্রাক্তন 'ল'-মেম্বার এস্‌. আর. দাশের মত স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিও তাঁর পুত্রকে এক পত্রে লিখেছিলেন : "That the bomb was necessary to awaken England !"
[ইংলণ্ডকে ঘুম থেকে তুলতে হলে ঐ বোমার প্রয়োজন !]

প্রধান বিপ্লবীরা এবার মর্মে মর্মে অনুভব করলেন :

"বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন নাশন,
বারে বারে দেখা দিবে।"

কারণ, তাঁদেরই উদ্দেশে জাতির যৌবন চিরকাল হৃদয় থেকে বলে এসেছে ঃ

"আমি রচি তারি সিংহাসন ;
তারি সম্ভাষণ ॥"

প্রবীণ নেতারা এবার হয়তো নূতন করে বুঝলেন যে, 'স্যাণ্ডার্স-হত্যা', 'এ্যাসেম্‌ব্লিতে বোমা-বিস্ফোরণ' বা 'ডে'-নিধন কিংবা 'ভূপেন চ্যাটার্জি অপসারণ'—এ-সব কোন য়্যাক্‌শান্‌ই 'সন্ত্রাসবাদমূলক কাজ' নয়। এ-সব জাতির উদাত্ত কণ্ঠধ্বনি, আত্ম-প্রতিষ্ঠাকল্পে সবল হস্তের কৃপাণ ঝঞ্ঝনা। হাজার সত্যাগ্রহ, মিটিং, প্রসেশান্‌ বা কড়ামিঠে আবেদনে যা না হত, তার বহুগুণ কাজ হল ভগৎ-বটুকেশ্বর-নিক্ষিপ্ত বোমার গগনভেদী শব্দে। তাই আইনজ্ঞ দাশমহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই বলেছিলেন, 'ইংলণ্ডের ঘুম ভাঙাতে বোমার প্রয়োজন ছিল !'···

বোমা নিক্ষেপ করেই ভগৎসিং ও বটুকেশ্বর দত্ত হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ফেলে দিলেন। প্রশান্ত চিত্তে দাঁড়িয়ে রইলেন—নয়নে কৌতুকচ্ছটা, ওষ্ঠে মৃদুহাসি !···তাঁদের কাজ হয়ে গেছে। তাঁরা অযথা কাউকে হত্যা করতে আসেননি, তাঁরা 'সন্ত্রাস' সৃষ্টির ব্রত নেননি—তাঁরা 'সন্ত্রাসবাদী' নন। তাঁরা বিপ্লবী—তাঁদের কাজ দেশকে বিপ্লবের পথে এগিয়ে নেওয়া, ভারতবর্ষের বক্তব্য বিশ্ববাসীকে কার্যকরিভাবে শোনান।···

নিরস্ত্র বীরদ্বয়কে সদম্ভে গ্রেপ্তার করল সশস্ত্র-পুলিশ। অনতিবিলম্বে তাঁরা কারারুদ্ধ হলেন।

বিচার-প্রহসনও সাঙ্গ হল ১৯২৯ সালেরই ১২ই জুন। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড লাভ হল উভয়েরই। এছাড়া তাঁদের বিরুদ্ধে রয়েছে স্যাণ্ডার্স-হত্যা ও অন্যান্য য়্যাকৃশানের অভিযোগ। সে-সব নিয়ে লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলা (তৃতীয়) রুজু করার ইতিহাস পরে উল্লেখ করা হচ্ছে।

যতীন দাস

১৯২৯ সালেরই অপর একটি ঘটনা। এমন ঘটনা ইতিপূর্বে আর ঘটেনি। 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থে পাই: "সেই ঘটনা হল তরুণ-তাপস, বিপ্লবী যতীন দাসের অনশনে আত্মদান। ভারতের 'টেরেন্স ম্যাক্সুইনি' জেল-বন্দীদের প্রতি 'মানুষের-ব্যবহার' দাবী করে তেষট্টি দিন নিরম্বু উপবাস করেন লাহোর সেণ্ট্রাল্ জেলে। এই অনশনে তাঁর মৃত্যু ঘটে। দেহত্যাগের তারিখ ১৩ই সেপ্টেম্বর। এ-মৃত্যু তো সাধারণ 'অনাহারে' মৃত্যু নয়। এ যে চিরঞ্জীবী হওয়ার দুর্জয় তপস্যা। এ-তপস্যায় প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকে জয় করেছেন তিনি, তিলে তিলে জীবনদান করে। দান সম্পূর্ণ করে তিনি হলেন জীবিতেশ্বর।"

('সবার অলক্ষ্যে,' ১ম পর্ব,—পৃঃ ৩৪)

'বেঙ্গল্ ভলাণ্টিয়ার্স বাহিনী' গড়ে উঠেছিল ১৯১৮ সালের কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে। সুভাষচন্দ্র তার 'জেনারেল্ অফিসার কমাণ্ডিং'। দক্ষিণ কলকাতা থেকে বিশেষ করে রিক্রুট্ করে যে স্বেচ্ছাসৈনিক-বাহিনী সংগঠিত হয়েছিল, তার নায়ক ছিলেন মেজর সত্য গুপ্ত। সত্য গুপ্তের প্রধান সহায়ক ছিলেন মেজর যতীন দাস। যতীন দাসের মন পড়ে ছিল বাঙলার বাইরের গোপন কার্যকলাপে। কাজেই, ভলাণ্টিয়ার্স-বাহিনীর দৈনন্দিন কর্মে যুক্ত হবার অবকাশ তাঁর ছিল না—বারে বারে তাঁকে বাইরের আহ্বানে

সাড়া দিতে হত। ভগৎসিংদের নেতা শচীন সান্যাল। বিদ্রোহী যতীন দাসেরও তিনি নেতা। শচীনবাবুর নির্দেশ পালন করার ফাঁকে ফাঁকে দক্ষিণ কলকাতা স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে তাঁর অবদান প্রচুর।...

১৯২৯ সালের ১৪ই জুন। যতীন দাসকে তাঁর কলকাতার গৃহ থেকে লাহোরের পুলিশের নির্দেশে গ্রেপ্তার করা হল। শৃঙ্খলিত যতীন দাস আনীত হলেন লাহোর জেলে ১৬ই জুন। শুরু হল ভগৎসিং রাজগুরু, শুকদেব সহ যতীন দাসের মামলা। এ-মামলাই পরিশেষে রূপান্তরিত হয়েছিল 'থার্ড্ লাহোর কন্সপিরেসি কেস্'-এ। অবশ্য যতীন দাস তখন পদাঘাতে আইন-আদালত চূর্ণ করে চলে গেছেন স্বর্গধামে।

যতীন দাস অনশনে আত্মদান করে সরকারী বিচার ও ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভের দায় থেকে মুক্ত হলেন। মৃত্যুঞ্জয়ী এই বীরের মৃতদেহ কলকাতায় আনা হল। আমরা 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থে পাই: "মহামৃত্যুর রাজকীয় শোভাযাত্রা সেদিন (১৬.৯.২৯) হাওড়া থেকে কেওড়াতলার শ্মশানঘাট পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ নরনারী সজল চোখে দেখেছে।...আর যাঁরা রক্তের বিনিময়ে রক্ত-উৎসব রচনায় উন্মুখ, তাঁদের চোখে কিন্তু জল ছিল না। তাঁদের বুকের কথা হাজার হাজার ইস্তাহারে প্রকাশ্যে সেদিন ছড়ান হয় জনতার মধ্যে। ইস্তাহারের শীর্ষে লেখা দেখেছিলাম: 'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা!'..."
('সবার অলক্ষ্যে', ১ম পর্ব,—পৃঃ ৩১)

আমাদের মনে পড়ে জি-ও-সি সুভাষচন্দ্র বসু এবং দেশপ্রিয় জে. এম্. সেনগুপ্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পরিচালিত, ইউনিফর্ম্-পরিহিত, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স-বাহিনী সেদিন লক্ষাধিক লোকের মৌন শোক-মিছিল করে, কী অপূর্ব নিষ্ঠায় যতীন দাসের শবাধারটি কাঁধে করে নিয়ে

এসেছিলেন হাওড়া থেকে কেওড়াতলা শ্মশানে!···আমাদের মনে পড়ে ভারতের এই তরুণ-'ম্যাক্‌সুইনি-'র আত্মবিলয়নে আইরিশ-'ম্যাক্‌সুইনি-'র পত্নী মিসেস্ মেরী কেমন উতলা হয়ে তারবার্তা পাঠিয়ে-ছিলেন ঃ "টেরেন্স্ ম্যাক্‌সুইনির পরিজন শোকে ও গর্বে যতীন দাসের মহাপ্রয়াণে দেশপ্রেমী ভারতবাসীদের সঙ্গে যুক্ত হলেন। স্বাধীনতার অভ্যুদয় সুনিশ্চিত।"···আমাদের আরো মনে পড়ে, মহাশ্মশানে যতীন দাসের চিতাশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর বৃদ্ধ পিতা শ্রদ্ধেয় বঙ্কিমচন্দ্র দাস মহাশয় কী অতুলনীয় গাম্ভীর্যে মন্ত্রোচ্চারণ করে বলেছিলেন ঃ "ওঁ নারায়ণ, যে দেশদ্রোহীরা মাতৃভূমিকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করেছিল, তাদের সকলের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমার আদরের খেঁতুকে (যতীনের ঘরোয়া নাম) অশ্রুঅর্ঘ্য সহ তোমার চরণে সমর্পণ করলাম।"···

যতীন দাসের মৃত্যু তাই সার্থক হল। বিশ্ব-নারায়ণের চরণে তেজস্বী পিতার 'পুত্র-দান' ব্যর্থ হল না। সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হল বলেই 'বেঙ্গল্ ভলান্টিয়ার্স'-এর জি-ও-সি সুভাষচন্দ্র যথাকালে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' গড়ে, নেতাজির গৌরবে ম্যাক্‌সুইনী-পত্নীর ভবিষ্যৎ-বাণীকে সফল করলেন। ভারতে 'স্বাধীনতার অভ্যুদয়' বিলম্বিত হল না।

লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলা (তৃতীয়)

১৯৩০ সালের ১০ই জুলাই 'লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলা' (তৃতীয়) একটি স্পেশাল্ ট্রাইব্যুনালের কোর্টে শুরু হল। এগার জন আসামীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য উচ্ছেদ ঘটানর অভিযোগ থেকে 'স্যাণ্ডার্স্-হত্যা' ইত্যাদি নানা য়্যাক্‌শানের অভিযোগ আনা হয়েছে। বিচার সাঙ্গ হল ৭ই অক্টোবর। ভগৎসিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসির হুকুম হল, এবং অপর আটজনকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দীপান্তরের দণ্ড।

কিন্তু দেশ মেনে নিল না এই দণ্ড। গৃহে গৃহে, শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গ্রামান্তরে দেখা দিল প্রবল অসন্তোষ। ভগৎসিংদের মৃত্যু ভারতবাসীর অসহ্য।

"গান্ধীজি জনতার নাড়ী ভালই বুঝতেন। তাই ভগৎসিংদের ফাঁসি বন্ধ করার জন্যে তাঁকে ব্যস্ত হতে হল। পাঞ্জাবীরা 'মার্শাল রেস্'। কাজেই, অহিংসার বার্তা এখানে মন বুঝে বলতে হয়।··· ইতিহাস জানে যে, এই মহাত্মা গান্ধীই ১৯২৪ সালে গোপীনাথ সাহার আত্মত্যাগ ও বীরত্বের প্রশংসামূলক প্রস্তাব সিরাজগঞ্জের প্রাদেশিক কংগ্রেস-সভা গ্রহণ করায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, এবং কলকাতা কর্পোরেশনকে অনুরূপ গৃহীত প্রস্তাবটি নাকচ করে দিতে বাধ্য করেছিলেন। যা হোক, আজ ১৯৩০ সালে জনমতের চাপে সেই মহাত্মাকেই ভগৎসিং-রাজগুরুদের আত্মত্যাগ ও বীরত্বের মর্যাদা দিতে হল, এবং 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি'র সাফল্য কামনায় এই বীরত্রয়ের প্রাণরক্ষা-কল্পে রাজদরবারে বিস্তর হাঁটাহাঁটি করতে হল।···কিন্তু ভবী ভুলবার নয়!"··· ('সবার অলক্ষ্যে', ১ম পর্ব,—পৃঃ ৩৫)

১৯৩১ সালের ২৩শে মার্চ ভগৎসিং, রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসি হয়ে গেল সায়াহ্নে, ৬টা ৪৫ মিনিটে। লাহোর সেণ্ট্রাল জেলের আকাশ-বাতাস বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল। সাধারণ কয়েদীদের চোখও অশ্রুসিক্ত। দেশবাসী বিক্ষুব্ধ। বাঙলার বিপ্লবীদের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে ওঠার আগ্রহে অপেক্ষমাণ।···

এদিকে সুভাষচন্দ্র সারা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে যে-কোন বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে বলে যাচ্ছেন: "পদানত এই ভারতবর্ষ হাজার 'ভগৎসিং' চাইছে।"···

উত্তরে জনতার ধ্বনি শোনা যায়: "ভগৎসিং, রাজগুরু, শুকদেব —জিন্দাবাদ!"···

ভাইস্‌রয়ের স্পেশাল ট্রেন ওড়াবার চেষ্টা

২৩শে ডিসেম্বর, ১৯২৯ সাল। দুর্জয় শীত। সকাল ৫টা ১৫ মিনিটের সময় দিল্লী থেকে চার মাইল দূরে কুরুপাণ্ডবদের দুর্গের কাছে একটি মোটর-সাইকেল এসে থামল। চতুর্দিক কুয়াশায় আচ্ছন্ন। পাশের মানুষ চেনা যায় না। সাইকেল থেকে নামলেন দু'টি আরোহী। একজনকে মনে হয় কোন মিলিটারি অফিসার, অপর ব্যক্তি তাঁর আর্দালি সম্ভবত। জঙ্গী-অফিসারের পরনে জঙ্গী-টুপি, কোর্তা, ব্রিচেস্ এবং পায়ে হাঁটু-পর্যন্ত-ঢাকা চামড়ার জুতা। জঙ্গী-ঘোড়সওয়ার-বাহিনীর মেজরের বেশ। আর্দালির গায়ে মিলিটারি ওভারকোট।

কিন্তু এই আগন্তুকদ্বয় আদপে সাধারণ সৈনিক নন। তাঁরা স্বাধীন ভারতের মুক্তিদাতা যে-সব সৈনিক জন্মগ্রহণ করে গেছেন, তাঁদেরই অন্যতম। মিলিটারি অফিসারের পোশাকে ছিলেন যশপাল, এবং আর্দালির ছদ্মবেশে ভাগরাম। ভাগরাম এখন স্বর্গগত। উভয়েই 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট্ রিপাব্লিক' দলের সভ্য। ভগৎসিংদের সতীর্থ।...

তখন ভারতবর্ষের ভাইস্‌রয় ছিলেন লর্ড্ আরউইন। তিনি কোল্‌হাপুর থেকে স্পেশাল ট্রেনে সেদিনই প্রত্যূষে দিল্লী আসছিলেন। ভগবতীচরণ এবং যশপালের উপর ভার পড়েছিল বড়লাটের গাড়ি উড়িয়ে দেবার।

গাড়ি পৌঁছবে ভোর ৬টায়। তার কয়েক মিনিট পূর্বেই মোটর-সাইকেলটি ভাগরামের হেপাজতে রেখে কুরুপাণ্ডব-দুর্গের কাছাকাছি একটি কুয়োর পাশে গেলেন যশপাল। উক্ত কুয়ো থেকে রেল্-লাইনের দূরত্ব মাত্র ২০০ গজ। রেল্-লাইনের তলায় একদিন পূর্বেই

বোমাটি ভগবতীচরণের দায়িত্বে স্থাপিত হয়েছিল। সেই বোমার সঙ্গে সেদিনই একটি তার সংযুক্ত করে, উহার অপরপ্রান্ত ঐ কুয়োর কাছে টেনে এনে গোপনে রাখা হয়; যশপাল এখন (অর্থাৎ ২৩শে ডিসেম্বরের প্রত্যূষে) ঐ তার-প্রান্তের সঙ্গে একটি ব্যাটারি যুক্ত করে ভাইস্‌রয়ের গাড়ি আসার অপেক্ষা করছেন। যথাসময়ে গাড়িখানা এলেই তিনি স্থইচ্‌ টিপে দেবেন।

নিয়ম হল, ভাইস্‌রয়ের গাড়ির আগে পাইলট্‌-ইঞ্জিন্‌ চলে যাবে লাইন্‌টি বিপদ-আপদ থেকে মুক্ত কিনা জানবার জন্যে। তাছাড়া সারা লাইন্‌ জুড়েই কিছু দূরে দূরে পুলিশ মোতায়েন করারও রীতি ছিল। এ-সবই লাট-বড়লাটদের নিরাপত্তার জন্যে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা।...

যশপাল পাইলট্‌-ইঞ্জিনের শব্দ শুনলেন। শব্দ শুনলেন নির্দিষ্ট সময়েই। কিন্তু চোখে কিছুই দেখা গেল না। ঘন-কুয়াশায় অল্প দূরের বস্তুও দেখা যায় না। পাইলট্‌-ইঞ্জিন্‌ চলে যাবার পনের মিনিট পরেই ভাইস্‌রয়ের গাড়ি যাবার নিয়ম। কাজেই, ঘড়ি ধরে ঠিক ১৫ মিনিট পরেই যশপাল স্থইচ্‌ টিপলেন। ব্যাটারি চার্জ হল। গগন-বিদারী শব্দে বোমা ফেটে গেল। বড়লাটের গাড়ি ঠিকই এসেছিল, ঠিকই চলে গেল—তবে অক্ষত দেহে। অর্থাৎ বোমা ফাটবার এক মুহূর্ত পূর্বেই গাড়ি বেরিয়ে গেছে।...এই ব্যর্থতার মূলে যশপালের ত্রুটি নয়, বড়লাটের সহায় যে ছিল সেদিন কুরুপাণ্ডব-দুর্গ ঘেরা নিবিড় কুয়াশা!

সকল আয়োজন ব্যর্থ হওয়ায় স্বভাবতই যশপাল ও তাঁর সঙ্গী বিষণ্ণ হলেন। কিন্তু ব্যর্থতা বিপ্লবীকে নিরাশ করে না। তাঁর জীবন আশার লালনে মুখর।...

এবার দুই বন্ধু ফিরে যাবেন দিল্লী। কিন্তু মোটর-সাইকেল স্টার্ট নিচ্ছে না। ঠাণ্ডায় জমে গেছে। তখন দুই বন্ধু ওটাকে ঠেলে নিয়ে চললেন। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই তাঁরা শুনলেন অনেকগুলো বুটের

আওয়াজ। পেছন থেকে যেন একদল সেপাই আসছে। বিপ্লবীদ্বয় প্রমাদ গনলেন। হয়তো তাঁদেরই ধরতে আসছে। কি আর করা! লড়াই করে জীবনদানের সৌভাগ্য যখন এসে গেছে, তখন তাকে সগৌরবে বরণ করে নিতে হয়। দু'জনেই পকেটস্থ পিস্তলে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

যশপাল একটু এগিয়ে এসে রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য, সেপাইরা কাছে এলেই তিনি এমনভাবে গুলি চালাবেন, যাতে অন্তত দু'চারজনকে ঘায়েল করে মৃত্যুবরণ করা যায়।

সেপাইরা কাছে এসে গেল। তাদের দু'তিন পা পেছনে ছিলেন অফিসার। প্রত্যেকেই রাইফেল্‌ধারী। সহসা অফিসার গুরু-গর্জনে হুকুম দিলেন: "আইজ্‌ রাইট্‌!" এ-হুকুম তো গুলি চালাবার নয়—এটা যে সেলাম জানাবার আদেশ!…

সিপাহী-দল যশপালকে সেলাম করতে করতে মার্চ করে চলে গেল—যশপালও মিলিটারি কায়দায় সে-সেলাম গ্রহণ করে সে-যাত্রা রক্ষা পেলেন। তাঁর পরনে ছিল 'মেজর'-এর পোশাক, কিন্তু মেজর সাহেবের টুপির উপর পিতলের ব্যাজে (ইন্‌সিগ্‌নিয়া) লেখা ছিল 'H. S. R. A.'—অর্থাৎ 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট্‌ রিপাব্‌লিকান্‌ আর্মি'! সৌভাগ্যবশত সান্ত্রীদের অফিসার দূর থেকে কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাতে সেটা লক্ষ্য করতে পারেননি। শুধু দেখেছিলেন তাঁর 'মেজরে'র উর্দি।…

তারপর মোটর-সাইকেল ধাক্কাতে ধাক্কাতে তাঁরা দু'জন দিল্লী এসে গেলেন। কথা ছিল, ঘটনার পরই মোটর-সাইকেলযোগে যশপাল চলে যাবেন দিল্লী থেকে ১৮ মাইল দূরে, গাজিয়াবাদ স্টেশানে। সেখানে ভগবতীচরণ অপেক্ষা করছেন তাঁর জন্যে। উভয়ে একত্রিত হলেই সটান পালিয়ে যাবেন কলকাতা।

কিন্তু সাইকেল-বিভ্রাট! ট্রেনেই যেতে হচ্ছে গাজিয়াবাদ। প্রথমশ্রেণীর একখানা টিকেট কেটে যশপাল সাহস করে রেলের

কামরায় ঢুকলেন। 'H. S. R. A.' ইন্‌সিগ্‌নিয়া তাঁর মিলিটারি-জারিজুরি সব ভণ্ডুল করে দেবে, এই ভাবনা। প্রথমশ্রেণী কামরায় ঢুকতেই দেখলেন একটি গোরা সৈন্য সেখানে আসীন। মেজর সাহেবকে দেখেই সে ঘাবড়ে গেল। প্রথমশ্রেণীর যাত্রী সে হতে পারে না। ভয়ে জোড়-পায়ে দাঁড়িয়ে এক সেলাম ঠুকে সে তড়াক্ করে বেরিয়ে বাঁচল। যশপালও তার নিষ্ক্রমণে বেঁচে গেলেন। আর্দালি-বেশী বন্ধু অবশ্য তৃতীয়শ্রেণীর যাত্রী।

উভয়ে গাজিয়াবাদ স্টেশানে এসে উপস্থিত হলেন। ভগবতীচরণ প্রথমশ্রেণীর ওয়েটিং-রুমে কথামত অপেক্ষা করছিলেন।···বন্ধুদের মিশ্র অনুভূতি। বিপদ-মুক্ত অবস্থায় পুনর্মিলনে আনন্দ, কার্য হাসিল হয়নি দেখে দুঃখ।···

শহিদ ভগবতীচরণ

রায়বাহাদুর শিবচরণ দাসের পুত্র ভগবতীচরণ। লাহোরের অধিবাসী এই পরিবার। বিত্তশালী ও সরকারী-পদবীপ্রাপ্ত পিতার পুত্র হলেও ভগবতীচরণের রক্তে প্রবাহিত ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব, দুঃখী ও নির্যাতিত ভারতবাসীর জন্যে মমত্ববোধ। বালক কাল থেকেই তাঁর মধ্যে সে-সব লক্ষণ দেখা গিয়েছিল।

ভগবতীচরণ অল্প বয়সেই বিয়ে করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম দুর্গা দেবী। কৈশোর পেরিয়েছে আগুন-ছোঁয়া স্বপ্নে। যৌবনে স্বামী-স্ত্রী স্পর্শ করেছেন বিপ্লবের মন্ত্র। 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট্ রিপাব্‌লিকান্ পার্টি'র যাবতীয় সশস্ত্র-আন্দোলনেই ভগবতীচরণের অবদান সর্বাঙ্গসুন্দর। লাহোরে 'স্যাণ্ডার্স-হত্যা' থেকে দিল্লীতে 'ভাইস্‌রয়ের স্পেশাল্ ট্রেনটি উড়িয়ে দেবার চেষ্টা' প্রভৃতি প্রত্যেক য়্যাক্‌শানেই ভগবতীচরণের সুদক্ষ সহযোগিতা অনস্বীকার্য। এরূপ সক্রিয় সহযোগিতা এবং কর্মনেতৃত্ব সত্ত্বেও পুলিশ কোনদিন তাঁকে খুঁজে পায়নি। লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলা'য় ভগবতীচরণের নামে গ্রেপ্তারী-

পরোয়ানা ছিল, পলাতক-আসামীরূপে মোটা টাকার পুরস্কারও পুলিশ তাঁর নামে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু কেউ তাঁকে ধরিয়ে দিতে পারল না।...

১৯২৯ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ভগবতীচরণের নেতৃত্বেই ভাইস্‌রয় লর্ড আরউইন-এর দিল্লীগামী ট্রেনের কামরা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন যশপাল। কাজটি সফল না হলেও বোমা-বিস্ফোরণ ঘটে ঠিকই। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের কর্ণে পেঁ ৗছায় সর্বাগ্রে। বিপ্লবের গুরু পদধ্বনি আর কেউ শুনতে না পেলেও ইংরেজ শুনেছিল সভয়ে। সুতরাং বিপ্লবীর দৃষ্টিকোণ থেকে এ-য়্যাক্‌শান্‌ও ব্যর্থ হয়নি।...

ভগবতীচরণ চুপ করে থাকার মানুষ নন। বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই একে একে কারারুদ্ধ হয়ে গেছেন। তাই কাজ তাঁর প্রতি মুহূর্তে বেড়ে যাচ্ছে।

বোমা তৈয়ের হচ্ছে দলের চাহিদা মেটাবার জন্যে। শুধু তৈয়ের করলেই চলে না, বোমা কার্যকরী হল কিনা তার পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

ভগবতীচরণ দু'একটি সতীর্থসহ চলে গেছেন, রাবী-নদীর তীর ধরে দূর অরণ্যে। সেখানে বোমা ফাটালে বনের পশু চম্‌কে উঠলেও কোন মানুষের কানে তার শব্দ যাবার সুযোগ নেই।...

বিপ্লবীরা শুরু করেছেন বোমার পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সহসা দিগন্ত কাঁপিয়ে দারুণ গর্জনে ফেটে গেল একটি বোমা। ভগবতীচরণের দু'খানি হাত মুহূর্তে গেল উড়ে। অরণ্যতলে লুটিয়ে পড়লেন রক্তাক্ত দেহে তরুণ-তাপস। মৃত্যুর দেবতা বুকে তুলে নিলেন সন্তানকে।... সম্মুখে বিহ্বল দু'একটি সতীর্থ। তাছাড়া ধারে-কাছে অপর আত্মীয় নেই, বিপ্লব-সতীর্থা আপন সহধর্মিণীও নেই।...বনতলে শায়িত

ক্ষত-বিক্ষত সৈনিক—ঊর্ধ্বে মহামৌন আকাশ—চতুষ্পার্শ্বে নিঃসীম নীরবতা। হিংস্র শ্বাপদকুলও নিশ্চুপ।...

সঙ্গীদের বিহ্বলতা কেটে গেল। কোনপ্রকারে তাঁরা রাবীর কূলে বনদিগন্তকে সাক্ষী রেখে প্রিয়তম বন্ধু ও কর্মনেতার শেষকাজ সম্পন্ন করলেন। অনুষ্ঠানের লৌকিক ত্রুটি থাকল প্রচুর। কিন্তু চোখের জলে, হৃদয়ের উত্তাপে এবং অন্তরের শ্রদ্ধায় তাঁদের তর্পণ হয়ে উঠেছিল অসামান্য। 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট্ রিপাব্লিকান্ পার্টি'র সেনানায়ককে শেষ-বিদায়ের লগ্নে তাঁরা সৈনিকের মর্যাদা দিতে ত্রুটি করেননি।

এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে। কিন্তু সংবাদটি পুলিশের কর্ণগোচর হয় 'লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলা'র একজন রাজসাক্ষীর মাধ্যমে। তার তারিখ ১৯৩১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি।...

ভগবতীচরণের অনন্যসাধারণ কর্মনিমগ্নতা তাঁকে রাবীর কূলে অরণ্যচ্ছায়ায় কর্মযোগীর স্তরে পৌঁছে দিল। সেই যোগীবর কর্মনিরত অবস্থায় সাধনার আসনে বসেই নির্বাণ লাভ করলেন। বিপ্লবীর জয়ধ্বজা অক্ষয় সৌন্দর্যে উড়িয়ে দিয়ে মহাপ্রস্থান করলেন মৃত্যু-বিজয়ী ভগবতীচরণ।...

দুর্গা দেবী

ভগবতীচরণ আত্মবিলয়ন ঘটিয়েও বেঁচে রইলেন ভারতবর্ষের তারুণ্য-শক্তির মধ্যে, বেঁচে রইলেন তাঁর সহধর্মিণী দুর্গা দেবীর কর্মজীবনে।...

১৯৩০ সালেরই ফেব্রুয়ারি মাসে, ভগবতীচরণের মৃত্যুর পর মাসখানেকের মধ্যে লাহোরে বিপ্লবী-দলের একটি গোপন সভা ডাকা হয়। যাঁরা তখনো ধরা পড়েননি, তাঁদের মধ্যে যথানির্দিষ্ট কর্মীরা সেদিন সে-সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার আলোচ্য-বস্তু ছিল

ছু'টি। প্রথম—ভগৎসিং ও অন্যান্য বন্দীদের লাহোর-জেল থেকে উদ্ধার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া। দ্বিতীয়—উক্ত সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা। উল্লিখিত ছু'টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর স্থির হল, এজন্যে রেলওয়ে-কোম্পানির ও গভর্ণমেণ্টের টাকা লুট করতে হবে; তাছাড়া যিনি যেখান থেকে যা-কিছু সংগ্রহ করতে পারেন, তাঁকে তা সত্বর পার্টি-তহবিলে জমা দিতে হবে।···

অর্থভাণ্ডার খোলা হল। সে-ভাণ্ডারে প্রথম দান এলো ভগবতী-চরণের বিপ্লবিনী-পত্নী ছুর্গা দেবীর কাছ থেকে। নিজের গহনাপত্র ও মূল্যবান সামগ্রী বিক্রয় করে তিন হাজার টাকা তিনি তুলে দিলেন এই ভাণ্ডারে। ('Roll of Honour', P.—413)

সবকিছু দিয়ে ফতুর হয়ে নিরাভরণা তাপসীর রূপ ধারণ করলেন ছুর্গা দেবী। স্বামীর আরব্ধ কর্মপথে বিপ্লব-সাধিকার কর্মযাত্রা দুঃসহ গতিতে এগিয়ে চলল। স্বাধীনতা-লাভের পূর্ব পর্যন্ত সে গতি থামেনি।···

দ্রষ্টব্য: 'ভাইস্‌রয়ের ট্রেন্ ওড়ান' সম্পর্কিত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে (১) বিপ্লবী-নেতা শ্রী বি. এন. আগরওয়ালের (বর্তমানে জৌনপুর মিউনিসিপালিটির কমিশনার) কাছ থেকে; (২) সাপ্তাহিক 'জনতা' (হিন্দী) থেকে; হিন্দী-লেখাটি শ্রীমতী ভক্তি লাহিড়ী কর্তৃক বাঙলায় অনূদিত ছিল।

॥ ষোল ॥

জোড়া খুন

[বন্ধুসহ বিভীষণ হত্যা]

বিহারের মজঃফরপুর জিলা ক্ষুদিরামের আত্মদানের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এখানকার তরুণ-হৃদয়ের রাজা কিশোর-শহিদ ক্ষুদিরাম বসু। যীশুর মত মৃত্যু-মঞ্চে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল জঘন্য নৃশংসতায়। যীশু বিশ্বকে মিথ্যা থেকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ক্ষুদিরাম স্বদেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। আদর্শ-বাদের পূজারী হবার অপরাধে উভয়েই ছিলেন অপরাধী।

ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকির কর্মভূমি মজঃফরপুর। ক্ষুদিরামের মৃত্যু-ভূমি মজঃফরপুর জেল, প্রফুল্ল চাকির আত্মবিলয়ন-ভূমি মোকামাঘাট স্টেশান্। তাঁদের রক্তে সিক্ত সে-সব অঞ্চলে বিপ্লবের বীজ ১৯০৮ সাল থেকেই ছড়িয়ে গেছে। কাজেই এই জিলা থেকে বহু বিপ্লবীর আগমন ঘটেছে, বহু সংগ্রামী এখানে স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রবাহকে খরতর করেছেন।…

১৯৩২ সালের ১৪ই নভেম্বর। সমস্তিপুরের মিউনিসিপালিটি-আপিসের দেওয়ালের গায়ে কারা যেন লাগিয়ে গেছে রক্তবর্ণে লিখিত ছ'টি পোস্টার। সে ছ'টি হিন্দীভাষায় লিখিত : বাঙলা মর্মার্থ হল ঃ

"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। রাজগুরু, শুকদেব, ভগৎসিং-এর ফাঁসির প্রতিশোধ চাই। আমি, আমার বিপ্লবী-দল 'সর্বভারতীয় রিপাব্লিকান্ পার্টি'র নির্দেশমত বিশ্বাসঘাতককে চরম শাস্তিদান করেছি। বিপ্লবই স্বাধীনতাপ্রাপ্তির নির্দিষ্ট পথ। শান্ত চিত্তে দুরন্ত

বিপ্লবকে বরণ করতে হবে। ধ্বংস বিহনে এ-পথপরিক্রমা সম্ভব নয়। এগিয়ে চলো, বন্ধু, আত্মশক্তির অমিত তেজে।”

(‘রোল অব্ অনার’, পৃঃ—৫২৭)

রক্তবর্ণে লিখিত এ-অক্ষরগুলোর মূল্য সামান্যই হত, যদি-না পাঁচদিন পূর্বে, ১৯৩২ সালেরই ৯ই নভেম্বর সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী ফণী ঘোষ নিহত হত। রক্তে রঞ্জিত সেই ভয়ঙ্কর সান্ধ্যলিপিই যেন পাঁচদিন পরে মিউনিসিপাল্-গৃহের দেওয়ালে আক্ষরিত হয়েছে। তা দেখে তাই ব্রিটিশ-শাসকের দুঃস্বপ্ন বেড়ে গেল, পুলিশের লজ্জার সীমা রইল না। কারণ, কে বা কারা ব্রিটিশ-প্রভুর আশ্রিতজনকে হত্যা করেছে, তার পাত্তা তারা তখনো বের করতে পারেনি।···

ফণী ঘোষ ভগৎসিংদের বিপ্লবী-দলের সক্রিয় সভ্য। লাহোর-ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হবার সাথে সাথেই সে পুলিশের স্নেহভাজন হয়ে উঠল। বন্ধুদের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হয়ে সে তার জানা ও অজানা নানা তথ্য পুলিশের প্রয়োজন মত সাজিয়ে কোর্টে নিবেদন করল। ‘বিভীষণে’র দায়িত্ব পালনে তার কোন খুঁত রইল না। ফলে, ভগৎসিং-রাজগুরু-শুকদেবের ফাঁসি হল, বাকি বন্ধুরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

ব্রিটিশ-সরকারও অকৃতজ্ঞ নয়। বেতিয়া শহরে পুলিশের দেওয়া অর্থে ফণী একটি দোকান খুলে রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করেছে। তার নিরাপত্তার জন্যে সশস্ত্র একটি পুলিশ-গার্ড্ বহাল রয়েছে। সসাগরা-পৃথিবীর অধীশ্বর ব্রিটিশ-সম্রাটের পক্ষচ্ছায়ায় ফণী ঘোষ নির্ভয়ে কাল কাটাচ্ছে। তাই তার ভয় করার কিছু নেই। কিন্তু সে জানে না—বিপ্লবীর পদসঞ্চার কারো কানে পৌঁছায় না, তার নির্মম সংকল্প বিশ্বাসঘাতককে শাস্তিদানে কোনক্রমেই শিথিল হয় না। অমোঘ তার বিধান নিয়তির মত নিশ্চিত।···

সেদিন সন্ধ্যায় নিজের দোকানের পাশে অপর একটি দোকান-ঘরের সম্মুখে বসে ফণী ঘোষ আড্ডা দিচ্ছে তার এক বন্ধুর সঙ্গে। বন্ধুর নাম গণেশপ্রসাদ গুপ্ত। এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে তার মাথায় পড়ল ভোজালির প্রচণ্ড আঘাত। বন্ধু গণেশ আততায়ীকে ধরবার চেষ্টা করতেই তার মাথায়ও এসে পড়ল অনুরূপ আঘাত অপর এক ব্যক্তির কুক্‌রি থেকে। আশপাশের দোকানদাররা ছুটে এল। লোক জমতে শুরু করল। কিন্তু ইতিমধ্যে আততায়ীরা উধাও। তারা পালিয়ে গেলেন ঘনায়মান অন্ধকারের ওপারে।

আহত বিভীষণ ও তার বন্ধুকে হাসপাতালে নেওয়া হল। ১৯৩২ সালের ১৭ই নভেম্বর ফণীর মৃত্যু ঘটে, এবং ২০শে নভেম্বর গণেশ শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।··

'ইণ্ডিয়ান্ সোস্যালিস্ট্ রিপাব্‌লিকান্ আর্মি'-র নির্দেশে ভগৎসিং প্রমুখের মৃত্যুর জন্যে দায়ী ফণী ঘোষ চরম শাস্তি পেল। বিভীষণকে সাহায্য করতে গিয়ে গণেশ গুপ্ত বেঘোরে প্রাণ হারাল। সাম্রাজ্যবাদের দম্ভ চূর্ণ করে বিপ্লবীর শাসন-বিধান জারি হয়ে গেল। দেশবাসী গভীর স্নেহে, সৌহার্দ্যে ও শ্রদ্ধায় জাতির বিশ্বাসহন্তা ও তার সহায়কের অজ্ঞাত শাস্তিদাতাদের গ্রহণ কবেছিল। তাঁদের নিরাপত্তার জন্যে বিধাতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিল।···

বিভীষণ-নিসূদন

শহিদ বৈকুণ্ঠ সুকুল ও চন্দ্রমা সিং

১৯৩২ সালের ৯ই নভেম্বর সন্ধ্যায় বিশ্বাসঘাতক ফণী ঘোষ এবং তার সাথী গণেশ গুপ্ত আহত হয়। কিন্তু পুলিশ খ্যাপার মত খুঁজে খুঁজেও আততায়ীদের পাত্তা পাচ্ছে না। তারা নানা কারণে যে দু'জনকে সন্দেহ করেছে তাঁরা পলাতক। সন্দেহ তাতে 'প্রমাণে'

পরিণত হয়েছে তাদের কাছে। পুলিশ ক্রমে পলাতকদের নাম উদ্ধার করেছে—তাঁরা বৈকুণ্ঠ সুকুল ও চন্দ্রমা সিং।···বৈকুণ্ঠ একটি স্বপ্নচারী সুন্দর কিশোর, চন্দ্রমা সিং বলিষ্ঠদেহী বীর্যদৃপ্ত এক যুবক। কিন্তু স্বপ্নচারী ঐ কিশোরের মধ্যে লুকিয়ে ছিল বজ্রশিখা, অনির্বাণ বহ্নিজ্বালা।···

শোনপুরে মস্ত এক মেলা বসেছে। দূর দূর থেকে বহু দোকানী, ব্যবসায়ী, নানাবিধ জনতা এসে ভিড় জমিয়েছে। বিখ্যাত এই মেলায় উৎসবের অন্ত নেই।···বৈকুণ্ঠ ও চন্দ্রমা ছদ্মবেশে এ-মেলায় এসেছিলেন। মেলা ছেড়ে সবেমাত্র তাঁরা গণ্ডক-ব্রিজের উপর উঠেছেন, তাঁদের গন্তব্যস্থানে যাবার মানসে—এমন সময় পুলের দুই দিক থেকে অতর্কিতে পুলিশ এসে তাঁদের গ্রেপ্তার করে ফেলল। ধস্তাধস্তি হলো প্রচুর। কিন্তু পুলিশেরা দলে ভারী। বোঝা গেল যে, কোথাও বিশ্বাসঘাতকতা হয়েছে—যে-জন্যে পুলিশ পূর্বাহ্নে তাঁদের সন্ধান জেনে অনুসরণ করে এখানে আসতে পেরেছে। সেই অশুভ দিনটি ছিল ১৯৩৩ সালের ৬ই জুলাই। বিভীষণ-হত্যার প্রায় আট মাস পর।···

বৈকুণ্ঠ এক দুর্জয় কিশোর। অথচ শিশিরস্নাত অর্ধস্ফুট কোরকের মত অপাপবিদ্ধ অনিন্দ্যসুন্দর তাঁর মুখখানা। কিন্তু পুলিশের খাতায়—'He was a dangerous criminal!' কাজেই, তাঁদের বিচার বাইরের আদালতে হতে পারে না। মতিহারি জেলের অভ্যন্তরে বসল স্পেশাল্ কোর্ট ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখে। রায় বেরুল ১৯৩৪ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি। বৈকুণ্ঠ পেলেন ফাঁসির হুকুম। চন্দ্রমার হল বার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।···শৃঙ্খলাবদ্ধ-আসামী তরুণ বৈকুণ্ঠকে তবুও ভয়। তাঁকে তাই আলাদা করে পাঠিয়ে দেওয়া হল 'গয়া সেণ্ট্রাল্ জেলে' অধিকতর নিরাপত্তায় ঘাতকের নির্মম হস্তে তুলে দেবার উদ্দেশে।···

"আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ"

ভারতবর্ষের নানা জেলে বহু বীর ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেছেন। তাঁদের আত্মদান অপূর্ব। আমরা সে অপূর্বতার স্পর্শ কল্পনায় আহরণ করি। কিন্তু বৈকুণ্ঠ সুকুলের ফাঁসির পূর্ব-রাতের এবং ফাঁসি-মঞ্চে তাঁর আরোহণের নিখুঁত ও অবিস্মরণীয় যে-ছবি সেদিন প্রত্যক্ষদ্রষ্টা শুধু নয়, তাঁর সঙ্গে একাত্ম-হয়ে-থাকা এক মরমী জেল-সঙ্গীর লেখায় পড়েছি তা তুলনাহীন। লেখাটি বেরিয়েছে ১৩৭৫ সালের (ইং ১৯৬৮) 'কম্পাস্'-এর শারদীয়া-সংখ্যায়। লেখক পুরুলিয়ার প্রবীণ নেতা (পঃ বাঙলার ভূতপূর্ব পঞ্চায়েত-মন্ত্রী) শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দাশগুপ্ত।

সেই রাতে বিভূতিবাবুর আত্মা সুকুলজির আত্মার সঙ্গে গানের ঝর্ণাস্রোতে এক হয়ে গিয়েছিল। যে পরিবেশে তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী কিশোরকে পেয়েছিলেন তা যেমন অপূর্ব—যে হৃদয় ও অনুভূতি দিয়ে তিনি সেই প্রাপ্তি আজ ৩৪ বছর পর আক্ষরিত করেছেন তাও তেমনি অপূর্ব। বিভূতিবাবুর লেখাটি অর্ঘ্য-নিবেদনের মত সর্বকালের সর্বলোকের রক্ত-দিয়ে-গড়া সম্পত্তি হয়ে গেছে একটি রসোত্তীর্ণ রূপ ধারণ করে। আমরা এখানে সুকুলজির ফাঁসির পূর্ব-রাতের কাহিনী বিভূতিবাবুর রচনা থেকে উদ্ধৃত করব। কারণ, এ-রচনা একাধারে ঐতিহাসিক ও প্রাণধর্মী।...আমরা তাই তাঁর লিখিত শিরোনামা অপরিবর্তিত রেখেই এ-অনুচ্ছেদের শিরোনাম দিলাম।...

১৯৩০ সালে বিভূতিবাবু আইন-অমান্য আন্দোলনের তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী হয়ে পাটনা ক্যাম্প্-জেলে ছিলেন। কয়েকটি অবাঙালী তরুণ-বন্দীসহ তিনি একদিন পড়ছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'মরণ-মিলন'। রবীন্দ্র-কাব্যের ছন্দ, ভঙ্গি ও সুর বর্ণজ্ঞানহীন-ভারতবাসীর কানেও

মধু বর্ষণ করে। আর বিভূতিবাবুর সঙ্গীরা তো শিক্ষিত অবাঙালী। তাছাড়া তাঁর পাশের কয়েকটি ছেলে ছিল কাশী বিদ্যাপীঠের। তারা এবং মিথিলার ছেলেরা কিছু কিছু বাঙলা বুঝত। পড়ছেন বিভূতিবাবু পরম অনুরাগে :

"আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়—
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহাবরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥"

একটি ছেলে পেছনে বসে ছিল। ফুটফুটে সুন্দর ছেলে। বিভূতিবাবুকে লাজুক-কণ্ঠে সে বলল : 'আমাকে এটা হিন্দি হরফে লিখে দেবেন ? আমি মুখস্থ করব।'

বিভূতিবাবু তাকিয়ে দেখলেন একটি কিশোর—নিষ্পাপ তার সরল দৃষ্টি।...

প্রশ্নোত্তরে জানলেন—বাড়ি তার মজঃফরপুর, নাম বৈকুণ্ঠ সুকুল !

তারপর ছেলেটি প্রায়ই আসত বিভূতিবাবুর কাছে। এটা-ওটা জিজ্ঞেস করত। একদিন সে জোরে জোরে পড়ছে : 'আমি করিব নীরবে তরণ।'

বিভূতিবাবু জিজ্ঞেস করলেন : 'বুঝেছ ?'

ছেলেটি বলল : 'বুঝেছি।...ঐ 'তরণ' ? ও তো আমাদের 'ত্যায়রণা'—মানে সাঁতার দেওয়া।'

সহাস্যে বিভূতিবাবু শুধালেন : 'পারবে সে-সাঁতার কেটে পার হতে ?'

কিশোর-বালক মধুর হাসল।

ইতিমধ্যে বিভূতিবাবু গান্ধী-আরউইন প্যাক্টে খালাস পেলেন, প্যাক্ট ভেঙে গেল, এবং পুনরায় তিনি জেলে এলেন। সেটা ১৯৩২

সাল। বছরখানেক নানা জেলে ঘুরিয়ে তাঁকে আনা হয়েছে গয়া সেণ্ট্রাল্ জেলে। তাঁকে রাখা হয়েছে 'পনের-ডিগ্রি'র দশ নম্বর সেলে। তাঁর পাশের সেল্ ছু'টোয় আছেন অপর দু'জন রাজবন্দী। নাম তাঁদের—রঘুনাথ পাণ্ডে ও ত্রিভুবন আজাদ।

আরো দু'টি বছর কেটে গেছে—১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিক।···বৈকুণ্ঠ সুকুলকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাবার জন্যে আনা হয়েছে 'গয়া সেণ্ট্রাল্ জেলে'। তাঁকে রাখা হয়েছে 'সাত-ডিগ্রি'র কণ্ডেম্ড্ সেলে। বিভূতিবাবুরা তা জেনেছেন। সুকুলও জেনেছেন যে, বিভূতিবাবুরা আছেন ঐ 'পনের-ডিগ্রি'র তিনটি পাশাপাশি সেলে।···

বিভূতিবাবুর বিস্ময়ের সীমা নেই। সেদিনকার বালক দু'চার বছরের অনন্য তপস্যায় হয়ে উঠেছেন দুর্জয় কিশোর! দিয়েছেন ধনুকে টঙ্কার! অভিমন্যুর শক্তিতে উদ্বুদ্ধ কিশোর ঘটিয়েছেন আজ 'নীরব তরণ' 'মহাবরষার রাঙা জলে!'···সকলকে পশ্চাতে ফেলে যাত্রা তাঁর মহান অগ্রজের গৌরবে!

বিভূতিবাবু ভেবে-ভেবে তন্ময় হন। তাঁর দু'টি চোখ চক্‌চক্ করে।···

ফাঁসির পূর্বদিন। ১৩ই মে, ১৯৩৪ সাল। 'সাত-ডিগ্রি' থেকে সন্ধ্যায় আনা হবে সুকুলকে 'পনের-ডিগ্রি'র এক নম্বর সেলে। এক নম্বর সেল্ থেকেই অপেক্ষিত ফাঁসির আসামীকে অতি প্রত্যূষে নিয়ে যাবার নিয়ম ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলাবার জন্যে।

সেদিন অপরাহ্ণে 'জেনারেল্ লক্-আপ' নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই হবে। কয়েদীদের যার যার ব্যারাকে ও সেলে ঢোকান হচ্ছে।

বিভূতিবাবুরাও তালাবদ্ধ হয়ে গেছেন সাত-তাড়াতাড়ি।…এখন সমারোহ করে নিয়ে আসা হবে শৃঙ্খলিত শার্দুল-শিশুকে এক নম্বর সেলে। বিশ্বাস নেই ঐ সান্ত্রী-পাহারা-লৌহগরাদে ও আকাশচুম্বী প্রাচীর বা সুকুলের পায়ের কঠিন বেড়ি এবং হাতের শৃঙ্খলকে। ও সবকিছুই বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। কারণ, সুকুল যে 'dangerous criminal'!—সবকিছুকেই ফাঁকি দিয়ে এ-বালকের পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়!

এবার বিভূতিবাবুর লেখার মর্ম উদ্ধৃত হচ্ছে:

"তখন সন্ধ্যা হয়নি। বিকেলটা সন্ধ্যার দিকে চলেছে। প্রচণ্ড শীত। কম্বল-কুর্তা গায়ে চড়িয়ে লোহার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে আছি। শিকল-বেড়ির ঝন্‌ঝন্ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠ সুকুল 'পনের ডিগ্রি'র করিডরে ঢুকলেন। চিৎকার করে বললেন: 'দাদা, আ গ্যয়া!'

"আমরা তিনজনেই পাশাপাশি তিনটি সেল্ থেকে যুগপৎ সংবর্ধনা-ধ্বনি জানালাম: 'বন্দেমাতরম্!'…

"অনেকগুলো ভারী বুটের শব্দ। জেলার, ডেপুটি জেলার, বড় জমাদার, সেপাই-সান্ত্রী অনেক—সবাই মিলে মহাসমারোহে তাঁকে নিয়ে এসেছে এক সেল্ থেকে অপর আর এক সেলে।…

"এক নম্বর সেলে ঢোকাবার সময় ফাঁসির আসামীর শিকল-বেড়ি কেটে দেবার নিয়ম। জেল-কোডে মৃত্যুযাত্রীর জন্যে এইটুকু মমতা দেখাবার বিধান আছে। কিন্তু সুকুলজির বেলায় তার ব্যতিক্রম। এখানে মহাশক্তিমান ব্রিটিশরাজ মায়া-মমতা দেখাতে অনিচ্ছুক। সুকুলজির পায়ের বেড়ি কাটা হল না। শৃঙ্খলিত-সিংহ গহ্বরে ঢুকে গেলেন।…জানি না, এই শিশুর চোখে কি ওরা বন্দী প্রমিথীয়ুসের চোখের আগুন দেখেছিল!

"ঢং ঢং করে ঘণ্টা পড়ল, বুঝলাম সন্ধ্যার গুনতি মিলে গেছে। অন্ধকার ক্রমে নেমে আসছে। তাকিয়ে ছিলাম এন্টি-সেলের মাথায় ঝুল্‌তে-থাকা একফালি আকাশের তারাগুলোর পানে।

"দাঁড়িয়েই আছি গরাদে ধরে। কোন কিছু করার আছে বা ভাববার আছে বলে মনে হচ্ছে না। পাশের সেলে ত্রিভুবন, তার পাশে রঘুনাথ—কেউ কোন কথা বলছেন না। দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরাও লৌহ-গরাদে ধরে।...

"বুটের শব্দে তাকালাম। বদলির ওয়ার্ডার ঢুকেছে লণ্ঠন-হাতে সেলের তালা দেখতে। নীরবে এলো, নীরবে চলে গেল। মহামৌন বুঝি কথা কেড়ে নিয়েছেন সবার কণ্ঠ থেকে!...

"কিছুক্ষণ পর আমার এন্টি-সেলে প্রবেশ করল ডিউটি-রত হাবিলদার। আমার সঙ্গে প্রত্যহ তার সুখ-দুঃখের নানা গল্প হয়।

"হাবিলদার যুক্তপ্রদেশের কোন এক পাঠান-পরিবারের ছেলে। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিক। হাতের লণ্ঠনটি নামিয়ে রেখে কতগুলো সাদা ফুল আমাকে দিয়ে সে বলল: 'সুকুলজি পাঠিয়েছেন।'—ফুলগুলি তুলে নিলাম গভীর বেদনায়। রেখে দিলাম লোহার তস্‌লাতে।

"হাবিলদার শুধাল: 'কি ভাবছেন বাবুজি?'

"—'কি আর ভাবব?'

"—'সুকুলজিকে বাঁচান যায় না? লাটের উপরে লাট আছে, তারও উপরে আছে বিলেতের বাদশা—বাঁচান যায় না?'

"আমি বিস্মিত হলাম। বলে কি রুক্ষ, কঠিন, নির্দয় এ সৈনিক?

"সে বলেই চলল, 'বাবুজি, অনেক বীর দেখেছি, অনেক বাহাত্বর দেখেছি—কিন্তু এমনটি তো দেখিনি? আমি গেল যুদ্ধে ভার্দুনে লড়েছি, মেসোপোটেমিয়ায় লড়েছি; মেরেছি অনেক, মরতে দেখেছি অনেক। সাহস, তেজ, বিক্রম ঝরে ঝরে পড়তে দেখেছি—কিন্তু এমন বাহাত্বর কখনো তো দেখিনি, কখনো তো ভাবতেই পারিনি জোয়ানের এমন রূপ?...'

"এবার সে চুপ করেছে।...বুঝলাম, প্রকাশের আবেগে রুদ্ধ হয়ে এসেছে তার কণ্ঠ। মনের বেদনা সে কাউকে বলতে পারে না। বললে সেটা হবে রাজদ্রোহিতা। কাজেই, আমার কাছেই বুকের সকল ব্যথা উজাড় করে দিতে হবে তাকে।...বলল, 'যেদিন স্থকুলজির ফাঁসির হুকুম পাকা হয়ে গেল, সেদিন থেকে তাঁর শরীর যেন গোলাপের মতো হয়ে উঠেছে!' হাবিলদারের উর্দু উক্তি হল: 'গুলাব জ্যায়সা—গুল্ জ্যায়সা খিল রহা থা।' অর্থাৎ, গোলাপ যেমন, ফুল যেমন বিকশিত হয়ে উঠছে। কবিগুরুর ভাষায় এ যেন—'সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠছে।'

"আমি অবাক হয়ে দেখলাম ঐ পাষাণ-বক্ষের অন্তরালে প্রবাহিত অন্তঃসলিলা প্রস্রবণ। পাঠান হাবিলদারের ত্ব'টি চক্ষু বেয়ে অঝোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।...বলে সে ধরা-গলায়: 'বাঁচানর কোন পথ কি নেই? আমার জীবন দিয়েও স্থকুলজিকে বাঁচাতে পারলে বুঝতাম যে খোদার কাজ করেছি!'

"ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে হাবিলদার চলে গেছে।...তার বুটের শব্দ মিলাতে-না-মিলাতেই এক নম্বর সেল্ থেকে ডাক এলো: 'বিভূতিদা!'

"সাড়া দিলাম। লোহার গরাদে ত্ব'হাতে ধরে দাঁড়িয়ে সাড়া দিলাম।

"বৈকুণ্ঠ আছেন এক নম্বরে। আমি দশ নম্বরে। নিঝুম নিস্তব্ধ রজনী। কাজেই, কথা শুনতে অসুবিধে নেই। সুকুলজি ভাঙা-বাঙলায় বললেনঃ 'একবার ক্ষুদিরামের ফাঁসির গানটা গাইবেন, দাদা ? সেই যে—হাসি হাসি পরব ফাঁসি ?'

"আমি সে-যুগে গান গাইতাম। বেশ জোরাল কণ্ঠে স্বদেশী-গান গাইতাম। মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ভাঙা সেলে বসে, ঐ জেলের ফাঁসি-মঞ্চে বসে বহুবার 'হাসি হাসি পরব ফাঁসি' গানটি গেয়েছি। এ-গানে কী যে মধু আছে জানি নে। জেলে, জেলের বাইরে যখনই এ-গান গেয়েছি, গান শেষ না হতে কেউ চলে যেতে পারত না। স্বদেশী গানের ভাণ্ডার আমার কাছে ছিল—বাঙলা, হিন্দী, উর্দু বহু গানের—কিন্তু জেলখানায় দেখেছি, 'হাসি হাসি পরব ফাঁসি'র মত জনপ্রিয় গান আর একটিও ছিল না। ক্যাম্প্-জেলেও আমি গাইতাম, আমাদের নামপাড়ার 'খ্যাপা'ও গাইত। বিহারী-রাজবন্দীরা জাঙিয়া-কুর্তা পরে বসে যেত, লোহার থালা-বাটি বাজিয়ে মাথা নেড়ে তাল দিত, একবার শেষ হলে আবার গাইতে বলত। ক্ষুদিরামের ফাঁসির এ-গানটিতে এমনই যাদু ছিল! হোক্ না তা অখ্যাত কোন কবির রচিত গান। হৃদয় দিয়ে গড়া এ-গান রসের ভিয়ানে ডুবিয়ে তিনি পরিবেশন করে গিয়েছেন।

"দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুরু করেছি গান।...গরাদে ধরে আকাশের পানে তাকিয়ে গাইছি গান আমার মন ও প্রাণ দিয়ে। পূর্বগামী ক্ষুদিরামের গান—'হাসি হাসি পরব ফাঁসি, মা, দেখবে ভারতবাসী'—শুনতে চাইছেন অনুগামী 'নবীন ক্ষুদিরাম,' যাঁর কণ্ঠে ঘাতক এসে পরাবে ফাঁসির রজ্জু কয়েক ঘণ্টা পরেই!...বহুক্ষণ ধরে গাইলাম সে-গান।...স্তব্ধ হয়ে শুনছেন এক নম্বর সেলের মৃত্যুঞ্জয়ী বালক, আমার পাশের সেলের সংগ্রামী-বন্দীরা, সমগ্র জেলের সকল কয়েদী।...কারো চোখে সে-রাতে ঘুম ছিল না। ঘুম ছিল না সিপাই-সান্ত্রী-মেট-পাহারাদার-অফিসার—কারো চোখেই। একটা বোবা আর্তনাদ

অসহায়-আবর্তে সবার বুকে ঝড় তুলেছিল। সে ঝড় নির্বাক। চোখের আগুন অশ্রু হয়ে ফুটে উঠেছিল কয়েদীর নয়নে শুধু নয়, আকাশের চেয়ে থাকায়ও। অন্ধকারের স্তরে-স্তরে চোখের জলের ভাষা। সে-ভাষার উত্তাপ অতি গভীরে লুক্কায়িত।

"গান শেষ হল। সুকুলজি বললেন: 'দাদা, এবার বাঁশি শুনব।' বাঁশি? বাঁশি কোথায় পাব জেলখানায়? একটা খালি দেশলাইয়ের খোল আর একটুক্রো পাতলা কাগজ হচ্ছে আমার 'ইম্প্রোভাইজড্'-বাঁশি। এটাই বাজাতাম ফ্লুট-এর মত করে। সুকুল তা জানতেন।

"বাজনা অনেকক্ষণ শুনলেন সুকুলজি। বললেন: 'সুরটা ভারি কোমল।'...আমি বললাম: 'এটা বিস্মিলের 'সর ফরোশী কি তমন্নার' সুর।

"সুকুল যেন লাফিয়ে উঠলেন। চেঁচিয়ে বললেন: 'গানটার সব পদ মনে আছে?'...উত্তর দিলাম: 'গাইছি।'

"কাকোরি-ষড়যন্ত্র মামলার রামপ্রসাদ বিস্মিল ফাঁসি-মঞ্চে আরোহণ করার আগে এ-গানটি গেয়েছিলেন। গানটি খাঁটি উর্দুতে হলেও জেলের কয়েদীরা সে-গান তেমনই অন্তর দিয়ে শুনত, যেমন আন্তরিকতায় শুনত তারা বাঙলায় রচিত গান—'বিদায় দে মা ফিরে আসি'।...এ যে প্রাণোৎসর্গের সামগান! এ কোন ভাষার অপেক্ষা রাখে না। যে-কোন হৃদয়েই এর কাঁপন লাগে।

"আমার কণ্ঠ জুড়ে বিস্মিলের গান। গরাদে ধরে স্তব্ধ নিশীথিনীর আকাশ পানে তাকিয়ে থেকে গেয়ে চলেছি:

'সর্ ফরোশী কি তমন্না অব্ হমারে
দিল্ মেঁ হ্যায়।
দেখ্না হ্যায় জোর্ কিত্না বাজু এ
কাতিল্ মেঁ হ্যায়॥'...

[মৃত্যুকে স্পর্শ করার ভাবনা এখন আমার মনে। দেখতে চাই ঘাতকের বাহুতে কত বল আছে।]

"গোটা গান ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বারে বারে গেয়ে যাচ্ছি।...আমার সুমুখের আকাশে তারাদের মেলা বিলীন হয়ে গেছে। দেশ-কাল-ব্যাপ্তিও গেছে দূর হয়ে। আমি শুধু দেখছি উত্তরপ্রদেশের এক কারাকক্ষে বিস্‌মিলের দু'টি উজ্জ্বল চোখ—আর বিহারের অপর এক কারাগৃহের এক নম্বর সেলে সুকুলের সতেজ সুন্দর মুখ।—আমার সঙ্গে সমানভাবে গলা খুলে, প্রাণ ঢেলে সুকুলও গেয়ে চলেছেন।

"আমি গাইছি গানের শেষ দু'টি পংক্তি :

'অব্‌না অগ্‌লে ওয়ল্‌লে হ্যায় আউর
না আরমানোকী ভীড়।
সিরফ মর্ মিট্‌নেকি হস্‌রৎ আপ্‌
দিলে এ বিস্‌মিল মেঁ হ্যায়॥'...

[এবার থেমে গেছে পূর্বেকার কলগুঞ্জন, মিটে গেছে সকল বাসনা। শুধু মৃত্যুকে বরণ করার কামনা বিস্‌মিলের হৃদয়ে এখন বিরাজিত।]

"কিন্তু সুকুলজি শেষের পংক্তির শেষটুকু নিয়ে উদ্বেল আবেগে বারে বারে গাইছেন :

"—'দিলে এ সুকুল মেঁ হ্যায়'—'দিলে এ সুকুল মেঁ হ্যায়'—'দিলে এ সুকুল মেঁ হ্যায়'!...সে আবেগধারার অর্ঘ্য-নিবেদন সমুদ্রকে নদীর সবটুকু ঢেলে দেবার মতই অন্তহীন ও অকুণ্ঠ।

"আমার সম্বল সীমিত। তবু যত গান ছিল, যত সুর ছিল সব—সব গেয়ে চলেছি অবিরাম, অশ্রান্ত।...মৃত্যুর পূর্বক্ষণে মৃত্যুযাত্রী শুনতে চাইছেন গান! আমি নীরব থাকি কি মতে? আমার সকল হিয়া, সকল রক্তকণিকা গান হয়ে-হয়ে ঝরে ঝরে পড়তে চায়। এই

ভীষণ সুন্দর নিশীথিনীর প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে যে গান দিয়ে, সুর দিয়ে ভরে রাখতে হবে! ঐ গান-বিছানো, ঐ সুর-বিছানো পথে যাত্রা করবেন মৃত্যুঞ্জয়ী বীর। জ্যোতির্ময় ঐ কিশোরের অপরূপ রূপ রাত্রি শেষে উষা-সমাগমে মিলিয়ে যাবে হায়, ঊর্ধ্বতমলোকে, সকল গানের ওপারে।

"ডিউটি-বদল হল পাহারাদের। জমাদার আমার সেলের তালা নেড়ে চলে গেল না! কাছে এসে বলল: 'বাবুজি, লোহার গরাদে ধরে আপনি দাঁড়িয়ে আছেন সারা রাত।·· দাঁড়িয়ে আছেন সুকুলজি। ···দাঁড়িয়ে আছেন পাশের সেলের পাণ্ডেজি, ত্রিভুবনজি।··· আপনাদের কথা বুঝি—আপনারা তো একই পথের যাত্রী।···কিন্তু সারা জেলে অন্য কারো চোখেও যে আজ ঘুম নেই! সবাই বসে, শুয়ে বা দাঁড়িয়ে আপনাদের গান শুনছে।

"জবাব দেবার কিছু নেই। জিজ্ঞেস করলাম: 'ক'টা বেজেছে?' ···বলল: 'এক বজ্ গ্যয়া'।

"ওয়ার্ডার চলে গেল। কঠিন বুটের শব্দ রোজের মত হল না। আজ অতি সন্তর্পণে তাদের চলাফেরা—এ ঘোর রজনীর স্তব্ধতা বিঘ্নিত করবার দম্ভ নেই তাদেরও।

"কি গাইব ভাবছি। সে-মুহূর্তে সুকুলজির আহ্বান এলো। বলছেন: 'দাদা, সে-গান গাইতে হবে।'

"—'কোন্ গান?'

"—'রবীন্দ্রনাথের ঐ, 'মরণ, হে মোর মরণ'!'

"—'ওটা তো গান নয়, কবিতা'।

"—'না না, ওটাই গাইতে হবে'।

" 'মরণ-মিলন' সবটাই আমার কণ্ঠস্থ, কিন্তু সে-বস্তু যে সুকুলের রক্ত-কণিকার সুগভীরে প্রবাহিত হয়ে আছে তা এবার বুঝলাম। তবু

ভাবছি একে সুর দিয়ে গাই কি করে? কি সুর দিয়ে, কেমন করে গাই?

"এক নম্বর সেল্ থেকে তাগিদ এলো: 'দাদা—গাইয়ে—!'

"আর তো ভাবা যায় না! কিশোর বন্ধুর আসন্ন বিদায়-লগ্ন দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে!···ভাবতে হল না।···কোথা থেকে, কেমন করে সুর আমার কণ্ঠে এলো জানি না। কে যেন পাত্র ভরে দিয়ে গেল। আমি দরবারী-কানাড়াতে ধরলাম—'অত চুপি চুপি কেন কথা কও ওগো মরণ, হে মোর মরণ!'

"নিজেকে কেমন করে মানুষ হারায় আমি জানি না—কিন্তু আমার কাছে সে-রাত্রি আর শুধুমাত্র রাত্রি হয়ে রইল না, অন্তহীন সমুদ্র হয়ে আমাকে অদৃশ্য গানের-লোকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। আকাশের দিকে চেয়ে-থাকা আমার চোখ দু'টি বুজে এলো—আমি গেয়ে চললাম:

'আমি যাব, যেথা তব তরী রয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,—
যেথা অকূল হইতে বায়ু বয়
করি আঁধারের অনুসরণ।'···

"গান আমি সেদিন গেয়েছিলাম—যে-গান কেউ কোনদিন গায় নি। এমন করে গান কেউ কোনকালে গেয়েছে কিনা জানি না। কখনো গাইবে কিনা তাও জানি না। আমি তো কোনদিন অমন করে গাইনি, জানি। আর কোনদিন গাইতে পারব না, তাও জানি। দরবারী-কানাড়ায় এর অন্তরা চলছে আকাশ অতিক্রম করে, এর অস্থায়ী নামছে মৃত্যুর অভিসারকের অন্তর স্পর্শ করে।···কেউ কি শুনেছে এমন করে এ-গান?···মরণকে আলিঙ্গন করতে করতে তন্ময়তায় শুনছেন, এবং সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইছেন দুর্জয় কিশোর:

'তুমি কারে করিয়ো না দৃক্‌পাত
আমি নিজে লব তব শরণ,
যদি গৌরবে মোরে ল'য়ে যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ ॥'

"রবীন্দ্রনাথের কোন গান, কোন কবিতা এমন অপূর্ব সার্থকতায় কখনো ভরে উঠেছে কিনা জানি না—আমি কিন্তু সমস্ত জীবনে ঐ একটি রাতেই যথার্থ গান গেয়েছিলাম, আর ঐ গানই সার্থক গেয়েছিলাম, কারণ, ঐ একটি হৃদয়ই পরমতম লগ্নে সে-গান শুনতে চেয়েছিল। শুধু শোনা নয়, সেই হৃদয় দিয়েই মৃত্যুঞ্জয়ী বীর আমার সঙ্গে সে-গান গেয়ে আমায় ধন্য করেছিলেন।···

"কখন চারটে বেজে গেছে জানি নে। স্নকুল বললেন : 'দাদা, 'সময় হইল নিকট এখন'—এবার শেষের সঙ্গীত হোক—'বন্দেমাতরম্'।···'

"এক নম্বর, আট নম্বর, নয় নম্বর—স্নকুলজি ও আমরা তিনজন—সমস্বরে গেয়ে চললাম 'বন্দেমাতরম্'। সেই বন্দনা শুধু মাতৃবন্দনাই ছিল না—সে ছিল মাতৃরূপা মহামৃত্যু-পূজার মঙ্গলাচরণ।···

"জেল-গেটের পেটাঘড়িতে ঢং-ঢং করে পাঁচটা বেজে গেল। শীতের উষা তখনো কুয়াশাচ্ছন্ন, অন্ধকার। একসঙ্গে অনেকগুলো ভারী বুটের শব্দ 'পনের-ডিগ্রি'র মধ্যে প্রবেশ করল। বৈকুণ্ঠ স্নকুল ডাক দিয়ে বললেন : 'দাদা, তব্‌তো চাল্‌না হ্যায়।'···তারপর মুহূর্ত থেমে আবার বললেন : 'একটি অনুরোধ রেখে গেলাম। আপনি বাইরে গিয়ে এবার বিহারের 'বাল্য-বিবাহ'-প্রথাটা তুলে দেবার চেষ্টা করবেন'।"···

আর কিছু নয়। মৃত্যুঞ্জয়ীর অন্তিম অনুরোধ—দেশ থেকে 'বাল্য-বিবাহ' রূপ কুসংস্কার দূর কর।···কেন তাঁর এই অনুরোধ? এর

কারণ, বৈকুণ্ঠ সুকুলকে ছোট বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর কিশোরী বধূ আপন গৃহ-বাতায়ন খুলে হয়তো বা অশ্রুপ্লাবিত নয়নে তাকিয়ে আছেন দূর গয়া-জেলের আকাশ-পথে প্রিয়তমের উর্ধ্বগামী দিব্য যাত্রার পানে! বিরহিণী বধূর আসন্ন স্বামী-বিয়োগের ব্যথা সঙ্গোপনে নিজের অন্তরে লালন করে সুকুলজি মৃত্যু বরণ করেছিলেন। কিন্তু এ আশাও তাঁর অব্যাহত ছিল যে, ভারতজননীর শৃঙ্খল-মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের সকল কুসংস্কার-মুক্তিও ঘটবে—'বাল্য-বিবাহ'ও দূর হবে।···

বিভূতিবাবু আরও লিখেছেন: "এবার সব নিস্তব্ধ-নিশ্চুপ।··· সুকুলজির সেলের তালা খুলে গেল—শব্দ পেলাম। তাঁর পায়ের শিকল-বেড়ি কাটার আওয়াজ হল। সুকুলজি বলছেন কানে এলো: 'আমি তৈয়ের আছি।'···দলবল সেল্ থেকে বেরুচ্ছে—শব্দ শুনছি। —সাধারণ ফাঁসির আসামীকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাবার সময় পিঠমোড়া করে বেঁধে হাত-কড়ি লাগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ, তারা সাধারণত অনিচ্ছুক-মৃত্যুযাত্রী। কিন্তু সুকুলজির দল তো স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ-যাত্রী! অথচ সুকুলজির বেলায় তার ব্যত্যয় ঘটান হয়নি—কারণ, পুলিশের ভাষায়, 'he was a dangerous criminal!'

"এক নম্বর সেল্ থেকে বেরিয়ে সুকুলজি বোধহয় একটু দাঁড়ালেন। আমাদের সেল্ লক্ষ্য করে তাঁকে বলতে শুনলাম: 'দাদা, তবে চলি—আবার আমি আসব। দেশ তো স্বাধীন হয়নি—আবার আসব।—বন্দেমাতরম্!'···

"আমরা তিনজন সমস্বরে ধ্বনি তুললাম 'বন্দেমাতরম্'!—সারা জেলে ধ্বনি উঠে গেল—'বন্দেমাতরম্'!···তারপর নিশ্চুপ পৃথিবী। মৃত্যুর পদসঞ্চারে স্তব্ধ সবার কণ্ঠ। শুধু সুকুলজির কণ্ঠে তখনো শুনছি—'বন্দেমাতরম্,' 'ভারতমাতা কি জয়!' মুক্তির অগ্রদূত রক্ত-

রঞ্জিত কঠিন পথের ক্ষত-বিক্ষত একক যাত্রী—তাঁর কণ্ঠধ্বনি মন্ত্রের মত করে সকলে সকল ইন্দ্রিয় দিয়ে শুধুই শুনছে, তাকে নিজেদের কণ্ঠস্বরে আবৃত করার মন আর কারো নেই।···

"শেষ ধ্বনি মর্মে এসে লাগল—'ভারতমাতা·কি—'। মাঝপথে সে-ধ্বনি থেমে গেল। আর কিছু শোনা গেল না।···সমগ্র কারাগার প্রতিধ্বনিত করে আওয়াজ হল 'দু-ম্'।···"

সমাপ্ত হয়ে গেল একটি তরুণ নটরাজের জীবন-নৃত্য।···

বাঙলা তথা ভারতবর্ষের জেলে জেলে বহু বিপ্লবী ফাঁসি গেছেন। তাঁরা প্রত্যেকে মহাবীর—তাঁরা প্রত্যেকে অতুলনীয়। কিন্তু তাঁদের বিদায়লগ্ন এমন করে লিখে রাখার মত কোন গুণী সহবন্দী কাছে ছিলেন না। তাই গানে-গানে অপরূপ হয়ে-ওঠা অমন 'ফাঁসির রাত' এর আগে বুঝি কখনো আসেনি। প্রত্যক্ষ-দর্শন ও প্রত্যক্ষ-অনুভূতি সিঞ্চনে ফাঁসির পূর্ব-রাতের অমন ছবি এর আগে কেউ বুঝি আঁকেন নি। বিভূতিভূষণও অপর কোন শহিদের 'মৃত্যুবরণ' অমন করে আর লিখতে পারবেন না। সেই জন্য শুধু শহিদ বৈকুণ্ঠ সুকুলেরই নয়, ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি শহিদের ফাঁসির পূর্ব-রাতটিকে স্পর্শ করার উদ্দেশে বিভূতিবাবুর লেখাটির প্রয়োজন আছে। উক্ত লেখার বহু-লাংশ নানাভাবে তাই উদ্ধৃত হল।

॥ সতের ॥

স্তিমিত হতে হতেও বিপ্লব-তরঙ্গের প্রচণ্ড ধাক্কা

বাঙলার বাইরে বিপ্লব-তরঙ্গ ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এলো। 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট্ রিপাব্লিকান্ পার্টি'র সামর্থ্য, সংগঠন ও আয়োজন অনু-পাতে উত্তরপ্রদেশে তার কর্মপ্রচণ্ডতা অসাধারণ। অল্পসংখ্যক তরুণ নিঃশেষে নিজেদের শুধু নয়, নিজেদের সংস্থাকেও বিলীন করে দেশজননীর আরাধনা সমাপিত করে গেলেন। তাঁদের অন্তর্ধানে পূজামণ্ডপ আলোকহীন, উৎসব কোলাহলহীন ও জনশূন্য। বিসর্জন নিখুঁত। কেউ অবশিষ্ট থাকলেন না। ফাঁসি-মঞ্চে ও কারাগৃহে অন্তর্হিত সকল কর্মী। কর্মদীপ নির্বাপিত। কিন্তু যাবার পূর্বে যে দু'একটি প্রচণ্ড আঘাত তাঁরা দিয়ে গেলেন তার কাহিনী ভুলবার নয়। সে-সব আঘাতের ঢেউ দেশ-কাল-ব্যাপ্তিতে ছড়িয়ে আছে ও থাকবে চিরকাল। 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট্ রিপাব্লিকান্ পার্টি'র তাই মৃত্যু নেই।

শহিদ হরিকিষেণের গুলিতে পাঞ্জাব-গভর্ণর আহত

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের 'মর্দান' অঞ্চলের কথা ১৯৩০-'৩১ সালে ভারতবর্ষের মানুষ ভাল করেই জেনে ফেলেছে। কারণ, এই অঞ্চল থেকে 'শরহাদ্-গান্ধী' খাঁ আব্দুল গফ্ফর খাঁর নেতৃত্বে, 'রেড্ সার্ট্'-সংস্থার মাধ্যমে দলে দলে পাঠান অহিংস আইন-অমান্য আন্দোলন করেছেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে এমন কঠিন লড়াই খুব বেশি ঘটেনি সারা ভারতের অনেক অঞ্চলেই। হাজার-হাজার মানুষ কারাবরণ করেছেন, বহুজন গুলির আঘাতে প্রাণ দিয়েছেন,

দেশসুদ্ধ নরনারী অমানুষিক নির্যাতনে অগ্নিদগ্ধ-কাঞ্চনের মত বিভাসিত হয়েছেন।

এ হেন মর্দান অঞ্চলেরই একটি তরুণ অহিংসার পথে পা না বাড়িয়ে সংগোপনে বেছে নিয়েছিলেন সহিংস এক বিপ্লবী-দলের পথ। ভারতবর্ষকে শৃঙ্খল-মুক্ত করার সংকল্প তাঁর অন্তরে, ব্রিটিশ-সিংহের কঠিন থাবা চূর্ণ-বিচূর্ণ করার হিম্মৎ তাঁর রক্তে, নিজেকে নিঃশেষে নিবেদিত করার স্বপ্ন তাঁর নেত্রে।...

শহর লাহোর। ১৯৩০ সালের ২৩শে ডিসেম্বর। মধ্যাহ্ন কাল। পাঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসব। উৎসব-সভার কাজ সমাপ্ত হতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার এবং পাঞ্জাব-প্রদেশের লাট জিয়োফ্রি ডি' মণ্ট্‌মোরেন্সি সদলবলে হলগৃহ থেকে বেরিয়ে আসবার জন্যে কয়েক পা এগিয়ে আসছেন। এমন সময় একটি তরুণ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর উদ্যত রিভল্‌বার গর্জে উঠল। পরপর দু'তিনটি গুলি ছুটে এসে ঘায়েল করল লাটকে। ঘায়েল হল আরো দু'টি পুলিশের প্রাণী।...তারপর হৈ-হুল্লোড়, ধস্তাধস্তি, ছুটাছুটি। হরি-কিষেণই সেই তরুণ। সংগ্রামী-'মর্দান' যাঁর জন্মভূমি। বিপ্লবী-পাঞ্জাব যাঁর কর্মভূমি।

বন্দী হলেন হরিকিষেণ।

এদিকে আহত সাব্‌ ইন্সপেক্টর চন্নন সিং-এর অবস্থা শঙ্কাজনক। তাকে তক্ষুণি মেয়ো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। কিন্তু নিয়তি নিষ্ঠুর। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুর কবলে সে ঢলে পড়ল।

কারারুদ্ধ বিপ্লবী হরিকিষেণ। সেসান্‌ কোর্টে মামলা উঠেছে। ইংরেজের দরবারে এ তরুণের স্পর্ধা অসহ্য, অপরাধ অমার্জনীয়। সুতরাং চরম শাস্তি তাঁর প্রাপ্য। কিন্তু বিদ্রোহী বীর। কে তাঁকে

শাস্তি দেবে? কে দাতা? কে গ্রহীতা? দেশমাতৃকার পদপ্রান্তে যিনি আত্মসমর্পিত—তাঁর নিজের বলে তো কিছুই নেই! না দেহ, না বিত্ত, না সংসার-পরিজন! আদর্শবিধৃত তাঁর কর্ম। কর্মান্তে সকল প্রাপ্তিই তাঁর লাভ হয়ে গেছে। পরিপূর্ণ এই তরুণ-কিশোর নিতান্ত নিরাসক্তের মাধুর্যে পৃথিবীকে দেখছেন। এই যে সুকান্ত দেহ, জীর্ণবাসের মত পরিত্যাগ করবেন একে তিনি যে-কোন মুহূর্তের নির্দেশে।

আদালত জানতে চাইল আসামীর বক্তব্য। স্মিতহাস্যে বললেন তরুণ বিদ্রোহী: "জাতির স্বাধীনতা লাভে অহিংসার পথ ব্যর্থ হয়েছে। ইংরেজের অনাচারে ও অত্যাচারে শতসহস্র লোক বিপর্যস্ত। আঘাত, অপমান ও শৃঙ্খলবন্ধনের দুঃখ থেকে শিশুবৃদ্ধ-নরনারী কারোই নিস্তার নেই। তাই সশস্ত্র-প্রতিবাদে আমি সক্রিয় হয়ে উঠেছি।"...

('Roll of Honour'—P. 428)

যথারীতি হরিকিষেণের বিচার সাঙ্গ হল। ফাঁসির দণ্ড দিয়ে তাঁকে পাঠান হল মিয়াঁওয়ালি জেলে।

১৯৩১ সালের ৯ই জুন। ভোর ৬টা। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তিক মর্দান-বাসী হরিকিষেণ 'বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' ধ্বনি তুলেছেন উদাত্ত কণ্ঠে। সেই ধ্বনি কাঁপিয়ে তুলেছে দিক্‌দিগন্ত। পাঞ্জাব-জেলের ফাঁসি-মঞ্চে সগৌরবে আরোহণ করলেন বীর হরিকিষেণ।

শৌর্যশিখরে উদ্ভাসিত মৃত্যুঞ্জয়ীদের পাশে আর একটি শহিদের আবির্ভাব ঘটল।...

এখানে উল্লেখ করা চলে যে, শহিদ হরিকিষেণেরই আপন ভাই হলেন ভকৎরাম। উভয়ে একই পথের যাত্রী। সেদিন থেকে দশ বছর পরে, ১৯৪১ সালে, বিপ্লবী ভকৎরামই নেতাজি সুভাষচন্দ্রের

পথপ্রদর্শক ও বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিলেন উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের পাহাড়ী-পথে। ভারত থেকে আফগানিস্তানে নেতাজির ঐতিহাসিক পলায়ন কালে ভকৎ-ই ছিলেন তাঁর দৃপ্ত পদযাত্রার একমাত্র সাক্ষী।...

চন্দ্রশেখরের সম্মুখ-যুদ্ধ

কাশীর এক প্রান্তে 'ভেলুপুরা' অঞ্চল। এখানে চন্দ্রশেখরের গৃহ। কিন্তু শৈশবেই বিশ্বনাথের বন্ধনহীন পদযাত্রা তাঁকে ঘরছাড়ার আহ্বান শুনিয়েছিল। কাজেই, পড়াশুনার বন্ধন কাটিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আইন-অমান্য-আন্দোলনে। তাঁর কর্মক্ষেত্র শুধু কাশীতেই আবদ্ধ রইল না। সারা উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব জুড়ে তিনি কাজের ক্ষেত্র তৈরি করে চললেন। গোটা উত্তর-ভারতের আকাশ দু'বাহু বাড়িয়ে তাঁকে দিয়েছে গৃহ, দিয়েছে কর্মভূমি।

একবার কিশোর চন্দ্রশেখর আইন অমান্য করার অপরাধে বেত্রাঘাতে জর্জরিত হলেন। তাতে তিনি দেশজননীকে ভুলে গেলেন না। বেত মেরে যাদের 'মা' ভোলান যায়, তিনি তাদের দলে নন। বরং শঙ্করের তৃতীয় নয়ন থেকে যে বহ্নি একদিন উৎসারিত হয়েছিল, তার একটি স্ফুলিঙ্গ এসে তাঁর চোখে জ্বলে উঠল। নিরস্ত্র-প্রতিরোধের পথ ত্যাগ করে যথাকালে চন্দ্রশেখরের প্রবেশ ঘটল সশস্ত্র-বিপ্লবের পথে। এ-প্রবেশে হতাশার প্রতিক্রিয়া নেই। এ-প্রবেশ জীবনবোধ ও সংকল্পে গৌরবময়।...

চন্দ্রশেখর আজাদ। 'হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট্ রিপাব্লিকান্ পার্টি'র প্রখ্যাত কর্মী। উত্তরপ্রদেশের নেতা, এবং পার্টিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এই বিপ্লবী তরুণ। তাঁর কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে 'সোস্যালিস্ট্ রিপাব্লিকান্ পার্টি'র পত্তনকাল থেকেই। কাকোরী-ট্রেন-লুট, দিল্লী এবং লাহোরের যাবতীয় সশস্ত্র-কর্মের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে তিনি ছিলেন

যুক্ত। কিন্তু পুলিশ তাঁকে খুঁজে পাচ্ছিল না। চন্দ্রশেখরের পশ্চাতে ধাওয়া করে তারা 'পণ্ডিতজি'র ছায়া দেখে, পণ্ডিতজির হদিস করতে-না-করতেই 'সীতারাম' ভেল্কি লাগিয়ে উধাও হয়! এইভাবে নানা ছদ্মনামে চন্দ্রশেখর ঘুরে বেড়ান সারা উত্তর-ভারতে। কিন্তু পুলিশ তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারে না। অথচ চন্দ্রশেখর তো এক জায়গায় চুপ করে লুকিয়ে থাকেন না! চষে বেড়াচ্ছেন উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব। নেতৃত্ব দান করে ঘটাচ্ছেন একটার পর একটা দুর্ধর্ষ য়্যাক্‌শান্। এ-নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি হাতে-কলমে, যুদ্ধস্থলে ;—শুধু হুকুম পাঠিয়ে কাজ সারেননি।···

১৯৩০ সালের ১৯শে অক্টোবর সরকার পক্ষ থেকে চন্দ্রশেখর আজাদকে ধরে দেওয়া, বা তাঁকে ধরা যায় এমন কোন সংবাদ দানের জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করা হল। সে-পুরস্কার বহু অর্থের। তবু আজাদের সংবাদ কেউ দিতে পারে না। আজাদের সংবাদ রাজ্য-পুলিশের অনধিগম্য। তাই পুলিশের লজ্জা, সরকারের দুশ্চিন্তা।···

সেদিন ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১ সাল। সকাল সাড়ে ন'টা। এলাহাবাদ এলফ্রেড পার্কে ছদ্মবেশী আজাদ এসেছেন একটি বিপ্লবী সতীর্থের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশে। তাঁদের গোপন কথাবার্তা চলছে।···

সেকালে এ-সব পার্ক, এবং পার্কে যে-সব লোক আনাগোনা করে তাদের উপর পুলিশের লোকেরা বিশেষ নজর রাখত। একটি ওয়াচার্-এর সন্দেহ হয়। সে থানায় খবর দেয় যে, দু'টি যুবক যেভাবে বসে যেমন করে কথা বলছে, তাতে তাদের সন্দেহজনক-ব্যক্তি বলেই মনে হচ্ছে।

কথাটা কানে যেতেই একজন ইউরোপীয়-অফিসারের অধীনে সশস্ত্র পুলিশ এসে এলফ্রেড পার্কটি ঘেরাও করে ফেলল। আজাদ

সহসা দেখলেন যে, তিনি ঘেরাও হয়ে যাচ্ছেন !···মুহূর্তে সচকিত হয়ে সাথীকে পালিয়ে যাবার আদেশ দিলেন। নিজে ট্রিগার্ টেনে গুলি চালাতে শুরু করলেন। যুদ্ধ বেধে গেল। জন-তিনেক পুলিশের লোক ঘায়েল হল। আজাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত। অসম-যুদ্ধ আর কতক্ষণ চলে ? শত্রুর বুলেট্-বিদ্ধ চন্দ্রশেখর আজাদ ! কিন্তু শত্রুর হাতে মৃত্যুগ্রহণের জন্যে তিনি এ-পৃথিবীতে জন্মাননি। নটরাজের নয়নবহ্নি আবার তাঁর নয়নে জ্বলে উঠল। নিজের পিস্তল উদ্যত হল নিজের ললাট লক্ষ্য করে। গুলি ছুটে এলো দুর্জয় গর্জনে। বীরের মৃত্যু আপন হস্তে ছিনিয়ে আনলেন বিদ্রোহী চন্দ্রশেখর।

"বৈরাগীর নৃত্যভঙ্গী চঞ্চল সিন্ধুর।
যত লোভ, যত শঙ্কা
দাসত্বের জয়ডঙ্কা,
দূর, দূর, দূর॥"···

স্বাধীনতার পূজারী চন্দ্রশেখর নিজেই একদিন নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন 'আজাদ' উপ-নামটি। সার্থক হল সে-নামকরণ। জাতির কাছে সেই উপ-নামকে প্রধান করেই তিনি আজ পরিচিত। মৃত্যুহীন চন্দ্রশেখরকে ভারতবর্ষের যৌবন চিরকাল প্রণাম করবে মহামুক্তির বাহক 'চন্দ্রশেখর আজাদ' রূপে।···

বোম্বাই-প্রদেশের গভর্ণর স্যার হট্সন্ আক্রান্ত

১৯৩১ সালের ২২শে জুলাই। পুণা শহরে ফার্গুসান্ কলেজের 'ওয়াদিয়া গ্রন্থাগার' হল-গৃহ। বোম্বাইয়ের অস্থায়ী-গভর্ণর স্যার আর্ণেস্ট্ হট্সন্ সভার পৌরোহিত্য সমাপন করে বেরিয়ে আসছেন। কয়েক পা এগিয়ে যেতেই হল্-ঘর কাঁপিয়ে শব্দ হল—'ড্রাম্'।··· একটি তরুণের অগ্নিনালিকা থেকে ছুটে এসেছে মারাত্মক বুলেট্ গভর্ণরের বুক লক্ষ্য করে।

গুলিটি বুকে আঘাত হেনে ঠিক্‌রে বেরিয়ে গেল, ছুটে গেল অন্য দিকে। লাট অক্ষত রইলেন!

গুলির এ হেন লীলাভঙ্গির কারণ কি? অমন তাজা, টাট্‌কা গুলি—অত কাছের নিশানা সত্ত্বেও পিছ্‌লে গেল কেন? তখনকার দিনে কাগজে-কাগজে এর নানা কৈফিয়ৎ বেরিয়েছিল। তখন সরকার থেকে অবশ্য কিছু বলা হয়নি।...কারো রিপোর্ট্‌ ছিল—মোটা ফাউণ্টেন্‌-পেনে ঠেকে গুলি পিছ্‌লে যায়; কেউ বলছিলেন—বুকের মেডেলে লেগে গুলি ফিরে আসে। মোটের উপর লাটসাহেবের সারা অঙ্গে এবং চিত্তে প্রবল ঝাঁকুনি লাগলেও তিনি যে শারীরিক ঘায়েল হননি, এ-কথা সত্যি। অতঃপর অবশ্য সঠিক সংবাদ সংগৃহীত হলে জানা গেছে যে, সেদিন লাটসাহেবের জামার নীচে লৌহবর্ম পরা ছিল। লৌহবর্ম বা 'স্টিল্‌ জ্যাকেট্‌' পরে সভা-সমিতিতে যাওয়া-আসা সাবধানী রাজপুরুষদের পক্ষে একটুও অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ, এই তো মাত্র সাত মাস পূর্বে পাঞ্জাবের গভর্ণর গুলির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন এমনই এক উৎসব-সভায়! তাছাড়া বাঙলার কথা না-তোলাই ভাল।...

একটি গুলির শব্দেই উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর ও পুলিশের তন্দ্রা টুটে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ল কয়েকজন ব্যক্তি আততায়ীর উপর। বন্দী হলেন তরুণ। নাম জানা গেল—বাসুদেব বলবন্ত গোগ্‌টে।...

বাসুদেব বলবন্ত গোগ্‌টে পুনার অধিবাসী। বি-এ ক্লাশের ভাল ছাত্র এই বাসুদেব। কোন বিপ্লবী-দলের সভ্য তিনি নন। কারণ, পুণা তথা মহারাষ্ট্রে সক্রিয় বিপ্লবী-প্রতিষ্ঠান বহুদিন অবলুপ্ত। কিন্তু ছড়িয়ে আছে তার আকাশে-বাতাসে ও গিরি-কন্দরে বিপ্লবের বীজ, বিপ্লবীর বাণী। মারাঠী-তরুণ ভুলবে কি করে চাপেকার-ভ্রাতৃত্রয়কে? ভুলবে কি করে ফাড্‌কে-রানাডে বা সাভারকরদ্বয়কে? মহামতি তিলক কি ভুলে যাবার সামগ্রী?...

১৯৩০-'৩১ সালে আইন-অমান্য-আন্দোলন সারা ভারতেই দুর্জয় রূপ নিয়েছে। পুলিশের অত্যাচার সর্বত্র মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। মহারাষ্ট্রেও তার ব্যতিক্রম নেই।

হট্‌সন্ সাহেব তখন বোম্বাই-সরকারের হোম্-মেম্বর। তাঁর আমলে অত্যাচার নগ্ন রূপ ধারণ করেছে। লাঠির আঘাতে মেয়ে-পুরুষ আন্দোলনকারীর হাড় গুঁড়ো হয়ে গেছে, গুলির আঘাতে কত লোকের মাথার খুলি উড়ে গেছে, কত নারী উন্মত্ত পুলিশের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছে, কত শিশু-বৃদ্ধ মিলিটারি-বুটের তলায় পিষ্ট হয়েছে। স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি খুইয়ে কত নিরপরাধ নরনারী কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে। সংগ্রামী-জনতা তাতেও স্তব্ধ হয়নি। তখন এই হট্‌সন্ সাহেবই 'মার্শাল্-ল' জারি করে 'জালিয়ানওয়ালাবাগে'র মহড়া দেবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।···

তরুণ-মহারাষ্ট্রের স্বভাবতই এই হট্‌সন্-শাসনের বিরুদ্ধে ছিল প্রচণ্ড ক্রোধ। কিন্তু কোন বিপ্লবী-সংস্থা ধারে-কাছে নেই। রাজনীতিক-দৃষ্টিকোণ থেকে কোন য়্যাক্‌শান্ করার সুযোগ কে করে দেবে?

ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বিপ্লবের আবাহন করেছে মহারাষ্ট্র। কিন্তু ১৯৩০ সালের বহু পূর্বেই সেখান থেকে বৈপ্লবিক-সংগঠন বিদায় নিয়েছে। অথচ বিপ্লবী-মন তো বিলুপ্ত হবার নয়!···

তরুণ গোগ্‌টে। বিশ বছরের 'ব্রিলিয়েণ্ট' যুবক। বি-এ ক্লাশের ছাত্র। চঞ্চল হয়ে গেছে তাঁর মন। তাঁর না আছে কোন তৈয়ারি, না বিপ্লবীর শিক্ষা-কর্মনৈপুণ্য বা অভিজ্ঞতা। অথচ, আছে প্রাণ—স্পর্শকাতর, কর্মপিয়াসী প্রাণ। সেই প্রাণে আঘাত লাগে প্রত্যেকটি নির্যাতন-কাহিনীর। দুঃখীর বেদনা শ্বসিয়ে ওঠে বুক থেকে। তাদের অশ্রু তাঁর নয়ন দু'টিকে সজল করে তোলে। পরাধীনতার জ্বালাবোধ

কোন বিপ্লবীর চেয়ে তাঁর কি কম ? নিশ্চয়ই নয়। তবে ? তবে কি চুপ করে থাকতে হবে তাঁকে ?

শিশুকাল থেকে গোগ্‌টে মনে মনে পূজা করে এসেছেন বিপ্লবী-নায়ক বিনায়ক সাভারকরকে। তাঁর বৃদ্ধবয়সের প্রতিদিনকার কর্মকথা জানার উৎসাহ গোগ্‌টের সামান্য ছিল না। কাগজে প্রদত্ত সাভারকরের কোন উক্তিই গোগ্‌টের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। তাছাড়া মহারাষ্ট্রের মৃত্যুবিজয়ী বীরবৃন্দ, পুণার শহিদকুল, বিপ্লব-কর্মের পথিকৃৎ দামোদর চাপেকার তাঁর ধেয়ানের ধন। বাঙলা ও পাঞ্জাবের রুদ্র ঐতিহ্য তাঁর আগুন-ছোঁয়া কল্পনার জীয়নকাঠি।

গোগ্‌টের সংকল্প দৃঢ়তর হল। না থাকুক কোন বিপ্লবী-সংস্থার নেতৃত্ব, না থাকুক কোন সাথী বা সহায়ক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন না—'একলা চল রে' ? একলাই চলতে হবে দুস্তর ও দুর্গম পথে। তাঁর রয়েছে বিনায়ক সাভারকরের অব্যক্ত আশীর্বাদ, রয়েছে তাবৎ সংগ্রামী-ভারতের প্রেরণা, অগণিত শহিদের বরাভয়।...

গোগ্‌টের একটি ভাই কার্যোপলক্ষে হায়দ্রাবাদে থাকতেন। হায়দ্রাবাদ তখন করদরাজ্য। সেখানে অস্ত্রশস্ত্র স্মাগল করা সহজতর বলে লোকের ধারণা। গোগ্‌টেও ভাইকে কাজে লাগালেন। তাঁর মাধ্যমে সহজেই গোগ্‌টে দু'টি রিভলভার সংগ্রহ করে ফেললেন।—তারপর ভাবছেন—কাকে তাক্ করা যায়! শয়তানের দূত ঐ হোম্-মেম্বর হট্‌সন্‌সাহেব তখন মহারাষ্ট্রের অস্থায়ী-গভর্ণর হয়ে বসেছেন। তাঁকে হাতের কাছে পাওয়া কি সম্ভব ? তাঁকে না-পেলে আর একজনকে হত্যা করেও লাভ আছে। তিনি হলেন শোলাপুরের কালেক্টর মিঃ নাইট্‌। লোকটার কুখ্যাতির সীমা নেই।...

বিদ্রোহী-কিশোর ব্যাকুল চিত্তে দিন গুনছেন। এমন সময় এলো ১৯৩১ সালের ২২শে জুলাই। স্যার হট্‌সন্‌কে হাতের কাছে পেলেন

গোগ্‌টে। বিপ্লবীর অদম্য শৌর্যে কেমন করে তিনি প্রকাশিত হলেন. তা ইতিপূর্বে ব্যক্ত করা হয়েছে।···

বন্দী গোগ্‌টের বিচার সাড়ম্বরে হয়ে গেল। পুলিশ বুঝেছিল যে, এটা ব্যক্তিক-প্রচেষ্টাপ্রসূত য়্যাক্‌শ্যান্‌—কোন বিপ্লবী-দলের সঙ্গে এর যোগ নেই। তবু এ-ছেলেকে ভীষণ সাজা দিতে হবে। কী স্পর্ধা! পেছনে কেউ নেই···একা এ ছেলে যুগিয়েছে রিভল্‌বার, প্ল্যান্‌ করেছে একা, এগিয়ে গেছে একা, একা ছুঁড়েছে গুলি লাটের বুক লক্ষ্য করে! লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি—অকম্পিত, দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন নিশানা। লাট বেঁচে গেছেন শুধু ঐ স্টিল্‌-জ্যাকেটের আশ্রয়ে।—এ-বালক তাই অধিকতর বিপদ-জনক, এর অপ্রত্যাশিত কর্মে পুলিশের ব্যর্থতা আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। এ যেন একটি 'লাইফ্‌-বম্‌ব্‌'—এমন জীবন্ত-বোমা সারা দেশে অলক্ষ্যে কত না ছড়িয়ে আছে!—

পুলিশ বা সরকারের ধারণা মিথ্যে নয়। ইতিহাসও বলবে একই কথা। সত্যি গোগ্‌টের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় 'একলব্যে'র একান্ত সাধনা। এমন সাধনা সে-যুগেও আর কোথাও দেখা যায়নি। সেদিক থেকে গোগ্‌টের য়্যাক্‌শান্‌ একটি বিশিষ্ট গুরুত্ব বহন করে নিশ্চয়ই।

বিচার সমাপ্ত হয়ে গেছে। সেসান্‌-জজ মিঃ ওয়াদিয়ারের আদালতে তাঁর সাজা হয়েছিল বার বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।*

দ্রষ্টব্য: শ্রীগোগ্‌টের কাছ থেকে গ্রন্থকারের পক্ষে শ্রীরবি রায় ('সন্ধান্‌ বাঙ্‌লো', শারানপুর রোড্‌, নাসিক-২) কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি অবলম্বনে লিখিত।

॥ আঠার ॥

রবীন্দ্রনাথ ও সশস্ত্র-বিপ্লব

তখন আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এম্‌-এ পরীক্ষার বছর। ১৯২৬ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি। রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ঢাকা শহরে এলেন। তাঁর আগমন-সংবাদ শিশু-বৃদ্ধ-নরনারী সবার চিত্তেই এক অপূর্ব আনন্দ এনে দিয়েছে। প্রায় ছাব্বিশ বছর পর নাকি তিনি এই শহরে পুনঃপদার্পণ করছেন। তাঁকে যথাযোগ্য অভিনন্দন জানাবার জন্যে সকলে ব্যস্ত। ছাত্রমহলে এক অভূতপূর্ব আন্তরিক সাড়া পড়ে গেছে শান্তিনিকেতনের ঋষি এবং বিশ্বের মহোত্তম কবিকে চাক্ষুষ দেখবার আগ্রহে, তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত বাণীসুধা পান করার আশায়।

কবি এসেছেন। লোহার পুলের অদূরে, কলঘরের কাছে, ফরিদাবাদ মহল্লার মোড়ে, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রাস্তায় সে কী জন-সমাবেশ! উৎসাহ-উদ্দীপনায় ব্যাকুল, শ্রদ্ধার আবেগে গভীর, বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে অনন্য সেই জনতা মহাকবিকে বরণ করে ঘরে তুলে নেবার কামনায় সুন্দর।

মেজর সত্য গুপ্তের দাদা শচীন গুপ্ত সদ্য পারস্য থেকে এসেছেন। তখন কর্মস্থল ছিল তাঁর পারস্যে। সুঠাম বিরাট তাঁর দেহ, শৌর্যবানের দৃপ্ত মূর্তি। দুর্দান্ত এক অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহীরূপে পুরোভাগে তিনি। তাঁর পশ্চাতে শত-শত সাইকেল-সওয়ার, পদাতিক স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ, বয়-স্কাউট্‌, বাদ্যভাণ্ড। শুভ্র-বস্ত্রপরিহিত এই বাহিনী সামরিক শৃঙ্খলায় গার্ড-অব্‌-অনার জানালেন কবিকে শহরের প্রবেশ-পথে।

নাগরিক-অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত জিলা-বিচারক বয়োবৃদ্ধ সারদা সেন, সাধারণ-সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক ফণিভূষণ চক্রবর্তি (বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের অবসর-প্রাপ্ত চিফ্-জাস্টিস)। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়কত্ব এবং সংগঠনের দায়িত্ব প্রধানত ছিল সত্য গুপ্ত ও তাঁর বন্ধুদের উপর।

পথে-পথে, দু'পাশের গৃহে-গৃহে, জনগণের এবং গৃহবাসীদের উদ্বেল আবেগ ও অভ্যর্থনামুখর হৃদয়কে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে চলেছেন কবি-সম্রাট মহারাজের গৌরবেই—ভাওয়ালরাজের জুড়িগাড়িতে। তাঁর সঙ্গে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, বালিকা নন্দিনী, রথীন্দ্রনাথ, দীনেন্দ্রনাথ এবং বিশ্বভারতীর চীনদেশীয় অধ্যাপক মিঃ লিম্। নগর-পরিক্রমা সাঙ্গ করে কবি উঠলেন এসে ওয়াইজ ঘাটে, বুড়িগঙ্গার বুকে অবস্থিত 'তুরাগ' নামক গ্রীন্-বোটে। বোটখানি ছিল ঢাকার নবাববাহাদুরের প্রিয় জলযান।

কবি অভিভূত হয়েছিলেন ঢাকাবাসীর আন্তরিকতায়। বললেন তিনি শোভাযাত্রীদের উদ্দেশে: 'এতবড় স্বাগত-অভিনন্দন আমার জীবনে এ-ই প্রথম।'

হয়তো এটা তাঁর অতিশয়োক্তি। কিন্তু জনতা ও কবির হৃদয়ের যে যোগাযোগ সেদিন ঘটেছিল, তার মধ্যে এতটুকু ফাঁক ছিল না। কারণ, শহরের নরনারী তাদের অন্তরের রাজাধিরাজকে কম্প্র-বক্ষে বরণ করার সময় কার্পণ্য দেখাবে কি করে?···

৭ই ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণে নর্থব্রুক হল্-এ (লালকুঠি) নাগরিক কবি-সংবর্ধনা। ভিড়-নিয়ন্ত্রণ করা অসাধ্য। একটা হল···তা সে যত বড়ই হোক···সেখানে বিশ্বের কবিকে দু'চারশত ভাগ্যবানের

জন্যে আটকে রাখার কল্পনা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা না বুঝেছিলেন কবির পপ্যুলারিটি, না জনতার মন। কোনপ্রকারে সে-সভা সাঙ্গ করে কবিকে তখুনি আনা হল বুড়িগঙ্গার তীরে, করোনেশান পার্কে। বিপুল জনতার ব্যাকুল সংবর্ধনা-সভা। সূর্য তখন অস্তগামী। নদীর তরঙ্গে তার রক্তিম উচ্ছ্বাস। কবির কণ্ঠ থেকে বাণী ঝরে ঝরে পড়ছে। অনুকূল আবহে তাঁর ঋষি-চিত্তে সঞ্চারিত হচ্ছে দূর থেকে ভেসে-আসা দিব্য অনুভূতি। দিগন্তের পানে তাকিয়ে তিনি বহু কথা বলেছিলেন। আজ মনে পড়ে, 'রবি অস্তাচলের পথে চলেছেন···কবিরও সেই পথে যাত্রা জীবনের সায়াহ্নে'···নদীতীরে এই ধরনের একটি বিদায়-বেদনার সুর ফুটে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের ভাষণে। সে-সুরের ছোঁয়া লেগেছিল সন্ধ্যার আলোছায়ায় মহাকবিকে ঘিরে-থাকা সুদূরপ্রসারী জন-মানসে। সারাটা আবহ তাতে একটি ধ্যান-তন্ময় মূর্তির রূপ ধারণ করেছিল। একটি অখণ্ড সত্তায় এক হয়ে হাজার হাজার মানুষ চোখ-কান-মন ও হৃদয় দিয়ে কবিকে স্পর্শ করেছিল যেন।···

পরদিন ৮ই ফেব্রুয়ারি। 'দীপালি-সঙ্ঘে'র মহিলা-সভা আহূত হয়েছে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ-প্রাঙ্গণে সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে। লীলা নাগ (রায়) তার উদ্যোক্তা। কবিকে গ্রীন্-বোট থেকে নিয়ে আসা, সভাস্থলের গেট রক্ষা করা, এবং কবিকে সভাশেষে তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব ছিল সত্য গুপ্ত ও তাঁর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীরই উপর।···

৯ই ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ হোস্টেল-প্রাঙ্গণে হল যুব ও ছাত্রসভা। ১০ই ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে কবি-কণ্ঠে উচ্চারিত হল প্রার্থনা, দিলেন একটি নিখুঁত ভাষণ।···

সেদিনই দুপুরে কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শনে গেলেন কবি। সন্ধ্যায় কার্জন হল্-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা। পথে ঢাকা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের 'রোভার্ স্কাউট্'-এর অভিবাদন গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৩ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবির চারটি বক্তৃতা বিদ্বৎ-সমাজ পরম নিষ্ঠায় শুনলেন।...

এইভাবে ঠাসা-প্রোগ্রামের চাপে ঢাকার দিনগুলো কবির কেটে যাচ্ছিল। দু' এক জায়গার আমন্ত্রণ তিনি রক্ষা করতে পারেননি। কারণ, স্বাস্থ্য তাঁর ভাল যাচ্ছিল না। ১৪ই ফেব্রুয়ারি কবি ঢাকা থেকে বিদায় নিলেন।...

কবি বোটেই আছেন। সত্য গুপ্ত এবং তাঁর বন্ধুবাহিনী কবিকে সেবাদানের সম্পূর্ণ ভার যে নিয়েছেন, তা পূর্বেই বলেছি। সুতরাং আমরা (তাঁর বন্ধুদল) পালা করে সারাদিন এবং অধিক রাত পর্যন্ত বোটের কাছে পাহারায় থাকতাম, ভিড় শতহস্ত দূরে ঠেলে রেখে। ...আমরা ক'জন স্থির করলাম, কবির সঙ্গে নিভৃতে দেখা করব। Exclusive interview জোর করে নিতে হবে—তাঁর সেক্রেটারি ইত্যাদির মাধ্যমে যা কখনো হবে না।

কিন্তু কী করে এ-interview আদায় করা যায় ভাবছিলাম।... তরুণ-মনে তখন বহু প্রশ্ন জমা হয়ে আছে। বিপ্লবী-দলের সক্রিয় কর্মী আমরা। সশস্ত্র-যুদ্ধে ইংরাজকে পরাস্ত করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার সংকল্প আমাদের। কিন্তু গান্ধীজির 'অহিংসাবাদ' দেশের মনকে ব্যাপৃত রেখেছে। আমাদের ধারণায় এই অহিংসা-মন্ত্র আমাদের কাজের পরিপন্থী। কাজেই, এ নিয়ে কবির সঙ্গে আলোচনা করার প্রয়োজন আমরা অনুভব করেছিলাম।...কিন্তু আমরা তো শুধু তাঁর দ্বাররক্ষক। তাঁকে ঘিরে আছেন গণ্যমান্য বয়স্করা। তাঁর ছোট-বড় প্রোগ্রাম করছেন তাঁর স্বাস্থ্যহিতাকাঙ্ক্ষী

সচিব এবং রিসেপশান-কমিটির কর্তারা। এই ব্যূহ ভেদ করে কবির ব্যক্তিগত স্পর্শ পাওয়া একটি অসাধ্য কাজ। আজকের দিনে এ-কাজ অতি সহজ হতে পারে, কিন্তু তৎকালের সৌজন্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতার ধারণা, বৃহতের প্রতি বিস্ময় ও শ্রদ্ধার গভীরতা এবং আত্মসম্মান-জ্ঞান ঐ ব্যূহ-প্রাচীর ভেঙে দেবার পথ আগলে থাকল।...এমন সময় হঠাৎ এরই মধ্যে দেখি—ইডেন কলেজ ও স্কুলের একদল ছোট-বড় ছাত্রী নিয়ে স্বয়ং লেডী প্রিন্সিপ্যাল, বাক্‌ল্যাণ্ড বাঁধের নীচে দিয়ে, কাদাভরা জমি পায়ে দলে আসছেন বোটের দিকে। প্রিন্সিপ্যাল ও শিক্ষিকাদের বেশ কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু মেয়েদের কী সে উচ্ছলতা ঐ কাদামাটির পথে ছুটে আসতে! তারা যে কবিকে প্রণাম করবে! কবি বোটের জানালা দিয়ে এই দৃশ্য দেখেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন বোটের ডেক্‌-এ। শুভানুধ্যায়ীদের বাধা মানলেন না। কী তাঁর রাগ! যেন আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়বার উপক্রম!...

বলেছিলেন তিনি পার্শ্বচরদের: "তোমরা কি ঐ ছোট্ট মেয়েগুলোর দুর্দশা দেখছো না? ওরা ছুটে এসেছে আমাকে দেখবে বলে—আর তোমরা ভেবেছো আমি খাঁচায় বসে থাকবো? আমার স্বাস্থ্য বড়, না ঐ মেয়েগুলোর প্রাণের টান বড়?"

বাইরে বেরিয়ে এসেছেন কবি। ভারতবর্ষের আদি-অন্ত দিনের মহান্ সাধনার প্রতীক এক মহর্ষির সৌন্দর্যে দাঁড়ালেন তিনি। মেয়েরা একে একে প্রণাম করে, তাঁর আশীর্বাদ আহরণ করে, দাঁড়াল সার বেঁধে। কবি একটুক্‌রো মিষ্টি ভাষণ দিয়ে বালিকাদের মন কেড়ে নিলেন। তারপর বোটের ভিতরে ফিরে এলেন। এবার অটোগ্রাফ্ দেবার পালা। এত মেয়ের চাহিদা রুগ্ন কবির পক্ষে মনোমত করে সাজানো সম্ভব নয়। কাজেই, কবি এক শিট্ কাগজ নিয়ে নামাবলীর মত নাম স্বাক্ষর করে চললেন...ঐ কাগজ অতঃপর টুকরো-টুকরো

করে এক-একটি স্বাক্ষর জন-প্রতি বিলি করা হবে। রহস্য করে সত্য গুপ্তকে কবি বললেন: "তুমি যে আমায় কেরানী বানালে!"··· সাথে সাথে জাপানের অভিজ্ঞতার কথাও বললেন। সেখানেও নাকি এমনি ঘটেছিল।···

সত্য গুপ্তই ঐ সময় কবির পার্শ্বে থেকে সবকিছু কণ্ডাক্ট করছিলেন। একটু বেশি করেই তিনি কবির কাছাকাছি হচ্ছিলেন নিজের মতলব সিদ্ধির উদ্দেশ্যে। মেয়েরা বিদায় নিতেই পার্শ্বস্থিত এই কর্মীটির দিকে কবি প্রসন্ন নয়নে তাকালেন। কর্মী সত্য গুপ্তের বয়স তখন চব্বিশ কি পঁচিশ। বীর্যদৃপ্ত-তারুণ্যের দ্যুতি তাঁর সর্বাঙ্গে। একখানি শাণিত খড়্গের ঝলমল রূপ। কবি তাঁর পানে তাকাতেই তিনি কবির পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন যে, তাঁরা ক'জন ছাত্র তাঁর কাছে নিভৃতে কিছু কথা বলতে ও শুনতে চান। কখন হবে সে সময়? কবি সস্নেহে বললেন: 'এসো এখুনি।' মুহূর্ত সময় না দিয়ে আমরা চার-পাঁচজন কবির পেছনে পেছনে তাঁর কামরায় ঢুকে গেলাম। আমরা সবাই ছিলাম স্বেচ্ছাসেবক। কাজেই, শুভানুধ্যায়ীরা আমাদের আটকাবেন কি করে? আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম যে, শুভানুধ্যায়ী-বৃন্দ আমাদের দিকে বিষ-নয়নে চেয়ে আছেন। সত্যি, তাঁদের চক্ষে আগুন থাকলে নিশ্চয় সেদিন দগ্ধ হতাম।···

কবি একটি আরাম-কেদারায় উপবিষ্ট। আমরা তাঁর পায়ের কাছে মেঝেতে পরমানন্দে বসে আছি। তিনি মুখর হয়ে উঠেছেন। প্রথমটায় তাঁর কথা শুধু গানের সুরে কানে আসছিল, মর্মে ঢুকছিল না। কারণ, তাঁর অপূর্ব রূপশ্রী নয়ন ভরে দেখতে গিয়ে শ্রবণেন্দ্রিয় তেমন কাজ করছিল না যেন। এত কাছে, এতক্ষণ ধরে এই মানুষটিকে দেখবার অবকাশ ইতিপূর্বে হয়নি। কি রূপ! মনে

হচ্ছিল···শ্বেতপাথরে খোদাই মূর্তি···বিধাতা-সৃষ্ট তাজমহল! কী কোমল, কী নিটোল, কী জীবন্ত তাঁর প্রতি অঙ্গ! নয়নে প্রদীপ্ত প্রতিভার বিভা। রেশমের মত তুলতুলে অজস্র শ্বেতশ্মশ্রু···কল্পনার দিব্য ঋষির শ্মশ্রুভার যেন! কথা বলার ভঙ্গি অনন্য, কথার সুর বাঁশির ধ্বনি হয়ে ভেসে আসে। একটু পরেই আমরা ধাতস্থ হলাম।···

কবি বহুক্ষণ ধরে 'চিরন্তন ভারতবর্ষে'র কথা, 'শান্তং শিবমাদ্বৈতম্'-এর কথা, 'মানব-ধর্মে'র কথা, শিক্ষার কথা অপূর্ব ভাষায় ও ভাবে বলে গেলেন।

আমরা একফাঁকে পরিষ্কার করে বললাম: "আমরা এই দেশের রাষ্ট্রিক-স্বাধীনতা সর্বাগ্রে চাই। ইংরেজকে আমরা জোর করে তাড়াব। এবং সেজন্য অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করব। আমরা জানি, আমাদের পথ মহাত্মার অহিংস-মন্ত্রের বিরোধী; কিন্তু বাঙলা দেশের যৌবনের ভাষা তো আপনার অগোচর নয়। সশস্ত্র-সংগ্রামেই তার চরম বিশ্বাস। আপনার আশীর্বাদ আমরা চাই।"

এই ক'টি কথাই পরিষ্কার ভাষায় আমরা বলতে পেরেছিলাম। অধিক কিছু নয়। কিন্তু কথা ক'টির উপরেই কবির অনাহত একটি অবিস্মরণীয় ভাষণ শুনেছিলাম সে-সন্ধ্যায়। আজ চুয়াল্লিশ বছর পরও সে-ভাষণের ঝঙ্কার আমাদের কানের কাছে গুঞ্জরিত হয়···যদিও তার অনেক কথাই ভুলে গিয়েছি।

কবি বললেন: আশীর্বাদ কে কাকে করবে? তোমাদের কামনা যদি কার্যে পরিণত হয়, সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে বৃহতের দিকে যদি এগিয়ে যেতে পার···তবে তোমাদের মধ্যেকার কর্মীদেবতাই তোমাদের আশীর্বাদ করবেন। সে-আশীর্বাদ কোন মেকানিক্যাল্ বস্তু নয়, প্রাণশক্তিতে স্বতন্ত্র তার পরিচয়। ঐ প্রাণশক্তির বন্যায় চালিত

তরুণের অভিযান অব্যাহত। তাকে বাধা দেবার ক্ষমতা কারো থাকে না। তোমরা সত্যাশ্রয়ী থাকলে জয়ী হবে।

একটু থেমে বলে চললেন কবি : কিন্তু মনে রেখো, হিংসা বা অহিংসা বড় কথা নয়। বড় হল সেই স্বাধীনতা লাভ···যার আশ্রয়ে মানুষ সত্যাশ্রয়ী হতে পারে, বড় হতে পারে, সর্বস্তরের নরনারী সর্বক্ষেত্রে মুক্তির স্বাদ পেতে পারে।

এ-প্রসঙ্গে কবির মনোভাব আমরা যা বুঝেছিলাম, তা হল :

"করুণা তোমার কোন্ পথ দিয়ে কোথা নিয়ে যায় কাহারে ;
সহসা দেখিনু নয়ন মেলিয়ে, এনেছ তোমারি দুয়ারে।"

তিনি বললেন : হ্যাঁ, গান্ধীজির কাছে অবশ্য অহিংসার মূল্য অনেক বেশি। তিনি সত্যের উপাসক। তাঁর মতে তাঁর 'সত্যে' পৌঁছাবার পথে যা কিছু অন্যায় বা অসত্য, তা বিনষ্ট হবে। কাজেই, যথার্থ রূপে অহিংসা-সত্যে পৌঁছলে অন্যায় যে 'পরাধীনতা' তা-ও বিলুপ্ত হতে বাধ্য। এ-ও একটা Experiment !···গান্ধীজির তত্ত্ব ভারতবর্ষে নূতন বস্তু নয়। কিন্তু তা অতি উঁচুদরের বস্তু···তা দেশের অধিকাংশই অনুসরণ করতে পারবে না ; কারণ, কোন কালেই এ-তত্ত্ব সকলে অনুসরণ করতে পারেনি। ইংরেজ-বিতাড়ন যদি এ-পন্থায় সম্ভবও হয়, ইংরেজ চলে গেলে ক্ষমতা কাড়াকাড়ির সময় দেশের লোভী-মন এ-কে নস্যাৎ করে দেবে। মুস্কিল এইখানে। তবু মহাত্মাকে সসম্মানে কাজ করতে দিতে হবে। তোমাদের মতের সঙ্গে গান্ধীজির মতের মিল না থাকাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু তাঁকে যদি অশ্রদ্ধা কর, তাঁকে যদি ফ্যানাটিক্যালি সমালোচনা কর, তাতে তোমাদের ক্ষতি, দেশের ক্ষতি।···

তারপর কবি যেন আমাদের ভুলে গেলেন। ভুলে গেলেন তাঁর চতুষ্পার্শ্ব। আত্মস্থ চিত্তে কথা বলে চললেন তিনি। মনে হচ্ছিল, যেন উত্তুঙ্গ গিরিশীর্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে বাণী-মন্দ্রিত ঝর্ণাধারা নেমে

আসছে বিরাট মৌনের ধ্যান ভেঙে। পাদদেশে বসে আমরা সে-বাণীসুধা আকণ্ঠ পান করছি।...

কবি বলছেন: এই ভারতবর্ষ, এর বুকে কত সভ্যতার পদধ্বনি বেজে গেছে। সে-পদধ্বনির নানা রেশ আজো ঐকতান জুড়ে এক অতি স্পষ্ট ও সত্য পটভূমি রচনা করে রেখেছে, যাকে উপেক্ষা করে আমরা এগুতে পারি না। কাজেই, একান্ত করে একটি তত্ত্বকে ধরে রাখলে চলবে কেন? ভারতবর্ষের সভ্যতায় মানুষ থেকে শুরু করে কীট-পতঙ্গ-জীবজন্তু ও বৃক্ষলতা সবকিছুর মধ্যেই বিধাতা ধ্যানস্থ। কিন্তু সৃষ্টির প্রতি মর্মেই যে পারস্পরিক বিরোধও বর্তমান, তাকেই বা অস্বীকার করলে চলবে কেন? সংঘাত ও মিলন সৃষ্টির স্তরে স্তরে। গীতার ভগবান ভাল করে এ-কথা জেনেছিলেন। তাই তাঁর এক হাতে আয়ুধ, অন্য হাতে বাঁশি।...

ইংরেজকে যদি দানব মনে কর, এবং সে-দানবকে তাড়িয়ে দেওয়া যদি তোমাদের ধর্ম হয়—তবে তোমাদের মধ্যেকার দানব-বৃত্তিকে সর্বপ্রথম তাড়াতে হবে। গান্ধীজির অহিংস-যুদ্ধ উভয় দানবের বিরুদ্ধে। তাই 'চৌরিচৌরা'য় এসে তাঁকে থামতে হয়। সেই থামার উদ্দেশ্য রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে আসা নয়, অধিকতর শক্তিমান হয়ে পুনরায় এগিয়ে যাওয়া। তোমরা খোলা চোখ এবং খোলা মন নিয়ে অগ্রসর হও। যে-অস্ত্রে ইংরেজ-লালিত দানবকে তাড়াবে, সে-অস্ত্রই যেন জাতির আভ্যন্তরীণ দানব-বুদ্ধিকেও বিনষ্ট করতে পারে। তাই উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্থির ধারণা রেখে কর্মে নিযুক্ত হও।...

তারপর সহসা সস্নেহ-দৃষ্টি আমাদের পানে প্রসারিত করে কবি বলে চললেন: বাঙলার ইতিহাস, বাঙলার জীবন, বাঙালীর কল্পনা বারে বারে জানিয়েছে যে, বাঙলার মাটি বিপ্লব-প্রসবিনী। ধর্মে, রাষ্ট্রে,

সাংস্কৃতিক জীবনে বহুবার বিপ্লব ঘটেছে এই বাঙলায়। এ-বিপ্লবের *অস্ত্র কোন ক্ষেত্রে ছিল প্রেম, কোন ক্ষেত্রে শাণিত আয়ুধ।* উভয় পন্থাকেই বাঙলার আবহ সাগ্রহে মেনে নিয়েছে। তাদের সহাবস্থানে দেশের ক্ষতি হয়নি।···কিন্তু যে দুর্ধর্ষ পথের যাত্রী হতে চাও তোমরা, তার জন্যে সহজ মূল্য দিলে চলবে না। সহজ মূল্য দেনও নি বিপ্লবের পথিকৃৎ কোন কিশোর বা তরুণ পৃথিবীর কোন দেশে। যথার্থ আদর্শ-পাগল হলে কারাবরণ কেন, ফাঁসির রজ্জু গলায় পরাও সহজ। তোমরাও তা পরবে। কিন্তু গোটা জাতিকে সে-পর্যায়ে তুলে ধরা কঠিন, যে-পর্যায়ে গেলে ইংরেজের কাছ থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া স্বাধীনতা-লক্ষ্মী স্বদেশবাসী ক্ষমতালোভীদের হাতে লাঞ্ছিতা না হন। বিপ্লবের পদধ্বনি আসমুদ্র-হিমাচল প্রসারিত না হলে যে-শক্তির বলে তোমরা বিদেশী শাসনের নাশন ঘটাবে, সে-শক্তিই তোমাদের হাত-ছাড়া হয়ে লোভীর স্বার্থ-কামনার অস্ত্র হয়ে দাঁড়াবে।···আমার ভয় তোমাদের জন্য। উন্মাদ হয়ে ছুটে চলবে—পথের মাঝখানে কঠিন পাথরে মাথা ঠুকে না তোমাদের মরতে হয়। সে-মৃত্যু বড় বেদনার! বিপ্লব সহিংস বা অহিংস পথে আসুক, তা নিয়ে আমি ভাবিত নই; কিন্তু কোন পথেই প্রচ্ছন্ন কাপুরুষতা বা নীচ অভিব্যক্তি বেঁচে থাকলে তার পরিণতি আত্মঘাতী।···

কবি একটু থামলেন। আরো অন্তরঙ্গ হয়ে বললেন শেষ কথা: আবার বলি, সারা দেশের প্রত্যেকটি নর-নারীর কানে সৃষ্টিমুখর বিপ্লবের বাণী যদি না পৌঁছে দিতে পার, তবে তোমাদের দুর্বার চেষ্টায় ইংরেজ পালালেও তোমরা বেঁচে থাকবে না। তার মানে, তোমাদের আদর্শ বেঁচে থাকবে না। অন্ধ-জনতার পুরোভাগে এসে তারাই নেবে জয়ের পূর্ণ ভাগ, যারা এতকাল অন্যায় ও অসত্যকে সমাজের প্রতি স্তরে একান্ত লোভে লালন করে এসেছে।···

কবি নির্বাক হয়ে গেলেন। তাঁর সকল অস্তিত্বে সুদূরের ছোঁয়া। গাঢ় অন্ধকার বুড়িগঙ্গার অপর তীরে ঘনীভূত হয়ে আসছে। জল-তরঙ্গে দু'একটি নক্ষত্রের প্রতিচ্ছবি। বোটের অভ্যন্তরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরুষের পদপ্রান্তে আমরা কয়েকটি তরুণ।...আমাদের সেদিনকার প্রাপ্তির তুলনা নেই।

কিছুক্ষণ পর প্রণাম করলাম ঋষি-কবিকে। বিদায়ের ক্ষণে আশীর্বাদ করলেন তিনি। আমরা জানি, সে-আশীর্বাদটুকু ছিল তাঁরই কল্পনার তারুণ্য-শক্তির উদ্দেশে। আমরা উপলক্ষ্য মাত্র।

কবি-কক্ষ থেকে বেরুতেই তাঁর পার্শ্বচরদের রোষদৃষ্টির সম্মুখীন হতে হল। চাপা-কণ্ঠে একজনকে বলতে শুনলাম : 'বুড়োমানুষটাকে মেরে না ফেলা পর্যন্ত এদের স্বস্তি নেই।'

আমরা শুনেও শুনলাম না কোন কটুবাক্য, দেখেও দেখলাম না কারো রোষদৃষ্টি। আমরা কোন 'বুড়ো'র কাছে তো যাইনি! মৃত্যুহীন এক চিরতরুণ ঋষির পদতলে বসে আমাদের তরুণ-চিত্ত 'নবীনে'র বাণী কান পেতে শুনে এসেছে!...আমরা ধন্য।...

দ্রষ্টব্য : ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ভাষণ দেবার জন্য আহূত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঢাকা শহরে ৭ই ফেব্রুয়ারি আগমন করেন। সেই সময়ে উল্লিখিত আলোচনা গ্রন্থকার ও তার বন্ধুদের সঙ্গে হয়, এবং তারই স্মৃতিলিপি এখানে পরিবেশিত হয়েছে।

॥ উনিশ ॥

শরৎ-মানসে বাঙলার দুঃসাহসিকার দল

বর্ষার দেরি আছে। তবু এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বুভুক্ষু ধরিত্রীর পিপাসা তাতে মেটেনি। তবে গ্রীষ্মের তীব্রদাহ কমেছে কিছুটা। দেউলটি স্টেশন থেকে হেঁটেই যেতে হয় সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্রের বাড়ি। গ্রামের বুক চিরে মাইল দেড়েকের এই হাঁটা-পথকে ভাল না লেগে পারে না। বিশেষত এ সেই পথ—যে-পথের উপান্তে তাঁরই গৃহ, যাঁকে নিবিড় মমত্বে ভালবেসেছে বাঙলার নর-নারী।

দুপুরে শরৎচন্দ্র একটু ঘুমোন বলে সবার ধারণা থাকায় ও-সময় তাঁর গৃহে লোকের ভিড় বিশেষ হয় না। কিন্তু ঠিক ও-সময়েই তাঁর কাছে যাবার ছাড়পত্র আমরা পেয়েছিলাম।

সেদিন গিয়ে দেখি—ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে শরৎচন্দ্র একটা বিলিতী কাগজ পড়ছেন। মুখে জ্বলন্ত বর্মা-চুরুট। মাঝে মাঝে ধোঁয়া ছাড়ছেন আরাম করে।

আমাকে দেখেই খুশি হয়ে উঠলেন। বললেন—এসো, এসো। এ দু'দিন ধরে তোমায় বড্ড এক্সপেক্ট করছিলাম। জেল থেকে বেরিয়েই আমার সঙ্গে দেখা করবে ভেবেছিলাম। অথচ অত দেরি করলে!

আমি বললাম—কই, তিন দিনের মধ্যেই তো এলাম!

গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন—না, কালই তোমার আসা উচিত ছিল। যাক্, কেমন আছ? কিন্তু তার পূর্বে বল তো, জেলে যাবার বুদ্ধি তোমায় কে দিলে? বুঝি ভেবেছিলে, জেলে যাবার সাহসটাকে না শাণালে আর চলছে না?

একটু থেমে আবার শুরু করলেন—আচ্ছা, হাজারবারও কি বলিনি—জেলে তোমরা যেয়ো না? বলিনি কি-বাইরে ঢের কাজ, এ-কাজ থাকবে অসমাপ্ত, তোমরা সবাই মিলে জেলে যাওয়া শুরু করলে? কিছুই শুনবে না! কেন গেলে ও-সব 'সিডিশান্' লিখতে?···

উত্তর দেবার অনেক কিছুই ছিল। এবং আমার উত্তরগুলো শরৎচন্দ্র মর্ম দিয়েই জানতেন। তিনি জানতেন যে, ১৯৩০ সালের বাঙলায় সত্য কথা লিখতে গেলেই 'সিডিশান্' হতে বাধ্য। তবু উত্তর কিছুই দিলাম না। কারণ, আমি জানতাম যে, শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ও-নিয়ে তর্ক করা বৃথা। তাঁর ধারণা ছিল, সরকারের সঙ্গে সরাসরি লড়াই করে আমাদের মত নিঃসম্বল তরুণদের পক্ষে ঐ যুগে "বেণু" কাগজখানাকে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব।

কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কোমলকণ্ঠে বললেন তিনি—আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তোমার "চলার পথে" বইখানা; ওর introduction-ও আমি লিখে দিয়েছি; ও-বইয়ের মারফতে বাঙলার মেয়েদের বিপ্লব-পন্থিনী হবার জন্যে direct appeal তুমি করেছ; কিন্তু বল তো সত্যি করে, তুমি কি বিশ্বেস করো যে, ছেলেদের মতো মেয়েরাও ও-সব কাজ করতে পারে?

আমি বিপন্ন বোধ করলাম। তবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথাবার্তা বলার সাহস শরৎচন্দ্রই দিয়েছিলেন। তাই নির্ভয়ে বললাম —বাঙলার মেয়েদের আমার চেয়ে অনেক বেশি ভাল করেই আপনি চেনেন। আমার লেখাটুকু পড়বার ধৈর্যও আপনার হয়েছিল। বইখানার introduction-ও আপনি লিখেছেন এমন কোন ধারণা থেকে, যে-ধারণা দিয়ে ওর মাঝে সেই সুরই খুঁজে বের করেছেন, যার

প্রতি দরদ আপনার কম নয়। অতএব আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার দায় আপনারই।

মিষ্টি হাসি বিলিয়ে শরৎচন্দ্র বললেন—র‍্যাঙ্ক্ সিডিশান্ ছড়ালে তুমি, আর প্রশ্নোত্তর দেব আমি?

গম্ভীরতর কণ্ঠে আরো বললেন—"চলার পথে"র introduction লিখবার সময় এ-প্রশ্ন আমার মনে এসেছিল। তখন তো তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি—তুমি যে রইলে জেলে!

আমি বললাম—এ আমার আশা বা কল্পনা নয়, এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস থেকে লেখা। একান্ত বিশ্বাস থেকে গল্পগুলো লিখেছিলাম বলেই ওর জন্যে আশীর্বাদ চেয়েছিলাম আপনার কাছে। নইলে সাহিত্য-রচনার দাবি নিয়ে সাহিত্য-সম্রাটের কাছে দাঁড়াবার স্পর্ধা আমি করিনি।

আমার কথাগুলো সব তাঁর কানে যেন পৌঁছল না। সুদূর-মনস্কতায় সুগভীর হয়ে উঠছিলেন তিনি।...স্তব্ধতা ধীরে ধীরে সমগ্র ঘরখানাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। রৌদ্রস্নাত-তরুবীথি ঊর্ধ্বে দীর্ঘশাখা প্রসারিত করে কাঁপছিল। আকাশের নীলোজ্জ্বল-ভাষায় শুনছিল তারা প্রাণজ আহ্বান। রূপনারায়ণের কলোচ্ছ্বাস মাথা খুঁড়ে মরছিল তীরের বুকে। শরৎচন্দ্রের দূরাবগাহী-দৃষ্টি গেছে চলে ভবিষ্যতের আবছায়া তটে, দ্রষ্টার দৃষ্টিদীপে দূরান্তের জগৎ বুঝি-বা প্রতিভাত!

একটু পরে প্রগাঢ় সহানুভূতির কণ্ঠে বাক্যমুখর হয়ে উঠলেন শিল্পী। দীর্ঘকাল অন্তে আজও সে-কণ্ঠস্বর আমার কানে বাজে। তাঁর কথাগুলো তেমন সাজিয়ে বলতে না পারলেও তাদের মর্মার্থ প্রকাশ করা আমার পক্ষে কঠিন নয়। কারণ, আমি তা আজও ভুলতে পারিনি।

বলে চললেন তিনি—ছাখো, এ দেশটাকে আমি ভালবাসি। ভাল যে বাসি, এ-কথাটা লক্ষবার বলতেও আমার এতো ভাল লাগে! এ-দেশের ছেলে-মেয়েগুলোকে ভালবাসি আরও বেশি। কেন এত ভালবেসে ফেলেছি, জানো? ছোটবয়সেই ঘরের কোণে বন্দী থাকা আমার পোষাত না। ঐ মাঠঘাট, ঝোপ-ঝাড়—ওরা ছিল আমার বাল্যের খেলাঘর। ঐ নদীনালা, দূর প্রান্তর—ওরা ছিল আমার কিশোর কালের স্বপ্ন। ঐ নরনারী ও ঘরছাড়া-পান্থ—ওরা প্রত্যেকে আজো আমার মনের সঙ্গী। গোটা দেশই তাই 'ঘর' হয়ে আমাকে ধরা দিয়েছে। এ-সব বাদ দিয়ে আমার মুহূর্তের কল্পনাও 'আমার কল্পনা' হয়ে ওঠে না।…

আবার কিছুক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে রইলেন তিনি। খানিকক্ষণ পর আবার বলে চললেন—ছাখো, এ আমি ভাবতেই পারিনে যে, পরের পায়ের তলায় পড়ে থাকুক এ-দেশটা, এমন কামনা কোন ভারতবাসীর হতে পারে। তাই তো অত্যুগ্র আত্মসম্মানবোধ থেকে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে যে-পন্থার অনুগামী হয়ে যে-কিশোর ফাঁসির মালা কণ্ঠে পরল, তার পন্থাকে বিচার না করেই তাকে আমি পরম আত্মীয় মনে করি। যাঁরা তার তথাকথিত উত্তেজনাকে লক্ষ্য করে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে ফেলেন, তাঁদের শুধু এইটুকুই বোঝাতে চাই যে—হঠাৎ চমকে-ওঠা পৌরুষের যে-দ্যুতি দেখে তোমার আতঙ্ক হল, সে যে অনাগত সম্ভাবনার অধিকারী মানব-শিশুর অপ্রতিহত দ্যুতিশিখা! দাসসুলভ কাপুরুষতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত তুমি—তোমার চোখে এ-আলোক তো সইবে না! তুমি চোখ বুজে প্রণাম করো শুধু আলোক শিশুকে—প্রবন্ধ লিখে নিজের কলঙ্ক বাড়িয়ো না।…

বাণী-চঞ্চল শরৎচন্দ্র স্তব্ধ হয়ে গেলেন।...একটু পরে কণ্ঠে তাঁর ভাষা ফিরে এলো—হ্যাঁ, কেন থাকব পরাধীন? অথচ থাকতেই যে হচ্ছে অধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে! কিন্তু পথকুক্কুরের এ-জীবনে দুঃসহ ঘৃণাবোধ কই?...হ্যাঁ, এই যে দীনতা—এর মূলে রয়েছে নিজেদেরই পুঞ্জীভূত ত্রুটি। বহু ত্রুটির মাঝে অন্যতম ত্রুটি হল নারীর প্রতি আমাদের ব্যবহার, তাদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা।... আজকাল অনেকের কণ্ঠেই সাম্যের বুলি শুনতে পাই। তাঁরা উইমেন্স্ 'সাফ্রেজ' ও 'স্যালভেশানে'র কথায় মুখর, দুঃখী-দরিদ্রের দুঃখ-মোচনে ব্যস্ত, মজুর-কৃষকের বেদনায় কাতর। তাঁদের কথাগুলো ভালো। কিন্তু তাঁদের বিশ্বেস করতে পারিনে বলেই যত দুঃখ। তাঁরা জাতির কল্যাণ করতে চান। কাজেই, তাঁদের কাছ থেকে কল্যাণ-আশীর্বাদ জাতি গ্রহণ করে না। দয়া-দাক্ষিণ্যের দিন চলে গেছে বহুকাল। কেউ কারো উপর অন্যায় যদি না করে, তবেই তো বাঁচোয়া। কিন্তু সে হতেই পারে না—যতকাল যাদের উপর অন্যায় করা হয়, তারাই আপন হাতে সেই অন্যায়ের প্রতিরোধ না-করতে পারছে। এবং এভাবেই যথার্থ কল্যাণ-সূচনা সম্ভব।...নারী করবে তার নিজস্ব কল্যাণ; চাষী-মজুর-দুঃখী-নির্যাতিত আনবে তাদের নিজস্ব মঙ্গল। তুমি-আমি উপকার করবার শুভবুদ্ধি নিয়ে তাদের মাঝে গেলে শুধু মিশনারীদের মতই অপকার করে বসব। তাদের গ্লানিকে নিজের গ্লানি না ভাবতে পারলে ইংরেজের দেওয়া 'ডোমিনিয়ান্ স্ট্যাটাস্'-প্রত্যাশী ভারতীয়ের মত মিথ্যে-সম্বল-সুখীই হবে তোমার নারীসমাজ কিংবা অপর যে-কোন শ্রেণী, যাদের কল্যাণ তোমার কামনা।

সহসা থেমে গিয়ে একটু লজ্জিত হয়েই যেন শরৎচন্দ্র শুধালেন—কি গা, 'বোরিং' হয়ে উঠছে কি? ..নাঃ, আজ আর কিছু বলব না।

অদ্ভুত রসবোধ ছিল এই মহান শিল্পীর। শ্রোতাকে ভুলে যেতেন না, কথা-কওয়ার কালে। তার ভাল লাগছে, কি লাগছে না, সেদিকেও খেয়াল রাখতেন তিনি শ্রেষ্ঠ কথকেরই মত।

আমি হেসে উত্তর দিলাম—না-বলে আপনি পারবেন না। বলার মুড্ এসে গেছে আপনার। আমার পরম সৌভাগ্য যে, এমন মুডে আপনাকে আজ পেয়েছি।

শরৎচন্দ্রের মন-তলে তখনো চলছে প্রলয় নৃত্য। তিনি স্থির হতে পারবেন কেন? বলে চললেন অভিভূতের মত—ছাখো, এ দেশটাকে গভীর করে আমি দেখেছি। এর মানুষগুলো আমার পরিচিত। শুধু বাঙলা নয়, এই ভারতবর্ষ কবে থেকে মরতে বসেছে, জানো? যেদিন থেকে এর পুরুষগুলো হয়েছে স্বার্থপর। এরা ষড়যন্ত্র করল মেয়েজাতটার বিরুদ্ধে। মেয়েদের ভক্তি করা শুরু করল এরা কথায়, কিন্তু ঘৃণা করতে আরম্ভ করল কাজে। ফলে, কল্পনার জগতে নারী পেল 'দেবী'র আসন, কর্ম-জগতে স্থান হল তার হেঁসেলে। ও দু'টোর কোনটাই নারীর অর্জিত বস্তু নয়—পুরুষের ইচ্ছানুরূপ পদবী লাভ। পুরুষ রচনা করল শাস্ত্র। পুরুষ বানাল বিধান। সেই শাস্ত্র ও বিধান অপৌরুষেয়-আদেশ হয়ে বেঁধে ফেলল নারীকে ন্যুব্জ করে। পুরুষ-রচিত-পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে নারীও যেদিন গর্ব বোধ করল তার দেবী-মাহাত্ম্যে, সেদিন থেকে নাভিশ্বাস উঠে গেছে জাতির।···

সহসা কার উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন যেন শরৎচন্দ্র। শ্লেষতীক্ষ্ণ-কণ্ঠে আমায় প্রশ্ন করলেন—কী হে, মেয়েদের 'ভক্তি' করো?

আমি জানতাম, উত্তরের প্রত্যাশায় তিনি ও-প্রশ্ন করেননি। চুপ করেই রইলাম।

বলে চললেন তিনি—এ-প্রশ্নই একদিন উঠেছিল বাঙলা দেশে। 'চরিত্রহীন' লিখে অপাংক্তেয় হয়েছিলাম সুধী-সমাজে—এইটেই

তোমরা জানো। কিন্তু এ-তো জানো না—'গৃহদাহ'-রচয়িতার বিরুদ্ধেও ক্ষমাহীন অভিযোগ যে, তিনি নাকি ভক্তির পাত্র যে-নারীজাতি, তার মর্যাদাহানি করেছেন!...এ-অভিযোগে ক্ষোভ নেই আমার। সত্যি, 'দেবী' জ্ঞানে মেয়েজাতকে ভক্তি আমি করি নে। আবার সামান্য অপরাধেই তাদের কাউকে ঘৃণাও করি নে। তা করি নে বলেই তো তাদের দেখতে চেয়েছি আমি মানুষী-দরদ ও মানুষী-সহানুভূতি নিয়ে। তাদের দুঃখে আমার মন কাঁদে। যেমন কাঁদে যে-কোন নিপীড়িতের জন্য। আমি জানি, মেয়েদের ও-দুঃখের গোড়ায় আমার পুরুষ-জাতের কাপুরুষতা রয়েছে বেশি। নারীকে আমি সম্মান করি, ভক্তি করি নে। নারীত্বের অপমান আমার কাছে তেমনই অসহনীয়, যেমন অসহনীয় পৌরুষের অপমান। নারীকে 'দেবী'র আসনে বসিয়ে ভাবরসে আপ্লুত হয়ে উঠবার মোহ আমার নেই। তাকে চিনেছি আমি মানুষেরই পর্যায়ে। মা-বোন-স্ত্রী বা বন্ধুর গৌরবেই সে আমার কাছে প্রতিষ্ঠিতা। 'দেবী' মনে করে তাকে ভক্তি করার ভণ্ডামিকে আমি অশ্রদ্ধা করি, আপন অজ্ঞাতেও তাকে অবহেলা করবার বর্বরতাকে আমি ক্ষমা করি নে।...কী অত্যাচারই না করে আসছ তোমরা এদের ওপর সেই আদিম কাল থেকে! অথচ ভুলেও বোঝ না—আজো যে প্রাণে বেঁচে আছ একটা জাত হিসেবে, তা শুধু এই মেয়ে-জাতেরই কল্যাণে। চরিত্রহীন পুরুষকে ভোট দিয়ে কাউন্সিল-য়্যাসেম্ব্লিতে প্রতিনিধি করে পাঠাতে তোমাদের লজ্জা নেই, পুজো-পার্বণে সে-শ্রেণীর পুরুষদেরই সাহায্য নিতে দ্বিধাবোধ নেই, সমাজের বিধান দেবার অজুহাতে তাদের আহ্বান জানাতে কুণ্ঠা নেই, এমনকি অমন পাত্রের হাতেই সজ্ঞানে মেয়ে তুলে দিতেও শঙ্কা নেই! অথচ, 'অভয়া'র জন্যে আমার সহানুভূতি নাকি সমাজদ্রোহিতা; 'সাবিত্রী'র রূপ-রচনায় সতীসাধ্বীদের নাকি অপমান ঘটেছে; 'রাজলক্ষ্মী'কে পরিত্যাগ না করে ভারতীয় নারী-আদর্শের শুভ্রতায় শ্রীকান্ত নাকি কলঙ্ক লেপে দিয়েছে!...তোমার

সমাজধ্বজীরা মেয়েদের ভক্তি করেন, দেবীর মর্যাদায় তাদের চিনেছেন—কাজেই, শিশু-বিধবাদের ব্রহ্মচর্য-পালনে তাঁরা শতমুখ; কুষ্ঠী-স্বামীকে নিজের কাঁধে বহন করে পতিতালয়ে দিয়ে এলো যে-নারী, তার সতীত্ব-মাহাত্ম্যে বিগলিত-চিত্ত। ফলে, আত্মমর্যাদাহীন এই নারীদের সন্ততি যে ভারতীয়ের দল—তারাও হারাল আত্মসম্মান-জ্ঞান। এবং অধিকতর সমর্থ যে ইংরেজ-প্রভু, তার পাদুকা মাথায় বহন করে তারাও পেল আজ রাজভক্তের শ্রেষ্ঠ তিলক! ভক্তির এই বিপুল বন্যায় ভেসে গিয়ে কী-ই না আমাদের তৃপ্তি!···

হঠাৎ দারুণ বিরক্তভরে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি শুধালেন—আবার অনেক পণ্ডিত বলেন না কি, মেয়েরা কঠিনতর কাজে পা মিলিয়ে চলতে পারে না পুরুষের সঙ্গে? 'Constitutionally' তারা নাকি 'unfit'!···আচ্ছা, এত বড় একটা বানানো কথা সত্য বলে তোমরা চালাতে চাও কী করে হে?···ইংরেজ তোমাদের কিছু না দেওয়ার কারণ ঐ একই কথায় বলে তো? দু'শ' বছর নিরস্ত্র করে রেখে আজ বলছে সে—তোমাদের হাতের নিশানা হয় না, তোমরা অসামরিক জাতি। ঠিক তেমনি, ঘোম্‌টা পরিয়ে, হেঁসেলে ঢুকিয়ে রেখে মূর্খ নারীকে হঠাৎ একদিন বাধ্য করলে পথ চলতে; বন্ধুর পথে পারল না সে তোমার সঙ্গে একই তালে পা ফেলতে; তখন তুমি ফতোয়া দিয়ে বসলে—'They are constitutionally unfit'! ইংরেজ নিজের প্রভুত্ব বজায় রাখবার উদ্দেশ্যে মিথ্যে কলঙ্ক দেয় ভারতবাসীকে, আবার ঐ একই মনোবৃত্তি থেকে পুরুষও মিথ্যে কলঙ্কে হেয় করে আসছে নারীকে যুগ যুগ ধরে। ফলে, তোমাদের অধঃপতনই কেবল সূচিত হল। জাতির মালিকানা-স্বত্ব দূর অতীতকাল থেকেই বিদেশীর হাতে গেল চলে। সহস্রাধিক বৎসর থেকেই তাই নব-নব প্রভুকে ঘরের সিংহাসনে বসিয়ে তোমাকে পদলেহনের গৌরব অর্জন করে আসতে হয়েছে। নারী ও শূদ্রকে

অপাংক্তেয় করে রেখে যে মুষ্টিমেয়ের দল গোটা জাতের উপর প্রভুত্ব করতে চেয়েছিল, তাদের অদৃষ্টে পরের দাসত্বভোগ যে অলঙ্ঘ্য ঐতিহাসিক সত্য !

একটু থেমে, সস্নেহ দৃষ্টি প্রসারিত করে আবার তিনি শুরু করলেন—ছাখো, এই যে প্রকৃতি—প্রতিশোধ নেবার দারুণ প্রবৃত্তি রয়েছে এর। এর সঙ্গে লড়তে গেলে মূল্য দেবার জন্যে তৈয়ের থাকতে হবে। প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়মকে যে-মুহূর্তে অবজ্ঞা করেছে মানুষ, সেই মুহূর্তে আহ্বান জানিয়েছে সে অনাগত ও অবাঞ্ছিত বিপর্যয়ের। সমাজের দুর্বুদ্ধি যেদিন থেকে নারীকে অস্বাভাবিক চরিত্রে পেতে চাইল, সেদিন থেকে মরে গেল নারীর প্রাণ, মরে গেল পুরুষের পৌরুষ।

আজ যারা যথার্থ দেশসেবার ভার নিতে চায়, যারা নিঃসন্দেহে নিজের কর্মকে কল্যাণপ্রসূ করতে চায়—তাদের সহজ হতে হবে, স্বাভাবিক হতে হবে। সহজ পরিপার্শ্বে নর ও নারী সম-গৌরবে যতকাল না প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, ততকাল তোমাদের পথ-পরিক্রমায় সাফল্যের স্পর্শ চিহ্নিত হবে না। আমি বলছি না যে, একই কালে তেত্রিশ-কোটি নরনারীকে ঐ স্তরে আনতে হবে বা আনা সম্ভব। আমি বলছি, আলো যেখানে জ্বালাতে চাইবে সেখানে কৃত্রিমতা থাকলে চলবে না। যারা দেশসেবার ভার নেবে তাদের চতুষ্পার্শ্বে অম্লান আলোকচ্ছটা জ্বললেই অনাগত ভবিষ্যতে গোটা ভারতবর্ষ আলোকিত হতে পারবে, সকল গ্লানি ও তমসা দূর হবে।

আজ তাই তোমাকে আমি ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে যাচ্ছি—তোমার "চলার পথে"র মাধ্যমে যে বিশ্বাসকে তুমি আক্ষরিত করেছ, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ যদি মেয়েরা না পায়, ভাবতে যদি পারে তারা যে, ও-কথাগুলো তাদেরই মনের ভাষা—তবে নিশ্চয় জেনো যে, একান্ত সহজতায়ই দুর্বল নারীও কঠিনতম কাজে পুরুষেরই মত

বিজয়িনী হবে। যে-পথ কেবলমাত্র পুরুষেরই পথ বলে প্রচার করে আসছে দাম্ভিকের দল, সে-পথ যে পুরুষ-নারী-নির্বিশেষে যে কোন বলিষ্ঠ সত্য-জিজ্ঞাসুরই পথ, তা প্রমাণিত হয়ে যাবে নিঃসংশয়ে।...

আমি বললাম—নারীদের রক্ত-রাঙা পথে ছুটতে দেখলে শিউরে উঠবেন যে শান্তিকামীর দল!

উৎসাহিত হয়ে শরৎচন্দ্র উত্তর দিলেন,—তাই তো বলি, ও-কল্যাণকামীদের বাস্তব কামনা হল শান্তি, মৃতের শান্তি। ওঁদের আশীর্বাদে ও বাস্তব-চলায় রয়েছে আকাশ-জমিন ফারাক। 'কালিকা'র মূর্তিকে কল্পনা করে ওঁরা উচ্ছ্বসিত হন। রুধিরলোভা 'ছিন্নমস্তা'র সর্বনেশে রূপ নাকি ওঁরা ধ্যান করেন। আপন ক্লীবতাকে ঢাকবার জন্যে যে-মহাশক্তির প্রয়োজন হয়েছিল দেবতাদের, সেই দশপ্রহরণধারিণী 'চণ্ডিকা' যে কখনো কোন 'লবঙ্গলতা'র কল্পনা নয়, তা-ও নাকি ওঁরা জানেন! অথচ বাস্তবক্ষেত্রে কোথায় ওঁদের যাত্রা?...দ্যাখো, অনেক কালের পরাধীন যে জাতি, তার থাকে হয়তো অনেক কিছু—কিন্তু থাকে না আত্মসম্মানবোধ। নিজেকে যে সম্মান করে না, কী করে দেবে সে সম্মান মা-বোন-স্ত্রী বা অন্য নারীকে?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার তিনি বলে চললেন,—দ্যাখো, যা সত্য তা প্রত্যেক মানুষের জন্যেই সত্য—স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের জন্যেই। দেশটা পুরুষের পক্ষে যতটুকু সত্য, মেয়েদের পক্ষেও ততটুকুই সত্য। দেশকে স্বাধীন করা এবং স্বাধীন রাখার দায়িত্ব মেয়ে-পুরুষ উভয়েরই সমান। এই সহজ সত্য যখনই অস্বীকৃত হয়, তখনই জাতির ধ্বংসযাত্রা হয় শুরু। আমাদের ধ্বংসযাত্রা অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছে, আজ অবস্থা চরমে এসে

গেছে। কিন্তু কে-ই বা তা বুঝতে চায়? শত্রুকে তাড়াবার জন্যে যে-অস্ত্র পুরুষের পক্ষে প্রশস্ত, সে-অস্ত্র শুধু মেয়ে হয়ে জন্মাবার অপরাধেই নারীর পক্ষে বর্জনীয় হতে যাবে কেন?

আমি বললাম—বুঝেছি হয়তো আপনার কথা। নারী ও পুরুষকে সহজ পরিসরে, সমদৃষ্টিতে শুধু যে দেখতে হবে, তা নয়—সম-পরিপার্শ্বে পরিবর্ধিত হতে দিয়ে তাদের প্রত্যেককে বুঝতেও দিতে হবে যে, তাদের মনে সেক্সগত 'superiority' বা 'inferiority' complex-এর কোন অস্তিত্ব থাকবার অবকাশ নেই।

আস্তে বললেন তিনি—অনেকটা তাই।...

আবার বললেন শরৎচন্দ্র—বাঙলাদেশের মেয়ে রুদ্রাণীর দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে যদি ওঠেই, তবে সে পুরুষালীর দুর্নাম পাবে না। জাগ্রতা-শক্তির সংস্পর্শে এসে তখন মুমূর্ষু জাতি বেঁচে উঠবে। যে-সত্যকে আশ্রয় করে দুঃসাহসিনী হয়ে উঠবে মেয়েরা, সে-সত্য 'সত্য' বলেই সবার চিত্তকে অধিকার করবে। সুতরাং সত্য-ভ্রষ্টার অপবাদ যারা তাদের দেবে—তারা আমল পাবে না কোন স্থানেই।

আমি বললাম—মেয়েরা নাকি আগুন; তাদের পাশে রেখে ঘৃত-রূপী পুরুষদের কাজ করতে হলে তারা যে যাবে গলে! এ সর্বনাশের প্রচণ্ড সাক্ষী নাকি আপনার 'ভারতী' ও 'সুমিত্রা' প্রসঙ্গ।

শরৎচন্দ্র নির্বাক হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। করুণ ও ক্লান্ত তাঁর আঁখি দু'টি। উদাস-দৃষ্টিতে রূপনারায়ণের পানে আছেন তাকিয়ে। নদীর বুকে তখন রাঙা-জলের কনকোজ্জ্বল কলোচ্ছ্বাস। ঢেউগুলি ভেঙে পড়ছে সুমুখের তটে। বর্ণশোভিত-যৌবনের উত্তাল সঙ্গীত

রূপদক্ষ-শিল্পীর চৈতন্যে বুনে যায় স্বপ্নজাল।···সহসা সোজা হয়ে বসে, আমার প্রতি গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে, আস্তে অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলে চললেন তিনি—মেয়েরা আগুন কিনা জানি নে। তবে পুরুষেরা ঘৃতের পুত্তলি হয়ে গেছে বলেই হয়তো আজ পঁয়ত্রিশ কোটি নর-নারীর জাতিকে সুদূর সমুদ্রের ওপার থেকে আগত মুষ্টিমেয় ইংরেজের পদসেবা করে বেঁচে থাকতে হয়!···আচ্ছা, 'সব্যসাচী'কে তোমার তো পছন্দ। অতিমানবের মর্যাদাও হয়তো-বা তাকে ভাবাবেগে দিয়ে এসেছ। সে-সব্যসাচীর অন্তরকে জয় করলেন যখন 'সুমিত্রা'—তখনই 'দেবতা'কে পরিচিত করলে তোমরা ক্লীব রূপে, 'দেবী'কে স্থান দিলে তোমরা মায়াবিনীর স্তরে! আবার সেই সব্যসাচীর প্রতিই 'ভারতী'র চিত্ত তখন আকৃষ্ট—জুগুপ্সা জাগল তখন তোমাদের মনে! অথচ বুঝলে না—ও-ক্ষেত্রে আগুনের পাশে ঘৃতের পুত্তলি ছিল না বসে। বুঝলে না—আগুনের স্পর্শে খাঁটি সোনা বেরিয়ে এসে ওখানে তোমাদের জানাল আহ্বান জয়যাত্রার দুস্তর পরিসরে! ··

—ছাখো, দেশকে বাঁচাতেই যদি চাও, তবে নেমে এসো মাটির পৃথিবীতে! দেব-দেবীর আসনে পুরুষ ও নারীকে বসিয়ে যে দুর্লঙ্ঘ্য-পথের স্বপ্ন দেখছ, তা একান্ত মিথ্যে, একান্ত বিজ্ঞান-অসম্মত। এই ভারতবর্ষ জুড়ে সুমিত্রা-ভারতীরই মত মেয়ের দল গড়ে তোলো দেখি! দেখবে, অমন নারীকে যারা কর্মের সঙ্গিনী করেছে তারা কখনো পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে অসহায়ের মত দুঃখ ভোগ করতে দেখে স্বস্তি বোধ করছে না। অমন নারী-পুরুষেরা দেবতা নয়, অতিমানব নয়, অসহজ নয়—তারা মানুষ, মহত্ত্বে শৌর্যে তারা শুধুই মানুষ। সুতরাং মানুষের প্রতিজ্ঞা নিয়ে তাদের যে যাত্রা. সেখানে অমানুষের খুঁড়িয়ে-চলা বিলুপ্ত হতে বাধ্য।···পৃথিবীর ইতিহাসে স্বাধীনতার জয়ধ্বজা যাঁরা উড়িয়ে গেছেন, তাঁরা কেউ দেবতা বা দেবী ছিলেন না—তাঁরা সব্যসাচী ও সুমিত্রারই মতো আত্মস্থ নর ও নারী।

শরৎচন্দ্র এমনি করে বলে গেলেন প্রায় দু'ঘণ্টা। আজ এতকাল পরে সকল কথা আমার তেমন মনে না থাকলেও সেই দ্বিপ্রহরের মহিমামুগ্ধ শরৎ-পরিপার্শ্বখানিকে আমি সম্পূর্ণতায় যেন স্পর্শ করে আছি। আপন চিন্তার আবেগে উচ্ছল বাঙ্ময়‌মুখর শিল্পীর সমগ্র চৈতন্যে সেদিন শৃঙ্খলিত ভারতের দুর্দশা তুফান তুলেছিল। তাঁর দৃষ্টি-সমীপে লাঞ্ছিত দেশের ছবি সেই দুপুরে যেন সমগ্র নারী-সমাজের আবেদন নিয়েই ছিল দাঁড়িয়ে।…

শরৎচন্দ্র আজ নেই। আজ খুঁটিনাটি বহু কথা মনে পড়ছে তাঁকে কেন্দ্র করে। কিন্তু সবার চেয়ে খাঁটি কথা যা আজ বলা চলে তাঁর সম্বন্ধে, সে হল—তাঁর শেষ-বয়সের দিনগুলো অন্তত বাঙলার দুঃসাহসী তরুণ ও তরুণীদের ঘিরেই শ্রদ্ধায় ও স্নেহে রচনা করে গেছে অজস্র স্বপ্ন। বাঙালী-তরুণ সে-যুগে সে-কথা বুঝেছিল। আজকের তরুণ-সমাজের কাছে সে-কথা ব্যক্ত কিনা জানিনে!

দ্রষ্টব্য: ১৯৩০ সালের এক অপরাহ্ণে সামতাবেড়ের গৃহে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে গ্রন্থকারের সাক্ষাৎকার-কালে-প্রাপ্ত শরৎচন্দ্রের কণ্ঠনিঃসৃত-ভাষণের আজ থেকে সতের বৎসর পূর্বেকার (১৯৫৩) স্মৃতিলেখা।

॥ কুড়ি ॥

দীনেশ গুপ্তের রবীন্দ্রনাথ

বিপ্লবীদের চলার পথে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা অসামান্য। এ-প্রসঙ্গে একটি একনিষ্ঠ তরুণ-বিপ্লবীর কাছে শোনা তাঁরই 'রবীন্দ্রনাথে'র কথা আমরা কিছু ব্যক্ত করব।

দীনেশ গুপ্ত 'রাইটার্স বিল্ডিংস্'-এর অলিন্দযুদ্ধ-খ্যাত বীর্যবান সৈনিক। দীনেশ গুপ্ত স্মিতহাস্যে ফাঁসির রজ্জু কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন। দীনেশ গুপ্ত মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করে গিয়েছিলেন ঐ মন্ত্র:

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥"

এই যে তত্ত্ব বা সত্য—বিপ্লবীর কাছে এ অজ্ঞাত বস্তু নয়। কিন্তু এর চেয়েও বহু গুণে প্রভাবান্বিত হয়েছিল দীনেশের চৈতন্য 'মৃত্যুঞ্জয়ী' হয়ে উঠবার তপস্যায় রবীন্দ্রনাথের বাণীমন্ত্রে। এ-তথ্য সকলের হয়তো জানা নেই।···

একটি আদর্শচঞ্চল কিশোর, যৌবনের দৃপ্ত পথে পা বাড়াতে না-বাড়াতেই পৃথিবীর মমতা উপেক্ষা করে স্বেচ্ছায় দিব্যধামে চলে গেলেন—তাঁর জীবনেতিহাস কতটুকুই বা হতে পারে! কিন্তু এই পারমাণবিক যুগে কেবলমাত্র বিজ্ঞানী নয়, মানুষ মাত্রই আজ উপলব্ধি করেছে যে, 'শক্তি'র পরিচয় কেবল আয়তনে আবদ্ধ থাকে না। দীনেশ গুপ্তের জীবন-পর্ব অতি সংকীর্ণ হলেও তাই তাঁর জীবন-সত্য সংকীর্ণ নয়। সুতরাং শক্তিময় এই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের তেজোময় রূপ কোন্ সাহিত্য-বাণী থেকে আন্তরিক প্রেরণা লাভ করেছে, তা জানবার ঔৎসুক্য আমাদের থাকবেই।

১৯২৭ সাল। 'বেণু'-পত্রিকার আপিস তখন ৯৩।১ এফ্, বৈঠক-খানা রোডের ত্রিতল বাড়িতে। দীনেশ কলকাতা এসেছেন। 'মে' কি 'জুন' মাসের এক দুপুর। বন্ধুদের সেকালে কলকাতার শহরে জমাট আড্ডা জমত বেণু-আপিসে। সাহিত্যরসিক মজুতবা আলির সঙ্গে আমরা একমত—সত্যি, আড্ডা ব্যতীত মানুষ দিলখোলা মনের স্পর্শ পায় না, দিলখোলা মন না হলে বড় কাজ করা যায় না। · বিপ্লবীরা আড্ডামুখী জীব। কিন্তু আড্ডাগুলোর ধর্ম ছিল একটু আলাদা। তাদের মূলে ছিল বিপ্লবাত্মক বোধ, তাদের রসান্বিত করত সতীর্থ-মন। যা হোক, সেদিন দীনেশ গুপ্ত হন্তদন্ত হয়ে আপিস-ঘরে ঢুকেই টেবিলের উপর একটি বইয়ের প্যাকেট দুম্ করে রাখলেন এবং চেয়ার টেনে বসলেন। মনে হল যেন একখানি ঝড় এসে ঢুকেছে এবং চেয়ারের আয়ত্তে বসে থাকা তাঁর পক্ষে দুষ্কর।

কোন ভূমিকা না করে অথচ সসংকোচে দীনেশ একটা পুলিন্দা আমার হাতে দিয়ে বললেন: ভারতবর্ষের সামরিক স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে একটা আবোলতাবোল রচনা লিখেছি 'বেণু'র জন্যে, আপনি একটু দেখে দেবেন।

আমি সুদীর্ঘ রচনাটি ড্রয়ারে রেখে দিলাম। তৎপর ঢাকা-প্রত্যাগত দীনেশের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম।···

আমি বললাম: ঐ প্যাকেটে কি বই এনেছ?

উচ্ছ্বসিত দীনেশ বললেন: সেকেণ্ড্ হ্যাণ্ড যুদ্ধবিজ্ঞানের বই, একখানা বলাকা, একখানা গীতাঞ্জলি।

আমার ভারি মজা লাগল। প্রশ্ন করলাম: ঐ মেসিন্‌গানের স্তূপের সঙ্গে গীতাঞ্জলির সমন্বয় ঘটাবে কি করে, দীনেশ?

কিশোর দীনেশ তখন সবেমাত্র প্রথম-যৌবনে পা দিয়েছেন। তাঁর চোখে দূরের স্বপ্ন; কামনায় বিশ্বজয়ের গুঞ্জন।

আমাকে উত্তর দিলেন: 'বেণু' কেমন করে বিপ্লবের তূর্যধ্বনির সঙ্গে তাল রাখে?

এমন উত্তর আমি ঐটুকু ছেলের কাছে আশা করি নি। মনে হল, ঐ চিরচঞ্চল কিশোরের কোথায় যেন তাঁরই অজ্ঞাতে সকল প্রশ্নের উত্তর স্থির হয়ে গেছে।

গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: দীনেশ, তুমি কবিতা ভালবাস?

—বাসি।

—লেখ না কেন?

—ভালবাসি বলেই লিখি না। কারণ, দু'একটা লিখে দেখেছি, ও আমার হয় না।

প্রশ্ন করলাম: আচ্ছা দীনেশ, তুমি তো ভীষণ চঞ্চল ছেলে, কোন্ বস্তু পড়বার সময় তুমি শান্ত হয়ে যাও?

— কবিতা।

—গীতার শ্লোকগুলোও তো কবিতা। তবে একদিন বলেছিলে কেন যে, গীতা পড়বার সময় তোমার কষ্ট করে মন বসাতে হয়?

—গীতা পড়তে ভাল লাগে, কিন্তু দু'লাইন পড়লেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের কথা মনে পড়ে, আর তখুনি ভাবতে বসি, কবে আমাদের যুদ্ধ শুরু হবে, কবে আমি সে যুদ্ধের সৈনিক হব! ব্যস্, গীতাপাঠ খতম হয়ে যায়!

—কিন্তু কার কবিতা তুমি স্থির হয়ে পড়?

—রবীন্দ্রনাথের।

—কেন?

—রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেই আমি 'গীতা'র বাণী আমার মাতৃ-কণ্ঠে খুঁজে পাই, আরো পাই এই পৃথিবী ও তার অগণিত মানুষকে, পাই আলো-বাতাস জীবজন্তু ও সবুজ গাছগুলোকে।

—রবীন্দ্রনাথের কবিতা তোমাকে চঞ্চল করে না?

—অভিভূত করে, ক্ষিপ্ত করে না। ভাল লাগে এত বেশি যে, আমার রক্তধারা বিবশ হয়ে আসে, মনে রোমাঞ্চ লাগে। আমি স্থির হই।

বললাম : তোমার খুব ভাল লাগে এমন দু'একটি চরণ আবৃত্তি করো না!

দীনেশ শুরু করলেন :

"হে বন্ধু, কী চাও তুমি দিবসের শেষে
মোর দ্বারে এসে।
কী তোমারে দিব আনি।
সন্ধ্যাদীপখানি?
এ-দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের,
স্তব্ধ ভবনের।
তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায়?
এ যে হায়
পথের বাতাসে নিবে যায়।"

চঞ্চল দীনেশ ক্রমশ স্থির হয়ে আসছেন। আবার বলতে থাকেন :

"দেখিবে সহসা—
সন্ধ্যার কবরী হতে খসা
একটি রঙিন আলো কাঁপি থরথরে
ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের 'পরে,
সেই আলো, অজানা সে উপহার
সেই ত তোমার।"

দীনেশের কণ্ঠ থেমেছে, কিন্তু কবিতার রেশ তাঁর সত্তায় অদৃশ্য তরঙ্গদোলায় বহমান।

আমি বললাম : আরো বল!

দীনেশ শুরু করলেন ঃ

> "বিরহী তোমার লাগি
> আছি জাগি
> দক্ষিণ-বাতাসে
> ফাল্গুনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।..."

> "ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
> জীবনের এপার ওপার।"

প্রশ্ন করলাম ঃ তোমার এ-সব পংক্তিগুলো অত ভাল লাগে কেন? মারামারি-কাটাকাটির কথা তো এতে কিছু নেই!

সহাস্যে দীনেশ আবার চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

বলেন ঃ কেন জানি নে—আমার খুব ভাল লাগে। ঐ যে অন্তহীন 'বিরহী'—তার যাওয়া-আসা যেন অন্তহীন কালের মধ্যে। তাকে আমার বড় আপনার মনে হয়। তার পৃথিবীতে আমাদের পৃথিবীরই দক্ষিণ-বাতাসের মর্মর আছে, ফাল্গুনের বর্ণময় নিশ্বাস আছে, অথচ আরো আছে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যেকার প্রাচীরকে অস্বীকার করার সাহস!

আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তুমি গান ভালবাস?

দীনেশ উৎসাহে উত্তর দেন ঃ খু-ব

—স্বদেশী গান?

—স্বদেশী গান তো নিশ্চয়ই, ঐ যুদ্ধের বাজনার মত। তবে খু-ব ভাল লাগে রবীন্দ্রসঙ্গীত।

—বল তো দু'একটি তোমার প্রিয় গানের দু'একটি চরণ!

দীনেশ বলে চললেন ঃ

> "দুখের পরে পরম দুখে,
> তারি চরণ বাজে বুকে,

সুখে কখন্ বুলিয়ে সে দেয়
পরশমণি।
সে যে আসে, আসে, আসে।"

আমি বললাম : আরো বল!

দীনেশ তাঁর ভাণ্ডারের দ্বার খুলে দিয়ে অজস্র গানের অজস্র চরণ আবৃত্তি করে চললেন। মনে হল, তাঁর কানে যেন কবির নীরব কণ্ঠের গীত ভেসে আসছে। তাই গানের আবৃত্তি তাঁর তন্ময়তাসুন্দর।

দীনেশের কণ্ঠে বেজে উঠল :

"ছিন্ন করে লও হে মোরে
আর বিলম্ব নয়।
ধূলায় পাছে ঝরে পড়ি
এই জাগে মোর ভয়।
এ ফুল তোমার মালার মাঝে
ঠাঁই পাবে কি, জানি না যে,
তবু তোমার আঘাতটি তার
ভাগ্যে যেন রয়।
ছিন্ন করো ছিন্ন করো
আর বিলম্ব নয়।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম : আচ্ছা, কিছু লোকে তো বলে, রবীন্দ্রকাব্যে মেয়েলী-ঢঙ বড় বেশি। ও পড়লে ছেলেরা ন্যাকা হয়ে যায়। কিন্তু তোমার কি মনে হয়?

দীনেশ আমার দিকে একটু তাকিয়ে রীতিমত ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেন : সেই লোকগুলো রবি ঠাকুরের একটি কথাও বুঝতে চায় না। ওদের হাতের কাছে পেলে—

দীনেশের আর বলা হল না। মনে হল, সেই কল্পিত মানুষগুলোকে কাছে পেলে দীনেশচন্দ্র তখুনি তাদের ঘাড় মট্‌কে দেবেন!···

রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা, গল্প দীনেশের প্রিয়তম সাথী ছিল।

কবির কাব্যে দীনেশ সেই ধ্বনি মর্ম দিয়ে অনুভব করতেন, যে-ধ্বনি তাঁকে কাল ও দেশের গণ্ডি পার করে একদা সে-জগতের গান শুনিয়েছিল, যার কল্পনা ঘুমিয়ে ছিল তাঁরই রক্তের নিভৃত স্পন্দনে।

'গীতা' পড়ে দীনেশ মৃত্যুকে জয় করেন নি। 'গীতা'র মর্ম রবীন্দ্রনাথের 'কবিতা' হয়ে সহস্র ছন্দে তাঁর কানে গুঞ্জরিত হতেই তিনি মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ী দীনেশের রক্তে অনুরণিত হল :

"দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,"...

"... ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।"...

আদর্শতন্ময় তরুণ আপন বিশ্বাসে দুঃসহ হয়ে শুনছেন :

"ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাতল ;
'যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল',
উঠেছে আদেশ,
'বন্দরের কাল হল শেষ।'..."

দীনেশ গুপ্তের যাত্রা আরম্ভ হয়ে গেল :

"মৃত্যু ভেদ করি
দুলিয়া চলেছে তরী।"

কেন তরী বেয়ে চলতেই হবে? তার কারণ :

"এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ।"

আনন্দনিমগ্ন তরুণ। কারণ :

"মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে।"

মৃত্যুঞ্জয়ী দীনেশ প্রচুর আশাবাদী। প্রচুর আত্মবিশ্বাসী। কাজেই, কবির বাণী তাঁর হৃদয়তলে তোলে প্রিয় গুঞ্জরণ। কবির ভাষায় মৃত্যুকে পরম প্রত্যয়ে বলতে পেরেছেন তিনি ঃ

"তোরে নাহি করি ভয়,
এ-সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে
প্রাণ দিব, দেখ্।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই
চিরন্তন এক!"

বিশ্বাসী দীনেশ। জিজ্ঞাসু দীনেশ। দীনেশের কণ্ঠেও তাই কবির প্রশ্ন ঃ

"বীরের এ রক্তস্রোত,
মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি
ধরার ধূলায় হবে হারা?"

কবির মতই এ-প্রশ্ন কারো কাছ থেকে উত্তরের প্রত্যাশায় দীনেশ গুপ্তও করেন নি। কারণ, এর উত্তর তাঁরও নিজের কাছেই ছিল। উত্তর জানা ছিল বলেই আত্মদানের সামর্থ্য তাঁর হয়েছিল।

"রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?"

—এও তাঁর প্রশ্ন নয়, এ তাঁর খুঁজে-পাওয়া উত্তর, এ তাঁর হৃৎপিণ্ডের প্রত্যয়ধ্বনি।

তাই রাত্রির তপস্যা সমাপ্ত হতেই অরুণ-আলোকের পদধ্বনি তিনি শুনলেন। সেই আলোক-সুধা পান করে তিনি মৃত্যুহীন হলেন।

তাই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এই তরুণ কারা-গৃহ থেকে তাঁর মণিদিকে লিখতে পারলেন ঃ

"…এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারি।"

'বজ্র' হতেও কঠোর পদক্ষেপে দীনেশের বিপ্লব-যাত্রা, কুসুম থেকেও কোমল অনুভূতির লালনে দীনেশের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞান। পরাধীনতার শৃঙ্খল দ্বিখণ্ডিত করার দুর্দান্ত শক্তির তিনি উপাসক। দুঃখে-দৈন্যে-অপমানে ক্লিষ্ট পরাধীন নরনারীর বেদনায় তিনি ব্যথাতুর। তাই যে-ধ্বংস মহৎ সৃষ্টির পূর্ব-সূচনা, তা দীনেশ গুপ্তের কাছে প্রেয়। বিপ্লবের পথ তাঁর কাছে ছিল বরণীয় শুধু নয়, রমণীয়ও।

কঠোর ও কোমলের সমাবেশ বিপ্লবীর সত্তায়, কঠোর ও কোমলের সমাবেশ রবীন্দ্রসাহিত্যে—সেই জন্যে বিপ্লবী-দীনেশের জীবনে রবীন্দ্রসাহিত্যের অত প্রভাব।

দীনেশ মহাক্ষত্রিয়! দীনেশ বীরের মত পৃথিবীর সমগ্র সৌন্দর্যকে ভালবেসে পরিপূর্ণ হয়েছিলেন। সে-সৌন্দর্যবোধই তাঁকে বন্ধনহীন সত্যের পানে নিয়ে গেছে। আলিপুর জেল থেকে 'খুকুদি'কে দীনেশ লিখলেন: 'ভালবাসা পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় জিনিস। যে যাকে ভালবাসে তার জন্যে প্রাণ দিতেও কি সে কুণ্ঠিত হয় কখনও?… ভালবাসা হিসেব জানে না…আমাদের ভালবাসার গণ্ডি বড় সংকীর্ণ, বড়ই অল্প-পরিসর। একে বড় করতে হয়। স্বার্থত্যাগ সে সাধনায় প্রথম কথা।'

দীনেশের এ-সব কথা তাঁর উপলব্ধ উক্তি। তাঁর চিঠিগুলো পড়ে মনে হয়, তরুণ দীনেশ 'প্রাজ্ঞে'র অনুভূতি নিয়েই বুঝি ভগবান বুদ্ধের কণ্ঠ থেকে নিজ কানে শুনেছিলেন:

"Friend, that love is false
Which clings to love for
Selfish sweets of love."

নিজের জীবনকে নিজের দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করে বিপ্লবের বেদীতলে আহুতি দিয়েছিলেন দীনেশচন্দ্র। তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা দিনে দিনে সুন্দর হয়েছিল। তাঁর এই দীক্ষা-তরুর মূলে জলসিঞ্চন করত রবীন্দ্রকাব্য, সে-তরুকে আলোক ও বাতাস দান করত রবীন্দ্র-দর্শন, সে-তরু যে-মাটির উপর দাঁড়িয়ে ছিল তার প্রতি রন্ধ্রকে উর্বর করত সতীর্থ এবং পুরোযায়ী শহিদদের বন্ধুত্ব, ত্যাগ, বীর্য ও আদর্শমগ্নতা।...

বিপ্লবী বিনয় বসুর নেতৃত্বে দীনেশ ও বাদল রাইটার্স্ বিল্ডিংস্-এ ঢুকে কারাধিপতি কর্নেল সিম্পসন্ ও অন্যান্য রাজপুরুষদের আক্রমণ করবেন স্থির হয়ে গেছে। লোম্যান্-হত্যার পর বিনয় বসু আত্ম-গোপন করে আছেন দলের শেল্টারে। তাঁকে রাখা হয়েছে মেটিয়া-বুরুজে রাজেন গুহ মহাশয়ের গৃহে। দীনেশ ও বাদলকে রাখা হয়েছে নিউ পার্ক স্ট্রীটের (বর্তমান 'সার্কাস পোস্ট-অপিসে'র কাছে) এক বাড়ির দ্বিতলে। মেটিয়াবুরুজ থেকে বিনয়কে রসময় শূর এবং নিউ পার্ক স্ট্রীট থেকে দীনেশ ও বাদলকে নিকুঞ্জ সেন ট্যাক্সি করে খিদিরপুর পাইপ রোডের মোড়ে একই সময়ে নিয়ে আসবেন বলেও স্থির হয়ে রইল। সময়ের একটু এদিক-ওদিক হবার উপায় নেই—কারণ, বিনয় বসুকে ধরবার জন্যে দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। পুলিশ এ-বাবদে যেন অর্ধেক রাজ্য বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত !...

দীনেশ ও বাদলকে আনবার জন্যে যথাসময়ে নিকুঞ্জ সেন নিউ পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। তিনি দেখলেন যে, তরুণদ্বয় দুঃসহ কর্মযাত্রার জন্যে তৈয়ের হয়েই কাব্যপাঠে মগ্ন! মৃত্যুপথে পা

বাড়াবার পূর্ব মুহূর্তে তপস্যানিবিড় কণ্ঠে দীনেশ পড়ে যাচ্ছেন :

'শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি
রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে
যুগান্তর-পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা-বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।"

বাদল মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছেন সেই আবৃত্তি।…দীনেশ পড়ে যাচ্ছেন :

"যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি
আঁকে নাই কলঙ্কতিলক।"

দীনেশ আবার পড়ছেন :

"তার পরে দীর্ঘ পথশেষে
জীবনযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্ত বেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে।"…

কিন্তু নিকুঞ্জ সেনের উপস্থিতি টের পেতেই তাঁরা কাব্যগ্রন্থ গুটিয়ে রাখলেন। এবং অনায়াসে সৈনিকের ক্ষিপ্রতায় 'এ্যাটেন্‌শান্‌' হয়ে দাঁড়ালেন।…

যাত্রা শুরু হল।

নির্ধারিত ক্ষণে দীনেশ ও বাদলকে খিদিরপুর পাইপ রোডের মোড়ে নামিয়ে দিয়ে নিকুঞ্জ সেন চলে গেলেন। ঠিক পাঁচ মিনিট পর আর একটি ট্যাক্সিতে রসময় শূর বিনয় বসুকে সঙ্গে করে সেই স্থানে এলেন।

নির্দিষ্ট কার্যক্রম মত বিনয় বসু, অপেক্ষমাণ দীনেশ-বাদলের সঙ্গে মিলিত হলেন। রসময়বাবু দূরে দাঁড়িয়ে দেখলেন যে, মিনিট-

খানেকের মধ্যেই একটি চলন্ত ট্যাক্সি থামিয়ে তাতে তাঁরা তিনজনে উঠে বসেছেন।···উল্কাবেগে বীরত্রয়ীকে নিয়ে ট্যাক্সি উধাও হয়ে গেল।

এর পরের ইতিহাস লোকচক্ষুর সম্মুখে ঘটেছে। তা সবারই কিছু জানা। কিন্তু সে-ইতিহাস অর্থহীন—যদি ইতিহাস-স্রষ্টা এই বিপ্লবীদের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রেরণা-উৎসকে খুঁজে না দেখি। দীনেশ গুপ্তের গভীর মানসে 'রবি'রশ্মির তরঙ্গ-বিকিরণ কি পরিমাণে ছিল, তার আলোচনা তাই অবান্তর মনে করলাম না।

দীনেশ গুপ্তের একটু পরিচয়

দীনেশ গুপ্তের আরো পরিচয় অতি সংক্ষেপে এখানে দিয়ে রাখি। 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থে তাঁর কর্মকথা বিশদভাবে লিখিত রয়েছে।

লোম্যান্-নিধনকর্তা মেজর **বিনয় বসুর** নেতৃত্বে দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্ত রাইটার্স্ বিল্ডিংস্ (ব্রিটিশ-সরকারের সাম্রাজ্য-পরিচালনার দুর্গ) আক্রমণ করেন ১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর। কারাগারের ইন্সপেক্টর-জেনারেল কর্নেল সিম্পসন্ সেই সংঘর্ষে নিহত হন, টয়নাম্-নেলসন্ প্রমুখ আই-সি-এস রাজপুরুষগণ আহত হন। স্টেট্স্ম্যান্-পত্রিকা সে-যুদ্ধের নামকরণ করেন 'Verandah Battle'. যুদ্ধ-অন্তে বীরত্রয়ী পটাশিয়াম্ সায়ানাইড্-এর 'এ্যাম্পুল্' গিলে ফেলেন। তৎসত্ত্বেও বিনয় এবং দীনেশ তাঁদের শেষ বুলেট্ নিজেদের মাথা লক্ষ্য করে তাক্ করেন। ফলে, সায়ানাইড্-এর য়্যাকশান্ তাঁদের দেহে ব্যর্থ হয়। আহত দীনেশ ও বিনয়কৃষ্ণ মেডিক্যাল্ কলেজ হাসপাতালে নীত হন। বাদল অবশ্য শুধু সায়ানাইড্ খেয়েছিলেন। তিনি তাই ঘটনাস্থলে মুহূর্তে দেহত্যাগ করেন। বিনয়কৃষ্ণের হাসপাতালে, ১৩ই ডিসেম্বর অমর মৃত্যু লাভ

হয়। দীনেশ সুস্থ হতেই আলিপুর সেণ্ট্রাল-জেলে স্থানান্তরিত হন। ১৯৩১ সালের ৭ই জুলাই দীনেশ সগৌরবে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন।...

দীনেশ গুপ্ত শুধুমাত্র 'মৃত্যুহীন শহিদ' নন, তাঁর মত সফল সংগঠক বিপ্লবীদের ইতিহাসেও অধিক নেই। মেদিনীপুরে 'বি. ভি.'-বিপ্লবী-দলের শাখা তিনিই পত্তন করেন। তাঁর আদর্শে, প্রেরণায় ও শিক্ষায় শিক্ষিত বিপ্লবীরাই তিন-তিনটি জিলা-শাসককে নিধন করে মেদিনীপুরে ইংরেজ-শাসন তৎকালে বিকল করে দিয়েছিলেন। ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে তাঁরই অনুগামী প্রদ্যোৎ-রামকৃষ্ণ-ব্রজ-নির্মলজীবন ফাঁসি গেলেন, তাঁরই মন্ত্রে দীপ্ত অনাথ পাঁজা ও মৃগেন দত্ত সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। দীনেশ গুপ্তের 'বিপ্লবী-মেদিনীপুর' সে-যুগে শৌর্যের ইতিহাসে একটি অমূল্য অধ্যায় সংযুক্ত করে গেছে।

এছাড়া দীনেশ ছিলেন দক্ষ স্বেচ্ছাসৈনিক। সুভাষচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত 'বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার বাহিনী'র তিনি ক্যাপ্টেন্। মেজর সত্য গুপ্তের তিনি প্রিয় অফিসার, নিয়মানুবর্তিতা-রক্ষায় অদ্বিতীয়।...

দীনেশ গুপ্তের আরো দিক ছিল। তিনি শুধু জাত-সাহিত্যিক নন, ছিলেন ধ্যানস্থ এক সাহিত্য-জিজ্ঞাসুও। জেল থেকে লিখিত তাঁর পত্রাবলী রসোত্তীর্ণ তো বটেই, দার্শনিক-তত্ত্বে এবং গভীর উপলব্ধিতেও সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কিশোর দীনেশের উপর কত সহজভাবে নিরন্তর বহমান ছিল, তা সে-যুগের 'বেণু'-সম্পাদক শ্রীভূপেন রক্ষিত-রায়ের সঙ্গে তাঁর একদিনের আলোচনায় সম্যক বিধৃত, এবং উপরোক্ত প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশিত।

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি

এখানে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হল, আজকের পাঠকদের আমরা আজ থেকে চল্লিশ বছর পূর্বেকার বাঙলা, তথা ভারতবর্ষে নিয়ে যেতে চাই। কারণ, ব্রিটিশ-শাসন-পিঞ্জরে আবদ্ধ, ভয়ে ও ত্রাসে জর্জরিত, এবং নিষ্ঠুর ও নির্মম অত্যাচারে পিষ্ট দেশবাসী কিভাবে বিপ্লবীদের তৎকালে গ্রহণ করেছিলেন, তার কিছু পরিচয় এই উদ্ধৃতিগুলো বহন করে।

॥ আনন্দবাজার পত্রিকা ॥

[মঙ্গলবার, ২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭ ; ইং ৯-১২-৩০]

গুলির আঘাতে বাঙ্গলার কারা-বিভাগের ইন্সপেক্টর-জেনারেল নিহত

গতকল্য বেলা ১২টার সময় কলিকাতার বুকের উপর রাইটার্স্ বিল্ডিংয়ে এক বিষম দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। ৩ জন বাঙ্গালী যুবক বাঙ্গলার কারাগার-বিভাগের ইন্সপেক্টর-জেনারেল লেপ্টেন্যাণ্ট কর্নেল সিমসনকে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে।

বেলা ১২-১৫ মিঃ—১২-৩০ মিনিটের মধ্যে ৩ জন বাঙ্গালী যুবক কারাগার-বিভাগের ইন্সপেক্টর-জেনারেলের অফিসে (রাইটার্স বিল্ডিং) আসিয়া উপস্থিত হয়। কর্নেল সিমসন তখন তাঁহার খাস মুন্সির (পারসন্যাল এ্যাসিস্টাণ্ট) সঙ্গে তাঁহার অফিসে বসিয়া কথা বলিতেছিলেন। যুবকত্রয় তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ ব্যক্ত করিলে চাপরাশী তাহাদিগকে উপরোক্ত কারণে অপেক্ষা করিতে বলে এবং কি কাজের জন্য তাহারা দেখা করিতে চায়, তাহা যথারীতি এক টুকরা কাগজে লিখিয়া দিতে বলে। কিন্তু যুবকগণ ইহা করিতে

অস্বীকৃত হয় এবং তাহাকে এক পার্শ্বে ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং দ্রুত গতিতে কর্নেল সিমসনের প্রতি ৫।৬ বার গুলি নিক্ষেপ করে। গুলির আঘাতে কর্নেল সিমসন তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন।···

কর্নেল সিমসনের ঘর হইতে বাহির হইয়া আততায়ীরা বারান্দা দিয়া চলিয়া আসে। দৌড়িবার সময় তাহারা অফিসগুলির কাঁচের জানালায় এবং সিলিং-এ গুলি করিতে থাকে। রাজস্ব-সচিব মিঃ মারের অফিসের জানালায় গুলির চিহ্ন রহিয়াছে। মিঃ জে. ডব্লিউ. নেলসনের অফিসে গুলির চিহ্ন রহিয়াছে।

অতঃপর তাহারা পাসপোর্ট অফিসে প্রবেশ করে এবং একজন আমেরিকানকে গুলি করে। কিন্তু গুলি ব্যর্থ হয়। কোন চাপরাশীর গায়ে গুলি লাগে নাই।

অতঃপর আততায়িগণ নেলসন সাহেবের ঘরে প্রবেশ করে এবং তাঁহার উরুদেশে গুলি করে। তাঁহার আঘাত গুরুতর নহে।···

॥ শেষ খবর ॥

শেষ খবরে জানা যায়, একজন আততায়ী আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে, অপর দুইজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় অবস্থান করিতেছে। একজনকে বিনয়কৃষ্ণ বসু বলিয়া নিশ্চিতরূপে জানা গিয়াছে। সে নাকি এই মর্মে এক মৃত্যুকালীন জবানবন্দী দিয়াছে যে, সে-ই বিনয়-কৃষ্ণ বসু এবং সে-ই মিঃ লোম্যানকে হত্যা করিয়াছে। আততায়িগণ তিনজনই ইউরোপীয় পোশাকে ভূষিত হইয়াছিল। বারান্দা দিয়া গুলি করিতে করিতে অগ্রসর হইবার সময় উহারা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতেছিল।···

[মঙ্গলবার, ২২শে আষাঢ়, ১৩৩৮ ; ইং ৭-৭-৩১]

॥ মঙ্গলবার প্রাতে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে ॥

সোমবার শেষরাত্রিতে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

মঙ্গলবার প্রাতে কলিকাতার প্রতি রাস্তার মোড়ে বহু পুলিশ মোতায়েন দেখা যায়। ইহা হইতেই প্রবল অনুমান হয় যে, ফাঁসি হইয়া গিয়াছে।

॥ মাতার নিকট শেষ পত্র ॥

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল

মা, যদিও ভাবিতেছি কাল ভোরে তুমি আসিবে, তবুও তোমার কাছে না লিখিয়া পারিলাম না।

তুমি হয়ত ভাবিতেছ, 'ভগবানের কাছে এত কাতর প্রার্থনা করিলাম, তবুও তিনি শুনিলেন না ! তিনি নিশ্চয়ই পাষাণ, কাহারও বুকভাঙ্গা আর্তনাদ তাঁহার কাছে পৌঁছায় না !' ভগবান কি, আমি জানি না, তাঁহার স্বরূপ কল্পনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তবুও এ-কথাটা বুঝি, তাঁহার সৃষ্টিতে কখনও অবিচার হইতে পারে না। তাঁহার বিচার ঘরের দ্বার চিরকাল খোলা, নিত্যই তাঁহার বিচার চলিতেছে। তাঁহার বিচারের উপর অবিশ্বাস করিও না, সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা পাতিয়া নিতে চেষ্টা কর। কি দিয়া যে তিনি কি করিতে চান, তাহা আমরা বুঝিব কি করিয়া ?···

তোমার 'নসু'

(দীনেশ গুপ্ত)

[বুধবার, ২৩শে আষাঢ়, ১৩৩৮ ; ইং ৮-৭-৩১]

॥ দীনেশের ফাঁসি ॥

(সম্পাদকীয়)

বিশ বছরের বালক দীনেশ ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ দিল। কৌতূহলী বালক যেমন নূতন খেলনা ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া গ্রহণ করিতে লালায়িত হয়, অসীম রহস্যময় মৃত্যুর সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইতে তাহার তেমনি সাধ হইয়াছিল। মাতা-পিতা, স্নেহশীলা ভ্রাতৃজায়া সকলকে সে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিয়াছে,—মৃত্যু ভয়ঙ্কর নহে, সে মরণমালা! মরণমালা গলায় পরিয়া মরণজয়ী জীবনের জয়োল্লাসে চলিয়া গেল!…

…অনেকে মনে করিয়াছিল, অন্তত প্রাণভিক্ষা দিয়া গভর্ণমেণ্ট জনমতের প্রতি কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবেন। হাইকোর্টের বিচারপতি বাকল্যাণ্ডের মন্তব্যে এই আশা দৃঢ় হইয়াছিল। কিন্তু চরম-দণ্ডের অন্যথা করিতে গভর্ণমেণ্ট স্বীকৃত হইলেন না। অসহায় জাতি—তদপেক্ষা নিরুপায় মাতার অশ্রুসিক্ত আবেদন ব্যর্থ হইল! দীনেশ বাঁচিল না—তাহাকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করা গেল না। খেদখিন্ন নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস একটা জাতির পঞ্জর-পিঞ্জর কাঁপাইয়া শূন্যে মিলাইয়া গেল, কম্পিত অধরোষ্ঠে কি কথা মৌন রহিয়া গেল ; বোঝা গেল না! কেহ কি বুঝিবে?

[বৃহস্পতিবার, ২৪শে আষাঢ়, ১৩৩৮ ; ইং ৯-৭-৩১]

॥ দীনেশ গুপ্তের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥

কর্পোরেশনের সভা স্থগিত

স্বকীয় আদর্শের অনুসরণে জীবন উৎসর্গকারী দীনেশচন্দ্র গুপ্তের ফাঁসিতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া গতকল্য বুধবার কলিকাতা কর্পোরেশনের একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এবং তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ কর্পোরেশনের সভা আগামী শুক্রবার পর্যন্ত স্থগিত রহিয়াছে।

শোকসূচক প্রস্তাবটি উঠিবার পর ইহুদী সদস্যগণ বাহিরে চলিয়া যান। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর তাঁহারা ফিরিয়া আসেন এবং সভা স্থগিত রাখার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেন। একজন মনোনীত হিন্দু সদস্য এবং একজন মুসলমান সদস্যও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দেন।

প্রস্তাবটি সম্পর্কে মেয়র ডাক্তার বিধান রায় বলেন ঃ

"...হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ বাকল্যাণ্ড রায়ে বলিয়াছেন যে, তাঁহার মতে এই যুবক আত্মস্বার্থ বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য এই কার্য করে নাই। প্রকৃতপক্ষে বিচারপতি বাকল্যাণ্ড ইতিহাসের রায়ই লিখিয়াছেন। ইতিহাসে আমরা এমন অনেক কাহিনী পাঠ করিয়াছি, যাহারা এক সময় এরূপ কার্যের জন্য দণ্ডিত হয়, পরবর্তীকালে তাহারাই আত্মোৎসর্গকারী বীর বলিয়া পূজা পায়।

সুতরাং এই যুবক তাহার আদর্শের অনুসরণে যে অবিচলিত সাহস দেখাইয়াছে, আসুন, আমরা সকলে তৎপ্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি।"

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।...

[শনিবার, ২৬শে আষাঢ়, ১৩৩৮ ; ইং ১১-৭-৩১]

॥ দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি ॥

বাঙ্গলার সর্বত্র বিক্ষোভ

বাগেরহাট : শ্রীযুক্ত রণদাকান্ত রায় চৌধুরির সভাপতিত্বে ৮ই তারিখে এক জনসভা হইয়াছে।…

কান্দি : ৯ই তারিখে কান্দিতে হরতাল হইয়াছে।

বরিশাল : ডাক্তার আনন্দমোহন রায়ের সভাপতিত্বে অশ্বিনী-কুমার হলে এক সভা হয়।…

ফরিদপুর : ছাত্ররা এক বিরাট মিছিল বাহির করিয়াছিল। বাবু দীনেশচন্দ্র সেন উকীলের সভাপতিত্বে এক সভা হয়।…

ময়মনসিংহ : ময়মনসিংহ জেলা ছাত্র-সমিতির উদ্যোগে এক সভা হয়। শ্রীযুক্ত হরসুন্দর চক্রবর্তি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিনয় বসুর পলায়ন

বিনয় বসুর 'পলায়ন' মানে তাঁর বন্ধু, সতীর্থ এবং বিপ্লবের পথে অভিন্ন-যাত্রী সুপতি রায়ের পলায়ন। এ-ব্যাপারে সুপতি রায়ের কৃতিত্ব গুপ্ত-সমিতির ইতিহাসে একটি অমূল্য অধ্যায়। আমরা এখানে তার কিছুটা 'বিপ্লবতীর্থে' নামক গ্রন্থ থেকে তুলে দিলাম। এই অংশ 'বিপ্লবতীর্থে'র গ্রন্থকার সুপতি রায়ের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে।

"৩০শে আগস্ট, ১৯৩০, দুপুরের দিকে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এলো। ঝড়-জলের প্লাবনে রাস্তাঘাট শূন্য। এমন সময় দু'টি প্রাণী ছাতা মাথায় থাকা সত্ত্বেও প্রচণ্ড বর্ষণে অসম্ভব ভিজে-ভিজে পথ চলছেন। সুপতি রায়ের সাধারণ বেশ। তাঁর পশ্চাতে বিনয় বোস--পরনে ছেঁড়া লুঙি, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, মাথায় নোংরা একটা গামছা জড়ানো। মুসলমান-কৃষকের পরিচ্ছদে বিনয়কে চেনা যাচ্ছিল না 'বিনয়' বলে। কিন্তু তাঁর আভিজাত্যপূর্ণ চেহারার ছাপ ওতে সম্পূর্ণ লুকায়নি। সন্ধ্যা তখনও নামেনি—তবু সর্বপৃথিবী অঝোর বর্ষণে ও পুঞ্জীভূত মেঘচ্ছায়ায় আঁধারাচ্ছন্ন।

"দোলাইগঞ্জ রেল-স্টেশানের সন্নিকটে একটা পোড়ো-বাড়িতে বিনয়কে বসিয়ে সুপতি দু'খানা টিকিট কেটে আনলেন। গাড়ি আসার পূর্ব মুহূর্তে তাঁরা প্ল্যাট্‌ফর্মে গিয়ে হাজির। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ-মুখী গাড়ি পৌঁছল এসে স্টেশানে। পুলিশ তচ্‌নচ্‌ করে সার্চ করল গাড়িটা, কিন্তু ঝড়-জলের দাপটে প্ল্যাট্‌ফর্মের উপর তারা নজর দিল না। পেছনের গাড়িগুলোর তালাশি হয়ে যেতেই বিনয় ও

সুপতি একটা কামরায় উঠে গেলেন। সে-কামরায় অনেকগুলো ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রত্যাগত নারায়ণগঞ্জের ছাত্র গুলজার করছিল। সুপতি তাদের মধ্যে গিয়ে বসলেন। বিনয় পাশের বেঞ্চে এক কোণে নিরীহ গ্রাম্য-মুসলমানের ভঙ্গিতে মাথা গুঁজে পড়ে রইলেন।"

('বিপ্লবতীর্থে,' পৃঃ—১০০-১০১)

সুপতি-বিনয় চাসারা স্টেশনে নেমেছিলেন। তাঁদের নানাবিধ সাহায্যের জন্য দলের ছেলেরা নানা রোল্-এ নানা স্থানে কাজ করে যাচ্ছিলেন। ঢাকা থেকে পালাবার সময় নেপাল নাগ, বিনয় বসু (ছোট), বঙ্গেশ্বর রায়, বকুল দাশগুপ্ত যথানির্দিষ্ট কাজ করে যান। নারায়ণগঞ্জে বিনয় এলে দলের ছেলেরা সুপতি রায়ের আদেশ মত নিজেদের ডিউটি-পোস্টে অবস্থান করেন। রাত্রিটা দলেরই কর্মী গিরিজা ও অমিয় সেনদের বাড়িতে বিনয়কে রাখা হয়। পরদিন সুপতি তাঁকে নিয়ে কি অদ্ভুত কৌশলে বিভিন্ন পোশাকে, ভীষণ ঝড়-বাদলে, নৌকা করে ত্রিপুরা জেলায় 'বিষনন্দী' নামক স্থানে এলেন—এবং স্টিমারে উঠে কি করে ভৈরব পেঁৗছলেন তার বর্ণনা এখানে আর দিলাম না। ভৈরব থেকে তাঁদের কলকাতা সফর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বিপ্লবতীর্থে' থেকেই তা তুলে দিচ্ছি ঃ

ভৈরব পৌঁছেই সুপতি রায় বুঝলেন যে, পুলিশের দৃষ্টি সেখানে সচল। ইতিমধ্যে সুপতি তাঁর জমিদারবাবুর পোশাকটি বদলে আবার মুসলমান-চাষীর বেশ পরে নিয়েছেন।

ভৈরব স্টেশানে কলকাতার টিকেট পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে দু'খানা মৈমনসিংহের টিকিট কেটে দুই বন্ধু পায়ে হেঁটে আট মাইল এগিয়ে এসে নগণ্য একটা স্টেশানে গাড়ি ধরলেন। গাড়ি কিশোরগঞ্জ

দ্রষ্টব্য ঃ 'বিপ্লবতীর্থে' পুস্তকে সুপতি রায়ের ছদ্মনাম লিখিত আছে 'সুশান্ত'। এখানে আসল নামই দেওয়া হল।

আসতেই মহাবিপদ। পুলিশের বিরাট বাহিনী সবগুলি ট্রেন সাড়ম্বরে তালাশি করছে। বিনয়দের গাড়ি প্ল্যাট্‌ফর্মে পৌঁছতেই কামরায়-কামরায় পুলিশের দল ঢুকে যেতে লাগল। সুপতি প্রমাদ গনলেন। বিনয়কে বসিয়ে রেখে তিনি তড়াক্ করে প্ল্যাট্‌ফর্মে নেমেই একজন টিকিট কালেক্টরের কাছে গিয়ে মিনতির সুরে বললেন: "বাবু, ফুলিশ্ ! আফ্‌নের ফাও তুইডা দরি—বাচান বাবু, বাচান !"

টিকিট কালেক্টর কিশোরগঞ্জেরই লোক। সরল বিশ্বাসী মুসলমানটির আবেদনে একটু আশ্চর্য হয়ে সে বলল: "পুলিশ—তাতে তোর কি ?"

সুপতি: "হুজুর, আমাগো টিকস্ নাই। ফুলিশ্ তো বাইন্দা নিবো। বাবুকত্তা, আফ্‌নারে টেহাডা দেই, তুইডা টিকস্ কইরা দেন।"

টি-কা: "কি কাণ্ড ? পুলিশ বাঁধবে কেন তোদের ? গাধা কোথাকার ! যা—গাড়িতে যা। ও পুলিশ তোদের জন্য নয়।"

টিকিট কালেক্টরের পা দু'টো জড়িয়ে ধরে, চোখের জল সত্যি বের করে সুপতি বললেন: "না বাপজান, ফুলিশ্ গুতাইবো। আপনি ধর্মের বাপ, টিকস্ কইরা দেন। আল্লার কসম্।"

টিকিট কালেক্টরের দয়া হল। ভাবল, গ্রামের নিরীহ কৃষক তো —সত্যি ভয় পেয়েছে এত পুলিশ দেখে। বলল: "কোথায় যাবি ?"

"—বাবু, কলে কাম কইরতে যামু। যেইহানে খুব বড় কল আছে, হেইহানকার টিকস্ দেউখান।"

"—কোথাকার কল ? কি কল রে ?"

"—এই যে বাবু, বড় বড় কল ? যেইহান থনে হুড়ুৎ কইরা ধুতি-গামছা বাইর অয়্ !"

টিকিট কালেক্টরের হাসি পেল। বলল: "বুদ্ধির ঢেঁকি—কাপড়ের মিলে কাজ করবি বুঝি ?"

একগাল হেসে সুপতি বললেন: "আইগা কত্তা' ঠিকঐ

কইছেন। আফ্‌নারা ইংরাজিনবিস—আমরা মুখ্‌খু মানুষ—অত জানি নাকি ?"

"—তা কোথায় যাবি ?"

"—খু-উ-ব বড় কল যেইহানে।"

"—টাকা আছে কত ?"

"—অনেক আইগা।"

"—কত ?"

"—হাতাইশ টেহা কত্তা।"—বলেই ট্যাঁক থেকে সাতাশটি টাকা বের করে দিলেন সুপতি। টিকিট কালেক্টরের হাতে দিতে দিতে বললেন : "গইনা নেন, বাবু।"

টিকিট কালেক্টর 'অনেক টাকা'র দৌড় সাতাশ টাকায় দেখে আবার হাসল। এবং সত্যি দয়াপরবশ হয়ে টিকিট-রুম্ থেকে দু'খানা কলকাতার টিকিট কিনে আনল। ফেরত টাকা হাতে দিতে গেলে সুপতি বললেন : "বাবু, বাচাইলেন। খোদা আফ্‌নার বালা করবো। ঐ টেহা কয়ডা আফ্‌নে নেন।"

"—তোরা খাবি কি পথে ?"

তাড়াতাড়ি পোঁটলা দেখিয়ে একগাল হেসে সুপতি বলেন : "বাবু—পেওয়াইজ্, মুড়ি, কাচামরিচ আছে হিডার মদ্দে।"

টিকিট কালেক্টর নিজের জন্য সামান্য রেখে সুপতিকে কিছু টাকা ফেরত দিয়ে বলল : "যা, প্ল্যাট্‌ফর্মের ঘরে গিয়ে বসে থাক। গাড়ি এলে তুলে দেব।"

সুপতি তাড়াতাড়ি বিনয়কে টিকিট কালেক্টরের কাছে ডেকে এনে বলল : "কত্তা, আফ্‌নে আমাগো হেই গরে ডুকাইয়া দেন—ফুলিশ্ নাইলে মারবো।"

টিকিট কালেক্টর ওঁদের তৃতীয় শ্রেণীর ওয়েটিং-রুমে ঢোকানয় পুলিশের কোন সন্দেহ হল না। তারা গাড়িগুলো তখন পূর্ণোদ্যমে সার্চ করছে। ওয়েটিং-রুমে ঢুকেই বিনয় গামছামুড়ি দিয়ে শুয়ে

পড়লেন। বিকারহীন, নিশ্চিন্ত একটি মানুষ!···সুপতি বিড়ি ফুঁকছেন (কখনো বিড়ি-সিগ্রেট তিনি খান না)—আর মিট্‌মিট্‌ করে তাকিয়ে দেখছেন পুলিশের কাণ্ড।···এবার পুলিশ ঢুকল বিনয়রা ট্রেণের যে-কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, সেই কামরায়!···সুপতি মনে-প্রাণে জাতির ভগবানকে প্রণাম জানালেন।

কলকাতার গাড়ি এসে যেতেই টিকিট কালেক্টর সুপতিদের নিয়ে ইণ্টারক্লাসে উঠিয়ে দিল, এবং গার্ড্‌কে বলে দিল যে, ঐ লোক দু'টি তারই গ্রামবাসী নিরীহগোছের ভালমানুষ, ওদের যেন জগন্নাথ-গঞ্জে পৌঁছে দেওয়া হয় একটু দেখেশুনে।

সুপতি তো কিছুতেই কামরায় ঢুকবেন না! বলেন: "কত্তা, এইডা তো বাবুগো গাড়ি—এইডায় উঠলে মাইর খামু।"

গার্ড্‌ সাহেব বলল: "আরে ব্যাটা ওঠ্‌—কেউ মারবে না।"

"—আইগা সরম লাগে। ডর্‌ করে। ফার্‌তাম না।"

গার্ড কপট-ক্রোধে বললেন: "তবে সাহেবদের গাড়িতে তুলে দেব—ঐ সেকেণ্ড ক্লাসে!"

সুপতি কাতরভাবে বলল: "না না, বাবুসায়েব! মাইরা ফালাইব সায়েবরা।"

"—তবে ওঠ্‌ এই গাড়িতে। ভয় কি? আমি তো তোদের নিয়ে যাচ্ছি।"

সুপতির ইচ্ছা ছিল না ইণ্টারক্লাসে যাবার, কারণ, সেখানকার কম ভিড়ে ধরা পড়বার আশঙ্কা অধিক। কিন্তু এ-যাত্রা বাধ্য হয়েই তারা দু'জনে ইণ্টারে উঠে বসলেন। বিনয়কে বেঞ্চের উপর না-বসিয়ে মেজেতে বসান হল। বিনয় মাথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন। স্বাস্থ্য-পূর্ণ সুশ্রী তাঁর রূপ—গায়ের রঙ ফর্সা—তাকে গেঁয়ো-মুসলমানরূপে চালিয়ে নেওয়া মুস্কিল। মাথা-ধরার অজুহাতে গামছাকাপড় মুড়ি দিয়ে পড়ে-থাকবার ব্যবস্থা তাই তাঁর জন্যে প্রশস্ত।···সুপতি দাঁড়িয়ে রইলেন। গাড়ি মৈমনসিংহ স্টেশানে আসতেই গুটিকয় পুলিশ-

অফিসার এসে ঐ কামরায়ই ঢুকল। তারা জগন্নাথগঞ্জের কাছাকাছি যাবে। সুপতির টিকিট করা ছিল। মৈমনসিংহ স্টেশানে নামবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু পুলিশ-অফিসারগুলোকে দেখে তাঁর অস্বস্তি-বোধ হল। স্টেশান-ঘরের দেয়ালে যে বিনয় বসুর ছবি-সমেত পুরস্কার-বিজ্ঞপ্তি বড় বড় পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, সে বিনয় বসু যে তাঁরই পায়ের কাছে নির্ভাবনায় শুয়ে আছেন!···একটি অফিসার প্রশ্ন করে: "ওটা শুয়ে কেন রে?"

"—হুজুর কত্তা, মাথার বিষে পইড়া আছে।"

"—তুই দাঁড়িয়ে কেন?"

"—আইগা, বাবুগো জাগায় বমু কেম্‌নে?"

"—ও, আচ্ছা, থাক্ দাঁড়িয়ে।"

পুলিশ-অফিসারবৃন্দ আরাম করে বসে কথাবার্তা শুরু করল। প্রসঙ্গ—বিনয় বসু, লোম্যান্, হড্‌সন্, এনার্কিস্ট্ গান্ধী, সাহেবসুবা, সুভাষ, চাকুরি ইত্যাদি হরেকরকম বিষয়। কিন্তু সকল কথাই ঘুরে-ফিরে ২৯শে আগস্ট-এর সেই রক্তক্ষরিত-সংঘটনাকে কেন্দ্র করে গুঞ্জরিত হতে থাকে।···সুপতি-বিনয়ের মজা লাগে! কিন্তু সুপতির বুকও কাঁপে—কি জানি, কিসে কি হয়! তবে সুপতি রায়ের দেহ ও মনের প্রতি অণু অত্যন্ত এলার্ট্, অতি সজাগ।···

জগন্নাথগঞ্জ এসে সুপতি ও বিনয় সহজেই স্টিমারে উঠতে পারলেন। পুলিশের লোক থাকা সত্ত্বেও তাদের কেউ সন্দেহ করল না। স্টিমারে উঠেই বাট্‌লারের কাছে গিয়ে সুপতি বললেন: "ভাইছাব, আমরা মুছলমান, আম্‌রারে কিছু খাওয়নের বন্দোবস্ত কইরা দেউহাইন—যা লাগে দিতাম।"

বাট্‌লার যখন জানল যে, এরা তার জিলার লোক, তখন সে তাদের বলল খালাসীদের কাছে গিয়ে বসতে।

সুপতি: "ভাইছাব, আমরা মুখ্‌খু মানুষ—চিনা যাইতে ফার্‌তাম না। আফ্‌নে আম্‌রারে দিয়া আওহাইন।"

বাট্‌লার খালাসীদের কাছে তাদের দু'জনকে দিয়ে এলো। এবং এ-ও বলে এলো যে, ওরা তার দেশবাসী, যাবেও তারই সঙ্গে।

সুপতি ট্যাঁক থেকে বিড়ির বাণ্ডিল খুলে খালাসীদের মধ্যে বিতরণ করলেন এবং ক্রমে বোকার মত নানা প্রশ্ন করে বেশ জমিয়ে তুললেন।

বিনয় কিন্তু ততক্ষণে মাথাধরার অজুহাতে গামছামুড়ি দিয়ে খালাসীদের মধ্যে শুয়ে পড়েছেন। কিছু পরে সুপতি জাহাজ দেখবার ছল করে আড্ডা ছেড়ে উঠে এলেন। নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন পুলিশের ব্যস্ততা।

স্টিমার দুর্দান্ত গতিতে ছুটে চলছে সিরাজগঞ্জের দিকে। সুপতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন জলের বুকে তার চাকার দাপাদাপি। গতির মূলেও এই দাপাদাপি। কিন্তু দাসত্বসুখে-সুখী ভারতবাসীর মনের চাকায় এ-দাপাদাপি নেই। তাই গতিহীন জাতির জীবন।···

অনেকক্ষণ পর বিনয়ের কাছে ফিরে এসে সুপতি দেখলেন যে, বন্ধু নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাচ্ছেন। এ কি মানুষ, না আত্মভোলা তরুণ-ভোলানাথ!···বিনয়ের ঘুম না-ভাঙিয়ে সুপতি গেলেন বাট্‌লারের কাছে। বললেনঃ "ভাইছাব, খাওয়নের আর কত দেরি? একটু হক্কালে অইলে বালা অয়্। ফ্যাট্‌টা জইলা যাইবার লাগছে।"

বাট্‌লার বলল: "তুস্‌রা মিঞারে ডাইকা আন, দিমু অহনি খাইতে।"

সুপতি রায় বিনয়-সহ ফিরে আসতেই বাট্‌লার উভয়কে তার ঘরে নিয়ে খেতে দিল। পরম পরিতৃপ্তিতে দুই বন্ধু আজ তিনদিন পর এই প্রথম ভাত খেলেন।···

স্টিমার সিরাজগঞ্জ ঘাটে লাগতেই নোংরা-কাঁথায় জড়ানো দু'টি বিছানা কাঁধে করে দুই বন্ধু ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে গিয়ে ট্রেনে উঠে পড়লেন। পুলিশের যত তম্বী ভদ্রবেশী যুবকদের উপর চলছিল—সাধারণ গ্রাম্য-মুসলমানের বেশে ছেঁড়াকাঁথার বিছানা কাঁধে যে দুঃসাহসী বিনয়কৃষ্ণ বসু পালিয়ে যাচ্ছেন, তা তাদের কল্পনায়ও ছিল না।···বাকি পথে ঈশ্বরদি-স্টেশানে পুলিশের কিছু উপদ্রব

হলেও বিনয়-সুপতি একটানে চলে এলেন দমদম, ঐ সিরাজগঞ্জ-প্যাসেঞ্জারে। শিয়ালদহ না-নেমে দমদম থেকেই কলকাতা যাওয়া স্থির ছিল—কারণ, শিয়ালদহ স্টেশান তখন ভীষণ গরম হয়ে আছে পুলিশের তৎপরতায়। তাছাড়া দিনের আলোয় গাড়ি পৌঁছবে শিয়ালদহ—তখন বিনয়ের মত একটি সুপুরুষ (যাঁর আবক্ষ-মূর্তিসহ পোস্টার স্টেশানের গায়ে গায়ে ছড়ানো) যতই নোংরা পোশাক পরে চাষীর ছদ্মবেশ গ্রহণ করুন না কেন—কলকাতার সুদক্ষ 'আই-বি' পুলিশের কাছে তাঁর ধরা পড়বার আশঙ্কা কম নয়।...

('বিপ্লবতীর্থে', পৃঃ—১০৪-১০৯)

সুপতি রায়ের কাজ শেষ হয়নি। পার্টির কলকাতা-কেন্দ্র থেকেই তাঁর উপর ভার দেওয়া হয়েছিল ঢাকার নির্দিষ্ট য়্যাক্‌শান্‌টি পরিচালনা করার। 'বি. ভি.'-র য়্যাক্‌শান্‌-স্কোয়াড্‌ থেকেই এই কাজের জন্য স্থির করা হয়েছিল বিনয়কৃষ্ণকে। অধিকন্তু সুপতিকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল প্রয়োজনে বিনয়কে দল-নেতাদের কাছে সঙ্গোপনে পৌঁছে দেবার। এই সুকঠিন দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন সুপতি রায়। তাঁর উপর নেতাদের আস্থা ছিল অপরিসীম। 'মন্ত্রগুপ্তি' মানেই সুপতি রায়, 'সুপতি রায়' মানেই মন্ত্রগুপ্তি—এটা 'বি. ভি.'-র এক প্রবীণ নায়কের উক্তি।

সুপতি রায়ের কাজ তাই এ-ক্ষেত্রে সমাপ্ত হবে বিনয়কে কলকাতায় অবস্থিত দল-নেতাদের কাছে পৌঁছে দেবার পর।

সাত নং ওয়ালিউল্লা লেন। কলকাতা ওয়েলেস্‌লি-স্কোয়ারের উত্তরদিকের একটি গলির উপর ক্ষুদ্র ঐ দোতলাগৃহ। দোতলার চার-দিক উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। সম্মুখে প্রাচীর-অভ্যন্তরেই বিস্তৃত জায়গা। সেখানে কতকগুলো বড় বড় শেড্‌—রিক্সা ও ট্যাক্সির গ্যারেজ-রূপে

তাদের ব্যবহার হয়। রিক্সাদি সারাই করানর নানা ব্যবস্থাও আছে। রিক্সাওয়ালার সর্বদা সরগরম করে রাখে সেই বাড়ি। আশেপাশে চতুর্দিকে বস্তিবাসী-মুসলমানদের আড্ডা, নিম্নশ্রেণীর গুণ্ডা-বদমায়েশদেরও আস্তানা। গৃহের সদর-গেট্ দিয়ে ঢুকে, গ্যারেজ্ গুলো পেরিয়ে, এক কোণে গাছগাছড়া ও লতায় ঢাকা ছোট্ট দোতলাটায় থাকেন রিক্সা-ব্যবসায়ের মালিক শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার। সুরেশবাবু 'বি. ভি.'-দলের প্রবীণ বন্ধু, সহায়ক ও গোপন কর্মের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক। তাঁর পরামর্শ সেই কালে হরিদাস দত্ত, রসময় শূর প্রমুখ বিপ্লবী-নেতাদের কাছে অপরিহার্য ছিল। সুতরাং এই সাত নং ওয়ালিউল্লা লেন ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত 'বি. ভি.'-র গোপন কর্ম-পরিচালনার পীঠস্থান তথা হেড্ কোয়ার্টার ছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য 'বি. ভি.'-র ব্যক্ত-কর্মচালনার হেড্ কোয়ার্টার ছিল 'বেণু'-আপিস। সেখানে সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ থেকে পার্টির যেকোন জেলার যেকোন কর্মীরই আনাগোনা ছিল। কিন্তু এখানে অর্থাৎ সাত নং বাড়িতে আসতেন সিক্রেট্-উইঙ্গ্ থেকে দু'চার জন মাত্র।···

সাত নং বাড়ির দোতলায় থাকেন সুরেশবাবু একা। তাঁর পরিবার থাকেন ঢাকা শহরে। গৃহের নীচের তলাটি বাসের অযোগ্য—তবে রিক্সাওয়ালাদের সর্দার ঐ স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘরখানিকেই বাসের উপযুক্ত মনে করতেন। ঐ সর্দারের নাম ছিল দোস্ত্ মহম্মদ। দোস্ত্ মহম্মদ ক্রমে 'দলের লোক' হয়ে গেলেন। তাঁর কীর্তি-কাহিনী অনুধাবনযোগ্য। 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থের প্রথম পর্বে তাঁর পরিচয় লিখিত আছে।

এবার সুপতি রায়ের কর্তব্য-সমাপ্তির কথা 'বিপ্লবতীর্থে'র পাতা থেকেই উদ্ধৃত করা হল:

"তখন বেলা দশটা। তারিখ ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ সাল। বিনয়কে নিয়ে সুপতি এসে ওয়ালিউল্লার সাত নং বাড়ির দোতলায় উপস্থিত। হরিদাস দত্ত ও রসময় শূর অনেকক্ষণ ধরে সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁদের পাশে ছিলেন সুরেশ মজুমদার। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতেই হরিদাস দত্ত ও রসময় শূর বাইরে এসে বিনয়কে জড়িয়ে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। তিনজন নেতাকে প্রণাম করলেন বিনয়। প্রণাম করলেন তাঁদেরকে সুপতিও। তাঁরা বললেনঃ 'বিনয় ভাই, তুমি ইতিহাস সৃষ্টি করেছ। আজ বাঙলা কেন, ভারতবর্ষের মেয়েপুরুষ দুঃসময়ের বন্ধু রূপে তোমার নাম জপ করছে'। তারপর সুপতিকে জড়িয়ে ধরে তাঁরা বললেন— 'বি. ভি.'-র কর্মপ্রতীক হয়ে তুমি যা করলে তার তুলনা নেই। তুমিও ইতিহাসে দীর্ঘজীবী হবে।" ('বিপ্লবতীর্থে', পৃঃ—১১২-১৩)

দিনেদুপুরে জনাকীর্ণ স্থানে একা এই একান্ত কঠিন কাজ সম্পন্ন করে, পুলিশের অসীম খবরদারি থাকা সত্ত্বেও সবার চোখে ধুলো দিয়ে, বিনয়কৃষ্ণ বসুর পলায়ন এবং নিরাপদে বিপ্লবীদের শেল্টারে আগমন একটি রহস্যজনক রোমাঞ্চকর ব্যাপার বলেই সবার কাছে মনে হবে।

লোম্যান্-হড্‌সন্ আক্রমণ একটি দুঃসাহসী ব্যাপার। বিনয় বসু ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলেরই ছাত্র। শুধু ছাত্র নন, 'সিনিয়ার্-মোস্ট্' ছাত্র। স্কুলে ও হাসপাতালে সবাই তাঁকে চেনে। দিনের আলোয় জনাকীর্ণ হাসপাতালে একা এই য়্যাক্‌শানে যাওয়া—কঠিন নার্ভ্-এর প্রয়োজন। কঠিন নার্ভ্ শুধু নয়, স্থিতধী না হলে নিশানা অমন অব্যর্থ হয় না। অতি সহজে, বেশ খানিকটা দূর থেকেই একজনকে নিহত করা এবং অপরকে মারাত্মকরূপে ঘায়েল করা মুখের কথা নয়। অথচ যাঁরা হত বা আহত হলেন তাঁরা উভয়েই সশস্ত্র। তাঁদের চতুষ্পার্শ্বে সশস্ত্র বডি-গার্ড। কার্য শেষ করে বিনয় বসু ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে পালিয়ে এলেন। বাধা দিলেন সত্যেন সেন (সরকারী কন্ট্রাক্টর)।

হেলায় ঐ বিপুলদেহী ব্যক্তিকে কুস্তির প্যাঁচে দূরে ছুঁড়ে ফেলে পালিয়ে এলেন অচঞ্চল ঐ তরুণ। তিনি বিশ্বকে চঞ্চল করে দিলেন নিজে স্থির থেকে। এ-সবই বিনয় বসুর অসীম কৃতিত্ব। রহস্যময় লোমহর্ষণকর তাঁর কার্যকলাপ। কিন্তু গাছ থেকে ফুলটিকে আলাদা করে ফুলের সবটুকু রূপ ও সৌগন্ধ উপলব্ধি করা যায় না। গাছের পরিচয়ও নিতে হয়। বিনয় বসু যে-সংস্থার অবদান সে-সংস্থার সংগঠন ক্ষমতা, কর্ম-পরিচালনার দক্ষতা এবং কর্মী গড়ার নৈপুণ্য অনুধাবন না করলে বিনয় বসুকেও বোঝা যাবে না। বিনয় বসু হঠাৎ আকাশ থেকে দেবদূতের মত ধরায় নেমে আসেননি। তাই আমরা এখানে বিনয়ের কলকাতা অবধি পলায়নকে যথার্থই যিনি সম্ভব করেছিলেন, সেই সুপতি রায়ের কর্মকাহিনী ব্যক্ত করলাম। এই সুপতি-বিনয়-বাদল-দীনেশ এবং আরো বহু তরুণ-কিশোর যাঁরা মানুষের কাছে বিস্ময়, তাঁরা যে-গুপ্তসমিতির মাধ্যমে রহস্যজাল বিস্তার করে গেছেন—সেই গুপ্তসমিতি তথা 'বি. ভি.'-র Organisational talent ও technic-এর কিছুটা আভাস এই পলায়ন-পর্বে ধরা পড়েছে। তাই সুপতি রায়ের কাহিনী 'বিপ্লবতীর্থে' গ্রন্থ থেকে বিশদভাবে উদ্ধৃত হল।...তাছাড়া কলকাতার শহরে পুরো তিনমাস সবার অজ্ঞাতে শ্রীরাজেন্দ্র গুহ মহাশয়ের শেল্টারে কাটিয়ে সেখান থেকেই রাইটার্স-প্রাসাদ-আক্রমণে যাত্রা সামান্য সাংগঠনিক শক্তির পরিচয় নয়। এই শেল্টার-এ একমাত্র রসময় শূর ব্যতীত আর কেউ যেতেন না। দলের প্রবীণ সভ্য রাজেনবাবু তাই পুলিশ তো দূরের কথা, দলের অধিকাংশের কাছেই অজানা ছিলেন। বিনয় বসুকে তিন মাস ধরে সযত্নে কাছে রেখে রাজেনবাবু ও তাঁর স্ত্রী সরযূ দেবীও মনে-প্রাণে নিয়ত মৃত্যুহীনদের পথের যাত্রী হয়ে উঠেছিলেন।*

* **'পরিশিষ্ট'** অধ্যায়ে "মহাজাতি সদন কর্তৃক গৃহীত টেপ্-রেকর্ডের অনুলিপি—শ্রীরাজেন্দ্রকুমার গুহের সঙ্গে আলোচনা" দ্রষ্টব্য।

যখন রাইটার্স-প্রাসাদ আক্রান্ত হল

॥ প্রত্যক্ষদর্শন ॥

['Main Stream' (Vol. Viii No. 4, September 27, 1969) পত্রিকায় শ্রী কে. পি. বিশ্বাস লিখিত ইংরাজি প্রবন্ধ ('When Writers Buildings Raided') থেকে বহুলাংশ বাঙলায় অনুবাদ করে নিম্নে দেওয়া হল। কারণ, উহা এক সাংবাদিকের চল্লিশ বছর পূর্বেকার প্রত্যক্ষদর্শনের আক্ষরিক অনুলিপি।]

১৯৬৯ সাল। সেদিন প্রেস-ক্লাবে বসে সবাই মিলে পুলিশ কর্তৃক হালে বিধানসভা-ভবন চড়াও করার ঘটনা নিয়ে রসালাপ করছিলাম। সহসা আমি কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। আমার মনে এলো বাঙলাদেশের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এক অতীত দিনের কথা। প্রায় চল্লিশ বছর আগে তিনটি দৃঢ়চিত্ত দেশপ্রেমী বিপ্লবী এলেন ঢাকা থেকে, আক্রমণ করলেন ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-পরিচালনার দুর্গ ঐ রাইটার্স-বিল্ডিংস্। সে নাটকে লঘু-রসের কোন স্থান ছিল না। তার আদ্যোপান্ত ভয়ঙ্কর, ঘটনাবহুল ও বিয়োগান্ত। সেখানে আমার অনুপ্রবেশই শুধু হাস্যরসাত্মক।

সেদিনের নাট্যমঞ্চে নায়ক ছিলেন বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত। বিনয় বসু মেডিক্যালের ছাত্র, তাঁর মাথার উপর পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কারের খড়্গ ঝুলছে। সে গল্প এখানে করব না। তবে এটুকু স্মরণ করতে হবে যে, সেই যুগে বাঙলার বিপ্লবীরা দেশের নানা অংশে 'ঈস্টার বিদ্রোহে'র অনুরূপ, নূতন করে অধিকতর দুর্ধর্ষতায় কর্মকাণ্ড রচনার কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল ঐ 'ঈস্টার' দিবসেই চট্টগ্রামের বিদ্রোহীরা প্রথম আঘাত হানলেন। এই অভাবিত কঠোর আঘাত সমগ্র জাতির স্নায়ুকেন্দ্রকে চঞ্চল করল। তারপর শুরু হল আঘাতের পর আঘাত—বৈপ্লবিক ঘটনার পর ঘটনা।

সাম্রাজ্যরক্ষক-রাজপুরুষদের ভাষায় সেকালের 'ঢাকা' ছিল—"বিষম সন্ত্রাসবাদীদের উর্বর প্রসার-ক্ষেত্র।" সেই ভয়ঙ্কর ক্ষেত্র পরিদর্শনকল্পে গেলেন পুলিশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল মিঃ লোম্যান্। রাজনীতিক কর্মী বা বন্দীদের উপর নির্মম ব্যবহারে যাঁর একমাত্র জুড়ি ছিলেন সম্ভবত কলকাতার পুলিশ-কমিশনার স্যার চার্লস্ টেগার্ট। লোম্যান্ সাহেব ঢাকা-জেলার পুলিশ-সুপার মিঃ হড্সন্ সহ শহরের হাসপাতালে গিয়েছিলেন। গোপন উদ্দেশ্য ছিল গভর্ণরের আসন্ন হাসপাতাল-পরিদর্শন উপলক্ষে নিরাপত্তার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করা। কিন্তু তাঁরা দু'জনেই সেই সময় বিনয় বসুর বুলেটে বিদ্ধ হয়ে ধরাশায়ী হলেন। তারিখটি হল ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট। বিনয় পালিয়ে গেলেন। যদিও তাঁর পরিচয় প্রকাশিত হতে বিলম্ব হল না।

আহতদের উভয়কেই তোলা হল ঐ হাসপাতালেরই বেড্-এ। লোম্যান্ বাঁচলেন না—যদিও কলকাতা থেকে এক ইউরোপীয় সার্জন ছুটে গিয়ে তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করেছিলেন। কিন্তু হড্সন্ সেরে উঠলেন। তাঁকে বাঁচালেন একজন ভারতীয় সার্জন।

পুলিশের নিষ্ঠুর জুলুম শুরু হল তরুণ, কিশোর ও ছাত্রদের উপর। তাতে বিপ্লববাদের ক্ষতি হল না। বম্ব্-পিস্তলের নীতি দেশের তরুণ-সম্প্রদায়কে অধিকতর উদ্বুদ্ধ করে চলল।

রাইটার্স-বিল্ডিংস্ ছিল দ্বৈত-শাসনপুষ্ট ব্রিটিশ-সরকারের প্রধানতম দপ্তর। সে-শাসনব্যবস্থা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এককালে বিকল করে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্য পুনরুজ্জীবিত হয় সেই ব্যবস্থা। সেই যুগে রাইটার্স-প্রাসাদ সাংবাদিকদের দৃষ্টি বড় একটা আকর্ষণ করত না। তাঁরা তাকিয়ে থাকতেন লালবাজার পুলিশ-দপ্তরের দিকে। কারণ, সেখানেই যত রোমাঞ্চকর খবর সৃষ্টি হত। রাজনীতিকদের গ্রেপ্তার থেকে শুরু করে বোমা-পিস্তল-ডিনামাইট্ আবিষ্কারের সংবাদদাতা ছিল ঐ 'লালবাজার'। রাইটার্স-প্রাসাদে শুভাগমন হত কতিপয় খেতাবধারী ভদ্রমহোদয় বা চাকুরিপ্রার্থীদের।

তা'ছাড়া সামান্য ক'জন সাংবাদিককেও হয়ত দেখা যেত দীর্ঘ বারান্দাগুলো দিয়ে প্রাসাদের উপরে-নীচে ওঠা-নামা করতে। তখন কিন্তু ঐ দুর্গে কারো আক্রমণের আশংকায় কোন কলাপ্‌সিবল্‌-গেটের প্রতিরোধ রচিত হয়নি।

দোতলায় সারিবদ্ধ প্রকোষ্ঠ। সে-সব প্রকোষ্ঠে বসতেন নানা দপ্তরের উচ্চতম রাজপুরুষগণ। ব্যতিক্রম ছিল দেশীয় এক্সিকিউটিভ-কাউন্সিলার বা মন্ত্রীদের বেলায়। তাই স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র বা আব্দেল করিম গজনভির মত সরকারের মান্য ব্রিটিশ এক্সিকিউটিভ্‌-কাউন্সিলারদের পাশাপাশি কামরায়ই মন্ত্রিগণ ঐ স্থান পেয়েছিলেন। জাঁকাল তক্‌মা শোভিত আর্দালিরা অফিসারদের প্রকোষ্ঠদ্বারে মোতায়েন থাকত। তাদের বৈশিষ্ট্য ছিল দৈহিক স্বাস্থ্য ও প্রহরীজনোচিত ভারিক্কী চাল! প্রভুর আদেশ কানে আসতেই এক-পায়ে দাঁড়িয়ে-থাকা ঐ আর্দালিকে ছুটে যেতে হবে হুকুম তামিল করতে। যত উঁচু দরের প্রভু, তত চিত্তাকর্ষক হত তাঁর আর্দালির পোশাক।

৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩০ সাল। নিত্যদিনের নিয়মে সেদিনও আমি সকালের দিকে গিয়েছি রাইটার্স্‌ বিল্ডিংস্‌-এ। দোতলায় উঠবার পথে আমি অস্বাভাবিক কিছুই দেখতে পাইনি। পশ্চিম প্রান্তের সিঁড়ির দরজা অতিক্রম করে বারান্দায় ঢুকতেই আমার একটু ব্যতিক্রম বোধ হল। দেখলাম, সুদীর্ঘ পূর্ব-পশ্চিম অলিন্দপথ একেবারে জনশূন্য, এমনকি আর্দালিগুলোও নেই। কিন্তু দূরতম প্রান্তে ইউরোপীয়-পোশাক-পরিহিত তিনটি তরুণকে দেখলাম পূর্ব-দিকে এগিয়ে যেতে—কণ্ঠে তাঁদের 'বন্দেমাতরম্‌' ধ্বনি। তখন আমার এইটুকু বোধগম্য হল যে, তাঁরা দোতলার কোণের ঘরটায় ঢুকলেন। সেটা ছিল ডিরেক্টর অব্‌ পাবলিক্‌-ইন্সট্রাক্‌শান্‌ মিঃ

স্টেপেলটনের ঘর। বাঙলার শিক্ষা-বিভাগীয় কর্তারূপে তিনি তৎকালে সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিলেন না।

রাইটার্স্‌ বিল্ডিংস্‌-এ উচ্ছ্বসিত 'বন্দেমাতরম্‌'-ধ্বনি শুনে বিস্ময়-বিহ্বল আমি কোন কিছু হদিস করার পূর্বেই, আমার অতর্কিতে দু'জন য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান্‌ সার্জেণ্ট আমাকে শক্ত করে ধরে টেনে নিয়ে গেল নীচের তলায়। তারা ভ্রুক্ষেপও করল না আমার প্রতিবাদে। দু'জন দেশী-পুলিশের হাতে আমাকে তুলে দিয়ে তারা হুকুম করল লালবাজার নিয়ে যেতে। এলাম লালবাজার হাজতে। সেখানে অনুমতি পেলাম আমার আপিসে ফোন্‌ করার। আমি 'এ্যাসো-সিয়েটেড্‌ প্রেসে'র রিপোর্টার। আমাদের সাহেব-ম্যানেজার ছিলেন টেগার্ট্‌ সাহেবেরই ব্যক্তিগত বন্ধু। কাজেই অতি সহজে আমি মুক্তি পেলাম।

পরে রাইটার্স্‌ বিল্ডিংস্‌-এ ফিরে এসে সংগ্রহ করলাম দুর্ধর্ষ সে-অভিযানের কাহিনী। তখন সমগ্র প্রাসাদ জুড়ে বিরাজ করছিল এক আতঙ্কবিধুর ছম্‌ছমে আবহ। আমাকে যে-স্থানে সার্জেণ্ট দু'টো পাকড়াও করেছিল, তার কয়েক পা দূরেই বিনয় বসু ও তাঁর সতীর্থদ্বয় কর্ণেল সিম্পসনের (ইন্সপেক্টর-জেনারেল অব্‌ প্রিজন্‌) ঘরে ঢুকে তাঁকে গুলি করে নিহত করেন। একটি কথা এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, বিশেষ করে সে-সব সময় বাঙলার বিভিন্ন কারাগারে রাজনৈতিক-বন্দীদের উপর অমানুষিক মারপিট ও অত্যাচার চালু ছিল। বীরত্রয় সিম্পসন্‌কে হত্যা করেই থামলেন না। অলিন্দের পূর্বদিকে এগিয়ে চললেন রিভল্‌বার থেকে অনবরত গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে। এর উদ্দেশ্য সম্ভবত সপ্রভু আর্দালি-গোষ্ঠীকে ভয়ত্রস্ত করা। তরুণ এই যোদ্ধৃত্রয়কে কেহ প্রতিরোধ করল না। তাঁরা নিঃশঙ্কচিত্তে সারা বারান্দা চষে বেড়ালেন—কণ্ঠ থেকে সমানে উচ্চারিত হতে থাকল 'বন্দেমাতরম্‌'। পৌঁছে গেলেন তাঁরা বারান্দার শেষপ্রান্তে।

আজকের মতই সেকালেও রাইটার্স-প্রাসাদের 'সেণ্ট্রাল্ উইঙ্' রিজার্ভ করা ছিল চীফ্-সেক্রেটারি, এক্সিকিউটিভ্-কাউন্সিলার বা মন্ত্রীপ্রমুখ শাসন-যন্ত্রের প্রধানতমদের জন্য।...এ-সব রাজপুরুষদের কেহ কেহ হয়ত বিপদ সম্পর্কে সময় থাকতেই অবহিত হয়েছিলেন নিজস্ব আর্দালির মাধ্যমে। তাই যথাসম্ভব সতর্কতায় তাঁরা লুকাবার চেষ্টা করলেন। যাঁরা সতর্কিত হননি, তাঁরা ঔৎসুক্যে দরজা ফাঁক করতেই 'সেণ্ট্রাল পোর্টিকো'তে দেখলেন ত্রয়ীকে। তৎক্ষণাৎ তাঁদের উদ্দেশে ছুটে এলো দুরন্ত বুলেট্। আহত হলেন ফিনান্স্ সেক্রেটারি মিঃ আলেকজাণ্ডার মার্ এবং জুডিশিয়াল্ সেক্রেটারি মিঃ নেল্সন্। আব্দুল করিম গজনভির প্রতিক্রিয়া কিন্তু অন্যরূপ হল। বড়ই করুণ-ভাবে তিনি কামরার অভ্যন্তরে অবস্থান করেই ঘন ঘন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করে চললেন! আর কেহ-বা টেবিলের নীচে অতিকষ্টে নশ্বর দেহটি ঢুকিয়ে পালিয়ে রইলেন। বিপ্লবীদেরকে বড় ভয়—কারণ, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে তাঁদের অনেকেই অন্যায় বড় কম করেন নি।...

আমার ধারণা, বিনয় ও তাঁর সতীর্থদ্বয় পরের টার্গেট্ স্থির করতে একটু দ্বিধায় পড়েছিলেন। কারণ, তাঁরা পাসপোর্ট্-আপিসঘরের মত একটা নগণ্য স্থানে ঢুকলেন কেন?* পাসপোর্ট্-আপিসঘর ছিল 'সেণ্ট্রাল্ পোর্টিকো'র পূর্বপ্রান্তে, চীফ্-সেক্রেটারির কামরা পেরিয়ে। হয়ত চীফ্-সেক্রেটারিই ছিলেন তাঁদের পরবর্তী লক্ষ্য। তাই সম্ভবত নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেই তাঁরা সে-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন কারো কিছু ক্ষতি না করে। তারপর ঢুকলেন তাঁরা 'ডি. পি. আই.'-এর কামরায়। মৃত্যুকে বরণ করার জন্য গ্রহণ করলেন বিষ, আপন অস্ত্র দিয়ে নিজের মাথা তাক্ করে ছুঁড়লেন গুলি। বাদল গুপ্ত তৎক্ষণাৎ ঢলে পড়লেন মহামৃত্যুর কোলে (কারণ, তিনি নিজেকে

---

* এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গুলি ফুরিয়ে যাওয়াতে রিভল্বারগুলো পুনরায় গুলিভর্তি করার জন্যে বিপ্লবীত্রয় পাসপোর্ট্-আপিসঘরে প্রবেশ করেছিলেন।

(গ্রন্থকার)

গুলি করেননি)। বিনয় বসু ও দীনেশ গুপ্ত মরেও মরলেন না। হাসপাতালে নীত হলেন। কিন্তু (পাঁচদিন পর) বিনয়ের মহাপ্রয়াণ ঘটল। বাঁচলেন শুধু দীনেশ।...

এ দুঃসহ অভিযান কিন্তু খুলে দিল রাইটার্স্-প্রাসাদে-প্রদর্শিত তথাকথিত প্রচণ্ড ক্ষমতার মুখোশটি। দোতলায় অবশ্য উচ্চতম সিভিলিয়ান্-রাজপুরুষদের মৌরসী-স্বত্ব। কিন্তু তেতলায় ঠিক কারাগার-অধিকর্তার প্রকোষ্ঠের উপরেই ছিল পুলিশ-অধিকর্তা তথা ইন্সপেক্টর-জেনারেল অব্ পুলিশের খাস কামরা ও অন্যান্য পুলিশ-অফিসারদের দপ্তর। এ-সব আপিসের আর্দালিরা শুধু সশস্ত্রই থাকত না, তারা উত্তম 'লক্ষ্যবেধী' না হলে উক্ত কাজে বহালও হতে পারত না।

তাছাড়া, এ-সব অফিসারবৃন্দের অধিকাংশই আপিসে বসে দৈনিক কাজকর্ম করার কালে টেবিলের উপরই খোলা রিভল্বারটি রেখে দিতেন—কারণ, তাঁদের মুরুব্বি পুলিশ-কমিশনার টেগার্ট্ সাহেবের যে ছিল এ অভ্যাস!

কিন্তু অকস্মাৎ বিপদ যখন সত্যি এলো, ঘন-ঘন বুলেট্ ছোঁড়ার শব্দে ও বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে সেক্রেটারিয়েটের আকাশ-বাতাস যখন কেঁপে উঠল, আর্দালি-পিয়নের দল যখন ত্রাসে এদিক-সেদিক পালাবার পথ পাচ্ছিল না তখন ও-সব লক্ষ্যবেধীর দল অথবা উন্মুক্ত রিভল্বারধারী কোন একটি অফিসারও দোতলায় নেমে আসার সাহস পেলেন না। তেতলা থেকে দোতলায় নেমে আসার অন্তত অর্ধ ডজন সংযোজক বারান্দা-পথ ছিল।...

কিছুদিন কেটে গেল। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়ে যেতেই আবার শুরু হল বিপ্লবীদের দুরন্ত কর্মকাণ্ড। কলকাতার ইউরোপীয়-সমাজের প্রতিক্রিয়া এ-সূত্রে লক্ষ্য করার বস্তু। 'রাইটার্স্-বিল্ডিংস্ অভিযান' এবং দীনেশ গুপ্তকে ফাঁসির দণ্ডদানের জন্য 'গার্লিক্ সাহেব

(ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট) হত্যা' ইউরোপীয়ান্‌দের ভয়-বিহ্বল করে দিয়েছিল। তারা সভা-সমিতি ডেকে প্রতিশোধ নেবার দাবী তুলল, প্রচার করা শুরু করল জাতি-বর্ণ-ধর্মগত নানা বিভেদের বার্তা, ছড়াতে লাগল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার জঘন্য বিষ। অথচ বিপ্লবীদের কর্মে বা চিন্তায় কোথাও না ছিল বিন্দুতম সাম্প্রদায়িকতাবোধ, না ছিল কিছুমাত্র জাতিবর্ণ-ভেদের স্পর্শ।···

রাইটার্স্‌-প্রাসাদ-অভিযানের পর থেকেই সেক্রেটারিয়েটে ঢুকবার জন্য অনুমতিপত্রের আমদানি হয়েছে। জনসাধারণ বা প্রেসের লোকদের ঐ প্রাসাদে ঢুকতে হলে অফিসারদের অনুমতি গ্রহণ অথবা 'আইডেন্টিটি-কার্ড' প্রদর্শন একান্ত আবশ্যক। শেষোক্ত প্রথা সর্ব-ভারতীয় এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ম্যানেজার সাহেবের নিয়ত চেষ্টায় চালু হয়েছিল। উল্লিখিত প্রাচীনতম কার্ড-হোল্ডারদের মধ্যে আমি অন্যতম। আমি আজও সাংবাদিকরূপে ঐ কার্ড ব্যবহার করে থাকি।

দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়ে গেল কারাগৃহের অভ্যন্তরে, একান্ত সংগোপনে। কিন্তু সে গোপনতা বজায় থাকেনি। ইতিপূর্বে কোন ছিদ্রপথে সে খবর বেরিয়ে এসেছিল। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের কাগজে (Advance) পরদিন প্রভাতে বড় বড় অক্ষরে শিরোনামাযোগে ছাপা হল: "Dauntless Dinesh Dies at Dawn!"*···

---

*এই অবিস্মরণীয় উক্তি বিপ্লব-জগতে এক ইতিহাস রচনা করে গেছে। এর রচয়িতা শ্রীইন্দু মিত্র। প্রবন্ধ-লেখক শ্রীবিশ্বাসের প্রতিভাধর বন্ধু। ইন্দুবাবু তৎকালে 'Advance' দৈনিকের প্রধান সাব্‌-এডিটর ছিলেন।

('Main Stream', 27. 9. '69, P.—15)

বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ

॥ ডালহৌসি স্কোয়ারের নব-নামকরণ ॥

১৯৬৯ সালের ৮ই ডিসেম্বর। এই দিনে বাঙলার যুক্তফ্রণ্ট-সরকার বিনয়-বাদল-দীনেশের নামে সাড়ম্বরে ও সশ্রদ্ধায় ডালহৌসি স্কোয়ারের নব-নামকরণ করলেন। বহুদিন-অপেক্ষিত এই কার্য সুষ্ঠু-ভাবে সম্পাদিত করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন ভূতপূর্ব পূর্তমন্ত্রী সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঙলার জনসাধারণ, রাজনৈতিক-দল ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দাবী তৎকালীন যুক্তফ্রণ্ট-সরকার বিনম্রচিত্তে গ্রহণ করেছেন। প্রধান বিপ্লবী-নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষের পৌরোহিত্যে সহস্র-সহস্র নরনারীর সম্মুখে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় 'বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ'-অঙ্কিত শিলান্যাস করেন। বিভিন্ন রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক-সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান, বহু দেশকর্মী, দেশনেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সরকার ও সর্বদলের পক্ষ থেকে বহু মন্ত্রী শহিদত্রয়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন।

সভা সুন্দরভাবে সমাপিত হবার পর 'নাট্যভারতী' কর্তৃক পরিবেশিত 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' যাত্রাগান অধিক রাত্রি পর্যন্ত চৌদ্দ-পনের হাজার শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। গোটা ডালহৌসি স্কোয়ার অঞ্চল সেই রাতে নব কলেবরে ও নবতর সত্তায় যেন ১৯৩০ সালের সেই শৌর্যময় প্রহরে চলে গিয়েছিল। এখনকার মানুষ 'তখনকার মানুষ' হয়ে যেন তাঁদের রক্তের দুলালদের জয়যাত্রা বিহ্বল নেত্রে দর্শন করছিলেন। সে কী impact! সে কী উৎসাহ! তখন বোঝা গেল যে, শোনাবার মত মন ও ভাষা থাকলে এ-যুগের তরুণ-তরুণীও সাগ্রহে এবং সশ্রদ্ধায় অতীত ঐতিহ্যের কথা কান পেতে শোনে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেদিনকার সমাবেশে একটি পুস্তিকা বিতরণ করেন। 'মহাকরণে অলিন্দ-যুদ্ধ' তার শিরোনামা। সে-পুস্তিকা থেকে আমরা কিছুটা উদ্ধৃতি দিলাম ঃ

"১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর বাঙলার সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী-আন্দোলনে একটি স্মরণীয় দিন। এইদিন বাঙলার বিপ্লবী-আন্দোলনের তিন তরুণ সেনানী একযোগে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের মূল কর্মকেন্দ্র কলিকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস্ বা মহাকরণ আক্রমণ করেন। সেই আক্রমণে তৎকালীন দুর্ধর্ষ কারা-মহাধ্যক্ষ মিঃ সিম্পসনকে নিহত করে এবং একাধিক উচ্চপদস্থ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীকে আহত করে তাঁরা নিজেদের অমর কীর্তি রেখে গেছেন জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে। নিজেদের প্রাণের মায়া ত্যাগ করে এই তিন তরুণ সেদিন যে দুর্ধর্ষ ও অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছিলেন সুরক্ষিত মহাকরণের বুকে, তার ফলে নির্যাতিত লাঞ্ছিত সমগ্র জাতি ফিরে পেয়েছিল তার আত্মবিশ্বাস। এই দুঃসাহসিক তিন তরুণের প্রত্যেকেই মাতৃভূমির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারকল্পে চরম আত্মত্যাগ করে শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু মুক্তিকামী মানুষের মনে আজও তাঁদের পবিত্র স্মৃতি রয়েছে অম্লান এবং সেদিন ম্রিয়মাণ পরাধীন জাতির চিত্তে যে সুগভীর দেশপ্রেম ও আত্মবিসর্জনের প্রেরণা তাঁরা জাগিয়েছিলেন তারই সামান্য স্মারকরূপে আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে মহাকরণের সম্মুখস্থ ড্যালহৌসি স্কোয়ারের নাম বদলিয়ে নতুন নামকরণ করা হচ্ছে **'বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ'**।

"দেশের মুক্তি-সংগ্রামে বাঙলার বিপ্লবী-ভূমিকা সর্বজনবিদিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ইংরেজ শাসকদের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র গুপ্ত বৈপ্লবিক-আন্দোলনের সূত্রপাত, তার বিভিন্ন পর্যায়ে বাঙালী বিপ্লববাদীদের দান অবিস্মরণীয়। এই আন্দোলনের প্রথমার্ধ ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, সত্যেন, যতীন্দ্রনাথ, রাসবিহারী,

গোপীনাথ, অনন্তহরি, প্রমোদ চৌধুরী প্রমুখ শহীদের আত্মদানে সমুজ্জ্বল।

"বিপ্লবকালের শেষার্ধে ১৯৩০ সাল থেকে স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পূর্ববর্তী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ ফৌজের গৌরবময় যুগ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। দেশমাতৃকার মুক্তিকামনায় বহু শহীদের রক্তদানে বিপ্লবকালের এই শেষার্ধও গৌরবোজ্জ্বল। শহীদ বিনয়-বাদল-দীনেশ বিপ্লব-যুগের এই শেষার্ধের তিনজন আত্মত্যাগী সৈনিক।" ('মহাকরণে অলিন্দ-যুদ্ধ', পঃ বঃ সরকার, পবসমু—৬৯।৭০—৫৬১৭ এফ-২ হাঃ)

এ-ছাড়া আমরা এখানে আরো একটি উদ্ধৃতি দেব অপর একটি পুস্তিকা থেকে। সে-পুস্তিকাও সেদিন ঐ সমাবেশে প্রচারিত হতে দেখা যায়। পুস্তিকার প্রকাশক 'সতীর্থ-সংহতি'। উহার নাম 'বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ উদ্বোধন'। উহাতে পাই তাৎপর্যপূর্ণ কিছু উক্তি। এই বিপ্লবীত্রয় কেন, কি উদ্দেশ্যে উক্ত মৃত্যু-অভিযানে অগ্রসর হয়েছিলেন—কি তাঁদের জীবনদর্শন বা আদর্শ—তা পরিষ্কার করে লিখিত রয়েছে পুস্তিকার সূচনায়ঃ

"প্রশ্ন হতে পারে যে, বিপ্লবীরা এই সাহেবগুলোকে তাক্ করলেন কেন? ব্যক্তিগতভাবে এঁরা সবাই কি অত্যাচারী শাসক ছিলেন? উত্তর সহজ। ব্যক্তিবিশেষের ভালমন্দ নিয়ে বিপ্লবীদের কোন মাথাব্যথা নেই। তাঁদের যুদ্ধ কোন ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে ছিল না, ছিল ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে। সেই শাসন-ব্যবস্থার প্রতীকদের তাঁরা তাক্ করতেন শাসন-ব্যবস্থা নস্যাৎ করার সংকল্পে। বিপ্লবীদের আরো দু'টি উদ্দেশ্য ছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন প্রথমত, ভয়কাতর ভারতবাসীর চিত্তে আত্মবিশ্বাস ও প্রচণ্ড সাহস সঞ্চারিত করতে, দ্বিতীয়ত, দাম্ভিক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের 'প্রেস্টিজ্' ও দম্ভ খান্‌খান্ করে দিয়ে পৃথিবীর সম্মুখে বিদেশী শাসক ও শাসন-যন্ত্রকে খেলো

করে দিতে। তরুণ-ভারত জানিয়ে দেবে যে, ভারতবর্ষের 'ডি-জিয়োর' শাসক ইংরেজ নয়, ভারতীয় 'নিরানব্বুই পার্সেণ্ট্' ।...

"ব্রিটিশ শাসনের লৌহ-কাঠামো-রূপ 'আই-সি-এস্' গোষ্ঠীকে আঘাত দিলে শাসন-যন্ত্র বিকল হতে বাধ্য। এই শাসকদের শাসনযন্ত্র আবার দাঁড়িয়ে আছে পুলিশ ও কারা-বিভাগের দৌলতে। 'সিভিল এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশান্'-এর এই স্তম্ভ দু'টির ক্ষমতা তৎকালে তাই প্রচুর ছিল। কাজেই, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত দেখা গেল বিপ্লবীরা একাধিক গভর্ণর থেকে শুরু করে আই-সি-এস্ গোষ্ঠী ও পুলিশ এবং কারা-বিভাগের অধিকর্তাদের উপর অনাহত আক্রমণ চালিয়ে গেছেন। তারই ফলে নিরস্ত্র আইন-অমান্য-আন্দোলনে হাজার মার-খাওয়া জনতাই ১৯৪২-এর সহিংস গণ-আন্দোলনে ইংরেজকে কঠিন আঘাত দিতে পেরেছিল। তারই ফলে নেতাজীর অতুলনীয় নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ চরম আঘাতে ব্রিটিশ-বাহিনীকে দেশছাড়া করেছিল।...

"পুলিশ ও কারা-বিভাগের 'আই-জি'দ্বয়কে নিধন করেই বিপ্লবীদের তরফ থেকে বিনয় বসু, দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্ত শত্রু-ধ্বংসের জিহাদ্ ঘোষণা করলেন। 'রাইটার্স্'-এ ঢুকে সর্বপ্রথম মিঃ সিম্প্‌সন্‌কে তাক্ করার আরো একটি কারণ ছিল। কারা-বিভাগের প্রতীক সিম্প্‌সন্ সাহেব 'আই-জি'র পদে থাকা কালেই বাঙলার জেলে-জেলে অহিংস-বন্দীদের বারে বারে লাঠিপেটা করে শায়েস্তা করা হয়। সিম্প্‌সন্-এর আমলেই আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের কর্তৃপক্ষ বন্দী সুভাষচন্দ্রকে গুণ্ডা-কয়েদীদের দ্বারা মারাত্মক-ভাবে প্রহৃত করে। দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র ঘণ্টার পর ঘণ্টা অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলেন তাঁর সেল্-এ। তাঁর সহবন্দী ছিলেন দেশপ্রিয়

যতীন্দ্রমোহন, সত্যরঞ্জন বক্সি, কিরণশঙ্কর রায়, সত্য গুপ্ত, নৃপেন ব্যানার্জি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সিম্প্‌সনের অনুচরদের হাতে তাঁদের অনেকেই সেদিন অল্প-বিস্তর মার খেয়েছিলেন।

"আলিপুর জেলের এই প্রহার এবং যৌবনের প্রতীক সুভাষচন্দ্রের দেহ থেকে এই রক্ত-ক্ষরণ বাঙলার বিপ্লবী ভুলতে পারেন না। প্ল্যান্‌মত প্রত্যাঘাতে ঋণ তাঁকে শোধ করতেই হবে।···

"কিন্তু তথাপি এ-কথা ভুললেও চলবে না যে, বিপ্লবীত্রয়ের উদ্দেশ্য শুধু সিম্প্‌সন্‌-হত্যাই ছিল না, ব্রিটিশ-শাসন-দুর্গ রাইটার্স্‌-প্রাসাদ ও তথাকথিত অপরাজেয় ইংরেজ-শাসকবৃন্দকে আক্রমণ করে ব্রিটিশ-বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণদান করাও তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। হয়েছিলও তাই। রাইটার্স্‌-শাসনকেন্দ্র তছ্‌নছ্‌ করার পর টেগার্ট্‌ সাহেব ও তাঁর বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধেই বীরবৃন্দ আত্মবিলয়ন ঘটিয়ে গেলেন। তাঁদের রক্তের স্রোতে স্নান করে তরুণ-ভারত অজেয় হয়ে উঠল।" ('বিঃ বাঃ দীঃ বাঃ উদ্বোধন'—পৃঃ ৫, ৬)

॥ একুশ ॥

ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি

॥ জেলখানা থেকে লিখিত শহিদদের অমর পত্রাবলী ॥

রবীন্দ্রনাথ 'একটি মন্ত্রে' বলেছেন : "এই ভূমাকে মানুষ যখন **স্বদেশের** মধ্যে দেখে তখন তার আর আত্মপ্রাণের মমতা থাকে না। তখন মানুষ আনন্দরূপমমৃতং—আপনার আনন্দরূপকে অমৃতরূপকে সর্বত্র সৃষ্টি করতে থাকে। প্রদীপের শিখার মত আত্মদানেই মানুষের আত্ম-উপলব্ধি।" তিনি আরো বলেছেন ঐ 'একটি মন্ত্রে' : "যখনি কোনো বৃহৎ ভাবের আনন্দ আমাদের মধ্যে জেগে ওঠে তখনি আমাদের কৃপণতা কোথায় চলে যায়। তখন আমরা রিক্ত হয়ে পূর্ণ হয়ে উঠি, মৃত্যুর দ্বারা অমৃতের আস্বাদ পাই। তাই মানুষ বলেচে, ভূমৈব সুখং, ভূমাই আমার সুখ ; ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, ভূমাকেই আমার জানতে হবে ; নাল্পে সুখমস্তি, অল্পে আমার সুখ নেই।"

('শান্তিনিকেতন' ; ষোড়শ সংখ্যা, পৃঃ—১০)

উপনিষদের 'বাণী' মন্ত্রের মত করে প্রচার করে গেছেন ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ। সেই বাণী কবির কণ্ঠে শুনেছেন স্বদেশপ্রেমী বাঙলার কিশোরদল। লৌহশৃঙ্খলে, কারাগৃহে, ফাঁসির মঞ্চে তাঁরা সেই বাণীকে উপলব্ধি করলেন। মৃত্যুর অপেক্ষায় ধ্যানস্থ হয়ে তাঁরা অমৃতের আস্বাদ পেলেন। তাঁরাও হয়ে উঠলেন মৃত্যুঞ্জয়ী সাধক। ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে তাঁরাও হলেন 'ভূমানন্দ ঋষি'। উপনিষদকারের বাণী আর তাঁদের বাণী অভিন্ন হয়ে রইল।

এই সত্য অনুভব করার জন্যেই আমরা মৃত্যুহীন কয়েকটি তরুণ-বিপ্লবীর জেলখানা থেকে লিখিত কিছু পত্র এখানে উদ্ধৃত করলাম। মৃত্যুপথযাত্রী এই বীরবৃন্দের অপূর্ব পত্র তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে সেদিন এসেছিল। আজ তা জাতীয়-ঐশ্বর্য।

দীনেশ গুপ্তের চিঠি

(এক)

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল,
কলিকাতা,
রবিবার, ২৯. ৩ ৩১

শ্রীচরণেষু,

বৌদি, গতকল্য তোমার চিঠিখানা পাইলাম। আজ মা ও দাদা আসিয়াছিলেন। দাদার কাছে শুনিলাম, আমাদের ফাঁসির হুকুমই বহাল রহিয়াছে।

বৌদি, এ-জন্মের মত তোমাদের কাছ হইতে বিদায় চাহিতেছি। জানি বিদায় দিতে তোমাদের বুক ভাঙ্গিয়া যাইবে, কিন্তু কি করিব, বিদায় যে লইতেই হইবে।

আজ অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। সেই যেদিন তোমাকে আমার বৌদিরূপে পাইলাম সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত সমস্ত কথাই আমার চোখের সমুখে যেন ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তোমাকে আমার দশ বৎসর বয়স হইতে এই বিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অনেক যন্ত্রণাই দিয়া আসিয়াছি। সমস্তই তুমি স্নেহের অত্যাচাররূপে হাসিমুখে সহ্য করিয়া আসিয়াছ, কখনও বিরক্ত হও নাই, কখনও মুখ ভার করিয়া থাক নাই। চিরকালই অসুখে তোমার হাতের বালি, আহারে তোমার হাতের রান্না আমার সবচেয়ে ভাল লাগিয়াছে, তাহা তুমি জান। তুমি আমাকে কেন, আমাদের সকলকেই তোমার একান্ত আন্তরিক ভালবাসা দ্বারা জয় করিয়া লইয়াছিলে। সেদিন পর্যন্ত আমার যদি অনেক টাকা হয়, তবে তোমার কি কি প্রিয় জিনিস আমি তোমায় উপহার দিব, সেই সম্বন্ধে নানা উদ্ভট কল্পনা মনে মনে করিয়াছি।

যাক্ ভগবান্ জন্ম-জন্মান্তরে তোমার মত বৌদিই যেন আমায় পাওয়াইয়া দেন, এই প্রার্থনা।

কিসে তোমাদের মনে শান্তি আসিতে পারে তুমি তাহার উপায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ। আমিই কি আর তা বলিতে পারি! তবে আমার মনে হয়, মরণকে আমরা বড় ভয় করি, তাই মরণের কাছে আমরা পরাজিত হই। এই ভয় যদি জয় করিতে পারি, তবে মরণ আমাদের কাছে তুচ্ছ হইয়া দাঁড়াইবে। মরণকে আমাদের ভয় না করিয়া নির্ভয়ে প্রশান্ত চিত্তে বরণ করিয়া লইতে হইবে। আর আমরা হিন্দু। মরণকে ভয় করিলে ধর্মের প্রধান সোপানই যে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারিব না। আমরা জানি, মরণ আমাদের হয় না, হয় এই নশ্বর দেহের, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। সেই আত্মাই আমি—আর সেই আত্মাই ভগবান। মানুষের যখন সে-উপলব্ধি হয়, তখনই সে বলিতে পারে, "আমিই সে ;—আগুন আমাকে পোড়াইতে পারে না, জল আমাকে পচাইতে পারে না, বায়ু আমাকে শুষ্ক করিতে পারে না, আমি অজর, অমর, অব্যয়।" গীতা বলিয়াছেন,--শস্ত্রসকল ইহাকে ছেদন করিতে পারে না, অগ্নিতে দহন করিতে পারে না, জলে ভিজাইতে পারে না, বায়ুতে শুষ্ক করিতে পারে না। এ আত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশোষ্য, নিত্য, সর্বব্যাপী।

তুমি বলিবে, এ-সব কথা তো আমিও জানি, কিন্তু মন তো শান্তি মানিতে চায় না। মন শান্ত করিবার একমাত্র উপায় ভগবানে আত্ম-সমর্পণ। ইহা ভিন্ন শান্তি পাইবার আর কোন উপায়ই নাই। আমরা যতই জপ-তপ করি না কেন, যতই ফোঁটা-তিলক কাটি না কেন, কিন্তু তাঁহাকে আমরা ভালবাসিতে পারি কই? তাঁহাকে যে ভালবাসিতে পারে, মরণ তো তাহার কাছে একটা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। তাঁহাকে যেমন করিয়া ভালবাসিয়াছিলেন বাংলার নিমাই, প্রেমাবতার যীশুখৃষ্ট, আর আমাদেরই দেশের সে-সব ছেলেরা, যাঁহারা হাসিমুখে মরণকে বরণ করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।

মনের আবেগে আজ অনেক কথা লিখিয়া ফেলিলাম। তোমাদের কষ্টের কারণ আমি হইয়াছি জানিয়া আমি নিজের মনেও কম ব্যথা পাই নাই। তোমরা আমাকে ক্ষমা করিও।

আমার সঙ্গীটি এখন বেশ ভালই আছে। অসুখ-বিসুখ আর নাই। আমিও ভালই আছি। ভালবাসা জানিবে। ইতি—

স্নেহের
ঠাকুরপো

(দুই)

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল,
কলিকাতা,
১৮ই জুন, ১৯৩১

বৌদি,

তোমার দীর্ঘ পত্র পাইলাম। অ-সময়ে কাহারো জীবনের পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। যাহার যে কাজ করিবার আছে, তাহা শেষ হইলেই ভগবান তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লন। কাজ শেষ হইবার পূর্বে তিনি কাহাকেও ডাক দেন না।

তোমার মনে থাকিতে পারে, তোমার চুল দিয়া আমি পুতুল নাচাইতাম। পুতুল আসিয়া গান গাহিত, "কেন ডাকাইছ আমার মোহন ঢুলী?" যে পুতুলের পার্ট শেষ হইয়া গেল, তাহাকে আর স্টেজে আসিতে হইত না। ভগবানও আমাদের নিয়া পুতুল নাচ নাচাইতেছেন। আমরা এক-একজন পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে পার্ট করিতে আসিয়াছি। পার্ট করা শেষ হইলে প্রয়োজন ফুরাইয়া যাইবে। তিনি রঙ্গমঞ্চ হইতে আমাদের সরাইয়া লইয়া যাইবেন। ইহাতে আপশোষ করিবার আছে কি?

পৃথিবীর যে কোন ধর্মমতকে মানিতে হইলেই আত্মার অবিনশ্বরতা

বিশ্বাস করিতে হয়। অর্থাৎ দেহের মৃত্যু হইলেই আমাদের সব শেষ হইয়া যায় না, এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে। আমরা হিন্দু, হিন্দুধর্মে এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছে, কিছু কিছু জানি। মুসলমান ধর্মও বলে, মানুষ যখন মরে, তখন খোদার ফেরেস্তা তার রু কবজ্ করিতে আসেন। মানুষের আত্মাকে ডাকিয়া বলেন, "অ্যায় রুহ্ নিকাল্ ইস কালিব্‌সে, চল্ খুদাকা জান্নৎমে।" অর্থাৎ তুই দেহ ছাড়িয়া ভগবানের কাছে চল্। তাহা হইলে বোঝা গেল, মানুষ মরিলেই তার সব শেষ হইয়া যায় না, মুসলমান ধর্মের এ বিশ্বাস আছে। খৃষ্টান ধর্ম বলে, "Very quickly there will be an end of thee here; consider what will become of thee in the next world"—অর্থাৎ দিন তো তোমার ফুরিয়ে এল, পরকালের কথা চিন্তা কর। বোঝা গেল খৃষ্টানধর্মও বিশ্বাস করে মানুষের দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মা মরে না। এই তিন ধর্মের কোন একটা স্বীকার করিতে হইলেই আমাকে মানিয়া লইতে হইবে যে, আমার মৃত্যু নাই। আমি অমর। আমাকে মারিবার সাধ্য কাহারো নাই।

ভারতবাসী আমরা নাকি বড় ধর্মপ্রবণ। ধর্মের নামে ভক্তিতে আমাদের পণ্ডিতদের টিকি খাড়া হইয়া উঠে। কিন্তু তবে আমাদের মরণকে এত ভয় কেন? বলি ধর্ম কি আছে আমাদের দেশে? যে দেশে দশ বছরের মেয়েকে পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ ধর্মের নামে বিবাহ করিতে পারে, সে দেশে ধর্ম কোথায়? সে দেশের ধর্মের মুখে আগুন। যে দেশে মানুষকে স্পর্শ করিলে মানুষের ধর্ম নষ্ট হয়, সে দেশের ধর্ম আজই গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত। সবার চেয়ে বড় ধর্ম মানুষের বিবেক। সেই বিবেককে উপেক্ষা করিয়া আমরা ধর্মের নামে অধর্মের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি। একটা তুচ্ছ গরুর জন্য, না হয় একটু ঢাকের বাদ্য শুনিয়া আমরা ভাই-ভাই খুনোখুনি করিয়া মরিতেছি। এতে কি 'ভগবান' আমাদের জন্য বৈকুণ্ঠের দ্বার খুলিয়া রাখিবেন, না 'খোদা' বেহেস্তে স্থান দিবেন?

যে দেশ জন্মের মত ছাড়িয়া যাইতেছি, যার ধূলিকণাটুকু পর্যন্ত আমার কাছে পরম পবিত্র, আজ বড় কষ্টে তার সম্বন্ধে এসব কথা বলিতে হইল।

আমরা ভাল আছি। ভালবাসা ও প্রণাম লইবে।

—স্নেহের ছোট ঠাকুরপো।

(তিন)

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল,
কলিকাতা,
৩০শে জুন, ১৯৩১

মা,

যদিও ভাবিতেছি কাল ভোরে তুমি আসিবে, তবুও তোমার কাছে না লিখিয়া পারিলাম না।

তুমি হয়ত ভাবিতেছ, ভগবানের কাছে এত কাতর প্রার্থনা করিলাম, তবুও তিনি শুনিলেন না! তিনি নিশ্চয়ই পাষাণ, কাহারও বুকভাঙ্গা আর্তনাদ তাঁহার কানে পেঁছায় না। ভগবান কি আমি জানি না, তাঁহার স্বরূপ কল্পনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু তবু একথাটা বুঝি, তাঁহার সৃষ্টিতে কখনও অবিচার হইতে পারে না। তাঁহার বিচারঘরের দ্বার চিরকাল খোলা; নিত্যই তাঁহার বিচার চলিতেছে। তাঁহার বিচারের উপর অবিশ্বাস করিও না, সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা পাতিয়া নিতে চেষ্টা কর। কি দিয়া যে তিনি কি করিতে চান, তাহা আমরা বুঝিব কি করিয়া?

মৃত্যুটাকে আমরা এত বড় করিয়া দেখি বলিয়াই সে আমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে। এ যেন ছোট ছেলের মিথ্যা জুজু-বুড়ীর ভয়। যে মরণকে একদিন সকলকেই বরণ করিয়া লইতে হইবে, সে আমাদের হিসাবের দু'দিন আগে আসিল বলিয়াই কি আমাদের এত বিক্ষোভ, এত চাঞ্চল্য?

যে খবর না-দিয়া আসিত, সে খবর দিয়া আসিল বলিয়াই কি আমরা তাহাকে পরম শত্রু মনে করিব? ভুল, ভুল। 'মৃত্যু' মিত্র-রূপেই আমার কাছে দেখা দিয়েছে। আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

—তোমার নসু

(চার)

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল,
৩. ৭. ৩১.
কলিকাতা

মণিদি,

আজ পত্র পেলাম।

ভগবানের আশীষ যারা পায়, অশেষ দুঃখ জোটে তাদেরই কপালে। সে দুঃখের মালা গলায় পরবার সৌভাগ্য ও শক্তি কত জনের হয় জানি না, কিন্তু যার হয়, তার জীবন পরম সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে।

ভগবান যাকে আপন কাজের জন্য বেছে নেন, তার সুখ, সম্পদ সবকিছু দেন ধুলোয় লুটিয়ে, করেন তাকে পথের ভিখারী, রিক্ত, কাঙাল। তিনি যাকে বরণ করেন, মরণ-মালা তারই গলায় পরিয়ে দেন। সে মালা কি সহজ!

"এ তো মালা নয় গো, এ যে
তোমার তরবারি।
জ্বলে ওঠে আগুন যেন,
বজ্র-হেন ভারী—
এ যে তোমার তরবারি।"

এ জীবনে সুখ পাওয়া বড় কথা হতে পারে, কিন্তু দুঃখ পাওয়া

তার চেয়েও বড়। সুখ ভোগ করতে পারে সকলেই, কিন্তু স্বেচ্ছায় দুঃখের বোঝা বইতে পারে ক'জন ?

শক্তির উৎস তিনি। যাকে তিনি তাঁর কাজের ভার দেন, সে-ভার বহন করার শক্তিও তাকে অযাচিতভাবে দান করেন তিনিই। নইলে সাধ্য কি তার যে, সে-গুরুভার এক মুহূর্তও সে সহ্য করে ?

যার প্রাণ আছে, শ্রেয়কে বরণ করবার জন্য যার আছে শ্রদ্ধা, সে কি কখনও তাঁর মহাশঙ্খের আহ্বান শুনে স্থির থাকতে পারে ? কি শক্তি আছে এই মিথ্যা মোহের যে, তাকে আটকে রাখবে ? তার আহ্বানে কি শক্তি আছে জানি না।

"শুধু জানি—যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষপাতি ; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত।"

আজ যাই, দিদি ! এ-ই হয়ত শেষ প্রণাম।

স্নেহের দীনেশ

(পাঁচ)

আলিপুর সেনট্রাল জেল,
কলিকাতা,
৫টা (সন্ধ্যা)
৬. ৭. ৩১

মা,

তোমার সঙ্গে আর দেখা হইবে না। কিন্তু পরলোকে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিব।

তোমার কিছুই কোনদিন করিতে পারি নাই। সে না-করা যে আমাকে কতখানি দুঃখ দিতেছে তাহা কেহই বুঝিবে না, বুঝাইতে চাই-ও না।

আমার যত দোষ, যত অপরাধ দয়া করিয়া ক্ষমা করিও।

আমার ভালবাসা ও প্রণাম জানিও।

—তোমারই নসু

(ছয়)

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল,
কলিকাতা
(সন্ধ্যা)
৬. ৭. ৩১.

স্নেহের ভাইটি,

তুমি আমাকে চিঠি লিখিতে বলিয়াছ, কিন্তু লিখিবার সুযোগ করিয়া উঠিতে জীবন-সন্ধ্যা হইয়া আসিল।

যাবার বেলায় তোমাকে আর কি বলিব? শুধু এইটুকু বলিয়া আজ তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছি, তুমি নিঃস্বার্থপর হও, পরের দুঃখে তোমার হৃদয়ে করুণার মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হউক।

আমি আজ তোমাদের ছাড়িয়া যাইতেছি বলিয়া দুঃখ করিও না, ভাই। যুগ যুগ ধরিয়া এই যাওয়া-আসাই বিশ্বকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে, তাহার বুকের প্রাণ-স্পন্দনকে থামিতে দেয় নাই। আর কিছু লিখিবার নাই। আমার অশেষ ভালবাসা ও আশীষ জানিবে।

— তোমার দাদা

(সাত)

আলিপুর সেন্‌ট্রাল জেল,
কলিকাতা,
৭. ৭. ৩১. (প্রত্যূষে)

বৌদি,

এইমাত্র তোমার চিঠিখানা পাইলাম। আমার জীবন-কাহিনী জানাইবার সুযোগ হইল না। কি-ই বা জানাইব বল তো ? আমার সব কথাই তো তোমাদের বুকে চিরকাল আঁকা থাকিবে। তুচ্ছ কালির আঁচড় কি তাহাকে আরও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারিবে ? আমার যত অপরাধ ক্ষমা করিবে। এ-জন্মের মত বিদায় ; ভালবাসা ও প্রণাম জানিবে।

তোমার
-- ঠাকুরপো

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের চিঠি

[মেদিনীপুরের দ্বিতীয় ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগ্‌লসাকে ১৯৩২ সালের ৩০শে এপ্রিল প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য ও প্রভাংশু পাল মেদিনীপুর শহরেই জিলা-বোর্ডের এক সভায় নিহত করেন। প্রভাংশু কার্যশেষে পালিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু প্রদ্যোৎ পারেন না। কারণ, তাঁর আগ্নেয়াস্ত্রটি অচল হয়ে যায়। প্রদ্যোৎ বন্দী হন। তিনি ফাঁসি-মঞ্চে আরোহণ করেন ১৯৩৩ সালের ১২ই জানুয়ারি। 'বি. ভি.'র মেদিনীপুর শাখার সভ্য, দীনেশ গুপ্তের মন্ত্রশিষ্য এই প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য দীনেশেরই মত ছিলেন বীর্যবান সৈনিক, অথচ রবীন্দ্রভক্ত এবং সাহিত্যানুরাগী। জেলখানা থেকে প্রেরিত তাঁর পত্রগুচ্ছ পড়েও বোঝা যায় যে, এই মৃত্যুযাত্রী কিশোরও 'অমৃত'কে উপলব্ধি করেছিলেন কারাগৃহের নিঃসঙ্গতায়, তপস্যামুগ্ধ জীবনে।

আমরা এখানে মাতা পঙ্কজিনী দেবীর কাছে লিখিত প্রদ্যোতের একখানা পত্র তুলে দিলাম। এ তো চিঠি নয়—'এ যে ভীষণ তরবারি'!]

এক

মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল,
মেদিনীপুর

মাগো,

আমি যে আজ মরণের পথে আমার যাত্রা শুরু করেছি তার জন্য কোন শোক কোরো না। আর আমার ভাইদের বলো যে, আমি আমার অসমাপ্ত কাজের ভিতর আমার হৃদয় রেখে গেলাম। আমার জন্য দু'দিন চোখের জল ফেলে ভুলে যাওয়ার চেয়ে, আমার সেই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে চেষ্টা করলে আমার ঢের বেশি তর্পণ করা হবে এবং আমার আত্মাও তাতে বেশি পরিতৃপ্ত হবে। আজ যদি কোন ব্যায়রামে আমায় মরতে হোত, তবে কি আপশোসই না থাকতো সকলের মনে; কিন্তু আজ একটা আদর্শের জন্য প্রাণ বিসর্জন করছি, তাতে আনন্দ আমার মনের কানায় কানায় ভরে উঠেছে, মন খুশিতে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফাঁসির কাঠটা আমার কাছে ইংরাজের একটা পুরনো রসিকতা বলে মনে হচ্ছে। আমার এই অন্তরের কথাটা তোমারই অন্তরের প্রতিধ্বনি।

মা, তুমি কিন্তু আমার কাছে কাজের কোন কৈফিয়ৎ চাইতে পারবে না। তুমি হয়তো জানো না তোমারই নিজের প্রয়োজনে আমাদের সৃষ্টি করেছো, কিন্তু তোমাকে আমি জানিয়ে যাচ্ছি, আমরা হাজার হাজার বছর ধরে তোমাদের অর্থাৎ বাঙলার মায়েদের মনে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই সৃষ্টি হচ্ছিলাম। আজ ধীরে ধীরে আমরা আত্ম-প্রকাশ করছি। আর আমি চিরদিনই জানি যে, আমি বাঙালী বা ভারতবাসী আর তুমি বাঙলা বা ভারতবর্ষ একই পদার্থ।

কোনদিন আলাদা করে ভেবে উঠতে পারি নি। তাই কোন বিপদ-শঙ্কাই আজ আমায় ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। যুগ যুগ ধরে তুমি যে অপমান, লাঞ্ছনা ও নির্যাতন সহ্য করে এসেছো, মাটিতে মুখ থুবড়ে বোবা গরুর মত মার খেয়েছো, তারই বিরুদ্ধে তোমার মনে যে বিদ্রোহের ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত বয়ে যাচ্ছিল— সেই পুঞ্জীভূত 'বিদ্রোহ'ই আমি। সেই 'বিপ্লব' আজ যদি আত্মপ্রকাশ করে তবে তার জন্য চোখের জল ফেলবে কেন? আমার এই কথাটা খুব সত্য বলে জেনো। আর তোমায় যদি কেউ 'খুনীর মা' বা 'ডাকাতের মা' বলে অবজ্ঞায় পরিহাস করে তবে নিজজ্ঞানে অন্তরে নিরুপম সৌন্দর্য বহন করে নীরবে করুণ নেত্রে তার অজ্ঞতাকে ক্ষমা করো। মানুষকে আমরা 'খুন' করি না, মানুষকে আমরা বাঁচাই। এ-কথা বাঙলা-দেশকে এখনো বোঝানো হয় নি। বাঙলার বিপ্লবের ইতিহাস ক'দিনেরই বা, তাই আমাদের আদর্শ এখনো সাধারণ্যে প্রচারিত হয় নি। সেই জন্য লোকে আমাদের হয়তো ভুল বোঝে, নতুবা জেনেও জানবার চেষ্টা করে না, আমাদের গালি দেওয়ার লোক পদে-পদেই। ইংরেজ আমাদিগকে কালিতে চিহ্নিত করে; কিন্তু ভারি দুঃখ হয়, যখন অহিংসবাদীরাও আমাদের 'হিংস্র' বলে নিন্দা করেন। আর মনে হয়, পরাধীন দেশে এইটাই বুঝি সবচেয়ে বড় অভিশাপ। আমরা আজ যে আদর্শের সন্ধানে চলেছি তা অহিংসবাদীদের কল্পনারও অতীত। 'মানবের হিংস্রতা' থেকে মানবকে রক্ষা করার জন্যই আমাদের এই প্রয়াস। বাঙলার বিপ্লবের ইতিহাসটা প্রায় পঁচিশ বছরের শিশু, এখনো ভাল করে কথা বলতে শেখে নি, তাই অনেকের গলাবাজির চোটে হয়তো তার কণ্ঠস্বর তলিয়ে যায়। কিন্তু আজ এই শিশুকণ্ঠ হতে যে পাঞ্চজন্য শঙ্খ বেজে উঠেছে, তা শীগ্‌গিরই জগৎকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দেবে।

লোকে আমাদের ভাবপ্রবণ বলে উপহাস করে। কিন্তু আমি এটা ভেবে পাই না যে, এই বাঙলা দেশের হাজার হাজার ছেলে,

যারা নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়, লেখাপড়া শিখেছে, জ্ঞানলাভ করেছে, এবং অনেক অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছে, তারা একজোটে ভাবপ্রবণ (sentimental) হয় কি করে!

বুড়োরা আমাদের প্রায়ই বলে থাকেন 'ভ্রান্ত যুবক', এবং করুণায় বিগলিত হয়ে বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের অনেকেই আমাদিগকে এই 'ভ্রান্ত পথ' থেকে ফিরানোর অনেক চেষ্টাই নাকি করেছেন—এমন কি খুব নিঃস্বার্থভাবে 'কমিটি'ও নাকি গঠন করেছেন শুনেছি। বুঝলে মা, এর ভিতরে কিছুই নেই, শুধুই উপর-চালাকি। আসল কথাটা কি জানো মা, যাঁরা এরকম উঠে-পড়ে আমাদের ফিরানোর চেষ্টা করছেন, হয় তাঁরা অথর্ব, নয় কাপুরুষ। কাউকে আঘাত দেবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই, কিন্তু এটা দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ।

'বিপ্লব' জিনিসটা কিছু আমাদের একচেটিয়া নয়। মানবজাতিকে ধ্বংসের হাত হতে বাঁচানোর জন্য যুগে যুগে এর প্রয়োজন হয়েছে। বৃদ্ধ যাঁরা, তাঁদের নমস্কার করি। তাঁরা আমার পূজ্য, কিন্তু তাঁদের জরাগ্রস্ত দেহমন 'নড়েচড়ে বসবার' সাময়িক কার্যটাকেও খুব বড় করে দেখেন এবং বাহিরে তার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা করেন এবং জলে ভেসে আসা আগাছার মতন যখন আমাদের পেছন ছাড়তে চান না, তখন বিরক্ত না হয়ে থাকতে পারি না। কি করবো? তখন বাধ্য হয়ে সেই তথাকথিত অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের শিশুর পর্যায়ে ফেলতে হয়।···তারপর যাঁদের প্রত্যেক রক্তবিন্দু দাসত্বের কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়ে গেছে, তাঁদের কথা আর ভাবি না। প্রকৃতির নিয়মে তাঁরা নিজেরা পচে মরেন, স্বখাত সলিলে ডুবে মরেন। কিন্তু যাঁরা মধ্যপন্থী, আপোষ-মীমাংসায় এখনও বিশ্বাসবান—তাঁদের জন্য দুঃখ হয়, কষ্টও হয়। তাঁদের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দুই-ই আছে, কিন্তু নেই কেবল আত্মসম্মান জ্ঞান। এই সম্মানবোধ জোর করে কাউকে কখনো শেখানো যায় না, বোঝানোও যায় না; এটা যৌবনের ধর্ম।···

তোমাকে কেউ যদি আমার চোখের সামনে নির্যাতন করে এবং

আমি যদি পাগলের মত লাফিয়ে না পড়ে বিচার করতে বসে যাই—এতে কোন সুরাহা হবে কিনা, এতে কতখানি বিপদ আছে, একলা ওর সঙ্গে পারবো কিনা, কিংবা সামনে কোন থানা থাকলে এজাহার দিয়ে পরে সেই পলাতক অত্যাচারীর সন্ধান নিয়ে ব্যাটাকে জেলে দেওয়া কিংবা সম্মানজনক আপোষ-মীমাংসা করা যাবে কিনা ; আর অত্যাচারী যদি ধরা না পড়ে, তবে কোন খবরের কাগজে তীব্র প্রবন্ধ লেখা যায় কিনা ইত্যাদি করে আমি ধীরমস্তিষ্কের ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবো সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাতৃদেহটা কি ছি-ছি করে বলে উঠবে না '—ছেলেবেলায় বুকের দুধের সঙ্গে বিষ দিয়ে কেন এই ক্লেদের পিণ্ডটাকে মেরে ফেলি নি ?'···

একথাটা খুবই সত্যি, যতই অধিক বিচার করবে ততই যুক্তি ও উৎপত্তি অধিকাধিক উৎপন্ন হয় এবং শেষের নির্ণয় দুর্ঘট হয়ে পড়ে। যাক, তোমার অর্থাৎ ভারতমাতার অপমান যথেষ্ট হয়েছে। আর চোখের জল ফেলে অপমানের ভার বাড়াবো না।···

কি অমৃতস্পর্শেই যে মরবার আগেই আমাদের ওজন বেড়ে যায় তা সাধারণ লোকে বুঝতে পারে না বলেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে থাকে, নইলে দেখতো এটা একটা হিসাব-নিকাশের ব্যাপার মাত্র।···

বেশি আর কি বলবো ! জীবনে অনেক আশাই ছিল। দেশের মধ্যেই আমাদের আদর্শটাকে অন্ত্রে অন্ত্রে ছড়িয়ে যাবো ; নবযুগের কুসংস্কারমুক্ত ভাব নিয়ে জাতিকে ও সমাজকে নবরূপ দেবো ; একেবারে আমূল সংস্কার করে একটা নবজাতি গড়ে রেখে যাবো ; সমস্ত গ্লানি, সমস্ত আবর্জনা ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে যাবো—কিন্তু আশ্চর্য মানুষের জীবন, হঠাৎ ডাক এলো, আমাকে যেতে হল ! কিন্তু একথা মনেও স্থান দিও না মা, যে, আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত চিন্তা সমস্ত আশাও লোপ পেয়ে গেল। সব রয়ে গেল—আমার বাঙলার ছেলেমেয়েদের মনে, আর আমার বাঙলার মায়েদের অন্তরে। বাঙলার ভূমি এত উর্বরা যে, তার ফসল উপচে পড়ছে।

এ বৎসরে অগ্রহায়ণে যে ফসল অঙ্কুর না হতে-হতেই শুকিয়ে গেল, আসছে হেমন্তে সে দ্বিগুণ হয়ে উঠবে, পরের ফসল দেশের মধ্যে সোনা ছড়িয়ে দেবে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার কিছুই নেই—যেটুকু বলেছি, বড় হলে আরো ভাল করে বলতে পারতাম। কিন্তু আর কেউ এই একটু 'মুখের কথা' বুঝুক বা না-ই বুঝুক, তুমি কিন্তু সম্যকরূপে বুঝবে, কেন না এটা তো তোমারি অন্তরের কথা!

মা, তোমার 'প্রদ্যোৎ' কি কখনো মরতে পারে? আজ চারিদিকে চেয়ে দেখ, লক্ষ লক্ষ 'প্রদ্যোৎ' তোমার দিকে চেয়ে হাসছে। আমি বেঁচেই রইলাম, মা, অক্ষয় অমর হয়ে—বন্দেমাতরম্!···*

দুই

[জ্যেষ্ঠভ্রাতা ডাঃ প্রভাতচন্দ্র ভট্টাচার্যকে লিখিত]

মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল,
বুধবার, ১১ই জুলাই, ১৯৩২

ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ

শতকোটি ভূমিষ্ঠ-প্রণাম নিবেদনমিদং,
বিশেষ পরে,—

আমি এখন বেশ ভাল আছি। জানি, মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে ও হবে। তাঁকে মনঃকষ্ট করতে বারণ করবেন। জগতে কেউ কখনো

---

* [সরকারের দৃষ্টির অন্তরালে জেলখানা হইতে গোপনে এই পত্রখানি মায়ের নিকট আসিয়াছিল বলিয়া ভাষা, ভঙ্গী ও ভাব সম্বন্ধে ইহা অপূর্ব ও অনবদ্য হইয়া উঠিয়াছে। মৃত্যুপথযাত্রী দেশভক্তের অন্তর্নিহিত ভাবরাশি ও আদর্শের একটি নিখুঁত রূপ ও অনাগতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পত্রখানির মধ্যে সুস্পষ্ট। সরকারের মারফত এ পত্র পাঠাইলে মায়ের কাছে পৌঁছিত কিনা সন্দেহ। হয়ত বা অত্যন্ত বিকৃতাঙ্গ হইয়া, একেবারে প্রাণহীন হইয়া দেখা দিত। ('শহীদ প্রদ্যোতকুমার', পৃঃ ৮২—দ্রষ্টব্য)]

চিরদিনের জন্য আসে নি এবং কেউ চিরদিন জগতে থাকবেও না। প্রাণ বাঁচানই জীবনের উদ্দেশ্য নয়, জীবন যদি জীবনের কাজেই না লাগলো, তবে সেরকম জীবনের প্রয়োজন কি? মায়ের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবেন। তাঁকে বলবেন যে, তাঁর চার ছেলের মধ্যে তিন ছেলে এখনো তাঁর সামনে বর্তমান। (চারটি পংক্তি পুলিশের কাটা) আর আমাকে আমার এই ব্রত করতে হবে। (সাড়ে ছয় পংক্তি পুলিশের কাটা)। জেলের নির্জনতা আমার এখন বেশ ভাল লাগছে; কেন না, এই নির্জনতা আমার জীবনের চরম সমস্যাগুলি তলিয়ে দেখার সুযোগ দেয়। আর সব অন্যান্য কারণ ছেড়ে দিলেও আমার এই নির্জনতা আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমাকে অনেকখানি লাভবান করতে পারবে বা পেরেছে। আধ্যাত্মিকতা জীবনের প্রাণ, প্রাণের অন্তরতম জ্বলন্ত পাবকশিখা।

আমি বেশ আনন্দেই আছি। আপনাদের কোন চিন্তা করবার দরকার নেই। যথাযোগ্য স্থানে প্রণাম ও ভালবাসা দেবেন এবং পত্র দেবেন।

ইতি—কচি
(প্রদ্যোৎ)

তিন

[বড় বৌদি শ্রীযুক্তা বনকুসুম দেবীর নামিত]

মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল.
২২-১১-৩২

শতকোটি ভূমিষ্ঠ-প্রণাম নিবেদনমিদং,

বিশেষ পরে,—

বৌদি,

আপনার আশীর্বাদী চিঠি পেয়েছি। কিন্তু তার উত্তর দিতে পারি নি।......'ভোলাদা' (শহিদের জনৈক নিকট-আত্মীয়) যে এত

আগেই আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন তা কে জানতো! তাঁকে বোধ হয় আজ unhonoured ও unsung-ই যেতে হল। কিন্তু আমি যে যাচ্ছি, আমি সকলের মধ্যে নিজের আসন সুদৃঢ়ভাবে পেতে রেখেই যাচ্ছি। কার কখন কিভাবে ডাক আসে, তা কে বলতে পারে!

আমার যাওয়ার কল্পনা যা এতদিন মনে মনে করে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে এসেছি, তা সফল হতে চললো। 'এবার চলিনু তবে, সময় হয়েছে নিকট এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে।' এমনি কত 'ছন্দ' যে আনন্দকে ঘিরে-ঘিরে উছল জলকল্লোলের মতই বেজে যাচ্ছে। আজকে এই 'আনন্দ'কে কোন কথাই 'ভাষা' দিয়ে প্রকাশ করতে পারে না। আমার এ যে আশাতীত, ধারণাতীত লাভ। ধর্মের জন্য দেশের জন্য, যেকোন উপাস্যের জন্য ত্যাগের, এমন কি জীবন-বিসর্জনের দৃষ্টান্তের জন্য পুরাণ বা ইতিহাসের পাতা উল্টাবার প্রয়োজন নেই; আমাদের চোখের সামনে আমরা প্রতিনিয়তই তা দেখতে পাচ্ছি। তাছাড়া পুনর্জন্মে মৃত্যুর পর অন্য দেহ পরিগ্রহে বিশ্বাস তো আছে, এবং শ্রীগীতাতে আছে শ্রীকৃষ্ণের বাণী—'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।' তাই, আমার জন্য কোন চিন্তা করবেন না। এইটুকু দুঃখই থাকলো যে, আপনার সঙ্গে দেখা করবার সুবিধা হয়ে উঠলো না। তারপর, গীতাঞ্জলিতে আছে:

"আকাশ হ'তে প্রভাত আলো
আমার পানে হাত বাড়ালো
ভাঙ্গা কারার দ্বারে আমার
সুরধুনী উঠল রে এই উঠল রে।"

এ-বাণী আমার অন্তরে স্পন্দিত হচ্ছে। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি এই দেখে যে, কবির এই ছন্দটা যেন আমার জীবনেরই প্রতিধ্বনি। আমার এই জীবনের খাতায় যে কবির কোন অক্ষরটিই বাদ যাচ্ছে না। সবই যে সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। এ তো গান শোনা নয় বা কাব্য পড়া নয়, এ যে একেবারে মর্মে মর্মে অনুভব। জীবনটা কী? একটা

অনুভবের সমষ্টি বই তো নয়, এই অনুভূতির স্মৃতিধারাই তো মানবের জীবন। এবং সেই একটানা জীবনস্রোতে যেদিন একটা প্রবল অনুভূতির আবর্ত সৃষ্টি করে, সেদিনই তো ঘটে প্রাণের জাগরণ। তাই আমার জীবনের এই অভিব্যক্তির মধ্যেই বিশ্বকবির গানের এই আশ্চর্য মিল দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি। যাক, তারপর আমার যে-আত্মা, সে-আত্মা যে শুধু অমর তা নয়, এর অধিকন্তু সে অপরিমেয় শক্তি। এ যে শুধু অক্ষয় অবিনশ্বর তা নয় এ বিভু, এ অসীম।

সেই অসীমতা, সেই বিভুত্ব শুধু মায়ায় আবৃত আছে। বুঝলেই মায়া ছুটে যাবে! আমি আসি। কেমন? এই বাংলার কোলেই আবার ফিরে আসব গৌরবের সহিত। অনেক কিছু লিখতে ইচ্ছা করে, কিন্তু প্রাণের কথা বাইরে প্রকাশ করবার ভাষা নেই। আমার শত শত প্রণাম গ্রহণ করে আমাকে সার্থকতার আনন্দ উপলব্ধি করতে সুযোগ দেবেন। 'মায়ের' প্রাণে আঘাতটা খুবই বেশি হয়ে বাজবে তা জানি, কিন্তু আপনারা সে-আঘাতটাকে লঘু করাবার চেষ্টা করবেন। আমাকে আমার অযোগ্যতার জন্য মাকে ক্ষমা করতে বলবেন। আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম। আসি, কেমন? ইতি—

আপনারই ছোট ঠাকুরপো

শ্রীপ্রদ্যোতকুমার ভট্টাচার্য

॥ রামকৃষ্ণ রায় এবং ব্রজকিশোর চক্রবর্তি ॥

[মেদিনীপুরের তৃতীয় ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্জকে ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর শহর মেদিনীপুরেই পুলিশ-গ্রাউণ্ডে, খেলতে যাবার সময়, দুর্জয়ী অনাথ পাঁজা ও মৃগেন দত্ত নিহত করেন। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র-সান্ত্রীর গুলিতে বীরদ্বয় হত হয়ে শহিদ-লোকের যাত্রী হন।...অতঃপর পুলিশ একটি ষড়যন্ত্র মামলা ফেঁদে রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তি ও নির্মলজীবন ঘোষকে ফাঁসির দণ্ড দেয়। রামকৃষ্ণ ও ব্রজকিশোর ১৯৩৪ সালের ২৫শে এবং নির্মলজীবন ২৬শে অক্টোবর

ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন।·· জেলখানা থেকে লিখিত রামকৃষ্ণ রায়ের এবং ব্রজকিশোর চক্রবর্তির পত্র এখানে উদ্ধৃত হল।···'বি. ভি.'র মেদিনীপুর শাখার অদম্য সৈনিক ও সংগঠক, এবং দীনেশ গুপ্তের মন্ত্রশিষ্য এই দু'টি অগ্নিশিশুও রবীন্দ্রকাব্যে নিমগ্ন থেকে কেমন করে 'আনন্দরূপমমৃতং'—অর্থাৎ আপনার 'আনন্দরূপকে, অমৃতরূপকে সৃষ্টি করে' মৃত্যুর অপেক্ষায় ছিলেন, তা এই পত্র-গুলোয় স্বাক্ষরিত হয়ে আছে।]

রামকৃষ্ণ রায়ের চিঠি

মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেল,
২রা অক্টোবর,
১৯৩৪

শ্রীচরণেষু,

মা, বহুদিন হলো আপনার কোন কুশল সংবাদ পাই নি, আশা করি কুশলে আছেন। মা, আজ আমার হৃদয়ে কি সুখ যে অনুভব করছি তা আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। কে যেন আলো দেখিয়ে বলছে, 'আয়, আয়, ফিরে আয়; ওখানে তোর স্থান হবে না, এই অনন্তের কোলে তোর স্থান'। তাঁর ডাকে আত্মহারা হয়ে ছুটে চলেছি। কোথায় চলেছি ও কেন চলেছি তা কিছুই জানি না। মাগো, আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছি বলে আপনি দুঃখ করবেন না, কারণ, এখানে যারাই এসেছে, তাদেরই ফিরে যেতে হবে। এই পৃথিবী ঠিক যেন একটি বাজার স্বরূপ, বাজার করুক বা না করুক ফিরে যেতেই হবে। যাঁর ইচ্ছাতে এ পৃথিবী চলছে সেই অনন্ত পুরুষ, যাঁর অঙ্গুলি হেলনে সমস্ত দুনিয়া ওলোট-পালোট হয়ে যেতে পারে তাঁর ডাক এলে সকলকেই চলে যেতে হবে। 'তারই ইচ্ছা হবেই পূর্ণ সকল জীবন মাঝে'!

মাগো, আমি আপনার হতভাগ্য সন্তান। পৃথিবীতে এসে কেবল আপনাকে দুঃখ এবং অশান্তিই দিয়ে গেলাম। আপনার

প্রতি আমি কোন কর্তব্যই করতে পারলাম না। তার জন্য আমায় ক্ষমা করবেন। বহু তপস্যা ও আরাধনার পর আমি আপনার মত মা পেয়েছিলাম, কিন্তু বিধাতা আমায় বেশিদিন আপনার চরণে স্থান দিলেন না। মা, আজ পর্যন্ত দুঃখ ও কষ্ট দিয়েই গেলাম। শুধু এই আশা নিয়ে গেলাম, আপনার মত মা জন্মে জন্মে যেন পাই। মাগো, আমার শুধু মনে হয় যে, আপনি আমার জন্য চিন্তা করে পাছে শরীর নষ্ট করেন, তা যেন না হয়। তাহলে আমি শান্তি পাবো না। গনা, ভুজঙ্গ, খোকন, ডলী ও মেজদার খোকা— এদের দেখে আমাকে ভুলতে চেষ্টা করবেন এই আমার অনুরোধ। আপনি আমার শতকোটী ভূমিষ্ঠ-প্রণাম গ্রহণ করবেন। ··আমি তবে এবারের মত আসি, মা! আপনার কোল হতে চিরবিদায় নিয়ে চললাম। 'গীতা'টি দিয়ে গেলাম।

প্রণত

আপনার স্নেহের

রামকৃষ্ণ

ব্রজকিশোর চক্রবর্তির চিঠি

(এক)

PRISONER'S LETTER

Midnapore Central Jail

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

মঙ্গলবার,

২. ১০. ৩৪

শতকোটী ভূমিষ্ঠ-প্রণাম,

মা, আপনার পত্র পাইয়াছি। মা, যদিও আমি আপনার আঁধার ঘরের আলো ছিলাম এবং যদিও এই ভারতের মহামানবের সাগর

তীর হতে, এই 'সব পেয়েছি'র দেশ হতে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছি, তথাপি আমি নিশ্চয় করে বলে যাচ্ছি আপনার ঘর কখনও অন্ধকার হবে না। এই "যোগ সাধন রহস্য" বইটি আপনার জন্য দিয়ে গেলাম। যদিও আপনার বয়স-আধিক্য ও অর্থাভাব আপনার শোককে বাড়িয়ে তুলবে তথাপি আমার বিশ্বাস, চাঁদের আলো, মধুর বাতাস, আকাশের পাখিরা গান গেয়ে বলবে: "ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উঠ"। মা, আপনার মত গুণবতী মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করেও ভগবানের কাজ, পাঁচজনের কাজ, কোন কিছুই করতে পারলাম না, এইজন্য আপনাদের নিকট ক্ষমা চাইছি। আপনাদের নিকট যে স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি তার জন্য আমি ধন্য।

মা, আপনি, ঠাকুরমা, দিদিমা, পিসিমা, কাকিমা এবং আর আর গুরুজনদের বলবেন তাঁদের নিকট আমার অক্ষমতার জন্য ক্ষমা চাইছি, এবং আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাচ্ছি, এবং শেষ-বিদায় চাইছি। মা, ফিরে আসবার যদি কোন পথ থাকে তবে এই 'সব পেয়েছি'র দেশে ফিরে আসব—তখন চরণে স্থান দেবেন। আমার মা, মা আমার, প্রণাম নিন।

"তবে আমি যাই গো তবে যাই,
ভোরের বেলা শূন্য কোলে ডাকবি যখন 'বেজা' বলে,
বলবো আমি—নাই গো 'বেজা' নাই, মাগো যাই।"

ইতি আপনাদের স্নেহের
প্রণত—ব্রজকিশোর চক্রবর্তি

Contents admissible under the rules. Passed & may be posted.

S/d—Illegible
Jailor

S/d—Illegible.
Superintendent

(দুই)

PRISONER'S LETTER

Midnapore Central Jail

শ্রীশ্রীহরি শরণম্

মঙ্গলবার,

২১. ১০. ৩৪

শতকোটী ভূমিষ্ঠ-প্রণাম,

বাবা, আপনি চার বছর আগে বলেছিলেন যে, যখন আমার চন্দ্রের দশা পড়বে তখন আমাকে ১২ বছর প্রবাসে বাস করতে হবে। এমন কি আমার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নয়, এই কথা আজ বর্ণে বর্ণে সত্য হচ্ছে। বাবা আপনার মত দূরদর্শী বিদ্বান পণ্ডিত ব্যক্তির ঘরে জন্ম নিয়ে আমি ধন্য। হয় আমি অক্ষম, নয় আমি আপনার পদসেবা করবার যোগ্য নই, তাই আমি কোন কিছু করতে পারলাম না। বাবা, গর্ব করবার মত অত ভগবানের প্রতি বিশ্বাস নেই, তবে যতটা আছে তাতে এইটুকু বলতে পারি, যিনি আপনাদের-আমাদের ভগবান তিনি আমার ইষ্টদেবী—

"তারি মাঝে যাব অভিসারে
তাঁর কাছে—জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি, কে সে! জানি নাই কে, চিনি নাই তারে
শুধু এইটুকু জানি—তারি লাগি রাত্রি অন্ধকারে
চলেছে মানব-যাত্রী···।"

বাবা, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনার চরণের ধূলি আমার পথের সম্বল হবে। গুরুজনদের আমাকে ক্ষমা করতে বলবেন এবং তাঁদের আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাচ্ছি এবং বিদায় চাইছি। আপনাকে সান্ত্বনা দেবার মত ভাষাও নেই, ক্ষমতাও নেই। আমার বিশ্বাস আপনি সকলকে সান্ত্বনা দিয়ে স্থির

করবেন। ফিরে এলে আপনার মত মহাপুরুষের চরণ-ধূলি ও চরণের স্থান হতে বঞ্চিত করবেন না—এই আমার শেষ অনুরোধ। আপনার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করলাম আর করযোড়ে আপনার নিকট ইহজন্মের শেষ-বিদায় প্রার্থনা করছি। ইতি—

প্রণত—ব্রজ

পুঃ—জেলগেটে এসে বই সকল, জামা কাপড় ও টাকা পয়সা নিয়ে যাবেন। 'গীতা' পুস্তকটি আপনার করকমলে দিয়ে গেলাম।

Contents admissible under the rules. Passed. May be posted.

S/d—Illegible S/d—Illegible

Jailor *Superintendent*

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের চিঠি

[চট্টগ্রাম-যুববিদ্রোহের শহিদ, পাহাড়তলী-অভিযানের অধিনায়িকা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ইউরোপীয়ান্-ক্লাব-আক্রমণেরই পূর্বদিন, অর্থাৎ মৃত্যুপূর্বদিন পলাতক অবস্থায় থেকে তাঁর জননীকে যে-পত্র লেখেন তার কিছু অংশ এখানে দেওয়া হল।]

২৪শে সেপ্টেম্বর

১৯৩২

মাগো!

তুমি আমায় ডাকছিলে? আমার যেন মনে হল তুমি আমার শিয়রে বসে কেবলি আমার নাম ধরে ডাকছ। আর তোমার অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভেসে যাচ্ছে!···মা! সত্যি কি তুমি এত কাঁদছ? আমি তোমার ডাকে সাড়া দিতে পারলাম না—তুমি আমায় ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে চলে গেলে।···মা! আমায় তুমি ক্ষমা কর—তোমায় বড় ব্যথা দিয়ে গেলাম। তোমাকে দুঃখ দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়। আমি স্বদেশজননীর চোখের জল মুছাবার জন্য বুকের রক্ত দিতে এসেছি। তুমি আশীর্বাদ কর, নইলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে না।···

একটিবার তোমায় দেখে যেতে পারলাম না। সেজন্য আমার হৃদয়কে তুমি ভুল বুঝো না। মাগো, তুমি এমন করে আর কেঁদো না! আমি যে সত্যের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি—তুমি কি তাতে আনন্দ পাও না? কি করবে মা! দেশ যে পরাধীন! দেশবাসী যে বিদেশীর অত্যাচারে জর্জরিত, দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, উৎপীড়িতা! তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবে না? তুমি কি কেবলই কাঁদবে? আর কেঁদো না মা! তুমি আর চোখের জল ফেলো না!···(এই পৃথিবী থেকে) যাবার আগে আর একবার তুমি আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ো। আমি তোমার কাছে জানু পেতে ক্ষমা চাইব। আমি যে তোমার মনে বড়ই ব্যথা দিয়ে এসেছি মা! তুমি আমায় ক্ষমা করো, ক্ষমা করো মা!···ইতি—

তোমার রাণী

(প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার)

ভবানী ভট্টাচার্যের চিঠি

['ব্ল্যাক্ এণ্ড ট্যান্' নীতির জনক, আইরিশ-আন্দোলন দমন-চেষ্টার অন্যতম নায়ক, বাঙলার কুখ্যাত গভর্ণর স্যার জন্ এণ্ডারসন্-শায়েস্তাকারী তরুণ বিপ্লবী-শহিদ ফাঁসির কক্ষ থেকে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে যে ছোট্ট পত্র পোস্টকার্ডে লিখেছিলেন, তার দু'টি পংক্তিই সাধক-বিপ্লবীর স্বরূপ পরিস্ফুট করে দেয়। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যা তিনি বলে গেছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হল।]

রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেল,

৩০শে জানুয়ারি, ১৯৩৫

স্নেহের খোকা,

অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায়—সাধক সেখানে সিদ্ধিলাভ করে।···আজ আমি বেশি কথা লিখব না, শুধু ভাবব।···মৃত্যু কত সুন্দর! অনন্ত জীবনের বার্তা তার কাছে।···

তবে এইটুকু বলি, তোমাদের সংবাদ আমি চাই। আমার চিঠি না পেলেও চিঠি দিয়ো। দূরে এসে আমি যেন তোমাদের আরো কাছে পাই। ভাবি, তোমরা যেন আমার পাশের ঘরেই আছ।

মা ও বাবাকে শতকোটী প্রণাম জানাবে। আমার দিদির পাদপদ্মতলে আমার অজস্র প্রণাম।

বুকভরা স্নেহ তুমি ও ছোট্ট বোনটি নিয়ো।

তোমার ছোটদা

ভবানী প্রসাদ

॥ বাইশ ॥

তাঁরাও দিয়ে গেছেন কম নয়

["কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি' কত বোন দিল সেবা ;
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা ?"

…কেউ লিখে রাখেনি। তারা সবার অজ্ঞাত, অখ্যাত। তাঁদের কেউ চেনে না। সারা ভারতবর্ষের বিপ্লবী-সংগ্রামে কত জায়া-জননী ও ভগ্নী যে স্বামীপুত্র ও ভ্রাতাদের সাহায্যকল্পে অতুল স্নেহে ও সাহসে এগিয়ে এসেছিলেন, তার ইতিহাস কতটুকুই বা লেখা আছে !]

গিরিবালাদিদি

নিমতলা মহাশ্মশান। একটি শবাধার কাঁধে এলো একটি দল : এ-শ্মশানে 'হরিবোল'-ধ্বনির কোনকালে বিরাম নেই। কত শব আসছে, চিতায় উঠছে। বৈশিষ্ট্য থাকে না বলেই কেউ বিশেষ করে নজর দেয় না। কিন্তু এই শবাধারটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করল ; কারণ, সবাই দেখছে, শবাধারটি জড়িয়ে আছে মস্ত একটি জাতীয়-পতাকা। জ্বলজ্বল করছে তেরঙ্গা নিশান। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তার বুকে অশোকচক্র।

পুরোভাগের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করল কেউ কেউ : 'কে মশায় ? কার দেহাবসান ঘটল ? কোন জাতীয়-নেতা নাকি ?'

—"আমার বৃদ্ধা দিদি। 'জাতীয়' বটে, তবে নেতা নন।"

ভিড় জমেছে কিছুটা। ঔৎসুক্য সবার চোখে-মুখে। মনে আসে তাদের নানা প্রশ্ন। কিন্তু স্বল্পবাক শবযাত্রীদের বেশি কিছু প্রশ্ন করতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। তবু সারাক্ষণের চেষ্টায় খুঁটে খুঁটে তারা বৃদ্ধার কথা সামান্য জেনে নেয়। তাদের শ্রদ্ধা বাড়ে।…

আনুষ্ঠানিক কর্মাদি সমাপ্ত করে যথাসময়ে চিতায় তুলে দেওয়া হল সেই শব দেহ। বহ্নিশিখার নির্মম দাহ ভস্মীভূত করে ফেলে ৭৬ বছরের একটি ইতিহাস। সে-ইতিহাস কে-বা জানে! সঙ্গোপনে শতদলের মত বিকশিত হয়েছিল সে-ইতিহাস আগুন-রঙে রাঙা এক যুগে।

গিরিবালা দেবী। ১৮৯৪ সালে তাঁর জন্ম। জন্ম হয় ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণার 'এনায়েৎনগর' গ্রামে। পিতার নাম স্বর্গীয় কৈলাশচন্দ্র সাহা-রায়। ৯ বছরে তাঁর বিয়ে হল। ১০ বছরে বিধবার বেশ পরে তাঁকে পিতার সংসারে ফিরে আসতে হয়। পিতার জমাট ব্যবসা নারায়ণগঞ্জ শহরে। গ্রামের গৃহে থাকেন মা ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। ক্রমে গিরিবালা বড় হলেন। সংসারের দায়িত্ব তাঁর উপরই পড়ল। কারণ, মা রুগ্না।

১৯২৬ সালের কথা বলছি। পিতার দেহাবসান ঘটেছে কিছু দিন পূর্বে। গিরিবালা পিতামাতার প্রথম সন্তান। তিনি এখন পাকা গৃহকর্ত্রী। রুগ্না মা এবং ভ্রাতৃবধূকে নিয়ে গিরিবালা দেশের বাড়িতে থাকেন। ভাইদের মধ্যে পদ্মপলাশ সাহা-রায় ছিলেন বড়। তিনি ছোট ভাইদের নিয়ে থাকেন নারায়ণগঞ্জের গদিতে। ব্যবসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর উপর। অধিকন্তু ছোট ছোট ভাইগুলোর পড়াশোনার দিকেও তাঁর নজর রাখতে হয়। সুমন্ত্র, নগেন ও ধীরেন তাঁর অনেক ছোট পড়ুয়া-ভাই। পড়ত তারা নারায়ণগঞ্জ-স্কুলে।

বাঙলার উনিশ শ' ছাব্বিশ সাল আগুন ছুঁয়েছে সঙ্গোপনে। তার তাপ বাঙলার ছাত্র-ছাত্রীদের রক্তে লেগে গেছে। সুমন্ত্র, নগেন ও ধীরেন কখন যেন সেই আগুন স্পর্শ করে ফেলেছে। নারায়ণগঞ্জে 'বি. ভি.'র সংস্থা জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। ঐ দলের তরুণ-কর্মী মালু ব্যানার্জির প্রভাবে তিনটি বালক মুগ্ধ। সহসা তাদের চলাফেরা,

হাবভাব ও চরিত্র বদলে গেল। দাদা বুঝলেন কিছুকাল পরে যে, ভাইগুলোর মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে 'স্বদেশী-রোগ'। আর উপায় নেই। ঝাড়ে-বংশে এবার পুলিশের কোপে শেষ হতে হবে। তিনি তিনটি ভাইকেই ১৯৩০ সালে পাঠিয়ে দিলেন গ্রামের বাড়িতে। ভর্তি হল তারা আবদুল্লাপুর উচ্চ-বিদ্যালয়ে। এনায়েৎনগর থেকে মাইলখানেক দূরে ঐ স্কুল।

কিন্তু দাদা পদ্মপলাশের হিসেবে ভুল হল। 'স্বদেশী-রোগ' শুধু শহরে-বন্দরে আবদ্ধ থাকবে এ-ভরসা তাঁকে কে দিয়েছিল? তিনি ধারণা করতে পারেন নি যে, অভিভাবকশূন্য গ্রামের আবহ এ-সব কাজের কত অনুকূল। অবশ্য পরে টের পেয়েছিলেন তিনি ভাল করেই।...

১৯৩০ সালের বাঙলা। তার বুকে দাউদাউ করে জ্বলছে বিপ্লবের আগুন। সে-অগ্নিতাপ আর অলক্ষ্যে নেই। সবার গোচরে সে-তাপতরঙ্গ প্রবাহিত। তার স্পর্শে সবার রক্ত টগ্‌বগ করছে।

সুমন্ত্র-নগেন-ধীরেনদের গ্রাম ও পরগণা জুড়ে বিপ্লবীদের আনা-গোনা। সাহা-রায়দের বাড়ি 'বি. ভি.'-কর্মীদের মস্ত আড্ডা—অবশ্য প্রকাশ্যে নয়। এমন রাত বাদ যায় না—যে-রাতে দু'একটি পলাতক কর্মী ঘুরে-ফিরে ঐ গৃহে আশ্রয় না নেন। ও-গৃহে শহিদ বিনয় বসুর বন্ধু সুপতি রায়ের আগমন ঘটে প্রায় রাতেই।

সাহা-রায়দের মস্ত বাড়ি। বসত-বাড়ির অদূরে ছিল তাঁদেরই একটি আলাদা ছোট্ট গৃহ। তার অবস্থান নির্জনে। সেখানেই বিপ্লবী-বন্ধুদের রাখা হত। পলাতকরা নিশ্চিন্তে সে-গৃহে আশ্রয় নিতেন। কিন্তু এ-সব ব্যবস্থা কি গৃহকর্ত্রীকে না-জানিয়ে করা চলে? তা'ছাড়া গৃহকর্তা পদ্মপলাশবাবু নারায়ণগঞ্জে থাকলেও তাঁকে গোপন

করে সবকিছু করে-যাওয়া অসম্ভব, দিদির সাহায্য ব্যতীত। অতএব দিদি গিরিবালা দেবীর সাহায্য চাই-ই।··

দি দি দেখছেন যে, ভাইদের বন্ধু ছোট-ছোট ছেলেগুলো তাঁদের বাড়িতে ঘন ঘন আসে। বড় মায়া লাগে ওদের ঘিরে। বড় ভাল ছেলে ওরা। স্বভাব-চরিত্রে যেন সোনার টুকরো। ভাইদের কাছে শোনেন যে, ওরা নাকি নিজেদের কথা ভাবে না—ভাবে পরের কথা। পরের রোগে-দুঃখে-শোকে এগিয়ে যায়। তাই ওদের ভালবাসে পাড়াপড়শী।···দিদি দূর থেকে ওদের আলাপ-আলোচনা কখনো শুনতে পান। ওরা বলে: দেশটা আমাদের। আমরা দেশের। আমরা বিশেষ একটি পরিবারের নই। আমরা সকল পরিবারের। দেশ আমাদের মা। দেশ আমাদের বাবা-মারও মা। সমাজের যত অন্যায় তা আমরা মানি না। আমরা মানি না ছোট-বড় জাত। মানি না ধনী-নির্ধনের পার্থক্য বা হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টানের বিভেদ। মানি না পুরুষের বহুবিবাহ এবং বিধবার উপর সমাজের নির্মম শাসন···। আর শুনতে হয় না। দিদির চোখদু'টি ছলছলিয়ে ওঠে। একটি সঙ্গোপনে-লালিত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে গভীর হয়ে। ন' বছর বয়সের এক গোধুলি-লগ্নের কথা মনে পড়ে—স্বপ্ন—সে এক অসহ্য স্বপ্ন!···

দিদির বড় ভাল লাগে এই ছেলেগুলোকে। ওদের কারো সঙ্গেই তিনি আলাপ করেন না। কিন্তু ওদের মধ্যেকার অব্যক্ত আগুন তাঁর শীতল দেহকে উত্তাপ দেয়। দূর থেকে স্নেহধারায় ওদের স্নাত করেন। বড়বাড়ি থেকে স্বহস্তে রান্না-করা খাবার নিজে দিয়ে যান ছোটবাড়িতে। ভাইদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে নিজেই আবার বাসনপত্তর ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। বাড়ির ঝি-চাকর জানে না, ছোটবাড়িতে সুমন্ত্ররা তিনটি ভাই ছাড়া আরো কেউ কখনো সেখানে আসা-যাওয়া বা খাওয়া-দাওয়া করে কিনা। নারায়ণগঞ্জে বসে পদ্ম-পলাশও কিছু জানতে পারেন না কোন সূত্রে এ-সব গোপন ঘটনা।···

'বি. ভি.'-র সংগঠন কার্য চলছে এখান থেকে। চলছে বিক্রমপুর পরগণার এক অঞ্চলের দল-গড়ার ব্যবস্থা এই ভাবে।...

ক্রমশ দিদি নিজের অজ্ঞাতেই দলের একজন হয়ে গেলেন। ভাল তিনি বাসতেন ভাইগুলোকে। সেই ভালবাসা ছড়িয়ে গেল ভাইদের দেখা না-দেখা বন্ধুদের ঘিরে। তারপর ধীরে ধীরে তাঁরই অজান্তে ভালবেসে ফেললেন তিনি বাঙলার সকল দামাল ছেলেদের—কানাই-ক্ষুদিরাম থেকে শুরু করে ঐ সেদিন ঢাকা শহরে লোম্যান্ সাহেবকে হত্যা করে যে-ছেলে পালিয়ে গেল তাকে পর্যন্ত, সকল দুরন্ত সন্তানদের। আহা, বিনয় পালিয়ে পালিয়ে কোথায় যেন দিন কাটাচ্ছে! মায়ের দুলাল কি কষ্ট-ই-না পাচ্ছে! আসত যদি ছেলেটা তাঁর কাছে! শিশুর মত বুকের আড়াল করে রাখতেন তিনি তাঁকে পুলিশের দৃষ্টি থেকে।...কিন্তু ভুলেও ও-সব চিন্তা প্রকাশ করেন না তিনি সুমন্ত্র-ধীরেনদের কাছেও. অজ্ঞাতে 'মন্ত্রগুপ্তি' তাঁর রপ্ত হয়ে গেছে।...

তারপর ১৯৩৪ সাল অবধি চলল লড়াই। কত ছেলে এসেছে তাঁর গৃহে রাতের অন্ধকারে। দুপুর রাতেও কতদিন উনুন ধরিয়ে রান্না করে পরম আদরে খাইয়েছেন সে-সব পলাতকদের তিনি।... তিনি লক্ষ্য করেন, ভাইদের মধ্যে ধীরেন যেন বেশি মেতে উঠেছে। অন্য ভাইরা যেন পিছিয়ে যাচ্ছে। ধীরেনকে ঠেকান যায় না। ধীরেনকে তাঁর ভাল লাগে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জে ধীরেনের যাতায়াত বেড়েই যাচ্ছে। ক্রমে দাদাও টের পেলেন। টের পেতেন না—কিন্তু একদিন পলাতকদের খোঁজে বাড়ি ঘেরাও করেছিল পুলিশ। দিদিরই বুদ্ধি ও সাহসে সেবার পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন পলাতক যুবকটি। পুলিশের কাছে প্রমাণ হল না যে, 'সাহা-রায় বাড়িতে' কোন পলাতক থাকে।...কিন্তু তাদের সন্দেহ তাতে বিন্দুমাত্র দূর হল

না। দাদাকে শাসন করল পুলিশ। কিন্তু দাদাও যেন কেমন বদলে যাচ্ছেন! কারণ, 'লোম্যান্-শুটিং' ঘটে যাবার পর দাদা পদ্মপলাশবাবুরও কেমন যেন গর্ব করার মত কিছু লাভ হয়েছে! রাইটার্স-প্রাসাদের অলিন্দ-যুদ্ধের কাহিনী শুনে তাঁর রক্ত নূতন খাতে বইতে শুরু করল।...তিনি এবার বাড়ি এসে ভাইদের ভালমন্দ কিছু বললেন না। একটি ঘরে চাল বোঝাই করে তালা দিয়ে রাখলেন। দিদিকে শুধু বলে গেলেন: "ধীরেনদের যে-কেউ যখন খুশি এলে তুমি, দিদি, তাদের খাওয়াবে। তারা যেন না-খেয়ে কখনো এ-বাড়ি থেকে না-যায়। এই ছেলেগুলো যে তোমার-আমার গর্বের ধন। তুমি তাদের 'মা' হয়ে থাক। শান্তি পাবে।"...

এই হলেন পদ্মপলাশ সাহা-রায়। ধীরেন সাহা-রায়ের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দিদির কনিষ্ঠ ভাই। কঠিন তাঁর বাইরেটা—অন্তর তাঁর দেশপ্রেমে স্নিগ্ধ।...

১৯৪১-'৪২ সাল। সুভাষচন্দ্রের বিস্ময়কর অন্তর্ধান-সংবাদে দেশ উৎকণ্ঠিত। একদিন ভেসে এলো তাঁর কণ্ঠ বার্লিন-রেডিও থেকে। সবাই ব্যাকুল চিত্তে সে বাণী-সুধা পান করে। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য স্পষ্টই যেন:

"রক্ত এখনও দিতে হবে ঢের
দিতে হবে আরো প্রাণ,
মৃত্যুর তীরে জীবনের ধ্বজা ওঠাতে॥"

বাঙলার মানুষ ওতে অভিনব জীবনের সর্বনাশা স্বাদ পেয়ে যায়।...

'বি. ভি.'-র বহু ছেলে পলাতক। বহুজনের গোপন গতায়াত ধীরেনের অবর্তমানেই তাঁদের বাড়িতে সমানে চলেছে। ধীরেনের

দাদার ভাতডালের ব্যবস্থায় কার্পণ্য নেই। দিদির আপ্যায়নে ও অন্নদানে ত্রুটি নেই।…ইতিমধ্যে একটি পলাতক—নাম তাঁর অসিত ভৌমিক—পেলেন পিতার মৃত্যুসংবাদ। পলাতক-অবস্থায় যথারীতি অশৌচ-পালনই চলে না—শ্রাদ্ধশান্তি তো দূরের কথা।

কিন্তু দিদি বললেন : কৃচ্ছ্রসাধন তোমরা যা করছ তার তুলনা নেই। ওতেই হবে। তবে শ্রাদ্ধের কাজ বাদ দেওয়া যাবে না। আমি ব্যবস্থা করব।

করলেন তিনি ব্যবস্থা। এক পুরুত ডাকিয়ে যথাসময়ে তাঁর 'সদ্য আগত অতি দূর সম্পর্কের গরীব ভাইটির' পিতার শেষকৃত্য তিনি করিয়ে দিলেন। কেউ অন্য কিছু টের পেল না। পুরুতও বুঝল না।…

১৯৪৩ সালের কথা। কলকাতার পলাতকরা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে পারছেন না। কারণ, পুলিশের ভয়ে বাড়িওয়ালারা মহিলা ছাড়া শুধু ছেলেদের বাড়ি ভাড়া দিতে নারাজ।

ধীরেন ও তাঁর বিপ্লবী-বন্ধুরা পরামর্শ করে দিদিকে নিয়ে এলেন কলকাতা। বলরাম দে স্ট্রীটে একখানা এক-ঘরের বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল। দিদি গৃহকর্ত্রী। ধীরেনের সঙ্গে আছেন তাঁর ছোট ভাই রূপে সত্যব্রত মজুমদার ও নীরেন রায়।

এই বাড়ি ছিল একটি গোপন আড্ডা, তৎকালীন 'বি. ভি.'-কর্মীদের। রাতের অন্ধকারে এখানে সত্যরঞ্জন বক্সি মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুধীর বক্সি মাঝে-মাঝে আসতেন দু'টি পাঞ্জাবী-তরুণকে নিয়ে। এই তরুণদ্বয় 'ইউ বোটে' এসেছেন ভারতের উপকূলে। বর্মা থেকে এনেছেন তাঁরা নেতাজির নানা নির্দেশ শরৎ বসু ও সত্য বক্সির কাছে নিবেদন করার জন্যে। শরৎবাবু এ-সব ব্যক্তিকে স্বভাবতই সত্যবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। সত্যবাবুর ছোট ভাই পুলিশের সন্দেহভাজন

ছিলেন না বলেই তাঁর মাধ্যমে নেতাজি-প্রেরিত 'আই. এন্. এ.'-র কর্মীরা 'বি. ভি.'-র পলাতক কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন।...

দিদি সবই বুঝতেন। পরম আনন্দে তিনি ভাইগুলোর দুর্জয় সাধনার সাক্ষী হয়ে তাঁদের শত্রুধ্বংসী মহা-যজ্ঞের সমিধ সংগ্রহ করে চললেন।...

বলরাম দে স্ট্রীটের বাড়িটা নানা কারণে ছেড়ে দিতে হল। ধীরেনরা উঠে এলেন চিৎপুর ও বিবেকানন্দ রোডের মোড় থেকে চিৎপুরের দিকে, সামান্য দূরে, শিবঠাকুর লেনের চারতলায়। এখন সঙ্গী একটি বেড়েছেন। তাঁর নাম গোপাল সেন। বন্ধুদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ কিশোর।...

ধীরেনদের কার্যকলাপ দিন দিন বিপদসঙ্কুল হচ্ছে বললে কিছুই বলা হয় না। বর্মার পরিস্থিতি, বিশ্বযুদ্ধের উত্থান-পতন ইত্যাদির সঙ্গে দোল খাচ্ছে 'বি. ভি.'-কর্মীদের অবস্থাও। অগ্নিকুণ্ডের উপর তাঁদের শয্যা। তাই স্থির হল যে, দিদিকে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

দিদি দেশে চলে গেলেন। ঠিক তার সাত দিন পরে শিবতলা লেনের বাড়ি পুলিশ ঘেরাও করল। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার—১৯৪৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর। কিছুক্ষণ পূর্বেই 'আই. এন্. এ.'-র লোকেরা একটি নক্সা ও প্ল্যান্ রেখে গিয়েছিলেন ধীরেনদের কাছে। ধীরেন ও সত্যব্রত বেরিয়ে গেছেন 'আই. এন্. এ.'-র লোক দু'টির সঙ্গে। ঘরে আছেন নীরেন রায় ও গোপাল সেন। পুলিশ দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে চাচ্ছে। নীরেন রুখছেন পুলিশকে সর্বশক্তি দিয়ে বন্ধ দরজাটা চেপে রেখে। গোপাল ইতিমধ্যে কাগজপত্রে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু দরজা ভেঙে গেল। সদলবলে পুলিশ ঘরে ঢুকতেই গোপাল যে-সব কাগজ পোড়ান যায়নি, তা বুকে আঁকড়ে

রাখলেন। পুলিশের সঙ্গে শুরু হল টানাহ্যাঁচড়া, ধাক্কাধাক্কি, জাপ্‌টা-জাপ্‌টি। একটা সেপাইয়ের সঙ্গেই গোপালের প্রচণ্ড মল্লযুদ্ধ। এক ফালি রাস্তার-ধারের-বারান্দা। দু'জনে জড়াজড়ি করে ছিট্‌কে এসে পড়লেন সেখানে। অন্য সেপাইরা সাহায্যে আসতে পারে না স্থানাভাবে। বারান্দার রেলিঙ ছিল খুব নিচু। পুলিশটা গোপালকে সহসা ছেড়ে দিয়েই ক্রোধের বশে দিল তাঁকে রাস্তার দিকে ধাক্কা। চারতলার বারান্দা থেকে গোপাল সেন তীরবেগে ছুটে এসে পড়লেন নিচের রাস্তায়। চূর্ণবিচূর্ণ প্রাণহীন দেহ। কিন্তু কাগজপত্র তাঁর বুক থেকে তখনো কেউ কেড়ে নিতে পারেনি!···

দিদি চলে এসেছেন দেশে। শুনলেন তিনি গোপালের শহিদ-লোকে আরোহণ-কাহিনী, বন্দী নীরেনের নির্যাতন-সংবাদ। তারপর জানলেন ১৯৪৪ সালের অক্টোবরে তাঁর প্রিয়তম ছোটভাই ধীরেনের গ্রেপ্তারের কথা। তারও কিছুদিন বাদে (১৯৪৫ সালের শেষের দিকে) জানলেন তিনি সত্যব্রতের ধরা পড়ার খবর। অর্থাৎ, যে নীড় তিনি শিবঠাকুর লেনের গৃহ-শীর্ষে রচনা করে এসেছিলেন—তা ভেঙে গেছে। গোপাল ইহলোক থেকেই অন্তর্হিত, নীরেন-ধীরেন-সত্যব্রত পর পর কারাগৃহে বন্দী।···সুধীর বক্সিকে দেখেছেন তিনি কখনো-সখনো তাঁর নীড়ে আনাগোনা করতে। তাঁকেও ধরেছে পুলিশ। শুধু ধরা নয়—শুনলেন তিনি একদিন যে, তাঁর ভাই ধীরেন সাহা এবং সুধীর বক্সি ও সত্যব্রত মজুমদারকে মিলিটারির হাতে তুলে দিয়েছে বাঙলার পুলিশ। তাঁদের নিয়ে গেছে লাহোর ফোর্টে। দিনের পর দিন চলছে তাঁদের উপর অত্যাচার মিলিটারি-কায়দায়।···

দিদির চোখে ঘুম নেই। তাঁর স্নেহের ভাইগুলোর কথা মনে হতেই দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা নামে।···

১৯৬৮ সাল শুরু হয়েছে। রোগেশোকে বার্ধক্যে জীর্ণা দিদিকে আর চেনা যায় না।···দেশ নাকি স্বাধীন হয়ে গেছে। কিন্তু এমন স্বাধীনতা চাইতে গিয়ে কানাই-ক্ষুদিরাম বা গোপাল সেনরা জীবন দিয়েছিলেন কি ?···দিদি ভাবেন। দিদি আরও ভাবেন —হাতেনাতে কী পেলাম ? ··দিদি আছেন পাকিস্তানের বাড়িঘর আঁকড়ে। তাঁর মনে হয়··পাকিস্তান যেন ব্রিটিশের শাসনকেও হার মানিয়েছে !··

পদ্মপলাশবাবু কিছুদিন হয় মারা গেছেন। অন্য ভাইরা এবং দিদি এতকাল দেশে থাকলেও ধীরেন তো বাড়ি-ঘরে আসতে পারেন না ! মাঝে মাঝে কোন ক্লান্ত দিনে পুরাতন স্মৃতি তাঁর মনে আসে। চেষ্টা করেন তখন ওপারের বাঙলার হাওয়া নিঃশ্বাসে গ্রহণ করতে—যদি বা সেখান থেকে স্বাধীনতার গন্ধ টেনে আনা যায় ! তা'ছাড়া এখন খুব ইচ্ছা হয় শেষের ক'টা দিন কলকাতায় ধীরেনের কাছে গিয়ে থাকতে, ধীরেনের পুরাতন বন্ধুগুলোর গায়ে-মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দিতে।···

১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে ধীরেন দিদিকে কলকাতা আনার ব্যবস্থা করলেন। এসে উঠলেন তিনি ধীরেনের ৮নং নারকেলডাঙ্গা রোডের বাড়িতে।··

দেহ ক্রমশঃ ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। বলতেন মাঝে মাঝে—আর বাঁচব না।···

ধীরেন কোন কাজে যাচ্ছেন পুরী। যাবার সময় বললেন দিদিকে ঃ পুরী যাচ্ছি, দিদি। তোমার জন্যে কি আনব ?

—কিছু না।

—একখানা সুন্দর নামাবলী ? কেমন ?

—কেন ?

—তুমি বাঁচবে না বলছ। শেষদিন তোমার গায়ে জড়িয়ে দেব ঠাকুরদেবতার নাম লেখা শুদ্ধ বস্ত্র। কি বল ?

—কেন ? তোদের নিশান নেই ? যে নিশানের জন্যে আমার গোপাল মরল, তোরা এত যন্ত্রণা সইলি, নেতাজি দেশছাড়া হলেন ?

ধীরেন নির্বাক !···

ক'দিনের মধ্যেই দিদি দেহত্যাগ করলেন। ত্রিবর্ণরঞ্জিত অশোক-চিহ্নলাঞ্ছিত জাতীয়-পতাকায় তাই গিরিবালা দেবীর মৃতদেহ আচ্ছাদিত।

শ্মশানে জড় হয়েছেন যত আগন্তুক, তাঁরাও সিক্ত-নয়নে দেখছেন—তপস্বিনী এক রয়েছেন শায়িতা ঐ শবাধারে। চিরজীবন দেশকে ভালবেসে গেছেন এই নারী। দেশের অগ্নিক্ষরা দিনগুলোয় অগ্নিশিশুদের লালন করেছেন তিনি। পার্থিব কিছু পাননি, পেয়েছেন তৃপ্তি। মৃত্যুক্ষণেও তাই তাঁর কামনা—ধন নয়, জন নয়, যশ নয়, ধর্ম নয়—শুধু একটু আশ্রয় সেই পতাকার তলে, যার জন্যে নেতাজি লড়েছেন, তাঁর ভাই ও বাঙলার ছেলেমেয়েরা যুদ্ধ করেছেন, তাঁর গোপাল সেন জীবন দিয়েছেন।···

লীলা সরকার

তাজপুর সরকার বাড়ি।

ঢাকা জিলার বিক্রমপুর পরগণায় তাজপুর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সে-গ্রামের নামী পরিবার 'সরকার'দের এই বাড়ি। 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থে পাই: "বিরাট পরিবার। অনেকগুলো হিস্যা। এই সরকার-পরিবার বিত্তে, সাংস্কৃতিক পরিচ্ছন্নতায়, সৌজন্যে ও রাজনৈতিক চৈতন্যে সমৃদ্ধ ছিল। গান্ধীজির নানা আন্দোলনে এ-বাড়ির মেয়ে-

পুরুষের অবদান সে-অঞ্চলে সর্বজনবিদিত। ওঁদেরই নিবারণ সরকার কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট নেতা। বাড়ির তরুণদের অনেকে অবশ্য অহিংসার পথে পা না-বাড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বিপ্লবের কর্মযজ্ঞে।" ('সবার অলক্ষ্যে', ২য় পর্ব, পৃঃ ১৮৮-১৮৯)

এ-বাড়ির ইন্দু সরকার ও শান্তি সরকার দু'টি ভাই। ইন্দু 'বেণু' পত্রিকার আপিসে থাকেন। একনিষ্ঠ কর্মী। দু'টি ভাই-ই 'বি. ভি.'-বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত। শান্তি দেশের বাড়িতে বাস করেই দলের কাজ করতেন। তাঁদের মা আইন অমান্য করে জেল খেটেছেন। সমস্ত বাড়িটাই ছেলেদু'টির প্রভাবে অসম্ভব ঝুঁকি নিয়েছিলেন সেই যুগে। কত নামকরা বিপ্লবীদের যে পলাতক অবস্থায় আপন গৃহে আশ্রয় দিয়ে এঁরা দেশসেবা করে গেছেন, তার কিছু ইতিহাস 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থে লিখিত আছে। আজ সে-গৃহেরই একটি কিশোরীর অবদান-কাহিনী এখানে তুলে দেব।

তাঁর নাম লীলা সরকার। ১৯৩৯ সালে এই মেয়েটি থাকতেন পার্কসার্কাস অঞ্চলে ব্রাইট্ স্ট্রীটের এক গৃহে। 'বি. ভি.'-র বিপ্লবী-কর্মী মধু ভট্টাচার্য বিক্রমপুরে সংস্থার দায়িত্ব নিয়ে আছেন। মেয়েটি তাঁর পাশের গ্রামের শুধু নয়—বন্ধু ইন্দু সরকারদের বাড়ির। কাজেই মেয়ের অভিভাবকদের অনুরোধে 'বি. ভি.'-কর্মী শান্তিময় গাঙ্গুলিকে*

* সুভাষচন্দ্র 'সিনর অর্‌ল্যাণ্ডো ম্যাজোট্টা' এই ইতালীয় নাম নিয়ে রুশ হয়ে জার্মানিতে চলে গেছেন (১৮. ৩. ৪১)। সেখান থেকে কাবুলের 'ইতালীয় লিগেশান'-এ খবর পাঠালেন যে, ভকৎরামকে (পেশোয়ার থেকে কাবুল পর্যন্ত পলায়ন কালে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গী ও গাইড) সত্বর কলকাতা গিয়ে শরৎচন্দ্র বসু ও সত্যরঞ্জন বক্সির সঙ্গে আলাপ করে 'বি. ভি.'-র একজন বিশ্বস্ত কর্মীকে কাবুলে নিয়ে আসতে হবে। সেই কর্মী 'নাশকতা'র টেক্‌নিক্ আয়ত্ত করবেন ইতালীয় বিশেষজ্ঞদের কাছে—কারণ, ভারতীয়-বিপ্লবীদের মধ্য থেকে আধুনিক পদ্ধতিতে

তিনি বললেন ঐ মেয়েটিকে পড়ানর জন্যে। নানা কারণে লীলার স্কুলে পড়া হয়নি। তাই প্রাইভেট্ ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ানর চেষ্টা করতে হবে। শান্তিময় তখন ছাত্র-আন্দোলনে মেতে আছেন। তা'ছাড়া ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-কলকাতা অনবরত যাতায়াত করছেন দলের কাজে। কিছুদিন পড়ানর পর শান্তির পক্ষে মাস্টারী চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। কাজেই মেয়ের ম্যাট্রিক পাশ করা বোধহয় তখনকার মত স্থগিত ছিল।...

১৯৪১ সাল। সুভাষচন্দ্র স্থির করেছেন দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের রাজনীতিক-সুযোগ নেবার সংকল্পে দেশ থেকে পালিয়ে যাবেন। 'বি. ভি.'-র নেতাদের সঙ্গে তাঁর গোপন পরামর্শ চলছে। টাকা-পয়সার প্রয়োজন নানা কাজের জন্যে। পলায়নের পূর্বব্যবস্থাকল্পেও অর্থের প্রয়োজন, 'বি. ভি.'-র দল চালানর জন্যেও টাকাকড়ি দরকার। রাজনৈতিক-ডাকাতির প্রোগ্রাম বহুকাল পূর্বেই প্রত্যাহৃত। কাজেই ১৯৪১ সালে অন্তত বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজন-শুভানুধ্যায়ীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না।

দলনেতারা শান্তি গাঙ্গুলিকে পাঠিয়ে দিলেন ঢাকায়। ঢাকা শহর, নারায়ণগঞ্জ বন্দর এবং ঢাকা জিলার অন্তর্গত গ্রামগুলো মোটামুটি চষে বেড়াতে হবে অর্থ তোলার দায়িত্ব নিয়ে। শান্তি

উক্ত কাজের উপযুক্ত একটি স্কোয়াড্ তৈরি করতে হবে। নেতাজির ভারত আক্রমণের কালে উহার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ভকৎরাম কলকাতা এসে শরৎবাবুর মাধ্যমে সত্য বক্সির সঙ্গে দেখা করেন। বক্সিমহাশয় 'বি.ভি.'-র একটি তরুণ কর্মীকে এই কাজের জন্যে কাবুল পাঠান। তিনি কাবুল পৌঁছেন ১৯৪১ সালের ১৮ই এপ্রিল। সেই তরুণই উল্লিখিত শান্তিময় গাঙ্গুলি।

('সবার অলক্ষ্যে', ২য় পর্ব, পৃঃ ২০১-২০৭)

গাঙ্গুলি ও অসিত ভৌমিক এ-কাজের তাগিদেই গেছেন বিক্রমপুর। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সন্ধ্যায় এসে পৌঁছেছেন তাঁরা তাজপুর। শীতের রাত। ক্লান্ত পা। শ্রান্ত দেহ। একটু আশ্রয় চাই। খানিকটা এগুলেই 'সরকারবাড়ি'। শান্তি সরকার তো বাড়ি আছেনই। আশ্রয় নিশ্চিত। সরকারবাড়ির সুখ-আপ্যায়ন কল্পনা করতে করতে দুই বন্ধু এগিয়ে গেলেন।...সরকারবাড়ির প্রবেশদ্বারে কয়েকটি তরুণ বসে গল্প করছে। শান্তি গাঙ্গুলি জিজ্ঞেস করলেন যে, শান্তি সরকার ঘরে আছেন কিনা।

উত্তর এলো : গ্রামেই নেই।

—কোথায় গেছেন?

...বাইরে। আজ ফিরবেন না।

সহসা নৌকো থেকে মাঝ-দরিয়ায় তাঁদের যেন কেউ ফেলে দিল। এই শীতের রাতে কোথায় আশ্রয়? দিনকাল খারাপ—কে-ই বা সাধ করে অজানা ছেলেদের ঘরে ঢুকিয়ে পুলিশের গুঁতো খাবে! পুলিশে ছুঁলেও যে আঠার ঘা! কি করা যায়?...শান্তি আস্তে বলছেন অসিতকে : এ-বাড়ির একটি মেয়েকে আমি বছর দুই আগে কিছুদিন পড়িয়েছিলাম। মধুদা পড়াতে বলেছিলেন।

অসিত : কোথায় পড়াতেন?

শান্তি : কলকাতায়।

—তবে আর কি! দেখুন না সে-মেয়ে আছে কিনা!

—এই পাড়াগাঁয়ে এত রাতে একটি মেয়ের নাম করে দেখা করতে চাইলে ঐ জোয়ানদের রি-এ্যাক্‌শান্ কেমন হবে ভাবছি।

—কেমন আর হবে? জিজ্ঞেস করুন। আর দেরি নয়। এদিকে পেট জ্বলে যাচ্ছে! শীতে হাড় কাঁপছে!

শান্তিময় সাহস করে বললেন : আচ্ছা, লীলা আছে? লীলা নামে একটি মেয়ে?

শান্তির আশঙ্কা বেঠিক হল না। জোয়ানদের একজন খেঁকিয়ে

উঠল : কে মশায় আপনি ? কি দরকার ঐ মেয়েকে দিয়ে ? কোত্থেকে আসছেন ?

শান্তি নরম সুরে অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে উত্তর দিলেন : তাকে বলুন গিয়ে যে, কলকাতায় তাকে যে মাস্টারমশায় পড়াতেন তিনি এসেছেন। আমার নাম শান্তিময় গাঙ্গুলি।

শান্তির কথাগুলো শুনেই ছেলেরা শান্ত হল। অতি ভদ্রভাবে আপ্যায়ন করে শান্তিদের তারা ঘরে নিয়ে বসাল।

তারপর লীলা এলেন। অভ্যর্থনা ছিল আন্তরিকতায় সহজ, সৌজন্যে সুন্দর। সরকারবাড়ির এ-বিষয়ে কার্পণ্য থাকতে পারে না। বিপ্লবীদের আশ্রয়দানে এ-গৃহ অলক্ষ্যে এক ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পর শান্তি ও অসিত শয্যায় গা ঢেলে দিয়েছেন। লীলা এসে মাস্টারমশায়কে (শান্তিময়কে) বারে বারে প্রশ্ন করেন যে, কেন তাঁরা এদিকে এসেছেন। শান্তির কোন উত্তরই মেয়ের মনে লাগে না। শেষটায় শান্তি সত্য কথা ব্যক্ত করলেন। বললেন যে, দলের গোপন কাজের জন্যে বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করছেন তাঁরা। পাশের গ্রামে কাজ সেরে, রাতের আশ্রয়ের আশায় মণ্টুর (শান্তি সরকার) খোঁজে এসেছিলেন এ-বাড়িতে।

লীলা চুপ করে কথাগুলো শুনে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। শান্তি ও অসিত লেপের উষ্ণ-আলিঙ্গনে মুহূর্তে ঘুমিয়ে পড়লেন।...

পরদিন অতি প্রত্যূষে শান্তিরা বিদায় নেবেন। লীলা নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে অনাড়ম্বরে ছোট্ট একটি পুঁটুলি শান্তির হাতে তুলে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।...

শান্তি পুঁটুলি খুলে দেখেন, ওর মধ্যে রয়েছে দু'গাছা সোনার চুড়ি আর টুকিটাকি সোনারই কিছু !···

একটি কিশোরী। বয়স কতই বা হবে! সতের কি আঠার! অম্লান এক শিখার গৌরবে তাঁর এ-প্রকাশ কি করে সম্ভব? সম্ভব, কারণ, তাঁরা ছিলেন শুধু একটি বিশেষ পরিবারের নন, একটি বিশেষ যুগের সন্তান। সে-'যুগ' ঘরে ঘরে এমনি ছেলেমেয়ের আসা-যাওয়ার সম্ভাবনা বিরচিত করে রেখেছিল।···

॥ তেইশ ॥

শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

১৯৩২ সাল। সমগ্র বাংলাদেশ বিপ্লবীর পদভারে কম্পিত। ইংরেজের বিপুল বাহিনী, দুর্ধর্ষ আই.বি. ও সাধারণ পুলিশ সারা দেশ তচ্‌নচ্‌ করেও সূর্যসেনকে (মাস্টারদা) ধরতে পারছে না। এদিকে চট্টগ্রামে, ঢাকায় ও কুমিল্লায় এবং মেদিনীপুরে ও কলকাতায় সাহেবদের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। এ দেখে শাসনকর্তা ইংরেজ শুধু্‌ নয়, বণিক শ্বেতাঙ্গদলও আর্ত চিৎকার শুরু করে দিল। বণিকদল সরকারকে প্ররোচিত করে চলল, দেশ জুড়ে দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে বাঙলার মানুষগুলোর উপর নির্যাতন চালাবার জন্যে। বাঙলার বিপ্লবীও তাই আই. সি. এস্. গোষ্ঠীর মৃত্যু-তালিকার মধ্যে বণিক-ইংরেজদের নাম যুক্ত করে দিলেন। ফলে, এই যুগেই বণিক-সভার সভাপতি ভিলিয়ার্স্‌ এবং স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার মূল-সম্পাদক ওয়াট্‌সনকে গুলি খেয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে বিলেতে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

সেদিন, বত্রিশ সালেরই ২৪শে সেপ্টেম্বর। চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার যুদ্ধ-বিজয়ী, যুব-বিদ্রোহের নায়ক, মহাবিপ্লবী সূর্যসেন চট্টগ্রাম শহরের উপকণ্ঠে এক গোপন আস্তানায় অবস্থান করছেন। ইতিমধ্যে স্থির হয়েছে যে, পাহাড়তলীর 'ইউরোপীয়ান ক্লাব' নিশীথের অন্ধকারে আক্রমণ করা হবে। আরো স্থির হয়েছে যে, এ অভিযানের নেতৃত্বভার অর্পিত হবে শ্রীমতী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের হস্তে।

প্রীতিলতা অল্প কিছুদিন হয় বি. এ. পাশ করেছেন। বয়স কতই বা? সম্ভ্রান্ত ঘরের আদুরে কন্যা। কিন্তু বিপ্লবিনীর তপস্যায় তাঁর

রূপান্তর ঘটেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে দশভুজার সাধিকা রূপে লক্ষ্মীবাঈ-এর কাল পর্যন্ত যে-দু'চারটি বীরাঙ্গনা অমিত বীর্যে ও অভ্রান্ত নেতৃত্বে পুরুষের দম্ভকে চূর্ণ করেছেন, তাঁদের প্রতিচ্ছবি প্রীতিলতার নয়নে যেন নেতা সূর্যসেন দেখতে পেয়েছিলেন। তাই নেতা সংকল্প করেছেন যে, একদল সাহসী ও বিশ্বস্ত বিপ্লবী যোদ্ধার নেতৃত্বে প্রীতিলতা যাবেন উল্লিখিত নিশীথ-অভিযান পরিচালনা করতে।

পরিকল্পিত রণযাত্রার পূর্ব লগ্ন। মাস্টারদার (সূর্যসেন) সম্মুখে প্রীতিলতা। প্রীতিলতা কর্মভার বোধে বিনম্র। মাস্টারদার দৃষ্টি দূরপ্রসারিত। নির্বাক চতুষ্পার্শ্ব। সহসা স্তব্ধতার বাঁধ ভেঙে প্রীতিলতা গভীরভাবে বললেনঃ মাস্টারদা, চিরদিন অনুবর্তীর আনন্দে কাজ করেছি। আজ কর্মনেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব দিলেন কেন ? একি আমি পারব ?···মাস্টারদা উত্তর দিলেন : পারবে, বোন। বাঙলার ঘরে ঘরে বীর যুবকের অভাব নেই। পৃথিবীর মানুষ তা জানে। বাঙলার গৃহকোণে বীরাঙ্গনার দল যে আজ রক্ত-বেদিতলে কর্মনিমগ্না তা-ও সবাইকে জানাতে হবে। মনে রেখো, তোমরা 'রাণী ঝান্সী'র উত্তরসাধিকা। ('চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন', পৃঃ ২৪ :)

কর্ণফুলী নদীর খেয়াঘাট। অঞ্চলটির নাম কোয়াপাড়া। তারিণী মাঝি এই পথেই সাম্পান যোগে বিপ্লবীদের নদী পারাপার করে। তারিণীর বলিষ্ঠ দেহ, বুদ্ধিপ্রখর চোখ। অজস্র বিপদে ভ্রূক্ষেপহীন তারিণীর রক্তে 'স্বদেশী'র ছোঁয়া গভীর ভাবে লেগেছে। এ হেন বিশ্বস্ত মাঝির সাম্পানেই কতিপয় বিপ্লবী উঠে পড়লেন। সন্ধ্যার আঁধারে কর্ণফুলীর খরস্রোত ঠেলে তারিণীর নৌকা উজানে পাড়ি জমাল। নৌকারোহীবৃন্দও প্রীতিলতার অনুগামী হয়ে নৈশ-অভিযানে যোগ দেবেন।···

নির্দিষ্ট সময়ে ছদ্মবেশে সকলে একত্রিত হলেন। যোদ্ধবেশা প্রীতিলতা। প্রণাম করলেন মাস্টারদারকে। আশীর্বাদ করলেন তাঁকে তাঁর বিপ্লবের গুরু : বিজয়িনীর গৌরব অধিকার করে ফিরে এসো, বোন।

উত্তরে প্রীতিলতা বললেন : আশীর্বাদ সফল হবে। জয় আমাদের নিশ্চয়। কিন্তু, বিদায় এ-জন্মের মত।...

সহকর্মীরা প্রত্যেকে মাস্টারদাকে প্রণাম করলেন। তাঁদের পরনে কোচোয়ানের পোশাক—ক্লাব-ঘরের বাইরে অপেক্ষমাণ ঘোড়ার গাড়ির কোচ্‌ম্যানদের মত। প্রীতির সামরিক-পরিচ্ছদ গন্তব্যস্থল পর্যন্ত ঢেকে রাখতে হবে। তাই তিনি গায়ে জড়িয়ে নিয়েছেন একখানা সাদা চাদর।...সৈনিকের বেশে সেই নিথর সন্ধ্যায় প্রীতিলতার রূপ সহস্র শিখায় জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু, দীপ্ত নয়নে তাঁর অভয়ার ছায়া ছিল। সিংহবাহিনী যেন আধুনিক রণসাজে দুঃসহা হয়ে পদানত জাতিকে মাভৈঃ মন্ত্র দান করতে এসেছিলেন।

আগ্নেয়াস্ত্র, বোমা এবং বিপ্লবী-যোদ্ধার বন্ধু 'পটাসিয়াম সায়ানাইড্' সঙ্গে নিয়ে মহিয়সী এক নারীর নেতৃত্বে চট্টলার তরুণ-সেনাদল রণযাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন।

রাত্রি প্রায় দশটা। নৃত্যগীত-মুখরিত 'পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান্ ক্লাব'। উৎসব জমেছে। 'হুইস্ট্ ড্রাইভ' খেলায়:শ্বেতাঙ্গ নারী-পুরুষ মত্ত। এদের সংখ্যা চল্লিশের মত। দূরে ক্লাবের সিংহ-দরজায় সার্জেন্ট ও মিলিটারি পুলিশের কঠিন পাহারা। সান্ত্রীদের সুমুখ দিয়েই বিচ্ছিন্নভাবে গাড়োয়ান-বেশী বিপ্লবীদলের একাংশ চলে গেলেন, এবং যে-যাঁর নির্ধারিত স্থান গ্রহণ করলেন। পূর্ব ব্যবস্থা মত সংকীর্ণ এক পথে প্রীতি ও দলের অপরাংশ ক্লাব-ঘরের পশ্চাৎভাগে

ঢুকে পড়লেন। যথাস্থানে 'টাইম্ বম্ব' স্থাপিত হল। মুহূর্তে মহেন্দ্র চৌধুরি ও সুশীল দে 'নৃত্যরসে উচ্ছল' শ্বেতপ্রভুদের উপর গৃহের সুমুখ দিক থেকে বোমা নিক্ষেপ করলেন। সমগ্র হল্‌ঘর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। পিছনের দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে চণ্ডিকার লাস্যে অভিযান-নেত্রী প্রীতিলতা রিভল্‌বার চালাতে লাগলেন। তাঁর সতীর্থদের অকম্পিত হস্তে চালিত আগ্নেয়াস্ত্র থেকেও অজস্র গুলি বর্ষিত হতে থাকল। ক্লাব-ঘরে ভীতত্রস্ত শ্বেত-নরনারীর চোখে তখন শরবিদ্ধ হরিণের আর্ত ছায়া।··

এতক্ষণে সান্ত্রীরা বুঝল যে, সূর্যসেন আক্রমণ করেছেন। ভয়ে তারা পাহারার কর্তব্য ভুলে গেল। বিহ্বলের মত তারা ছুটে গেল হেড্-কোয়ার্টারের দিকে। হয়তো ভেবেছিল যে, এক ব্যাটেলিয়ান্ সৈন্য ছাড়া সূর্যসেনকে ঠেকানো কি সম্ভব?

সেনাধ্যক্ষা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নির্দেশে ক্লাব-ঘরের দুই দিক থেকে আধঘণ্টা ধরে আক্রমণ চলল। হতাহত হল যথেষ্ট। যারা পালাতে পারল তারা বাঁচল। শ্বেতাঙ্গ জাতির শ্বেত-দম্ভ সেই কালরাত্রির দুর্যোগে বীরকন্যা প্রীতিলতার প্রচণ্ড শৌর্যে এবং চট্টলবাসী বিপ্লবীদের দুঃসাহসে ধূলায় লুণ্ঠিত হল।···

আরব্ধ কর্ম সমাপিত। নেত্রী সিটি বাজিয়ে দিলেন। যোদ্ধার দল জোর কদমে প্রীতিলতার সুমুখে এসে সেনাবাহিনীর ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন। মুহূর্তে অবিচলিত-কণ্ঠে আদেশ দিলেন তিনি: 'বন্ধুদল, এবার সরে পড়।'···নেত্রীর আদেশে তাঁরা লঘুপদে রওনা হলেন।··· দূরে দেখা গেল তীব্র সন্ধানী-আলোক ক্ষিপ্রতায় চতুর্দিকে বিচ্ছুরিত করে ছুটে আসছে সাঁজোয়া-গাড়ি।··মহেন্দ্র চৌধুরির খেয়াল হল,— কই প্রীতিদি তো সঙ্গে আসেন নি? তড়িৎ বেগে তিনি ফিরে এলেন প্রীতিলতার কাছে। উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন: 'শীগ্‌গির চলুন, দিদি! সাঁজোয়া-গাড়ি এসে গেল!'···

মাধুর্যমাখা গভীর কণ্ঠে উত্তর এলো : 'ঐ উর্ধ্বলোকে আমার যাত্রা।···তোমরা পালিয়ে যাও, ভাই।' ··

বিভ্রান্ত মহেন্দ্র কিছুই বুঝলেন না।···

প্রীতি স্মিতহাস্যে বললেন : 'কাজ আমার সমাপ্ত। রিভল্‌বারটি নিয়ে যাও।···প্রণাম মাস্টারদাকে। তোমাদের জন্যে একটিমাত্র মন্ত্র—এগিয়ে চল।'···প্রীতিলতা সায়ানাইড্‌ গ্রহণ করলেন।··· মৃত্যুর আলোক জ্বলে উঠল চোখের সুমুখে।

মহেন্দ্র দেখলেন তাঁর মমতাময়ী মহিয়সী নেত্রী 'শহিদে'র ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন পাহাড়তলীর বন্ধুর প্রান্তরে, নিঝুম নিঃসীম নিশীথে। ···ধীরে—অতি ধীরে—বেদনাবিধুর চিত্তে 'দিদি'র দেওয়া রিভল্‌বারটি মাথায় ঠেকিয়ে মহেন্দ্র ঘনান্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।···

সাঁজোয়া-গাড়ি ততক্ষণে ঘটনাস্থলে এসে গেছে।···

পুলিশের কর্মব্যস্ততা শুরু হল। ··প্রীতি দেবীর প্রাণশূন্য দেহলতা শুধু বন্দী হয়েছে। তাঁর দেহ তল্লাশী করে পাওয়া গেছে শ্রীকৃষ্ণের একখানা ছবি, শহিদ রামকৃষ্ণের একটি ফটো, পাহাড়তলী ক্লাবের প্ল্যান্‌, একটি চামড়ার বেল্ট, ইণ্ডিয়ান্‌ রিপাব্লিকান্‌ আর্মির (চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের সৈন্যবিভাগের নাম) নোটিশ, রিভল্‌বারের কার্তুজ এবং একটি হুইসেল্‌। এ ছাড়া প্রীতিলতার স্বহস্তে লিখিত একটি স্টেট্‌মেণ্ট। একে 'টেস্টামেণ্ট্‌' বলাই ভাল।

বাঙলার বিপ্লব-ইতিহাসে আদর্শমুগ্ধ দুঃসাহসিকদের জীবনদানের ঘটনা বারে বারে লিখিত হয়ে আছে। সে-মৃত্যুর চলমান চিত্র অজস্র সৌন্দর্যে সুন্দর। বহু শহিদের রক্তে দেশজননীর চরণ বিধৌত। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকে অন্যজন থেকে আলাদা। প্রত্যেকে অনন্যসাধারণ। তাঁদের তুলনা তাঁদেরই মধ্যে। দেশপ্রেমে, নিয়মানুবর্তিতায়, শৌর্যে ও নিষ্ঠায় তাঁরা অবশ্যই সমস্তরের। তবু কোথায় যেন আপন

বৈশিষ্ট্যে পৃথক তাঁরা। পৃথক সত্ত্বায় এই জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রত্যেকটি জ্যোতির্লিখা বিপ্লবের নভোনীলে দীপ্ত হয়ে আছেন।

সূক্ষ্ম এই পার্থক্যবোধের কথা বাদ দিলেও প্রীতিলতার অবদানের বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা যায়। কারণ, রাজনীতিক ও সামাজিক গুরুত্ব এই সংঘটনায় প্রচুর। ভারতবর্ষের বিপ্লব-ইতিহাসে প্রীতিলতাই প্রথম নারী, যিনি একটি সশস্ত্র-অভিযান পরিচালনা করে সার্থক নেতৃত্বের উদাহরণ রেখে গেছেন এবং শহিদ হয়েছেন। এর তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসেও অনেক করে নেই।

১৯৩২ সালে সূর্যসেনের স্বপ্ন সফল করেছেন 'রাণী ঝান্সী'র উত্তরসাধিকা, নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। আবার ১৯৪৩-'৪৪ সালে নেতাজির মোহন যাদুস্পর্শে প্রীতিলতার বৈপ্লবিক-নেতৃত্বদানের ধারাকে অব্যাহত করে গেছেন 'ঝান্সীর রাণী বাহিনী'র কর্ণেল, নেত্রী লক্ষ্মী স্বামীনাথন। সুতরাং বুঝতে হবে যে, প্রীতিলতার অবদান একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। প্রত্যেকটি বৈপ্লবিক-এ্যাক্‌শানের মতই উহার সামগ্রিক রূপ ইতিহাসের শৌর্য-ধারায় বহমান। বিপ্লব ও রাজনীতির দিক থেকে এর গুরুত্ব অসামান্য।

প্রীতিলতার 'টেস্টামেণ্ট'

প্রীতিলতার শব তল্লাশী করে যে-বিবৃতি পাওয়া গিয়েছিল তা উদ্ধৃত হয়েছে সূর্যসেনের বিচার সম্পর্কিত হাইকোর্টের (কলিকাতা) বিচারপতিদের জাজ্‌মেণ্ট-এ। সেই বিবৃতির অনুলিপি প্রকাশিত হয়েছে শ্রীঅনন্ত সিংহের 'অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়' নামক প্রবন্ধে। আমরা তার কিয়দংশ এখানে তুলে দিলাম।

দ্রষ্টব্য: ১৯৩০-'৩৪ সালের চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের অন্যতম যুদ্ধ-নেত্রী এবং যুদ্ধ-ক্ষেত্রে একমাত্র বিপ্লবী-শহিদ প্রতিলতা ওয়াদ্দেদার সম্পর্কে তথ্যাদি 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' পুস্তক থেকে গৃহীত।

মৃত্যুভয়হীন বিপ্লবিনীর মতই যে Statement তিনি শহিদলোকে যাবার পূর্বক্ষণে রেখে গেছেন—তা একটি 'টেস্টামেন্ট'! অপূর্ব সাহসিকতা, আত্মত্যাগ, নিয়মানুবর্তিতা, চরিত্র এবং নেতৃত্বের ঐতিহ্য তিনি দিয়ে গেছেন জাতিকে তার উত্তরাধিকার রূপে। এ অধিকার অমূল্য। এ টেস্টামেন্ট অনন্য।

॥ বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক ॥

আমি জানিয়ে যাচ্ছি যে, আমি 'ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিকান্ আর্মি'র চট্টগ্রাম-শাখার সৈনিক। এ-বাহিনীর আদর্শ হল অত্যাচারী, শোষক ও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কবল থেকে দেশজননীকে মুক্ত করে একটি 'ফেডারেটেড্ ইণ্ডিয়ান্ রিপাব্লিক্' স্থাপন করা।···

আমরা 'স্বাধীনতা'র যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি। আজকের এ্যাক্‌শান্ (পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান্ ক্লাব আক্রমণ) ঐ চলমান স্বাধীনতা-যুদ্ধেরই একটি অংশ মাত্র। ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা হরণ করেছে, আমাদের সমাজদেহকে নিরক্ত করেছে, কোটি কোটি নরনারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। আমাদের রাজনীতিক, আর্থিক, মানসিক, দৈহিক, নৈতিক—সর্ববিধ দৈন্যের মূলে ইংরেজ-শাসন। ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতার শত্রু, আমাদের চরম বৈরী। তাই ইংরেজ -- হোক সে বা তারা রাজপুরুষ বা সাধারণ নর-নারী – তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে হবে। মানুষের জীবন নেওয়া কোন আনন্দের বস্তু নয়, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অন্তরায় যে-কেহ হলে তাকে যেকোন উপায়ে স্তব্ধ করা অবশ্য কর্তব্য।···

আজকের এই সশস্ত্র-অভিযানে অংশগ্রহণকল্পে আমার পরম শ্রদ্ধেয় নেতা মাস্টারদার আদেশ আমার জীবনে লব্ধ এক গৌরবময় সম্পদ। কারণ, যে-বাঞ্ছিত কর্মের জন্য এতকাল আমি অপেক্ষা করে ছিলাম, তা পালন করার সুযোগ আমি পেলাম। আমি কার্যভার সম্পূর্ণ দায়িত্ববোধে গ্রহণ করেছি। অবশ্য ঐ পুরুষশ্রেষ্ঠ

যখন আমাকে এ অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য নিযুক্ত করলেন, তখন আমি সংশয় প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু নেতার প্রত্যয় ও আদেশের সুরে তিনি আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, আমাকেই ও-কাজ করতে হবে, ভগবান আমার সহায় থাকবেন। আমি শিশুকাল থেকেই ভগবৎবিশ্বাসী। আমি আমার নেতার কণ্ঠে ভগবানের বাণী শুনেছিলাম!···

* * *

আজকের যুগে দেশের মেয়েরা স্থিরপ্রতিজ্ঞ যে, তাঁরা আর পিছিয়ে থাকবেন না। স্বাধীনতা-সংগ্রামে ভাইয়েদের পাশে এসে তাঁরাও দাঁড়াবেন—স্বহস্তে কাজ করে যাবেন, হোক সে কাজ যতই কঠিন বা বিপজ্জনক। আমি তাই সাগ্রহে কামনা করি যে, আমার বোনেরা আর তাঁদেরকে দুর্বল মনে করবেন না। তাঁরা হাজারে হাজারে ছুটে আসবেন বিপ্লব-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে, ছুটে আসবেন দুঃখ-কষ্ট-দুর্যোগ ও ভয়ঙ্করকে বরণ করার আনন্দে।···

১৯৩০ সালে পড়বার উদ্দেশ্যে কলকাতা চলে এসেছিলাম।··· আমার কোন বিপ্লবী ভাইয়ের নির্দেশে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বন্দী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করার জন্য তৈয়ের হলাম। মৃত্যুপথযাত্রী রামকৃষ্ণ। দেশকে ভালবাসার অপরাধে ব্রিটিশ-কানুনের শৃঙ্খলে বন্দী রামকৃষ্ণ ফাঁসির আগ্রহে অপেক্ষমাণ। আমি 'কাজিন্ সিস্টার' সেজে কোনক্রমে রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি আদায় করলাম। প্রত্যেকদিন যেতাম হাসিখুশি সপ্রতিভ ঐ বীরকে দেখার জন্যে। তাঁর ফাঁসি-মঞ্চে আরোহণের পূর্বে আমি অন্তত চল্লিশটি ইণ্টারভিউ নিয়েছিলাম। তাঁর সমাহিত রূপ, অকপট আলাপ-আলোচনা, মৃত্যুর তপস্যায় প্রশান্ত আত্মসমর্পণ, দ্বন্দ্বহীন ভগবৎভক্তি, শিশুসুলভ সারল্য, প্রেমস্নিগ্ধ হৃদয়াবেগ, গভীর জ্ঞান, নিবিড় আত্মানুভূতি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল; দুঃসাহসিকতার পথে চলবার সামর্থ্য আমার দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

রামকৃষ্ণদার ফাঁসির পর সক্রিয়ভাবে বৈপ্লবিক কোন এ্যাক্‌শানে যাবার আগ্রহ আমার প্রচণ্ড হয়ে ওঠে।···

* * *

১৯৩২ সালে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে চট্টগ্রাম চলে এসেছিলাম। দুর্জয় ইচ্ছা 'মাস্টারদা'র সঙ্গে পরিচিত হবার। হলও তাই। কয়েকদিনের মধ্যেই আমি দাঁড়ালাম এসে দুইটি অপূর্ব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের কাছে। তাঁরাই পরিচালনা করছেন প্রসিদ্ধ 'চট্টগ্রাম বিপ্লবী-সংস্থা'কে। তাঁরা হলেন মাস্টারদা ও নির্মলদা (নির্মল সেন)।

নির্মলদার সঙ্গে অল্পক্ষণের পরিচয়েই বুঝলাম যে, ঐ মানুষটির মধ্যে মহানুভবতা ও সৌন্দর্যে-ভরা একটি হৃদয় আছে ; সে-হৃদয়ে বিপ্লবের একনিষ্ঠ নীতি এবং ভগবৎ বিশ্বাস নিখুঁতরূপে সন্নিবদ্ধ। আমি সত্যি পরম ভাগ্যবতী, কারণ, আমি অমন একটি বৃহৎ পুরুষের সংস্পর্শে এসেছিলাম—যিনি সবার অজ্ঞাতে এই পৃথিবী ত্যাগ করে চলে গেলেন, যিনি জানতে দিলেন না তাঁর দেশবাসীকে যে, তিনি ছিলেন কত পরিশুদ্ধ ও অনন্যসাধারণ এক মহান্ মানব।···

নির্মলদার মৃত্যু আমাকে আঘাত দিল, আমাকে আরো দুঃসাহসিনী করে দিল।···কিছুদিনের মধ্যেই বি. এ. পরীক্ষার ফল বেরুল। জানলাম—'ডিস্টিংশন' নিয়ে পাশ করেছি। আমি অবিলম্বে বৈপ্লবিক কর্মযজ্ঞে আমার আত্মা ও সর্ব হৃদয় নিবেদিত করলাম। স্নেহক্ষরা গৃহের বন্ধন পশ্চাতে পড়ে রইল।

শিশুকাল থেকেই আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ হল ভগবানের প্রতি গভীর বিশ্বাস, তাঁর প্রতি অবিচল ভক্তি। সারা জীবন এ সম্পদ আমি সযত্নে বক্ষে ধারণ করে এসেছি। এবং আজ তাঁর পাদমূলে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করার জন্যে চূড়ান্তভাবে যখন প্রস্তুত হয়ে এসেছি, তখন এই চির-বাঞ্ছিত লগ্নে আমার বক্ষের সেই সম্পদ যেন আরো অমূল্য, আরো মধুর, আরো জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে।

আমি জানি, আমার বিপ্লব-দর্শন আমার ভগবৎ-জিজ্ঞাসার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত না হতে পারলে আমি কোনদিনই 'বিপ্লবিনী' হতে পারতাম না।

বিধাতার কাছে আমার প্রার্থনা নিবেদন করে আমি আমার আজকের মহান কর্তব্য পালন করতে ব্রতী হলাম। আমি আরো কামনা করি ভগবানের কাছে যে, তিনি যেন সকল গ্লানি ও অশুচিতা থেকে আমাকে মুক্ত করে তাঁর পদপ্রান্তের অর্ঘ্য হবার যোগ্যতা দান করেন।*

* শহিদ প্রীতিলতার মৃতদেহে প্রাপ্ত তাঁর স্বহস্তে লিখিত সম্পূর্ণ ইংরাজি বিবৃতি এই গ্রন্থের 'পরিশিষ্টে' প্রদত্ত হল। বিবৃতি সংগৃহীত হয়েছে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' (১৮. ৯. '৬৯), পৃঃ ৭৯৩-৭৯৫ থেকে।

॥ চব্বিশ ॥

অবিভক্ত বাঙলার মুসলিম বিপ্লবী

১৯১০ সাল। এক অন্ধকার রাতে বুড়ীগঙ্গা পেরিয়ে দু'খানা ছোট্ট নৌকা ঢাকা শহরের অপর পারে 'জিঞ্জিরা'র গঞ্জে এসে ভিড়েছে। দশটি যুবক* দু'টি নৌকা থেকে নেমে কিছুটা বিচ্ছিন্নভাবে গ্রামের পথে হাঁটা দিলেন। নিঃসীম অন্ধকার। মানুষ চেনা দায়। তখন পথঘাট জনশূন্য। গ্রামের মানুষেরা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর যুবকবৃন্দ এসে দাঁড়ালেন শুভাঢ্যা গ্রামের এক ধনী সাহা-পরিবারের গৃহ-সম্মুখে ···

দলপতির নির্দেশে গৃহ-বারান্দায় উঠে সকলে নিশ্চুপে দাঁড়ালেন। তৎপর উপ-দলপতিকে দলপতি আস্তে বললেন : "মাস্টারসাহেব, আমি ফিরে না-আসা পর্যন্ত সবাইকে নিয়ে আপনি এখানেই অপেক্ষা করুন।···এঁরা কেউ যেন একটি কথাও না বলেন, হাত-পা যেন একটুও না নড়ে, অন্ধকারে মিশে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।"··· এইটুকু বলেই দলপতি শ্রীশচন্দ্র পাল (রডা-ষড়যন্ত্র-খ্যাত) কোথায় যে উধাও হলেন, তা অপরেরা অনুমান করতে পারলেন না।···

প্রায় বিশ মিনিট কেটে গেল, শ্রীশচন্দ্রের সন্ধান নেই। এদিকে রাজ্যের মশা সবাইকে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে, কিন্তু সেই রাক্ষুসে

* দশটি যুবকের নাম :—শ্রীশচন্দ্র পাল (নেতা), সৈয়দ আলিমদ্দিন আহম্মদ (উপনেতা), হরিদাস দত্ত, প্রফুল্ল গুহ, নীললোহিত দাশগুপ্ত, হরিদাস রায়, বিভূতি বসু, প্রফুল্ল রায়, প্রতুল ঘোষ ও খগেন দাস।···এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীহরিদাস রায় অতঃপর ১৯১০ সালেই 'শুভাঢ্যা-অস্ত্র-মামলায়' দুই বছরের দণ্ডপ্রাপ্ত হন। মুক্তিসংঘ-দলের সভ্যদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কারাদণ্ড লাভ করেন। তখন হরিদাস রায়ের বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। কিন্তু সাহসে, দৈহিক শক্তিতে এবং মন্ত্রগুপ্তি-রক্ষায় তাঁর তুলনা ছিল না।

জীবগুলিকে তাড়িয়ে দেবার সুযোগ নেই। কারণ, প্রত্যেকের প্রতি স্থাণুর মত হাত-পা বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অচল করে রাখার নির্দেশ!···সময় আর কাটে না। তরুণদের মনে হচ্ছিল, যেন এক যুগ ধরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাঁরা গা পেতে বীভৎস মশার কামড় খাচ্ছেন।

হঠাৎ তরুণদের সুমুখে ঘরের দরজা খুলে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন শ্রীশচন্দ্র। বেরিয়ে এসেই আস্তে উপ-দলপতিকে তিনি বললেন: "মাস্টারসাহেব, একজনকে দোরগোড়ায় পাহারায় রেখে অন্যদের নিয়ে ঘরে ঢুকুন। এঁরা ঘরের পুরুষদের চোখের উপর টর্চ-এর আলো ফেলে রাখবেন এবং বুকের কাছে রিভলবার তাক্ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। মেয়েদের কাছে কেউ যাবেন না। আপনি সবকিছু লক্ষ্য রাখুন।" মাস্টারসাহেবের নির্দেশে তরুণদল মুহূর্তে গৃহে প্রবেশ করে যাঁর যাঁর স্থান নিয়ে প্রচণ্ড শক্তির টর্চগুলোর আলোয় গৃহবাসীদের চোখ ঝলসিয়ে দিলেন। পুরুষদের বুকের কাছে উদ্যত রিভল্‌বার। সাহা-পরিবারের নগদ সঞ্চয় তরুণদের হাতে আসতে বিলম্ব হল না। অতঃপর মহিলাদের উদ্দেশে শ্রীশচন্দ্র বললেন: "মা'রা গায়ের অলঙ্কার খুলে দিন।" সবাই অঙ্গ থেকে অলঙ্কার খুলে দিলেন। কিন্তু দিলেন না একটি তরুণী। ভয়হীনা অদ্ভুত তরুণী। তাঁর কোলে একটি ছ'সাত মাসের অপূর্ব মিষ্টি ছেলে। শ্রীশবাবু মহিলাকে ভয় দেখিয়ে (কার্যোদ্ধারের জন্যে) আদেশ দিলেন ছেলেটিকে মা'র কোল থেকে তুলে নিতে! মাকে শাসান হল যে, গা থেকে গয়না খুলে না দিলে তাঁর শিশুকে কেটে ফেলা হবে। মা তবু অবিচলিত। মাস্টারসাহেবের হুকুমে হরিদাস দত্ত শিশুটিকে নিয়ে এলেন মা'র কোল থেকে। ছেলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি বাইরের ঘনান্ধকারে। আশ্চর্য—শিশুটি কাঁদে না, লেপ্‌টে লেগে থাকে হরিদাসবাবুর বুকে! এত করার পরও মা'র কোন ভাবান্তর নেই। নিশ্চিন্ত দৃষ্টি মেলে তিনি তাকিয়ে আছেন দলপতির পানে।

তাঁর অঙ্গের অজস্র গহনা থেকে জ্বলন্ত দ্যুতি ঠিকরে বেরিয়ে যেন এই সশস্ত্র বাহিনীর নিষ্ঠুর আদেশকে ব্যঙ্গ করছে।...

দুর্ধর্ষ বিপ্লবী শ্রীশচন্দ্রের হার হল! কারণ, অতঃপর কি করে একটি তরুণীর অঙ্গ থেকে অলঙ্কার ছিনিয়ে আনতে হয়, সে-শিক্ষা 'স্বদেশী-ডাকাত'দের জানা ছিল না! তাই অবশেষে তিনি মা'র কোলে শিশুটিকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে মাস্টারসাহেবকে ইঙ্গিত করলেন। শিশু এলো। মা সস্নেহে কোলে নিয়ে বললেন: "আমি জানি আপনাদের হাতে আমার ছেলের কোন ক্ষতি হতে পারে না। আমি বুঝেছিলাম আপনারা কে!...আমি আমার মা'র কাছে এসেছি। বড়ই গরীব আমার বিধবা মা। রাতে তাঁর কুঁড়েঘরে আমাকে থাকতে না দিয়ে তিনি এখানে শক্ত আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। আমি বুঝেছি অর্থ ও গহনা আপনাদের কত প্রয়োজন। আমার স্বামী বিরাট ধনী। আমার স্বামীর ঘরে গেলে আমিই আপনাদের হাতে সর্বস্ব তুলে দিতাম। আমি জানি, আপনাদের অর্থ দেওয়া সার্থক। কিন্তু এখানে কিছুই দিতে পারব না। কারণ, আমার শ্বশুরঘরের কেউ যে বিশ্বাস করবেন না অলঙ্কার-লুণ্ঠনের গল্প! তাঁরা ভাববেন যে, আমার মা'রই গহনা আত্মসাৎ করবার এ এক কারসাজি। আমি জীবন থাকতে আমার মাকে মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা বহন করতে দেব না।"...

বিপ্লবীরা মুগ্ধ-নয়নে দুঃসাহসিকা ও চতুর একটি গ্রাম্য-তরুণীর পানে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন। কোথা থেকে পেল এই নারী এমন বোধ? কোথায় ছিল তার স্বতন্ত্র ঐ সাহসের উৎস?...মুহূর্তে মাস্টারসাহেব তাঁর বাহিনীকে 'রিট্রিট্' করার হুকুম দিলেন। প্রচুর অর্থ আয়ত্ত করে বিপ্লবীরা ঘনান্ধকার পথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।...

* * *

এই মাস্টারসাহেব হলেন একজন অজ্ঞাত মুসলমান বিপ্লবী-নেতা। বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের বন্ধু ও সতীর্থ।

মাস্টারসাহেবের পুরো নাম সৈয়দ আলিমদ্দিন আহম্মদ। ঢাকা শহরে আশক জমাদার লেন্-এ ১৮৮৪ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল সৈয়দ আমিরুদ্দিন আহম্মদ। আশক জমাদার লেন্-এ তাঁদের নিজস্ব বাড়ি। ইসলামপুর রোডে পিতার একটি বড় দর্জির দোকান ছিল। মাস্টারসাহেব পিতার তৃতীয় পুত্র। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হেমচন্দ্র ঘোষও তৎকালে আশক জমাদার লেন্-এ মাস্টারসাহেবদের প্রতিবেশী ছিলেন।

হেমচন্দ্র ও আলিমদ্দিন শিশু-বয়স থেকেই ঢাকার নবাব আব্দুল গণি সাহেবের 'ফ্রি হাইস্কুলে' পড়তেন। ঐ স্কুল তৎকালে বেচারাম দেউড়ি রোডে অবস্থিত ছিল। তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত (বর্তমানের ক্লাস এইট) উভয়ে একত্রে একই ক্লাসে পড়ে হেমচন্দ্র চলে যান ঢাকা 'কে এল. জুবিলি স্কুলে', এবং আলিমদ্দিন ভর্তি হন স্থানীয় মাদ্রাসা উচ্চ-বিদ্যালয়ে।

আলিমদ্দিন ১৯০৬ সালে এণ্ট্রান্স পাশ করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। ১৯১০ সালে আশক জমাদার লেন্-এর বাড়িটি বিক্রয় করে আলিমদ্দিন সাহেবের পরিজনেরা শহরের প্রান্তে উর্দু-অঞ্চলে খোয়াজে দেওয়ান রোডে নতুন একটি বাড়ি কিনে সেখানে উঠে এলেন। পিতার মৃত্যু এবং আরো নানা বিপর্যয়ে মাস্টারসাহেবের সংসার আর্থিক অনটনের মধ্যে হিম্সিম্ খেতে লাগল। মাস্টারসাহেবের এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়া হল না। ১৯১২ সালে তাঁকে বাধ্য হয়ে ঢাকা কালেক্টরেট-এ চাকুরি গ্রহণ করতে হয়। এই সময় স্বগৃহে তিনি ছাত্র পড়াতেন বলেই তাঁকে সবাই 'মাস্টারসাহেব' নামে পরিচিত করেছিল।

আলিমদ্দিন সাহেব হেমচন্দ্র ঘোষের আবাল্য-বন্ধু এবং তাঁর দুর্জয় পথের চিরসাথী ছিলেন। ১৯০২ সাল থেকেই শ্যামাকান্ত ও

পরেশনাথের আখড়ায় দুই বন্ধু ডন-কসরৎ করতেন, আর সঙ্গোপনে আলোচনা করতেন কি করে ইংরেজ তাড়িয়ে দেশকে স্বাধীন করা যায়। পড়াশুনা, খেলাধুলা, খাওয়া-দাওয়া—এমন কি শোয়া-বসা পর্যন্ত অনেক সময় উভয়ের একত্রেই সম্পন্ন হত।

১৯০৫ সালে হেমচন্দ্র যখন তাঁর গুপ্ত-সমিতি (মুক্তিসঙ্ঘ) স্থাপিত করেন, তখন আলিমদ্দিন সাহেব তাঁর একজন প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য হন। উভয়ে মিলেই তখন একটি 'ভলাণ্টিয়ার ক্লাবে'রও পত্তন করেন। আলিমদ্দিন সাহেব বিপ্লবের আদর্শ, দল-সংগঠনের টেক্‌নিক্ ও জীবন-দর্শন তাঁর বন্ধু অথচ নেতা হেমচন্দ্রের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং হাতেনাতে বৈপ্লবিক-য়্যাকশান্ করার দক্ষতা অর্জন করেন শ্রীশচন্দ্র পাল মহাশয়ের কাছ থেকে। শুভাঢ্যা-ডাকাতির পর শ্রীশচন্দ্রের কাছ থেকেই শিক্ষালাভ করে একাধিক য়্যাকশানে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। রডা-য়্যাকশান্‌খ্যাত হরিদাস দত্ত প্রমুখ বিপ্লবী-নেতা আজও মাস্টারসাহেবের কর্মদক্ষতা এবং য়্যাকশান্-পরিচালনায় নেতৃত্ব-কৌশল উল্লেখকালে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন।

আলিমদ্দিন সাহেব ছিলেন শক্তিশালী ও সুদক্ষ কুস্তিগীর। লাঠিখেলা, ছোরাখেলা এবং নানাবিধ শারীরচর্চায় পারদর্শী বলেই তাঁর গৃহসংলগ্ন (উর্দু-অঞ্চলে) নিজস্ব আখড়ায় প্রচুর হিন্দু-মুসলমান যুবক আনাগোনা করত। ধর্মবিশ্বাসী, স্বদেশপ্রেমী এবং দুঃসাহসী এই নেতাকে ঐ অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান-নির্বিশেষে সবাই পরম শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেছিল, হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিল। তাই উত্তরকালে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের সময়ও (তাঁর বর্তমানে) তাঁর পাড়ায় কোন দুষ্কৃতিই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আলিমদ্দিন সাহেবের পাড়া, অর্থাৎ ঢাকা শহরের উর্দু-অঞ্চল বরাবরই মুসলিম-অধ্যুষিত।

মাস্টারসাহেবের আখড়া ছিল হেমচন্দ্র ঘোষের দলের একটি রিক্রুটিং সেণ্টার। সেখানে প্রধান রিক্রুটার ছিলেন মাস্টারসাহেব স্বয়ং। বহু মুসলমান এবং অনেক হিন্দু তরুণ ঐ আখড়ার মাধ্যমে আলিমদ্দিন সাহেবের নেতৃত্বে বিপ্লবীদলে ভিড়ে যান। তাঁর সংগঠিত মুসলিম-বিপ্লবীদের সংস্থা ঢাকা শহরে ও মাণিকগঞ্জে বিশেষ দানা বেঁধে ওঠে। ঢাকা শহরে তৎকালে 'এন্টি-স্যোসিয়াল্ এলিমেণ্ট'দের কিছু প্রাদুর্ভাব হয়। হেমচন্দ্র ও আলিমদ্দিন সে-যুগে স্বহস্তে গুণ্ডাদমনে প্রবৃত্ত হতেন বলেই তাঁদের অনুগামীরা অত দুর্ধর্ষ হবার শিক্ষা হাতেনাতে লাভ করেছিলেন।...

'রডা-অস্ত্র-লুণ্ঠন' ইত্যাদি ব্যাপারে শ্রীশচন্দ্র, খগেন দাস, হরিদাস দত্ত প্রমুখ বিপ্লবিগণ কলকাতায় কর্মব্যাপৃত হবার পর আলিমদ্দিন সাহেবকে হেমচন্দ্র জানালেন যে, পুলিশের আক্রমণ থেকে দলকে বাঁচাবার ভার অন্তত ঢাকা শহরে তাঁকেই স্বহস্তে নিতে হবে। কারণ, অদূর ভবিষ্যতে দলের সিনিয়র কর্মীদের মধ্যে আর কারো হয়ত জেলের বাইরে থাকা সম্ভব হবে না। আলিমদ্দিন সাহেবের মস্ত সুবিধা ছিল যে, তিনি পাঁচ ওয়াকৎ নামাজ-পড়ুয়া ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান—পুলিশ তাই তাঁকে ভুলেও 'বিপ্লবী' বলে মনে করত না। সুতরাং মাস্টারসাহেব সহজে নিজেকে গোপন করে ফেললেন। তৎকালে তাঁর কাজ ছিল অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা, 'সিডিশাস্'-পুস্তকাদি সামলান এবং শেল্টারের ব্যবস্থা করা। সংগোপনে মুসলিম-তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেম ও বিপ্লবের বাণী প্রচার করে গোপনতম সংস্থা-নিউক্লিয়াস্কে অক্ষুণ্ণ রাখার দায়িত্ব অবশ্য তাঁর ছিলই।...

এককালে মাস্টারসাহেবের প্রধান মুসলিম-বিপ্লবীশিষ্য ছিলেন নৈমুদ্দিন আহম্মদ। তাঁর পিতা ছিলেন আসাম-সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ঢাকা শহরের কায়েৎটুলী পাড়ায় ছিল তাঁদের বাড়ি। নৈমুদ্দিন এম-এ., বি-এল. পাশ করে ঢাকা বার-এ ওকালতি শুরু

করেন। দলগঠনে, অর্থ সাহায্যে এবং অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার কাজে তিনি তৎপর ছিলেন। তাঁর দু'টি ছোট ভাই সলাউদ্দিন ও সালেউদ্দিনও এই দলের কর্মী ছিলেন। পরিশেষে অবশ্য তাঁরা সরকারী উচ্চপদে বহাল হয়ে হেমচন্দ্র বা মাস্টারসাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেননি।

মাস্টারসাহেবের একটি অনুরাগী কর্মতৎপর তরুণ শিষ্য ছিলেন আব্দুল জব্বর। আব্দুল ঢাকা কলেজের ছাত্র। বি-এ. পাশ করার পরও তিনি মাস্টারসাহেবের নির্দেশে দল-সংগঠনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। হেমচন্দ্র উক্ত তরুণের নামোল্লেখে এখনো বলেন: "জব্বরের মত ছেলে আরো ক'টা জন্মালে দেশে স্বাধীনতা-যুদ্ধ ঐ দুর্দিনে আরো সুন্দর হত—হিন্দুর পাশে দাঁড়িয়ে বহু মুসলমান-তরুণ পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মুক্তি-সংগ্রামে আত্মদান করতে পারত।···কিন্তু বিধাতা অকালে জব্বরকে ছিনিয়ে নিয়ে তা ঘটতে দিলেন না!"···জব্বরের মৃত্যুতে মাস্টারসাহেবের দক্ষিণ হস্ত যেন অবশ হয়ে গেল। জব্বরের হিন্দু-মুসলমান সতীর্থরা স্বজন-বিয়োগে মুষড়ে পড়লেন।

১৯১৫ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত দেশের বিপ্লবী নেতা ও কর্মীরা অধিকাংশই কারাগৃহের অন্তরালে রইলেন। ১৯২০ সালের শেষান্তে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে হেমচন্দ্র দেখলেন যে, প্রমথ চৌধুরি এবং আলিমদ্দিন সাহেব প্রমুখ নেতৃস্থানীয় দু'একজন এবং তাঁদের দু'চারটি বিশ্বস্ত কর্মী অতি সংগোপনে দলের নিউক্লিয়াস্‌কে বাঁচিয়ে রেখেছেন। হেমচন্দ্র নতুন করে দল-গঠনে মন দিলেন। তাঁর নির্দেশে পুলিশের পরিচিত কর্মীরা নিজেদের দৃশ্যত বিপ্লব-জগৎ থেকে সরিয়ে ফেললেন। হেমচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র, হরিদাস দত্ত, ডাঃ সুরেন বর্ধন, রাজেন্দ্র গুহ, খগেন দাস প্রমুখ বিপ্লবীরা কেহ লোক-দেখান সংসারী হলেন, কেহ-বা ধর্মজীবন গ্রহণ করার ভান করলেন।

মাস্টারসাহেব এমনিতেই ধর্মচর্চায় বিশ্বাসী। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল নিজেকে ঐ ধর্ম অনুশীলনের আবরণে আরো গুটিয়ে ফেলার জন্যে। কারণ, অন্তত আগামী আট-দশ বছর ধরে নূতনতর দল গড়ে ইফেক্‌টিভ এক বৈপ্লবিক-পরিকল্পনা নিয়ে ভবিষ্যতে একদিন কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি করতে হবে। কাজেই, তাঁদের মত দল-নেতাদের সংগোপনে বাস করে সবার অলক্ষ্যে উক্ত দল-সংগঠনে ব্রতী হওয়া দরকার।

মাস্টারসাহেব সাগ্রহে কোরাণ-গীতা-বাইবেল নিয়ে মশগুল হলেন। কিন্তু কুস্তির আখড়াটি ঠিকই চলল। গোপনে দল-সংগঠনেও তিনি বিরাম দিলেন না। অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখার কাজও অব্যাহত রইল। পাড়ার লোক তাঁকে আরো বেশি করে জানতে থাকল কুস্তিবিলাসী, সত্যনিষ্ঠ, শিক্ষিত, সর্বধর্মসমন্বয়-সাধক এবং অকৃতদার একটি খাঁটি মুসলমানরূপে। পুলিশ কোনদিনই তাঁর স্বরূপ বুঝে নেবার অবকাশ পেল না।···

মুক্তিসঙ্ঘের (উত্তরকালীন বি. ভি.) বৈপ্লবিক-কার্যের প্রস্তুতিপর্ব (১৯৩০ সাল পর্যন্ত) সবার অজ্ঞাতে সমাপিত হবার ইতিহাস। এই প্রস্তুতি-পর্বে মাস্টারসাহেবের অবদান কত স্পষ্ট ও সুগভীর ছিল তা উক্ত প্রতিষ্ঠানের নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ, হরিদাস দত্ত বা অন্যান্য কতিপয় কর্ম-নেতার (যাঁরা শেষ পর্যন্ত গোপনে মাস্টারসাহেবের সঙ্গে যোগা-যোগ রক্ষা করতেন) কাছে আমরা শুনেছি : কিন্তু দুঃখের বিষয় মুক্তিসঙ্ঘের প্রচণ্ড কর্মকাণ্ড ১৯৩০ সালেরই ২৯শে আগস্ট লোম্যান-হত্যা ও হড্‌সন্‌-জখম রূপ কার্যে সূচিত হবার পূর্বেই এই মুক্তিসাধক শৌর্যবান বিপ্লবী দেহরক্ষা করেন।

হঠাৎ একদিন তাঁর মুখ দিয়ে এক ঝলক রক্ত উঠে এলো। ভেসে গেল বুক। এলিয়ে পড়ল শয্যায় বলদৃপ্ত তাঁর দেহ। দারুণ যক্ষ্মা—যাকে বলে 'গ্যালপিং থাইসিস্' !···মৃত্যু ছিনিয়ে নিল আজন্ম-বিপ্লবী, নামযশ-প্রচারবিমুখ অনন্যচিত্ত দেশসেবক ও বন্ধুবৎসল মাস্টার-সাহেবকে। তিনি দেখে যেতে পারলেন না তাঁরই বিপ্লব-প্রতিষ্ঠানের দুর্জয় কর্মকাণ্ড, আশীর্বাদ করে যেতে পারলেন না তাঁর সাধনার উত্তরসাধক বিনয়-বাদল-দীনেশ বা প্রদ্যোৎ-অনাথ-মৃগেন-ভবানীকে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণকালে, জেনে যেতে পারলেন না নেতাজির 'আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজে'র অতুল কীর্তিকাহিনী।···

মাস্টারসাহেব দেহরক্ষা করলেন। অগণিত হিন্দুমুসলমান-জনতা এবং তরুণ গুণগ্রাহীদল পুষ্পমাল্যশোভিত তাঁর শবাধার কাঁধে করে সমাধিস্থলে নিয়ে গেল। বিদেহী ঐ বীর বিপ্লবী ও কর্মতাপসকে তারা সম্মিলিত সজল-শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। অথচ আলিমদ্দিন সাহেবের সখা, সতীর্থ, বন্ধু এবং কর্মনেতা ও ভাবগুরু হেমচন্দ্র ঘোষ কারাকক্ষের অভ্যন্তরে বসে যথাসময়ে কিন্তু এই দুঃখ-সংবাদ জানতে পারলেন না !···

মাস্টারসাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর মুসলিম-কর্মীদলের ছবি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে এলো। এ সম্পর্কে 'সবার অলক্ষ্যে' নামক গ্রন্থে যে বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে তা অবান্তর হবে না বলেই এখানে উদ্ধৃত করা গেল: "১৯২০ সালের পর থেকে খগেন দাস, সুরেন বর্ধন (ডাঃ), কৃষ্ণ অধিকারী ও মাস্টারসাহেব (আলিমদ্দিন আহম্মদ) অতি সংগোপনে ও ধীরে ধীরে 'সেল্-সিস্টেমে' সংগঠন কার্য চালিয়ে যাচ্ছিলেন প্রধানত মফঃস্বলে ও শহর-প্রান্তে। মাস্টারসাহেব বেশি

দিন কাজ করতে পারেননি। দারুণ যক্ষ্মা রোগে অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মাধ্যমে অতি স্বাভাবিকতায় সেকালে মুসলমান কর্মিগণ দলীয় সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁরা কিন্তু তখন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দল গড়ে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক এক স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন এই দলের কর্মীদের চোখে দেখেছিলেন। কিন্তু এ বস্তু দেখেছিলেন তাঁরা মাস্টারসাহেবের চোখ দিয়ে। তাই মাস্টারসাহেবের মৃত্যুতে তাঁদের স্বপ্ন দেখার চোখ এবং আদর্শ বুঝবার মন অন্তর্হিত হয়ে গেল। বিপ্লবের পথ থেকে তাঁরা হারিয়ে গেলেন!"··· ('সবার অলক্ষ্যে'—২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৪)

সে-যুগে এই মুসলিম-তরুণদল বিপ্লবের পথ থেকে হারিয়ে গেলেও 'বিপ্লব' মুসলিম-চিত্ত থেকে কখনো হারিয়ে যায়নি। কারণ, 'No action is ever lost!' তাই সুদীর্ঘকাল অন্তে শোনা গেল একান্ত নূতন এক পরিপার্শ্বে, 'ভাষা-আন্দোলনে'র মাধ্যমে, পূর্ব-বাঙলার হারিয়ে-যাওয়া মুসলিম-বিপ্লবীদের উত্তরসাধক মুসলিম তরুণ-দলের পথচলায় 'বিপ্লবে'র পদধ্বনি। দেখা গেল 'আব্দুল বরকৎ' প্রমুখ শহিদদের রক্তে সেই পুরোযায়ী মুসলিম-বিপ্লবীদেরই সতীর্থ সূর্যসেন-প্রীতিলতা-বিনয়-বাদল-দীনেশের রক্তোচ্ছ্বাস।···

॥ পঁচিশ ॥

বিপ্লব-ইতিহাসে অবিস্মরণীয় দুইজন সংগঠক

পূর্বাভাস

১৮৭৯ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল অবধি সংঘটিত বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এ-গ্রন্থে লেখা হয়েছে। বাংলা এবং সর্বভারতের সশস্ত্র-য়্যাকশানের কথা এখানে থাকলেও, ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৫ সালে অনুষ্ঠিত বাঙলাদেশের বৈপ্লবিক-কর্মকাহিনী এখানে দেওয়া হয়নি।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৫ সালের বাঙলাদেশের বিপ্লব-ইতিহাস প্রধানত সূর্যসেন-পরিচালিত চট্টগ্রাম-বিপ্লবীগোষ্ঠী এবং হেমচন্দ্র ঘোষ নিয়ন্ত্রিত 'বি. ভি.'-দলের দুর্জয় কর্মে সমুজ্জ্বল। এই দুইটি বিপ্লবীদলের যাঁরা সংগঠক এবং সর্বাধিনায়ক, তাঁরা বাঙলার বিপ্লব-ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। তাঁদের আমরা ভুলতে চাই না বলেই এ অধ্যায়ের সূচনা।

'বি. ভি.'র সর্বাধিনায়ক : হেমচন্দ্র ঘোষ

মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যৎ-বাণী : "এমন দিন আসবে, যখন শূদ্রশ্রেণীর তন্দ্রা কেটে যাবে। তখন সমাজের প্রত্যেক স্তরে প্রতিষ্ঠিত হবে শূদ্র-রাজ।" এ-ভবিষ্যৎবাণী পেয়েছিলাম আমরা ১৮৯৬ সালে। তার বহু পরে রাশিয়ায় এবং বর্তমানে চীনদেশে শূদ্র-রাজ কায়েম হয়ে গেছে। খেটে-খাওয়া মানুষের সেসব দেশে জয়জয়কার।

এ-ভবিষ্যৎবাণীর উপরই ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তব্য-মর্ম হল: স্বামীজীর ভবিষ্যৎ-বাণী সম্পর্কে আরো আলোকপাত ঘটে হেমচন্দ্র ঘোষের একটি পত্র থেকে। হেমচন্দ্র হলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতা। তাঁর রয়েছে দীর্ঘকালের কর্ম-ইতিহাস। জাতির মুক্তিযুদ্ধের অবিচলিত সৈনিক হেমচন্দ্রের কারাকক্ষে বারম্বার নির্যাতন-প্রাপ্তি কারো অজানা নেই। আমার অনুরোধে স্বামীজির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের ঘটনা স্মৃতির ভাণ্ডার আলোড়িত করে একটি পত্রযোগে তিনি পাঠিয়েছিলেন।···

স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে হেমচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুদের দেখা হয় ঢাকা শহরে, ১৯০১ সালের ১৩ই ও ১৪ই এপ্রিল। সে-সাক্ষাতের বিশদ বিবরণ হেমচন্দ্র লিখিত পত্রেই* লিপিবদ্ধ।

উক্ত পত্রে পাই: "স্বামীজি আমাদের সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে বললেন 'তোরা অমৃতের পুত্র!'···ঐ স্পর্শ, ঐ কণ্ঠস্বর আমাদের রক্তে যেন বিদ্যুতের ছোঁয়া দিল। আমরা মুহূর্তে উৎসাহিত হলাম, উদ্বুদ্ধ হলাম, অন্তহীন দুঃসহ পথচলার আবেগে থরথর কেঁপে উঠলাম।"

হেমচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুদের স্বামীজি আরো বলেছিলেন: "পরাধীন জাতের ধর্ম নেই। তোদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তি লাভ করে পরস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া।"

সে-মুহূর্ত থেকেই হেমচন্দ্র পেলেন অমিত শক্তির সন্ধান। খুঁজে পেলেন অব্যক্ত-বেদনার মুক্তিপথ, বন্ধনডোর ছিন্নভিন্ন করার সন্ধান। ···বলছেন হেমচন্দ্র ডক্টর ভূপেন দত্তের কাছে লিখিত তাঁর পত্রে: "স্বামী বিবেকানন্দ সেদিন আমার কাছে ধর্মগুরু হয়ে আবির্ভূত হননি, তিনি দেখা দিয়েছিলেন সুদূরদ্রষ্টা রাজনীতিজ্ঞরূপে। আমি ও শ্রীশ পাল প্রমুখ আমার কতিপয় বন্ধু (যাঁরা সাক্ষাৎকালে উপস্থিত

---

* এ-পত্রটি 'A letter' শিরোনামায় 'পরিশিষ্টে' সংযুক্ত হয়েছে (হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে।)

ছিলেন) চিরকাল রাজনীতিক এই মহাগুরুর বাণী স্মরণ করে রেখেছি। ভবিষ্যতে অজস্র বন্ধু-বান্ধবসহ অতি বিনম্র চিত্তে আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছি তাঁর আদেশ প্রতিপালন করতে—সুখী ভারতজননীর ক্রোড়ে সমৃদ্ধ বাঙলার স্থান করে দিতে, বাসযোগ্য নূতন পৃথিবীর কল্পনাকে বাস্তব করে তুলতে।"

এই যে হেমচন্দ্র ঘোষ—ইনিই হলেন 'বি. ভি.'র সর্বাধিনায়ক। ইনি ১৯০৫ সালে স্থাপিত 'মুক্তিসঙ্ঘ' নামক গুপ্ত বিপ্লবী-সমিতির (উত্তরকালের 'বি. ভি.') প্রতিষ্ঠাতা*।

হেমচন্দ্র সম্বন্ধে সুখ্যাত লেখক এবং প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীনগেন্দ্র কুমার গুহ-রায় লিখিত 'দুর্ধর্ষ বিপ্লবীর কাহিনী' নামক প্রবন্ধ থেকে কিছু উদ্ধার করা গেল। লেখাটি ঐতিহাসিক-তথ্যে মূল্যবান।

শ্রীযুক্ত গুহ-রায় লিখছেন:

"বিপ্লবী বাংলার দধীচি বিনয়-বাদল-দীনেশ এবং তাঁহাদের মত আরও মৃত্যুঞ্জয় বীর যে বৈপ্লবিক সঙ্ঘের সদস্য ছিলেন, শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ হইলেন উহার সঙ্ঘপতি। তাঁহার আদি বাসস্থান বাখরগঞ্জ জেলার গাভা গ্রামে। হেমচন্দ্রের পিতৃদেব এবং মাতৃদেবীর নাম—৺মথুরানাথ ঘোষ এবং ৺মনোমোহিনী দেবী। তাঁহাদের চার পুত্র এবং তিন কন্যা। পুত্রদের মধ্যে তিনজন প্রভাসচন্দ্র, রমেশচন্দ্র এবং ক্ষিতীশচন্দ্র লোকান্তরিত হইয়াছেন। বৈপ্লবিক কার্যাদিতে বিশেষ করিয়া অস্ত্র-সংগ্রহ ব্যাপারে ক্ষিতীশচন্দ্রের সাহায্য ও সহযোগিতার তুলনা ছিল না। মথুরানাথ ছিলেন ঢাকা শহরের একজন ব্যবহার-জীবী। শহরের ইসলামপুর অঞ্চলে আশক জমাদারের গলিতে তিনি সপরিবারে বসবাস করিতেন। সেখানে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর

* "মহাজাতি সদন কর্তক গৃহীত টেপ্-রেকর্ডের অনুলিপি—হেমচন্দ্র ঘোষ' ('পরিশিষ্ট' অধ্যায়) দ্রষ্টব্য।

মাসের ২৪ তারিখে হেমচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শৈশব, বাল্য, কৈশোর এবং যৌবনের অধিকাংশ কাল কাটিয়াছে পিতৃদেবের কর্মস্থল ঢাকা শহরে।

"হেমচন্দ্রের বিদ্যা-শিক্ষা হয় ঢাকার কে. এল্. জুবিলি উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ে। কৈশোরে বিদ্যার্থিজীবনে তাঁহার প্রাণে দেশোদ্ধারের ভাব জাগ্রত হয়। ছাত্রবন্ধুদের মধ্যে সেই ভাব সঞ্চারিত করার জন্য তিনি উদ্যোগী হইলেন। তিনি জানিতেন যে, দেহে ও মনে তাহাদিগকে সুস্থ, বলিষ্ঠ ও নিষ্কলুষ করিতে পারিলে স্বদেশানুরাগ আপনা হইতেই প্রাণে জাগিবে। সেইজন্য হেমচন্দ্র ব্যায়াম-চর্চার মাধ্যমে ছাত্রদের সাহসী ও শক্তিমান করিয়া তুলিবার এবং সদ্‌গ্রন্থাদি পঠন-পাঠনের ও নীতি শিক্ষাদানের সময়োপযোগী ব্যবস্থা করিলেন। এই সমুদয় কার্যের ভিতর দিয়া ছাত্র-জীবনেই তাঁহার সংগঠনীশক্তি বিকাশ লাভের সুযোগ পায়।

"সেকালে ঢাকা নগরীতে বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ ব্যায়াম-বীর শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিখ্যাত মল্লবীর পরেশনাথ (ওরফে পার্শ্বনাথ) ঘোষের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। শারীরচর্চায় অনুরাগী শহরের বহু যুবক তাঁহাদের নিকট ব্যায়াম ও কুস্তি শিক্ষা করিতেন।

"হেমচন্দ্রের শারীরচর্চার গুরু ছিলেন শ্যামাকান্ত ও পরেশনাথ। স্বদেশী-আন্দোলনের কালে (১৯০৫ খ্রীঃ) তিনি লাঠি খেলায় দীক্ষা নিলেন বঙ্গ-বিশ্রুত বিপ্লবী নেতা পুলিনবিহারী দাসের নিকটে। হেমচন্দ্র ব্যায়ামচর্চায় ও লাঠি খেলায় দক্ষ হইয়া উঠেন। তাঁহার শিক্ষালাভের আগ্রহ, শৃঙ্খলাবোধ এবং কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য ঐ তিনজন শিক্ষাগুরুই তাঁহাকে স্নেহ করিতেন। সেকালে ঢাকা শহর গুণ্ডার উপদ্রবের জন্য কুখ্যাত ছিল। গুণ্ডারা কিশোর এবং তরুণ যুবকদের বিপথগামী করিত এবং প্রকাশ্যে দিন-দুপুরে ভদ্রঘরের মেয়েদের প্রতি কুৎসিত ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিত না। শ্যামাকান্ত,

পার্শ্বনাথ এবং পুলিনবিহারী গুণ্ডা দমনে অনেকটা সফলকাম হইয়াছিলেন। গুণ্ডার দল ঐ তিনজনকে বাঘের মত ভয় করিত। তাঁহাদের পরে হেমচন্দ্র এবং তাঁহার দলের নওজোয়ানেরা গুণ্ডাদের মনে ভীতি সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন। শ্যামাকান্ত বলিতেন—'ব্রহ্ম সত্য, বুলেট্ও সত্য।' হেমচন্দ্র এবং তাঁহার দলভুক্ত যুবকগণ এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়া চলিতে প্রয়াসী ছিলেন। সেই বাণী তাঁহাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। এইখানে বলিয়া রাখিতেছি যে, হেমচন্দ্র তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতির নামকরণ সংগোপনে করিয়াছিলেন "মুক্তিসঙ্ঘ"। এই নামটি নাকি ব্রহ্মবান্ধবের খুব পছন্দ হইয়াছিল।

"প্রাক্ স্বদেশী-যুগে যে-সমুদয় তরুণ বাঙালী দেশমাতার দাসত্ব-শৃঙ্খল ভাঙিবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হইয়াছিলেন, হেমচন্দ্র তাঁহাদেরই একজন। বিপ্লবী-দলের কার্যে আত্মনিয়োগ করার দরুন তাঁহাকে অকালে শিক্ষায়তনের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে হইল। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানার্জনের আগ্রহ ছিল অদম্য এবং মেধা ও স্মৃতি-শক্তি ছিল তীক্ষ্ণ। সুতরাং বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়াও তিনি কর্মব্যস্ত জীবনের সাময়িক অবসরের মধ্যে বিদ্যানুশীলনের দ্বারা নানা বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে কখনও ত্রুটি করিতেন না। তাঁহার ওই সমস্ত গুণ বার্ধক্যেও লোপ পায় নাই। এই বিপ্লবী-নেতার সতীর্থগণের মধ্যে অনেকেই উচ্চশিক্ষিত। তাঁহারা হেমচন্দ্রকে বরাবর জ্ঞান-তাপসের মর্যাদা দিয়া আসিতেছেন। সে মর্যাদা সত্যই তাঁহার ন্যায্য-প্রাপ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী একাধিক গুণগ্রাহী সতীর্থের নিকট শুনিয়াছি যে—তাঁহাদের নেতা হেমচন্দ্রের মত তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন অধ্যয়নশীল ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও অল্প মিলিবে। পৃথিবীর রাজনীতিক ইতিহাস তাঁহার নখদর্পণে। এই বৃদ্ধ বয়সেও অতি আধুনিক রাজনীতিক-ইতিহাসের (আন্তর্জাতিক) কোন সংবাদ সন-তারিখ সহ জানিতে হইলে বন্ধুরা তাঁহার কাছেই যান।

"জীবনাদর্শ রূপায়ণে ও ধর্ম-জীবন গঠনে হেমচন্দ্র প্রেরণা পাইয়াছেন স্বাদেশিকতার আদ্যাচার্য ঋষি রাজনারায়ণ বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, 'সন্ধ্যা' পত্রিকার ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপ্লবী মহানায়ক অরবিন্দ ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দ) এবং ভগিনী নিবেদিতার জীবনী, কর্মাবদান, রচনামালা ও ভাষণাবলী হইতে। বিপ্লবী নেতা পি. মিত্র এবং মহিলা বিপ্লবী সরলা দেবী তাঁহাকে দিয়াছেন শৌর্যসাধনার শিক্ষা। স্বদেশপ্রেমধর্মের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত 'আনন্দমঠ' মুক্তি-সাধনার নবীন সাধককে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে দেশাত্মবোধে। আনন্দমঠের সন্তানের মত তিনিও 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রে দীক্ষা নিয়াছেন বন্দিনী দেশমাতৃকার মুক্তিকল্পে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' এবং 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র, অশ্বিনীকুমার দত্তের 'ভক্তিযোগ' এবং লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের 'গীতাভাষ্য' তাঁহার মানসিক গঠনে একান্ত সহায়ক হইয়াছিল।

"বিদেশী রাজার রাজত্বকালে হেমচন্দ্রের জীবনের উপর দিয়া কত বার বহিয়া গিয়াছে নিগ্রহ-নির্যাতনের ঝড়। কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত না হইয়া আগাইয়া গিয়াছেন লক্ষ্যের দিকে। তাঁহার জীবনের দীর্ঘকাল কাটিয়া গিয়াছে কারাগারে এবং বন্দী-শিবিরে। তবু ওই বিপ্লবী-সাধক কোনদিন ব্রতপালনে পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার লাঞ্ছনা ভোগ আরম্ভ হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। গুণ্ডাদলের সমাজবিরোধী দুষ্কার্য প্রতিরোধ করিতে যাইয়া হেমচন্দ্র ফৌজদারী মামলায় জড়িত হইয়া পড়েন; এবং কিছু দিন হাজতে আটক থাকিবার পরে তিনি খালাস পান। তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত মিথ্যা মামলা টিকিল না।

"স্বদেশী আন্দোলনের যুগে, ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, ঢাকা শহরে পিকেটিং করিয়া বিলাতী কাপড় পুড়াইয়া ফেলিবার জন্য পুলিশ হেমচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করে। কিছু দিন হাজতবাসের পর তিনি মুক্তি পাইলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে হেমচন্দ্র বিপ্লবীদলের

কার্যোপলক্ষে ত্রিপুরা-আগরতলা যান। বঙ্গ-বিভাগের পর নব-গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের তদানীন্তন ছোট লাট হেয়ার সাহেব ত্রিপুরার মহারাজার প্রাসাদে এক সামাজিক উৎসবে যোগদান করেন। তৎকালে স্থানীয় পুলিশ সন্দেহক্রমে হেমবাবুকে এবং তাঁহার সঙ্গী প্রখ্যাত খেলোয়াড় জ্ঞানচন্দ্র রায়কে (ওরফে জ্ঞানা পোদ্দার) গ্রেপ্তার করিয়াছিল। জ্ঞানবাবু সঙ্গে সঙ্গেই জামিনে মুক্তি পান, কিন্তু হেমবাবুকে হাজতে আটক থাকিতে হইল আড়াই মাস। মুক্তির পরে তাঁহাকে আগরতলা হইতে বহিষ্কার করা হয়।

"প্রথম মহাবিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবার (১৯১৪ খ্রীঃ, ৪ঠা আগস্ট) কিছুকাল পূর্ব হইতে বাংলাদেশে বিভিন্ন বিপ্লবীদলের কর্মতৎপরতা বাড়িয়া যায়। সেই সময় প্রথম 'ভারত রক্ষা আইনের' প্রয়োগ হইল। ইতিমধ্যে 'রডা'র অস্ত্র লুঠ হইল। হেমচন্দ্রের সহযোগী শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত ও খগেন দাস প্রমুখ বিপ্লবীবৃন্দ বিপিনবাবুর 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সঙ্গে একযোগে এই দুঃসাহসী বৈপ্লবিক-কর্ম সাধন করেন। সুতরাং উক্ত আইনের বিধান মতে হেমচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁহাকে তাঁহার গাভা গ্রামের বাড়িতে অন্তরীণ (interned) করা হয়। গোয়েন্দা-পুলিশ প্রমাণ পাইল যে, হেমচন্দ্র বিপ্লবীদলের একজন নেতা এবং শত্রুপক্ষের যোগাযোগে ভারতে ব্রিটিশ-রাজত্বের উচ্ছেদ-সাধনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। তখন তাঁহাকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩নং রেগুলেশন মতে রাজবন্দী (State prisoner) করা হইল। স্বগৃহে অন্তরীণ হইতে তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইল (১৯১৫ খ্রীঃ) মেদিনীপুরের সেন্ট্রাল জেলে। পরের বৎসর তিনি কারান্তরিত হইলেন হাজারিবাগ সেন্ট্রাল জেলে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে সেই জেল হইতে সরাইয়া আনিয়া আবদ্ধ করা হইল আলিপুর ও ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে। অতঃপর হেমচন্দ্রকে নদীয়া জেলার মেহেরপুরে অন্তরীণ করিয়া রাখা হয় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। পরের বৎসর তাঁহাকে আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলে স্থানান্তরিত করা হইল।

যুদ্ধের সমাপ্তির সঙ্গে 'জেনারেল্ য়্যাম্নেস্টি' ঘোষিত হইলে (১৯২০ খ্রীঃ) তিনি মুক্তি পান।

"বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতির অস্তিত্ব প্রকাশ পাইলে কাজ করা যে কত কঠিন, তাহা হেমচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন। দলের কয়েকজন বিশিষ্ট সতীর্থের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি প্রচার করিয়া দিলেন যে, রাজনীতিক কাজের মধ্যে তাঁহারা আর থাকিবেন না। সমাজ-সেবার মাধ্যমে দেশের হিতসাধনে তিনি এবং তাঁহার সহকর্মিগণ শক্তি-সামর্থ্য নিয়োগ করিবেন। পুলিশকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য তিনি ওই কূট চাল চালিলেন। তিনি তাঁহার পুরাতন কর্মক্ষেত্র ঢাকা শহর ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া মেজদা রমেশচন্দ্র ঘোষ উকিলের বাসায় বাস করিতে লাগিলেন। দলের হরিদাস দত্ত গেলেন রংপুর জেলার নাগেশ্বরী থানায় ক্ষেতখামারের কাজে, এবং শ্রীশ পাল আরম্ভ করিলেন চাউলের ব্যবসায়। অন্যান্য সন্দেহভাজন কর্মীরাও সাংসারিক কাজে মন দিলেন। পুলিশ প্রথম অবস্থায় চিহ্নিত-বিপ্লবীদের ওইরূপ নিষ্ক্রিয়তাকে 'ভাঁওতা' বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল। সেই কারণে তাঁহাদের গতিবিধির উপর দুই-তিন বৎসরকাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হইল। কিন্তু ওই সকল বিপ্লবীদের নিষ্ক্রিয় দেখিয়া অবশেষে পুলিশের ধারণা জন্মিল যে, হেমচন্দ্র এবং তাঁহার দলের বিপ্লবীরা রাজনীতি ছাড়িয়া দিয়াছেন। এমন কি বাংলার অন্যান্য বিপ্লবীদলেরও অনুরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল।

"এদিকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে, হেমচন্দ্রের কারাগারে আবদ্ধ থাকা কালেই, বাহিরের কর্মিগণ সংগোপনে নূতন সদস্য সংগ্রহ করিয়া ভগ্নপ্রায় দলটিকে পুনর্গঠিত করার কার্যে মনোযোগী হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্র ও তাঁহার কারামুক্ত সহকর্মীরা বাহিরের নূতন সদস্যগণের সহিত গোপনে, পুলিশের অগোচরে, রাত্রির অন্ধকারে যোগাযোগ স্থাপন করিতেন। তাঁহারা মনোযোগী হইলেন আদর্শ বিপ্লবী গড়িয়া তুলিতে এবং নূতন নূতন যুবককে দলে আনিয়া সদস্য-সংখ্যা বৃদ্ধি

করিতে। প্রমথ চৌধুরি, আলিমদ্দিন সাহেব (মাস্টারসাহেব), কৃষ্ণ অধিকারী ও প্রমথ চক্রবর্তি ছিলেন ওই কার্যে অগ্রণী। প্রধানতঃ তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টায় হেমচন্দ্রের দলটি প্রাণ-চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিভিন্ন অঞ্চলে কতগুলি সঙ্ঘ স্থাপিত হইল। সেইগুলির মধ্য দিয়া লোকসেবা, শারীরচর্চা, শিক্ষা-প্রচার ইত্যাদির কাজ চলিল; কিন্তু গোপনে চলিতে লাগিল সশস্ত্র-বিপ্লবের প্রস্তুতি। ··

"কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল, উত্তরবঙ্গ, মেদিনীপুর এবং পাটনা ইত্যাদি অঞ্চলে দলের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হইল। এই সংগঠনী কার্যে দলের বিশিষ্ট সদস্য সত্যরঞ্জন বক্সি, অনিল রায়, সত্য গুপ্ত, ভূপেন রক্ষিত-রায়, রসময় শূর, ভবেশ নন্দী, প্রফুল্ল দত্ত, মণীন্দ্রকিশোর রায়, সুরেন দত্ত, সুরেন নাগ প্রমুখের কর্মাবদানও একান্ত উল্লেখযোগ্য। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা দীপালী-সঙ্ঘের লীলা নাগ (পরে 'রায়') হেমচন্দ্রের দলে যোগদান করেন। কলিকাতায় একটি মহিলা-বিভাগ খোলা হইল এবং উহার পরিচালনার ভার ন্যস্ত হইল মীরা দত্ত-গুপ্তার উপরে। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা-ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিপ্লবী-নেতা ললিত বর্মণ সদলবলে হেমচন্দ্রের সহিত মিলিত হইলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে অনিল রায় ও লীলা নাগের সঙ্গে কর্মপন্থা লইয়া হেমচন্দ্র তথা নেতৃস্থানীয় সতীর্থদের মতানৈক্য হওয়ায় দলের একাংশ পৃথক হইয়া যান। তাঁহারা 'শ্রীসঙ্ঘ' নামে একটি নূতন 'বিপ্লবী-সংস্থা' গঠন করেন। হেমচন্দ্রই ঢাকা শহরে সমাজ-সেবার কাজ সবার গোচরে করিবার জন্য অনিল রায়ের সম্পাদনায় 'শ্রীসঙ্ঘ' নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপিত করিয়াছিলেন ১৯২২-'২৩ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীসঙ্ঘ ব্যতীত ঢাকায় এই দলের আরো সঙ্ঘ ছিল। উহাদের নাম 'শান্তিসঙ্ঘ', 'ধ্রুবসঙ্ঘ', 'Boys Reading Institute,' 'Social Welfare League' ইত্যাদি। পৃথক হবার পর হেমচন্দ্রের দল 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' (সংক্ষিপ্ত নাম 'বি. ভি.') বলিয়া ক্রমে পুলিশের নথিপত্রে চিহ্নিত হইল।

"প্রথম মহাবিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত হেমচন্দ্রের দল বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির 'আত্মোন্নতি' দলের সহিত বহুক্ষেত্রে মিলিত হইয়া কাজ করিয়াছে। তৎপর এই দল 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে মিলিত হইয়া কাজ করে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর কলিকাতা সার্পেন্টাইন লেনে গোয়েন্দা পুলিশের দারোগা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুলী করিয়া বধ করেন এই দলের কর্মনেতা শ্রীশ পাল। তাঁহার সাহায্যকারী রূপে সঙ্গে ছিলেন বিপিন গাঙ্গুলির দলের রণেন গাঙ্গুলি। নন্দলাল বিহারের মোকামা ঘাট রেলওয়ে স্টেশনে প্রফুল্ল চাকিকে গ্রেপ্তার করিতে গেলে প্রফুল্ল নিজের রিভলবারের গুলীতে আত্মবিলয়ন ঘটাইয়াছিলেন।··· কলিকাতা 'রডা কোম্পানী'র অস্ত্র অপসারণের চাঞ্চল্যকর ঘটনায় হেমচন্দ্রের দলের শ্রীশ পাল, খগেন দাস ও হরিদাস দত্তের অবদান উল্লেখযোগ্য। 'বি. ভি.'-দলের অনুষ্ঠিত আরও কতগুলি দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক-কার্যের উল্লেখ করিতেছি :

> "১৯৩০ খ্রীঃ ২৯শে আগস্ট পুলিশ-বিভাগের বড়কর্তা লোম্যান সাহেবকে ঢাকা শহরে বিনয় বসু গুলী করিয়া বধ করেন এবং ঢাকার পুলিশসাহেব হড্‌সন্‌কে মারাত্মকভাবে আহত করেন।
>
> ১৯৩০ খ্রীঃ ৮ই ডিসেম্বর বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত কলিকাতা রাইটার্স্ বিল্ডিংস্-এ হানা দিয়া কারা-বিভাগের বড়কর্তা সিম্প্‌সন্ সাহেবকে বধ করেন এবং কতিপয় ইংরেজ রাজপুরুষকে আহত করেন।
>
> ১৯৩১ খ্রীঃ ৭ই এপ্রিল মেদিনীপুরে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট পেডি সাহেব নিহত হন।
>
> ১৯৩১ খ্রীঃ ২৯শে অক্টোবর ইয়োরোপীয়-সমিতির সভাপতি ভিলিয়ার্সকে বিমল দাশগুপ্ত আক্রমণ করেন।
>
> ১৯৩২ খ্রীঃ ৩০শে এপ্রিল মেদিনীপুরে পরবর্তী ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস্ সাহেব নিহত হন। মামলায় প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসি হয়। সঙ্গী প্রভাংশু পালকে কেহ ধরিতে পারে নাই।

১৯৩৩ খ্রীঃ ২রা সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরে তৃতীয় ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ সাহেবকে বধ করেন অনাথ পাঁজা ও মৃগেন দত্ত।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লা শহরে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স সাহেবকে নিধন করেন ললিত বর্মণদের অনুগামিনী শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। 'বি. ভি.'-র কলিকাতা-কেন্দ্রের সঙ্গে ওই অভিযানের কমনেতাদের একান্ত যোগ ছিল।

১৯৩৪ খ্রীঃ 'দেওভোগ শুটিং'-এ এণ্ডারসন্ সাহেবের ভিলেজ গার্ড্ নিধন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

ইহার পর ১৯৩৪ খ্রীঃ ৮ই মে দার্জিলিং পাহাড়ে ঘোড়দৌড়ের মাঠে বাংলার তদানীন্তন গভর্ণর স্যার জন্ এণ্ডারসন্‌কে গুলী করিয়া বধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। চেষ্টা সফল না হইলেও রাজনৈতিক তাৎপর্যে ইহার তুলনা কমই মিলিবে। গুলী করিয়াছিলেন 'বি. ভি.'-দলের ভবানী ভট্টাচার্য ও রবি বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং ঘটনাস্থল পর্যন্ত সঙ্গে গিয়াছিলেন উজ্জ্বলা মজুমদার ও মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে ষড়যন্ত্র মামলায় ভবানী ভট্টাচার্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন, উজ্জ্বলা মজুমদারের চৌদ্দ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়, এবং যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয় মনোরঞ্জন ও রবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সুকুমার ঘোষ এবং মধু বন্দ্যোপাধ্যায়েরও চৌদ্দ বৎসরের দ্বীপান্তর লাভ ঘটে। সুশীলের সাজা হয় বার বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড।

"হেমচন্দ্রের দলের সাহিত্য-প্রচারবিভাগের কার্যাবলী প্রশংসনীয়। 'বেণু' মাসিকপত্র কলিকাতা হইতে ভূপেন রক্ষিত-রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে (বঙ্গাব্দ—বৈশাখ, ১৯৩৩)। কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে বিপ্লব ও জাতীয় মুক্তির বাণী প্রচার করে 'বেণু'। নানাবিধ নিগ্রহ-নির্যাতন সত্ত্বেও উহা প্রায় ছয় বৎসর কাল জীবিত

ছিল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে উহা বন্ধ হইয়া যায়। সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকা সম্বলিত ভূপেন রক্ষিত-রায় প্রণীত 'চলার পথে' নামে একখানা গল্প-পুস্তক প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। গল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের তরুণীদের নিকট বিপ্লবের আবেদন জানান হয়। সেই আবেদন যে নিষ্ফল হয় নাই তাহা শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং শান্তি ঘোষ, সুনীতি চৌধুরি, উজ্জ্বলা মজুমদার, কল্পনা দত্ত, বীণা দাস, কমলা দাশগুপ্তা, মায়া দেবী, পারুল মুখার্জি প্রভৃতির দুঃসাহসিক কার্যের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। ওই পুস্তকখানা সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 'চলার পথে' নাম দিয়া তরুণ-প্রবীণ সর্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার জন্য 'বি. ভি.'-দলের পক্ষ হইতে সুভাষচন্দ্র বসুর আবেদন লইয়া একখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। মুসলিম লীগের শাসন-কালে নাজিমুদ্দিন-সরকার উহাকে তিন মাসের অধিক কাল বাঁচিয়া থাকিতে দেন নাই। এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে, সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্রের অত্যন্ত স্নেহভাজন ছিলেন হেমচন্দ্র। সেই স্নেহের প্রকাশ পাই সেই কালে 'বেণু' কাগজে বিনা দক্ষিণায় তাঁহার অমর উপন্যাস 'বিপ্রদাস' প্রকাশিত হইতে থাকিবার মধ্যে।

"হেমচন্দ্রের উপরে 'বি. ভি.'-দলের পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকিলেও তিনি একক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেন না। সম্মিলিত নেতৃত্বে দল পরিচালিত হইত। যে-সকল বিশিষ্ট সদস্য তাহাতে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের কতিপয়ের নাম প্রদত্ত হইল—হরিদাস দত্ত, ডাঃ সুরেন বর্ধন, রাজেন গুহ, সত্যরঞ্জন বক্সি, রসময় শূর, সত্য গুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, ভূপেন রক্ষিত-রায়, প্রফুল্ল দত্ত, সুরেন নাগ, সুরেন দত্ত, জ্যোতিষ জোয়ারদার, যতীশ গুপ্ত, ভূপতি রায়, নিকুঞ্জ সেন। সুপরিচালনা, আদর্শ নিষ্ঠা, মন্ত্রগুপ্তি ও আত্মবলিদানের জন্য ভারতের বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে এই দল উচ্চাসন পাইয়াছে। প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

তাঁহার রচিত 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' গ্রন্থে (পৃঃ ৬৬৬) হেমচন্দ্রের 'বি. ভি.' দল সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে উদ্ধৃতি দিতেছি :

"ঢাকার হেমবাবুর গ্রুপ : হেম ঘোষ ও হরিদাস দত্ত ('বড়দা' ও 'মেজদা') যে-দল গঠন করেন, বাংলার বিপ্লবের ইতিহাসে সেই দলের দান অপরিসীম। হেমবাবুর দলে উচ্চশিক্ষায়, ব্যায়ামচর্চায়, সংস্কৃতিতে ও ললিতকলায় অগ্রণী বহু যুবক যোগদান করেন। বিপিন গাঙ্গুলি ও যতীন মুখোপাধ্যায়ের সহিত হেমবাবু, শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত, সুরেন বর্ধন ও আরও কয়েকজনের মাধ্যমে ইহাদের সহযোগিতা ছিল। দেশে 'হোয়াইট্ লাইফ ফরফিট্' এই মত গৃহীত হইবার পর ঢাকায় লোম্যান্ ও হড্সন্‌কে* চরম শাস্তি দেওয়া হয় ; মেদিনীপুরে একটির পর একটি ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, অনাথ পাঁজা, মৃগেন দত্ত, ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ, নবজীবন, নির্মলজীবন— ইংরেজের নৃশংসতা ও বর্বরতার প্রতিশোধ হিসাবে—ইহারা মৃত্যুদণ্ড দেন।...ইহাদের গ্রুপের একটি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিত না হইলে বাংলার বিপ্লবীদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।..."

শ্রীযুত গুহ-রায় অতঃপর লিখেছেন :

"ইংরেজের নৃশংস ও বর্বরোচিত অত্যাচার কেবল বিপ্লবপন্থীদের উপর নয়, অহিংস-সত্যাগ্রহীদের উপরও নিরঙ্কুশ চালিত হইয়াছে। মেদিনীপুরে যে-অত্যাচার জিলা-শাসক পেডি চালাইয়াছিলেন তাহার তুলনা নাই।

"ইংরেজ শাসকগণের ওইরূপ নৃশংসতা ও বর্বরতার প্রতিশোধ দিয়াছিলেন হেমচন্দ্রের বিপ্লবীদলের মৃত্যুঞ্জয় বীর যুবকেরা। মেদিনীপুর শহরে বিপ্লবীদের রিভলবারের গুলীতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পেডির নিহত হওয়ার ঘটনা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

* হড্সন্ মারাত্মকভাবে আহত হইয়াও প্রাণ হারান নাই। লোম্যান্ নিহত হন।

“১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আইন-অমান্য-আন্দোলন চলিতে থাকা কালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি বে-আইনী ঘোষিত হয়। তৎকালে হেমচন্দ্র ঘোষ ছিলেন উহার সেক্রেটারি। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। বিচারে তিনি আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। কারাদণ্ড ভোগ পূর্ণ হইবার পূর্বেই গান্ধী-আরউইন্-চুক্তির সর্ত মতে তিনি মুক্তি পান। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর হেমচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয় ‘বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স’-এ। কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেল, বক্‌সা দুর্গ, দেউলি বন্দী-শিবির ইত্যাদি স্থানে তাঁহাকে আবদ্ধ রাখা হয় সাত বৎসব। তিনি মুক্তি পাইলেন ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর।

“দ্বিতীয় মহাবিশ্বযুদ্ধ চলিতে থাকা কালে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তিনি এবং সমগ্র বাংলাদেশ হইতে তাঁহার পঁচিশজন সহকর্মী নিরাপত্তা আইনের (Security Act) বিধান মতে গ্রেপ্তার হইয়া বন্দী হইলেন। এবার তাঁহাকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে, হিজলী বন্দী-শিবিরে, বক্‌সা-দুর্গে, রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে এবং দমদম জেলে। তিনি মুক্তি পাইলেন ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে, কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর পরে।

“ ‘বি. ভি.’ সঙ্ঘের যে সমুদয় বিপ্লবী বীর মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য আত্মবলিদান করিয়া শহিদ হইয়াছেন, তাঁহারা হইলেন—বিনয় বসু, বাদল (সুধীর) গুপ্ত, দীনেশ গুপ্ত, নৃপেন দত্ত, বীরেন রায়-চৌধুরি, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, অনাথ পাঁজা, মৃগেন দত্ত, ব্রজকিশোর চক্রবর্তি, রামকৃষ্ণ রায়, নির্মলজীবন ঘোষ, নবজীবন ঘোষ, মতি মল্লিক, ভবানী ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় ভৌমিক, অসিত ভট্টাচার্য, হৃষীকেশ সাহা, সন্তোষ বেরা, প্রবোধ মজুমদার, গোপাল সেন, শচীন কর ও অমলেন্দু ঘোষ। সঙ্ঘপতি হেমচন্দ্রের চরিত-কথা কীর্তনের সঙ্গে ওই সকল দিব্যলোকবাসী দধীচিকে সশ্রদ্ধ-চিত্তে স্মরণ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতেছি।

"হেমচন্দ্র এবং তাঁহার সতীর্থ ও ভাগিনেয় প্রসিদ্ধ সাংবাদিক সত্যরঞ্জন বক্সি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনীতিক বন্ধু ও বিশ্বস্ত সহযোগী। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে হেমচন্দ্র সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে বোম্বাই যান—গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তৎকালীন রাজনীতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনার জন্য। তথা হইতে তাঁহারা উভয়ে গান্ধীজির সহিত দিল্লী যান এবং গান্ধী-আরউইন্ চুক্তির প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করেন। হেমচন্দ্র কংগ্রেসের লাহোর ও করাচী অধিবেশনে যোগদানের জন্য সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে গিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রের গৌরবোজ্জ্বল মহিমময় রাজনীতিক-জীবনের সঙ্গে হেমচন্দ্র ও 'বি. ভি.'-দলের সম্বন্ধ ছিল অতি ঘনিষ্ঠ। ইঁহাদের আন্তরিক সমর্থন ও সহযোগিতা হইতে তিনি কোনদিনও বঞ্চিত হন নাই। তাঁহার 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পত্রিকা প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনায় এবং 'ফরোয়ার্ড ব্লক' সংস্থা গঠনে ইঁহারা আগাগোড়া সাহায্য করিয়াছেন। কলিকাতায় 'হলওয়েল'-স্মৃতিস্তম্ভ-অপসারণ-আন্দোলনে হেমচন্দ্রের দল সক্রিয় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ভারতবর্ষ হইতে গোপনে অন্তর্ধানের ব্যাপারে এবং 'আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজে'র সশস্ত্র-অভিযানে হেমচন্দ্রের সতীর্থগণ সহায়তা করিয়াছেন। শরৎচন্দ্র বসুর সঙ্গেও হেমচন্দ্রের সম্বন্ধ ছিল ঘনিষ্ঠ। সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর যথাসময়ে তিনি শরৎচন্দ্রের 'সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান্ পার্টি' গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করেন। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ওই পার্টির সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অতঃপর হেমচন্দ্র প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি এখন নিভৃতে অধ্যয়নের মধ্য দিয়া কালাতিপাত করিতে ভালবাসেন।" ('গল্প-ভারতী', শ্রাবণ ১৩৬৫, পৃঃ ১৪১--১৪৭)

শ্রীযুক্ত নগেন গুহ-রায় আজ থেকে এগার বছর পূর্বে হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ব্যক্তিগত ও সংস্থাগত জীবনের কথা যা লিখে গেছেন তা সংক্ষেপে সুন্দর ও তথ্যবহুল। হেমচন্দ্রের ব্যক্তিগত পরিচয় কি

আর থাকবে? এসব বিপ্লবীদের ব্যক্তিসত্তা সম্পূর্ণভাবে মিশে থাকে দল-সত্তার মধ্যে। হেমচন্দ্র মানেও তাই 'বি. ভি.'। 'বি. ভি.' মানে হেমচন্দ্র। সুতরাং 'বি. ভি.'র ইতিহাসই হেমচন্দ্রের জীবনেতিহাস।

হেমচন্দ্র দের 'বি. ভি.'-প্রসঙ্গে দু'টি বিষয় এখানে উল্লেখ করব :

॥ ডি' ভ্যালেরার কাছে সুশীল চৌধুরি ॥

'বি. ভি.'র নেতৃত্ব ভারতবর্ষের আশু বৈপ্লবিক-সংগ্রামে বহির্ভারতের প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতাদের পরামর্শ সংগ্রহেও কিন্তু চেষ্টিত ছিল। দলের একটি কর্মী শ্রীসুশীল চৌধুরি ১৯২৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর গেলেন বিলেতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার জন্য। লণ্ডনগামী জাহাজ ছাড়বার পূর্বমুহূর্তেও তাঁকে শেষ কথা বললেন (হেমচন্দ্রের তরফ থেকে) সত্য গুপ্ত ও ভূপেন রক্ষিত-রায় যে, সুশীল যেন প্রথম সুযোগেই ডাব্‌লিন গিয়ে ডি' ভ্যালেরার সঙ্গে যথানির্দেশ যোগাযোগ করে বাঙলার অবস্থা, ভারতের পরিস্থিতি ও বিপ্লবীদের কার্যক্রম ঐ মহান্ নেতার গোচরে এনে তাঁর যথোপযুক্ত অভিমত তাঁদের জানান। সুশীলকে বিদায় দেবার জন্যে সেদিন সত্য গুপ্ত, ভূপেন রক্ষিত-রায় ও যতীশ গুহ কলকাতার জাহাজ-ঘাটে গিয়েছিলেন।

১৯২৯ সালের জুলাই মাসে সুশীল সত্যিই ডাব্‌লিনে ডি' ভ্যালেরার গৃহে উপস্থিত হন। আইরিশ-মহানায়ক তখন গৃহে ছিলেন না। তাঁর পত্নী সাদরে ভারতীয়-ছাত্রটিকে গ্রহণ করলেন। তিনি জানালেন যে, ডি' ভ্যালেরাকে বাড়ি পাওয়া মুশকিল। পার্টির কাজে তিনি প্রায়ই অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে থাকেন। এমনও হয় যে, দু'চার দিন সমানে হয়ত বাড়ি ফেরার সময়ই তাঁর হয় না। সুতরাং ডি' ভ্যালেরা-পত্নী সুশীলকে পার্টি-অফিসে পাঠিয়ে দিলেন। মহানায়কের সেক্রেটারির সঙ্গে তাঁর দু'ঘণ্টা দীর্ঘ আলোচনা হল।

খুঁটে-খুঁটে বহু কথা তিনি জেনে নিলেন। সেক্রেটারির চমৎকার ইংরেজি ভাষণ শুনে সুশীল মুগ্ধ হয়ে কিছু প্রশংসা করতেই তিনি আচম্‌কা বললেন: "I am ashamed of that. They (the English) have crushed our language and culture. We must resist it—উপায় নেই বলেই তোমার সঙ্গে শত্রুর ভাষায় কথা বলছি।" তিনি আরো বললেন, "তোমরা নিজের ভাষাকে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে ঠকে যাবে।"···এর পর এক সময় ডি' ভ্যালেরা তাঁর চেম্বারে সুশীলকে ডেকে পাঠালেন। গভীর-ভাবে তিনি আলাপ করলেন হেমচন্দ্রের এই প্রতিনিধিটির সঙ্গে। সুশীল অনুভব করলেন সংগ্রামী-ভারতের প্রতি এই মানুষটির গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা। যাঁকে এককালে বাঙলার তরুণদল বিপ্লবের পথে 'আইডল্‌' মনে করত, তাঁকে ঐ স্বল্পকালের নিবিড়তম সান্নিধ্যে সুশীল নূতন করে 'আইডল্‌'-এর আসনেই গ্রহণ করে আনন্দ পেলেন। ডি' ভ্যালেরা বললেন: 'তোমরা এগিয়ে যাও। আমাদের সকল সহানুভূতি, সমবেদনা ও সক্রিয় মন তোমাদের পদযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে ও থাকবে।' সুশীল বললেন: 'অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে আমাদের কিছু সাহায্য করতে পারা যায় কি?'···ডি' ভ্যালেরা প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাকালেন সুশীলের মুখের পানে। ভাবলেন এক মুহূর্ত। তারপর স্মিতহাস্যে বললেন: 'ত্যাখো, দুর্ধর্ষতম শত্রু-পরিবেষ্টিত ছোট্ট এক দ্বীপের মানুষ আমরা। আছি তোমাদের কাছ থেকে বহু দূরে। কাজেই অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা সম্ভব নয়। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, মানসিক সহানুভূতি ও অকপট কামনার মূল্য কম নয়। সেই সহানুভূতি ও তোমাদের জয়-কামনা অকপট হয়ে রয়েছে আমার ও আমার বন্ধুদের হৃদয়ে। তোমরা দুর্যোগের পথিক, এগিয়ে যাও। নিজেদেরকে নিজেরা সাহায্য করতে পারলেই পথ পরিষ্কার হয়ে আসে। আমাদের শিক্ষা অন্তত তাই।'···

সুশীল শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে চলে এলেন। কিন্তু ঐ

মহামানবের কম্বু-কণ্ঠের বাণী আজও স্পষ্ট হয়েই তাঁর কানে ঝঙ্কৃত হয়। দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর আজও ডি' ভ্যালেরার এ-সব উক্তির পুনরুল্লেখ করতে গিয়ে সুশীল ১৯২৯ সালের জুলাই মাসের সেই রাতে ফিরে যান, সে-রাতের স্তব্ধতাকে সেদিন পরম রমণীয় করে ভেঙে ভেঙে দিচ্ছিল মহানায়কের কণ্ঠধ্বনি।...

সুশীল চৌধুরি দেশে চলে এলেন ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তখন আইরিশ-বিপ্লব-শায়েস্তাকারীরূপে পরিচিত 'ব্ল্যাক্ এণ্ড্ ট্যান্' নীতির প্রবর্তক স্যার জন্ এণ্ডারসন্ বাঙলার গভর্ণর। ইতিমধ্যে যতীশ গুহ ব্যতীত 'বি. ভি.'-দলের নেতৃস্থানীয় সবাই কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন। তবু ঐ এণ্ডারসন্ সাহেবের কালেই ১৯৩৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরের তৃতীয় ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্জ 'বি. ভি.'র হাতে নিহত হলেন। তারপর ১৯৩৪ সালের ১০ই এপ্রিল নিহত হল এণ্ডারসন্-লালিত ভিলেজগার্ড্ নারায়ণগঞ্জের উপকণ্ঠে 'দেওভোগ' অঞ্চলে। একটি মাসও কেটে গেল না। সহসা সারা পৃথিবী খবর পেল যে, স্বয়ং গভর্ণর স্যার জন্ এণ্ডারসন্ই ঘায়েল হয়েছেন 'বি. ভি.'র হস্তে, দার্জিলিঙ্ শহরে, লেবঙ-এর ঘোড়দৌড়-মাঠে। রক্ত-আক্ষরিত ঐ ঘটনার তারিখ ১৯৩৪ সালের ৮ই মে। অবশেষে তাৎপর্যপূর্ণ এই বৈপ্লবিক-য়্যাকশানে বিদেশে সবার চেয়ে খুশি হল বিপ্লবী-'আয়ার্'। তাঁদের 'Fianna Fail' কাগজে বেরিয়েছিল অভূতপূর্ব আন্তরিকতায় অমূল্য প্রশংসা-বাণী। তাঁরা সাগ্রহে স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁদের একটি 'কাজ' করে দিলেন বাঙলার বিপ্লবীরা। তাঁদের 'শত্রু'র আজ যথার্থই রাজনৈতিক-মৃত্যু ঘটল।...এর বহু পরে বাঙলা দেশের বিপ্লবীদের চরম শত্রু স্যার চার্লস্ টেগার্ট্ প্রসঙ্গক্রমে যে-উক্তি করেছিলেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতবর্ষ থেকে তিনি বিদায় হয়ে গেছেন বহুদিন। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল। তিনি নিযুক্ত

হয়েছেন প্যালেস্টাইনে তথাকার গোলমেলে অবস্থার মোকাবেলা করার জন্যে। এক ভোজসভার বক্তৃতায় তিনি যা বলেছিলেন, স্মৃতি থেকে তা উদ্ধৃত হল : The grandest of revolutionaries I have ever met is the Bengal Brand. In sheer excellence of character they surpass their counter-parts in any other country.
[আমি এ পর্যন্ত যেসব বিপ্লবীর সংস্পর্শে এসেছি তাঁদের মধ্যে বাঙলার বিপ্লবীরা 'গ্রাণ্ডেস্ট' (সর্বাধিক ভাব-সুন্দর)। চরিত্রবলে পৃথিবীর যেকোন দেশের বিপ্লবীদের মধ্যে তাঁরা অগ্রগণ্য।]

টেগার্ট প্রমুখ ছিলেন সংগ্রামী-ভারতের ঘোরতর শত্রু। কিন্তু শত্রু যদি বীর হন, তবে তাঁর প্রতিপক্ষের বীরত্ব ও মহনীয় রূপ তাঁকে অভিভূত করবেই। টেগার্ট স্বচক্ষে দেখেছেন এই দেশের তরুণকে ফাঁসির মঞ্চে, বেত্রাঘাতে, শৃঙ্খলবন্ধনায় অবিচল থাকতে। কারণ, ১৯২৯ সাল থেকে তরুণ-রক্তে নূতন করে লেগেছিল যে 'সর্বনাশের নেশা!' শহিদ যতীন দাসের শবযাত্রায় আমরা হাজার হাজার ইস্তাহার বিলি হতে দেখেছিলাম। শীর্ষে তার লেখা : 'রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা!' ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, ইস্তাহারের প্রতি পংক্তি জুড়ে ছিল বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান, সশস্ত্র-অভিযানে দস্যু ইংরেজকে ভারত থেকে বিতাড়নের নির্দেশ। প্রতিটি অক্ষর তার আগুন-ছোঁয়া। বাঙলার তরুণদল কত লক্ষবারই না ঐ অক্ষর-নিঃসৃত অগ্নিরস পান করেছেন! তারই সঙ্গে চলেছে তাঁদের প্রস্তুতি—১৯৩০-'৩৫ সাল পরিব্যাপ্ত সংগ্রাম শুরু করার প্রস্তুতি।...

॥ রক্তে আমার লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা ॥

একটি ইস্তাহারের শিরোনামা। সে-ইস্তাহার প্রকাশন সম্পর্কে কিছু তথ্য বলা প্রয়োজন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইস্তাহারটির প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ১৯২৯ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে। শহীদ যতীন দাসের শবানুগামী শোক-মিছিলের নয়নে আগুন জ্বেলে দিয়েছিল ঐ ইস্তাহারের অক্ষরগুলো অগ্নিস্রাবী-মূর্তি ধরে। সে আগুন স্তব্ধ, অন্তর্নিহিত। লক্ষ জনতার পরাণে শুধু অজ্ঞাতে লাগে 'সর্বনাশের নেশা'। হোক তা নির্বাক, হোক নিস্পন্দ।...

এ-ইস্তাহার ছাপান বড় সোজা কাজ ছিল না সেই কালে। পুলিশের ভয়ে সন্ত্রস্ত প্রেসওয়ালারা। কার বুকে কত সাহস যে, 'আই. বি'.র সহস্র চোখ উপেক্ষা করে সে এসব সিডিশান্ ছাপাতে যাবে ?

কিন্তু বিপ্লবী বাধাকে স্বীকার করেন না। পথ কেটে তাঁকে চলতেই হবে। ইস্তাহার ছাপাবারও তাই পথ হল।

নির্মলচন্দ্র গুহের 'ডেভেন্হাম প্রেস'। এইখানেই তৎকালে 'বেণু' পত্রিকা ছাপান হত। বিপ্লবীরা এই প্রেসেই ইস্তাহারটি ছাপাবার ব্যবস্থা করলেন। প্রেসের মালিক তো রাজি, কারণ তিনি 'বি. ভি.'র সক্রিয় সভ্য। কিন্তু কম্পোজ করবে কে ? মেসিন চলবে কার হাতে ?...তবে অনড় ইচ্ছার কাছে যেকোন প্রতিবন্ধক অর্থহীন।... অতি সংগোপনে এবং অতি নিষ্ঠায় ছাপান হল হাজার হাজার ইস্তাহার সারা রাত জেগে।...পাণ্ডুলিপি কম্পোজ করেছিলেন একটি অখ্যাত সাধারণ মানুষ। তিনি ঐ প্রেসেরই কম্পোজিটার। তাঁর কাজটি ছিল কিন্তু অসাধারণ। আজ সে কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়েই ইতিহাসে তাঁর পরিচয় আক্ষরিত হল। এ-ব্যক্তির নাম সুধীর সরকার। কোন বিপ্লবীদলের কর্মী তিনি ছিলেন না। মাসে মাসে 'বেণু' কম্পোজ করেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি অনুরাগী হয়ে ওঠেন 'বেণু'র কর্মীদের প্রতি। তাঁর অজ্ঞাত ঐ বিপ্লবী-কর্মীদেরও

ক্রমে তিনি বিশ্বাসভাজন হয়ে যান। কত বড় বিপদসঙ্কুল এই গুরু-দায়িত্ব ঐ সাধারণ কম্পোজিটারটি যে সেদিন গ্রহণ করেছিলেন, তা তিনি নিজে না জানলেও বিপ্লবীরা জানতেন। অথচ এত অধিক বিশ্বাসই তিনি অর্জন করেছিলেন যে, তাঁকে ঐ দায়িত্ব দিতে দায়িত্বশীল বিপ্লবীরা একটুও দ্বিধা বোধ করলেন না। এর কারণ, সেদিন ছিল বিপ্লবের যুগ; তখনকার সর্বস্তরের তরুণ-কিশোর আপন অজ্ঞাতেই ছিল বিপ্লব-যুগের সন্তান।···

বিপ্লবীরা এ প্রত্যয় নিয়েই ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ পথে এগিয়ে যেতেন।···

সুধীর সরকার বিপ্লবীর সে-প্রত্যয়ের মর্যাদা রক্ষা করেছেন সারা জীবন।···ঠিক তাঁরই মত সে-প্রত্যয়ের মর্যাদা দিয়ে এসেছেন চিরকাল আর একটি মানুষ। তাঁর নাম শশীভূষণ গাঙ্গুলি। শশীবাবু ছিলেন 'ডেভেনহ্যাম প্রেসের'ই কর্মচারী। তিনি 'ট্রেডেল্' মেসিন চালাতে জানতেন কিছুটা। তাঁরই সাহায্যে নির্মলবাবু ও তাঁর কতিপয় বিপ্লবী-বন্ধু রাতভর খেটেখুটে হাজার-হাজার ইস্তাহার ছাপিয়ে নিলেন।···

আজ একচল্লিশ বছর পর ইতিহাসের পাতায় সুধীর সরকার বা শশীভূষণ গাঙ্গুলির মত সহানুভূতিশীল ব্যক্তির নামোল্লেখ কালে একটি কথা বুঝতে হবে যে, এ-ধারার অজস্র মানুষের সামান্য সহায়তাও ছিল বিপ্লবীদের পথ চলায় অসামান্য পাথেয়। সুধীর সরকার বা শশীভূষণদের তাই সর্বযুগেই বিপ্লবীদের প্রয়োজন হয়। তাঁরাও অবিনশ্বর।···

॥ হেমচন্দ্রের সংগঠন-রীতি ॥

হেমচন্দ্রের দল-সংগঠন রীতি বস্তুতই অপূর্ব। ১৯০৫ সালে গুটিকয়েক আত্মনিবেদিত বন্ধু নিয়ে যে-দল তিনি নিজের সামর্থ্যে, দক্ষতায় ও পরিশ্রমে অনন্যচিত্ত হয়ে গড়ে তুলেছিলেন—তার পরিধি

তখন বিশেষ বিস্তৃত ছিল না। তবু ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত উহার কর্মকাণ্ড ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রচণ্ড। 'মিনিমাম্' শক্তি নিয়োগে 'ম্যাক্সিমাম্' ফল লাভ করার বুদ্ধি তাঁর ছিল—অর্থাৎ হেমচন্দ্র রাজনীতি যেমন বুঝতেন, তেমনি অভিজ্ঞ ছিলেন তার প্রয়োগনীতিতে। দলগঠনে কোনকালেই তিনি 'কোয়ান্টিটি'র উপর জোর দিতেন না, তাঁর লোভ ছিল 'কোয়ালিটির' প্রতি। এসব গুণাবলী থাকাতেই প্রয়োজনে তিনি 'আত্মোন্নতি-সমিতি'র সঙ্গে একত্রে কর্মে অবতীর্ণ হলেন। উভয় দলের যুগ্ম-চেষ্টায় অনুষ্ঠিত 'নন্দলাল-হত্যা' (প্রফুল্ল চাকির বিশ্বাস-হন্তারক পুলিশ ইন্সপেক্টর) এবং 'রডা-অস্ত্র-লুণ্ঠন' বিপ্লবী-ইতিহাসে তাই স্বর্ণাক্ষরে লিখিত দু'টি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে রইল।*

১৯২০ সালের পর হেমচন্দ্রের দল-সংগঠনের প্রতিভা আরো বিস্ময়কর রূপে প্রকাশিত। পুলিশের দল তো দূরের কথা অপরাপর বিপ্লবীদলের কাছেও নিজেকে এবং দলের প্রধানদের কর্মত্যাগী 'প্রাক্তন বিপ্লবী' রূপে পরিচিত করে যে ছদ্মবেশ তাঁরা ধারণ করতে পেরেছিলেন তার সাফল্য অসাধারণ। তিনি তাঁর সংগঠন-টেক্‌নিক্ অব্যর্থ করে তোলাতেই সারা বাঙলা ও বহির্বাঙলায় একটি নিখুঁত গুপ্ত-সংস্থা গড়ে উঠল 'মুক্তিসঙ্ঘ' তথা 'বি. ভি.' নামে। সে-সংস্থার দুর্মদ পরিচয় পেল দেশবাসী ১৯৩০ সাল থেকে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ পর্যন্ত।....

এই সার্থককর্মা ব্যক্তিকে তাঁর সার্থকনামা দলটির পটভূমে স্থাপন করেই সুখ্যাত বিপ্লবী-সাহিত্যিক অমলেন্দু দাশগুপ্ত অতি সংক্ষেপে অথচ অতি তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় লিখেছেন: "ফল দিয়া বৃক্ষের পরিচয়,

* (১) "পরিশিষ্টে" সংযুক্ত 'রডা কোম্পানির অস্ত্র-হরণের তাৎপর্য'—দ্রষ্টব্য।
(২) "মহাজাতি সদন কর্তৃক গৃহীত টেপ-রেকর্ডের অনুলিপি—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বর্ধন" ("পরিশিষ্ট" অধ্যায়) দ্রষ্টব্য।

এই সংকেতটুকু প্রয়োগ করিলেই হেমবাবুর পরিচয় আপনারা পাইবেন।" ('বক্‌সা ক্যাম্প'—পৃঃ ১৩৯)

আরো পরে হেমচন্দ্রের সাফল্যকে স্বীকৃতি দিতে গিয়ে তাঁর ত্রিসপ্ততিতম জন্মদিবসে (২৪শে নভেম্বর, ১৯৫৭) 'দৈনিক হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড্' পত্রিকা তাঁকে অভিহিত করেছিলেন 'Prince among Patriots' আখ্যায়। সে উৎসব-সভায়ই কলকাতা পৌরসভার তৎকালীন মেয়র ডক্টর ত্রিগুণা সেন আবেগমুগ্ধ-কণ্ঠে বলেছিলেন: "I seek the blessings of Hemchandra personally as well as on behalf of the Bengali race so that they may not falter from the path of duty and devotion in pursuit of their ideal." মেয়র আরো বলেছিলেন: "I am an ardent believer in the youth of Bengal as a living force and given guidance and leadership they are sure to pursue in right earnest the task and tradition bequeathed to them by Sages like Hemchandra." ('সবার অলক্ষ্যে', ২য় পর্ব, পৃঃ ১৪৮-১৪৯)

এই হেমচন্দ্র ঘোষ সম্পর্কেই ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ) অধুনা প্রকাশিত একটি গ্রন্থের ('বক্‌সা থেকে দেউলী') ভূমিকায় লিখেছেন: "শরৎচন্দ্র (সাহিত্য-সম্রাট) আমাকে বলিয়াছিলেন, 'পথের দাবী'র মালমশলা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিয়া।" ...

॥ আশাবাদী হেমচন্দ্র ॥

হেমচন্দ্র শুধু 'বি. ভি.'-র নয়, ভারতবর্ষের সংগ্রামী-যুগেরও একটি ইতিহাস। সবার অলক্ষ্যে ক্যামেরা ও Press-এর অগোচরে তাঁর কর্মময় জীবন সগৌরবে সূচিত হয়েছে। আজও স্তব্ধ-নিরালায় স্তূপীকৃত

পুস্তক-পত্রিকার মধ্যে বসে তিনি আদর্শের স্বপ্নে ধ্যানস্থ থাকেন। আত্মীয়স্বজন প্রচুর আছেন। কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে নিজেকে আলাদা নির্বাসিত করে তাঁর একক অবস্থান। নিজের চতুষ্পার্শ্বে এখনো কৃচ্ছ্রতায় উজ্জ্বল এক স্বপ্নময় বিভা বিরাজিত। তাঁর ধারণা অনুসারে তাঁদের কল্পিত 'স্বাধীনতা' এখনো আসেনি। রাষ্ট্রিক-স্বাধীনতা এসেছে নিশ্চয়ই; কিন্তু দেশাত্মবোধে সুন্দর যে মানসিক ও আর্থিক স্বাধীনতা—অধিকাংশের পক্ষে তা আসে নি। যে ত্যাগ ও বীর্যের পথে ভারতের স্বাধীনতা-যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, তা স্বাধীনতা-রক্ষার কালে ত্যাগবীর্যহীনতায় বিপথগামী। তাঁর মতে, যেটুকু আমরা পেয়েছি তার সাহায্যে বৃহৎ ও মহৎকে করায়ত্ত করার চেষ্টা না করে তার অপব্যবহারে আমরা একটি মানসিক-নৈরাজ্যের উপকণ্ঠে আনীত হয়েছি। অথচ এই দুর্দশা দেখেশুনেও ছিয়াশী বছরের এই জন্ম-বিপ্লবী এতটুকু আশাহত নন। তরুণ-সমাজের প্রতি তিনি স্নেহশীল। তাকিয়ে আছেন তাদেরই পানে।

তিনি বলেন: "আমরা কোনকালেই নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস রাখি নি। এটা আমাদের মারাত্মক দুর্বলতা। তাই ইংরেজের কলাকৌশলে বিভ্রান্ত হয়ে আমরা আত্মসমর্পণ করলাম। তাড়াতাড়ি ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে, রাজ্যপাট কংগ্রেস ও লীগ্-এর মধ্যে ভাগাভাগি করে 'স্বাধীন' হলাম। অথচ আপন শক্তিতে আস্থা রেখে একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলেই 'স্বাধীনতা' অর্জন করা যেত, দান রূপে আসত না। ভিক্ষুকের হাতে রাজ্যপাট এলো। রক্তরঞ্জিত-উষ্ণীষ মাথায় পরে রাজসিংহাসনে যাঁরা বসতে পারলেন না, তাঁরা পরের দেওয়া স্বর্ণমুকুট শিরোধার্য করে পরের দিকেই তাকিয়ে রইলেন বাহবা পাবার লোভে। দেশের লোক ভেসে গেল অনাদরে ও উপেক্ষায়। আত্মসুখ, প্রবঞ্চনা, লোভ, কলহ, শ্রমবিমুখতা ও অনাচার সর্বত্র জাঁক করে বসল 'ডিমক্রেসি'রই নামে। বিশ বছর ধরে আমরা সে-ডিমক্রেসির রূপ দেখেছি। তার

প্রত্যুত্তরে ঘরে ঘরে তথাকথিত যে-বিপ্লবের তাণ্ডব জন্মগ্রহণ করছে তার রূপও একই ধাতে গড়া বলে মনে হচ্ছে। কোথাও সংযম, নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা, নির্লোভ-আদর্শ বা নিঃশেষে আত্মবিলয়নের প্রেরণা নেই। মাইক্, ক্যামেরা ও প্রেস সম্মুখে রেখে বিপ্লব ঘটানর চেষ্টা সর্বত্র। এই যে 'ফাঁকি দিয়ে স্বর্গলাভে'র চেষ্টা জাতীয়-জীবনের সকল ক্ষেত্রে—এর মূলে ঐ 'Partition of India.' আত্মপ্রবঞ্চনা করে, সংগ্রামী-দেশকে 'বিট্রে' করে ক্ষমতার লোভে যে-অপকীর্তিকে সেদিন প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছিল তারই ফলশ্রুতি বর্তমানের ভারতীয় ও পাকিস্তানী জীবনযাত্রার বিকৃত রূপ। যাঁরা দেশকে বিভক্ত করেছিলেন, তাঁদের ক্ষমা নেই। ইতিহাসের চোখে তাঁরা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে বিশ্বাসঘাতক। জিন্নার সঙ্গে একই কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তৎকালীন কংগ্রেস-হাইকমাণ্ডকে বিচার করবে পাকিস্তান ও ভারতের আগামী দিনের মানুষ।"

হেমচন্দ্র আরো বলেন: "সত্যি আত্মবিস্মৃত আমরা। ভারতবর্ষের কথা ছেড়েই দিচ্ছি। এই বাংলায় কিসের অভাব ছিল? বুদ্ধি ও বিদ্যার জগতে, ত্যাগ-কর্ম ও সাধনার জগতে পৃথিবীর যেকোন দেশের মানুষের সমস্তরে বাঙালীর আনাগোনা ঘটেনি কি? রামমোহন-বিবেকানন্দ-বঙ্কিম-দেশবন্ধু-অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্র-শরৎচন্দ্র-সুভাষ-নজরুল প্রমুখ কত মনীষী এই বাঙলার মাটিকে ধন্য করে গেছেন। তাঁরা সবাই তো বিশ্বমানব—যেকোন শ্রেষ্ঠ দেশও তাঁদের পেলে ধন্য হত। সাহিত্যে-শিল্পে-কাব্যে-বিজ্ঞানে-দর্শন চর্চায়-ধর্মে-নৃত্যে-ভাস্কর্যে-চিত্রে-গানে কালজয়ী প্রতিভা নিয়ে যাঁরা ভারতবর্ষকে যথার্থই যশস্বিনী করে গেছেন তাঁদের তুলনা বিশ্বের ভাণ্ডারে খুব বেশি কি? তারপর শৌর্যের ইতিহাস। এখানে বাঙালীকে অজেয় করে গেছেন শহিদকুল; অজেয় করে গেছেন মোহনলাল-মীরমদন-ঝান্সির রাণী থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু পর্যন্ত একাধিক সেনাধ্যক্ষ। এঁদের অমন আত্মবিলয়ন, মৃত্যুর আহ্বানে

অমন অকুণ্ঠ যাত্রা—তার তুলনা কোথায়?…কিন্তু আজ সেসব কথা ভুলেই গিয়েছি। তাই 'বিপ্লব' করতে গিয়ে জগদীশচন্দ্র, গান্ধীজি বা পি. সি. রায়ের মর্মর-মূর্তি ভেঙে ফেলি, পুরাতন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে মিথ্যা বৈপ্লবিক-পানপাত্রে কণ্ঠ ডুবিয়ে নেশাতুর হয়ে উঠি। বিপ্লবের এই উচ্ছৃঙ্খল ও কুৎসিত রূপ বেদনাদায়ক। তবু বলব, এ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাণবিমুখ নয়। কাজেই উচ্ছৃঙ্খলদের আমি ভালবাসি, তাতেই বেদনা অনুভব করি এদের অনাচারে আরো বেশি। সান্ত্বনা পাই এই ভেবে যে, যথার্থ নেতৃত্বের নির্মম অথচ স্নেহাতুর স্পর্শে এদের রূপ বদলে যাবে। আমি বিশ্বাস করি বিপ্লবের এসব তথাকথিত ধারকদের তবুও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, কারণ বাঙলার ঐতিহ্যই এদেরকে রক্ষা করতে বাধ্য। নিষ্ফল-আন্দোলনে মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে এদের চৈতন্যও একদিন ফিরে আসবে। তখন এরাই প্রত্যাবর্তন করবে স্বপথে, বন্ধনহীন আদর্শচঞ্চল 'বিপ্লবে'র পথে।"…

আমরাও মনে করি – সেই পথে হবে নিজের স্বার্থ অবলুপ্ত, সকল ক্ষুদ্রতা ও অসত্য হবে নিদূরিত। সেই পথেই প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে বলবে এই তরুণ-বিদ্রোহীদল :

'মোদের চক্ষে জ্বাল জ্ঞানের মশাল
বক্ষে ভরা বাক,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন
নিত্য কালের ডাক।' (নজরুল)

হেমচন্দ্র আরো বলেন: "যথার্থ নেতৃত্ব পেলে এদেরই ইনটেলেক্ট খোরাক পাবে বঙ্গের শ্রীচৈতন্য থেকে শ্রীসুভাষেরই কাছে। এরা ত্যাগ ও বীর্যে 'মানুষ' হবে বঙ্গের শহিদকুলের শৌর্য-সাধনাকে সম্বল করে। এরা বুঝবে প্রপাগেণ্ডা করে শহিদ তৈরি করা যায় না—'শহিদ' জন্মায়। পরিপার্শ্বের চাপে মৃত্যুলাভ, আর মৃত্যুকে সজ্ঞানে আদর্শবোধ থেকে বরণ করে নেওয়া—এক বস্তু নয়।"

হেমচন্দ্র কিছুক্ষণ থামলেন। তারপর স্মৃতি আলোড়িত করে বলে চললেন: "আমরা বাঙালীকে চিনি না। কিন্তু আমাদের শত্রু ব্রিটিশ-রাজপুরুষদের বাঙালীকে চিনে ফেলতে ত্রুটি হয়নি। তার প্রমাণ আমার কাছে আছে।…'রডা-অস্ত্র-লুণ্ঠনে'র পর ১৯১৪ সাল থেকে ১৯১৭ সাল আমি অন্তরীণে স্টেট্ প্রিজনার রূপে ঢাকায় এবং হাজারিবাগ ও কলকাতার বিভিন্ন জেলে দিন কাটিয়েছি। এসব জেলে বাঙলার তদানীন্তন লাট লর্ড কারমাইকেল্ ও লর্ড রোনাল্ড্শে এবং চীফ্ সেক্রেটারি মিঃ স্টিফেন্সন্ পর পর জেল-পরিদর্শন করতে এসে আমার সেল্-এ এসেছেন। তাঁদের তৎকালীন উক্তি আজও আমি ভুলিনি।

"লর্ড কারমাইকেল্ আমাকে বলেছিলেন: এ বিপ্লবী-আন্দোলন অনায়াসে থামান যেত, যদি বাঙলার 'ইন্টেলকচ্যুয়েল্ জায়াণ্ট্রা' এর পেছনে না থাকতেন।

"লর্ড রোনাল্ড্শের উক্তি: তোমাদের রামমোহন, মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, টেগোর, বঙ্কিম—These intellectual stalwarts are behind this movement. How to stop it!"

"স্টিফেন্সন্ সাহেব: তোমাদের শক্তি কোথায় আমরা জানি। রাইফেল-পিস্তলের সঙ্গে যুদ্ধ করা যায়, কিন্তু বাঙালীর ভাবপ্রবণ-আদর্শবাদের সঙ্গে যুদ্ধ চলে না। তোমাদের রক্তকণায় বিদ্রোহ—তোমাদের সুপার-ইন্টেলেকচ্যুয়েলরা এক-একটি 'রিবেল্'। অনেক দুঃখ তোমাদের আছে। কিন্তু তাতে তোমাদের ভয় নেই—You are a lot of incorrigible desperadoes.…"

হেমচন্দ্র সম্পূর্ণ ভরসা রাখেন আজকের তরুণ-তরুণীদের উপর। তিনি মনে করেন, তাদের শুভবুদ্ধি ফিরে আসবে। তারা বাঙালীর

সন্তান—সঠিক নেতৃত্বের সন্ধানে তারা বেরুবেই। কানাই-ক্ষুদিরাম-বিনয়-দীনেশ-প্রীতিলতার মালমসলা দিয়ে গড়া অনেক তরুণ-তরুণীই তাদের মধ্যে আছে। নেই শুধু একটা রাসবিহারী, একটা যতীন মুখার্জি বা একটা সূর্যসেন। শতকরা নিরানব্বই জনের সার্বিক স্বাধীনতা আনয়নের জন্যে যে-নেতৃত্বের প্রয়োজন, সে-নেতৃত্বও বাঙালী দিয়েছে। সুতরাং তাঁদের খুঁজেপেতে বরণ করে নিতে হবে নেতাজির মত পুরুষের কালজয়ী এক নেতৃত্ব। বাঙলার মৃত্যু অসম্ভব। বাঙালীর শৌর্যেই ভারতবর্ষ বিশ্বজয়ীর গৌরবে বাঁচতে বাধ্য।

বার্ধক্যজীর্ণ দেহেও ছিয়াশী বছরের বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র আজও সুস্থ চিন্তাধারা এবং বলিষ্ঠ আশাবাদে সুন্দর। তাঁর কল্পনায় সার্থক আয়ুধ দেশের যৌবন—উচ্ছৃঙ্খল, কিন্তু প্রাণমুখর যৌবন। এই অব্যর্থ আয়ুধ স্বহস্তে ধারণ করার সফল 'নেতৃত্ব' আসবে ঠিকই। 'নেতাজি'র মত কোন সম্পূর্ণ-নেতৃত্ব নব-কলেবরে আবির্ভূত হবেনই। তাঁর পদধ্বনি শোনার অপেক্ষায় হেমচন্দ্র মৃত্যুর পরও কান পেতে থাকবেন। নইলে 'মা যা হবেন'—চিরদিনের এই কল্পিত রূপে যে ভারতবর্ষের রূপায়ণ ঘটবে না!···

পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে, পরিচ্ছন্ন চিন্তাধারা ব্যক্ত করার কালে মনে হয়, এই মানুষটি যেন সত্যি বলতে পারেন:

> "বাণী ক্ষুরধার,
> বীণা মোর শাপে তব হল তরবার ··!"
>
> (নজরুল)

বিপ্লবের সার্থকতম নেতা পৃথিবীর ইতিহাসে যে ক'জন জন্মেছেন তাঁদের অন্যতম রূপে সুভাষচন্দ্রকে হেমচন্দ্র জেনেছিলেন বহু পূর্বেই। তিনি বলেছিলেন তাঁর এক বন্ধুকে একদিন, Hugh Toye-এর বই থেকে পাঠোদ্ধার করে: "এই ছাখো, সুভাষচন্দ্রকে শত্রুপক্ষ কী ভাবে বুঝেছে। বলছেন Hugh Toye নেতাজি সম্পর্কে—'By the

magnitude of his conception, by the example of his magnetic, burning zeal, his tenacity and personal force, by the tradition he left of sacrificial patriotism, must be measured the stature of Subhas Chandra Bose. His place in Indian History cannot be denied. Idol of the masses in Bengal, his youthful daring, his 'panache', his reckless courage caught the imagination of India. He gave much to his country. Even after the ruin of all he built, something of substance remained.' "

('SPRIGING TIGER'—P. 197)

হেমচন্দ্র বলে যাচ্ছিলেন: "রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে এই একটি নেতাই জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁর নেতৃত্ব পূর্ণাঙ্গ, নিখুঁত, সম্পূর্ণ।* এমন নেতৃত্বেরই পুনঃ প্রয়োজন ভারতবর্ষকে বাঁচাবার জন্যে, পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্যে।···আমাদের দেশে হাজারগণ্ডা দল আছে, কিন্তু কোথাও এক বিন্দু সঠিক নেতৃত্ব নেই। 'নক্‌শাল্‌' বা লেফট্‌-রাইট্‌ যেকোন পার্টিই হোক—কারোই কিছু করার ক্ষমতা আসবে না দেশের মাটি দিয়ে গড়া, দেশের ঐতিহ্যপুষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ নেতার নেতৃত্ব না পেলে। চীন থেকে মাও সে তুং সাহেবের ছবিখানি নেতার আসনে বসিয়ে বা রুশ থেকে স্তালিন্‌-লেনিনদের মূর্তি নেতার গদিতে রেখে 'পোস্টার-বিপ্লব' করা যায়, কিন্তু যথার্থ বিপ্লব তো দূরের কথা, গণচেতনার দ্বার বিন্দুমাত্রও খোলা যায় না। নিজেদের বুকের রক্ত দিয়ে, স্বদেশের মাটি থেকে গড়া একটি 'কম্যুনিস্ট্‌ নেতাজি'র আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত এসব অতি-বামদেরও কোন সুরাহা হবে

---

* 'পরিশিষ্টে' প্রদত্ত শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক শ্রীভক্তকুমার ঘোষকে লিখিত "দ্বিতীয় পত্র" দ্রষ্টব্য।

না।···তাই বারে বারে আমি বলব যে, যে-দল যে-মতবাদই যথার্থ 'বিপ্লব' সকলের কল্যাণে আনুক না কেন, তার কর্মী ও নেতাকে কোন্ স্তরে উঠতে হবে তা বাঙলার মনীষীবৃন্দ, শহিদকুল ও অনন্যসাধারণ শক্তিধর নেতাজি জানিয়ে গেছেন।···"

হেমচন্দ্র ঐতিহাসিক পুরুষ। তাঁর বাণীও তাই চিরকাল ইতিহাসবিধৃত হয়ে থাকবে।

চট্টগ্রাম বিপ্লব-বাহিনীর সর্বাধিপ : সূর্যসেন

তখন সন্ধ্যা ৬টা। কংগ্রেস-আপিস থেকে প্রথমেই একটি তরুণ-দলকে পাঠান হচ্ছে চট্টগ্রাম শহরের অনতিদূরে 'ধুম্'-এর দিকে। তাঁরা রেল্-লাইন্ ওড়াবেন। এর কিছু পরে যথানির্দিষ্ট সময়ে বিপ্লবীরা ঘটাবেন চট্টগ্রাম-রাইজিং। সেদিন ১৮ই এপ্রিল।...

একটি কিশোর কর্মীকে প্রশান্ত কণ্ঠে দলপতি বললেন দু'টো রিক্সা ডেকে আনতে। একটু চঞ্চল, একটু আনমনা সে-কিশোর একটু পরেই যেসব ঘটনা ঘটবে তারই স্বপ্নে। দলপতির আদেশ খুব ভাল করে তার কানে যায়নি। চট করে নিয়ে এল সে একটি রিক্সা। রিক্সা থেকে নামতেই প্রশ্ন করলেন দলপতি—'একটা কেন?' বলেই কিশোরকে তার গণ্ডের সম-মাপে প্রচণ্ড একটি চড় কষে দিলেন। তার সারা দেহ ঐ ভীষণ চপেটাঘাতে থরথর কেঁপে ঘুরে গেল।...পড়িমরি দে ছুট্!...মুহূর্তে নিয়ে এল সে অপর একটি রিক্সা।...

রিক্সা দু'টোয় চড়ে ধুম্-গামী বিপ্লবীরা বেরিয়ে গেলেন।...

একটু পরে দলপতি ও সে-কিশোর পায়ে হেঁটে পথ চলা শুরু করলেন। তাঁদের গন্তব্যস্থল শহরের অভ্যন্তরেই।

এ দলপতি আর কেউ নন—তিনি সূর্যসেন। চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানের সর্বাধিনায়ক সূর্যসেন। উল্লিখিত কিশোর হলেন বিনোদ দত্ত। 'মাস্টারদা'র হাতে-গড়া বিপ্লবী। নেতার বুকের অফুরন্ত ভালবাসা পেয়ে, প্রয়োজনে কঠিন হস্তের প্রচণ্ড চড় খেয়ে কর্মপথে চলতে-চলতে 'মানুষ' হয়েছিলেন এই বিনোদ দত্ত। উপরতলার সকল

কর্মী জেলে বা মৃত্যুমুখে অপসারিত হতেই মাস্টারদা এই বিনোদ দত্তের উপর তাঁর আসন্ন অভাবে এবং তারকেশ্বর দস্তিদারের অবর্তমানে দলের নেতৃত্বভার ন্যস্ত করে গিয়েছিলেন। মাস্টারদার নির্বাচন ব্যর্থ হয়নি। নেতা ও সিনিয়ার কর্মীদের না-থাকা কালে দলের কাজ বিনোদ দত্ত আপ্রাণ ধৈর্যে ও দক্ষতায় চালিয়ে গেছেন। প্রায় এগার বছর ধরে বিক্ষুব্ধ চট্টগ্রামেই পলাতক থেকে বৈপ্লবিক কাজ করে যাওয়া সামান্য কথা নয়। দীর্ঘকাল অন্তে তিনি ধরা পড়লেন। কিন্তু তখন সাক্ষী-সাবুদ কই? কাজেই তাঁকে অল্প সাজা দিয়েই পুলিশকে খুশি থাকতে হল।

আজ দীর্ঘ উনচল্লিশ বছর পর নানা প্রশ্ন করে প্রৌঢ় বিনোদ দত্তের কণ্ঠে আমরা শুনেছি: "মাস্টারদা ও আমি ঐ কাণ্ডের পর পায়ে হেঁটে চলে এলাম ব্রাহ্মমন্দিরে। পথে আদর করে দাদা বললেন—'ব্যথা পেয়েছিস?' আমি বললাম—'শিক্ষা পেয়েছি।'··· দাদা খুশি হলেন। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি বললেন,—'হ্যাঁরে, কত বড় কাজ করতে যাচ্ছিস! তোরা বিপ্লবী। তোরা চোখেও শুনবি, কানেও দেখবি—তবে তো সফল হবি অসম্ভব কাজে!'···"

বিনোদবাবু একটু হেসে আমাদের বলেছিলেন: "আমি এগার বছর একটানা পলাতক থেকে কাজ করতে পেরেছিলাম, ধরা পড়িনি, কাজেও বিরাম দিইনি—শুধু মাস্টারদার ঐ একটি চপেটাঘাতের আশীর্বাদে।"

এ-কাহিনী থেকেই 'সংগঠক' সূর্যসেনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'মানুষ' তৈরি করতে তিনি জানতেন। সে-ক্ষেত্রে তাঁর মূলধন ছিল হৃদয়ের অন্তহীন প্রেম, শিক্ষাদাতার কঠোরতম শাসন এবং পথচলার নির্দেশদানে স্পষ্টতা। কর্মীরা তাঁর কাছে পেয়েছেন ভালবাসা, পাননি

আস্কারা। বিভিন্ন কর্মীর মধ্যে কোন তারতম্য করার অভ্যাস থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত। সর্বোপরি সকল বিপ্লবী-নেতার মতই 'আপনি আচরি ধর্ম' তিনি অনুগামীদের তা শেখাতেন।

দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্ন নিয়ে সূর্যসেনের জন্ম। অসাধারণ শক্তির সাধক হয়ে তিনি কর্মপথ খুঁজে বের করেছেন। সেই পথে অবিচল বিশ্বাসে ও দুর্জয় সাহসে তিনি এগিয়ে গেছেন। কিন্তু সে-অভিযান সম্ভব হত না, যদি তাঁর আদর্শ-গ্রহণ এবং আদর্শ-প্রয়োগ নিখুঁত না হত। অকপটে তিনি 'মানুষে'র মর্যাদায় নিজেকে তুলে ধরেছিলেন। তাই অনায়াসে তিনি 'মানুষে'র স্তরে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন তাঁর সতীর্থদের। সংগঠক সূর্যসেনের সাফল্য-সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় এখানেই।...

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সে-জন্যেই দাস্যসুখে খুশি ভারতীয়দের জীবনেই আমরা শুনতে পেয়েছি 'মানুষে'র পদধ্বনি। চট্টলার শহরে-গ্রামে-অরণ্যে-পর্বতে লিখিত হয়েছে 'মানুষে'র কীর্তি। বাঙলার দিকে দিকে চিহ্নিত হয়েছে 'মানুষে'র পথযাত্রা।...

চট্টলার 'নয়াপাড়া গ্রাম'। কবি নবীন সেনের জন্মভূমি। সূর্যসেনও এই গ্রামেই জন্ম নিয়েছিলেন। অখ্যাত একটি গ্রামকে এক প্রতিভাধর কবি তাঁর হৃদয়ক্ষরা কাব্যধারা দিয়ে একদিন ধন্য করেছেন, আর একদিন তাকে ধন্য করেছেন এক দুর্জয় বিপ্লবী তাঁর হৃদ্‌পিণ্ডের রক্তধারা নিঙড়ে দিয়ে। মোটের উপর দু'টি কালজয়ী পুরুষের কল্যাণে 'নয়াপাড়া গ্রাম' আজ ভারতবাসীর তীর্থক্ষেত্র।...

সূর্যসেনের জন্মতারিখ ১৮৯৩ সালের ২৫শে অক্টোবর। তাঁর মাতা শশীবালা দেবী। পিতার নাম রাজমণি সেন। শিশুকাল

থেকেই সূর্যসেনের চরিত্রে স্থৈর্যের লক্ষণ দেখা গেছে। কৈশোরে তাঁর চতুষ্পার্শ্বে চটুলতার ছোঁয়াচ লাগতে পারেনি। একটু স্বতন্ত্র, একটু গম্ভীরতর, একটু আত্মনিমগ্ন ভাব তাঁর স্বভাবে ছিল তো বটেই—কিন্তু সে-ভাব ছিল আড়ম্বরহীন। কাজেই বাইরে থেকে মানুষটিকে কেউ কোনদিনই অসাধারণ ভাবতে পারেনি।...বাল্যকাল পার হতেই সমাজসেবা বা নির্যাতিত ও দরিদ্র্যের প্রতি সহানুভূতিমূলক কাজ তাঁকে উৎসাহিত করত।

বহরমপুর কলেজে পড়ছেন সূর্যসেন। তৎকালে দীক্ষা পেলেন তিনি বিপ্লব-মন্ত্রে। তাঁর চিন্তাস্রোত একটি খাতে উদ্দাম গতি লাভ করল।

সূর্যসেনের সতীর্থ অনুরূপ সেন বহরমপুরের পরিবেশেই তাঁর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন। উভয়ের বন্ধুত্ব প্রগাঢ়। উভয়ের চিত্ত দেশজননীর বন্ধনমুক্তির কল্পনায় রঙিন, উভয়ের স্বপ্ন সে-কল্পনার রূপায়ণে মুখর। কিন্তু এ পরম সুহৃদের সঙ্গে পদযাত্রা তাঁর বেশিদূর এগোয়নি। কারণ কারাবাসে বন্ধুর হঠাৎ মৃত্যু ঘটে।

শহর চট্টগ্রামে সূর্যসেন একটি সেবা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নাম তার ‘সাম্য আশ্রম’। এ আশ্রম গড়তে গিয়ে সহকর্মী ও বন্ধুরূপে তিনি পেলেন গিরিজাশংকর চৌধুরি, চারুবিকাশ দত্ত ও অম্বিকা চক্রবর্তিকে; অনুগামীরূপে পেলেন নির্মল সেন, অনন্ত সিংহ, রাজেন দাস, গণেশ ঘোষ, যতীন রক্ষিত, সুখেন্দু দত্ত, রাখাল দে প্রমুখ তরুণদের। গিরিজাশংকর ও চারুবিকাশ দত্ত ছিলেন ‘অনুশীলন সমিতি’র সভ্য। অম্বিকাবাবু ও সূর্যসেন ছিলেন ‘যুগান্তর দলে’র সঙ্গে বৈপ্লবিক-বন্ধনে আবদ্ধ। ‘আত্মোন্নতি-সমিতি’র সঙ্গেও সূর্যবাবুদের বৈপ্লবিক-আত্মীয়তা অটুট ছিল চিরকাল।

সূর্যবাবু এ-সময় শিক্ষকতা করছেন। ছাত্রবৎসল আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষকরূপে তাঁর মর্যাদা ছড়িয়ে পড়েছে শহরের সর্বত্র।…

'সাম্য আশ্রমে'র পরিচালক সূর্যসেন বাঙলার বিপ্লবী-নেতাদের অভিরুচি মত ১৯২১ সালে গান্ধীজির আবির্ভাবের পর কংগ্রেস-আন্দোলনের শরিক হলেন। ক্রমে চট্টগ্রামে কংগ্রেস-আপিস তাঁর আয়ত্তে এল। তিনি কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারি।

সূর্যবাবু এখন লোকের চোখে মস্ত বড় সমাজসেবী, কংগ্রেসসেবী ও আত্মভোলা কর্মনেতা। মাস্টারি ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু 'মাস্টার' তথা লোক-শিক্ষকের পদ থেকে ইতিহাস তাঁকে অব্যাহতি দিল না। চট্টগ্রামের আপামর তরুণ-সমাজের তিনি গুরু ও দাদা হয়ে রইলেন চিরদিনের জন্যে। তাঁর নাম 'মাস্টারদা'। কিন্তু পাব্‌লিক্‌-পলিটিক্সের সংগঠনক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্ব যতই থাকুক, তাঁর সংগঠন-ক্ষমতা কালজয়ী স্বীকৃতি পেল সংগোপনে। গুপ্ত-সমিতির নেতা সূর্যসেনের সংগঠন-প্রতিভার সার্থকতম ক্ষেত্র তাই সংগ্রামী যুবকদের হৃদয়-নিভৃতে, তাদের আগুন-ছোঁয়া রক্তদোলার প্রতি রন্ধ্রে। এই যে অনন্য সংগঠক —ইনিই হলেন 'মহা বিপ্লবী' সূর্যসেন। সূর্যসেন শুধু চট্টলার নন, সমগ্র দেশের আগত ও অনাগত তরুণদলের মৃত্যুহীন বন্ধু ও গুরু— তিনি তাঁদেরই যথার্থ মাস্টারদা।…

অতি সংগোপনে বিপ্লবী-চট্টগ্রামের সংগঠন-কার্য চলছে। চলছে তার আসন্ন কর্মযজ্ঞের প্রস্তুতি-পর্ব। বিদেশী শাসককে মৃত্যু-আঘাত দিতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ-সিংহের থাবা অকেজো না করে দেবার পূর্বে বিরাম নেই।…

অতন্দ্র কর্মতপস্যায় নিযুক্ত বিপ্লবী-সন্ন্যাসী। নিখুঁত সৌন্দর্যে সারা চট্টগ্রামে সূর্যসেন দলের পরিসর বাড়িয়ে যাচ্ছেন। শহরে-

গ্রামে যুবকশ্রেণী কংগ্রেসের আওতায় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী গড়ে সমাজসেবা করে 'দেশসেবা'র পাঠ নেন। প্রকাশ্য কাজে সমাগত যুবকদের মধ্য থেকেই সূর্যবাবুর বিপ্লবী-অনুগামীরা গুপ্ত-সমিতির কর্মে ছেলেমেয়েদের টেনে আনেন। ফলে, চট্টলার যৌবন দুঃসাহসী কর্মস্বপ্নে বিভোর হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করতে হবে যে, এই গোপন সংগঠনকার্যে সূর্যবাবুর একান্ত সহায়ক ছিলেন নির্মল সেন। তাঁকেই বলা চলে চট্টগ্রাম বিপ্লব-সংস্থার যথার্থ 'সেকেণ্ড্ ম্যান'—the Mother of the Institution।···

সংগঠক সূর্যসেন ছিলেন কর্মতপস্বী—কর্মলোভী নন। তাই একান্তভাবে লিপ্ত থেকেও নির্লিপ্ত থাকতেন তিনি সকল কর্মে। সেই জন্য 'ডিক্টেটার' হবার প্রয়োজন তাঁর হয়নি, যদিও কোন কাজই তাঁর অনুমোদন ব্যতীত সম্পন্ন হতে পারে, এ-কথা ভাববার মানুষ ছিল না তাঁর দলে। 'ডিমক্রেসি' ছিল তাঁর চরিত্রের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে, কারণ অমন আত্মনিয়ন্ত্রিত ও আত্মনিয়মানুগ মানুষ অপরকে পরিস্ফুট হবার সুযোগ না-দিয়ে থাকতে পারেন না।

সূর্যবাবুর জনৈক সহকর্মী* বলেন: "যেকোন বিষয় নিয়েই হোক, উপস্থিত কর্মী ও কর্মনেতাদের প্রত্যেকের অভিমত মাস্টারদা শুনতেন। কাউকে বাদ দিতেন না। নিজে একটি কথাও বলতেন না। সকলের অভিমত জানার পর সর্বশেষে নির্মল সেনের দিকে তিনি তাকাতেন। নির্মল সেনের চিন্তাশক্তি ও বাস্তব-বুদ্ধির প্রতি মাস্টারদার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। সাধারণত নির্মল সেনের মন্তব্য প্রয়োজনে একটু ছাঁটকাট করেই মাস্টারদা তাঁর অভিমত ব্যক্ত করতেন। সে অভিমত তখন 'অর্ডার্'। তার নড়চড় নেই।···অবশ্য এ-ও দেখা গেছে যে, কোন কোন ক্ষেত্রে সবার মতের বিরুদ্ধে মাস্টারদা রায় দিয়েছেন। তাঁর

*শ্রীযুক্ত বিনোদ দত্ত।

'রায়' তখন পার্টির অর্ডার্। সে-অর্ডার্ সে-সব ক্ষেত্রে আক্ষরিক-ভাবে পার্টি মানতে পেরেছে বলেই বহু বিপদ থেকে সে বেঁচে গেছে। কাজেই আমরা প্রতি মুহূর্তে জানতাম যে—'মাস্টারদা ভুল করতে পারেন না, তিনি অভ্রান্ত।'···নেতার প্রতি অমন বিশ্বাস যেমন আমাদের মনে শক্তি দিয়েছে, তেমনই নেতার আদেশের সক্রিয় শরিকরূপে নিজেদের ভাবতে পারতাম বলেই সকল কর্মে সেই বোধ আমাদের আত্মনির্ভর করেছে।"···

সূর্যসেন কর্ম-তপস্বী বলেই প্রত্যেকটি কর্মীর চিত্তে ছিল তাঁর অনড় আসন। তাই তিনি খাঁটি 'ডিমক্র্যাট্'। তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতা-লোভী কোন কর্মীর ষড়যন্ত্র করার প্রয়োজন হত না। কারণ, ক্ষমতা তিনি ডিক্টেটারদের মত আঁকড়ে থাকেননি ; ক্ষমতা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে সবাই নিশ্চিন্ত হতেন।···

এই মানুষটির মধ্যে 'ভিতর' ও 'বাহির' নামক আলাদা করে কোন প্রকোষ্ঠ ছিল না। তাঁর ভিতর-বাহির ছিল অভিন্ন। সেখানে যেকেহ প্রবেশ করতে পারত, যখন-তখন। কিন্তু প্রবেশের পূর্বে তাকে কর্মানুগ হতে হবে-বই কি।··

সূর্যসেনের দেহরূপে একটুও জলুস ছিল না। বাইরে থেকে তিনি অতি সাধারণ। ছোট্ট, শীর্ণ চেহারার মানুষ। তাঁর কোন ব্যক্তিত্ব আছে বলেই বোঝা যায় না। কিন্তু দু'টি চোখ। কী তীক্ষ্ণ, কী সুদূরপ্রসারী ও অন্তর্ভেদী! অমিত শক্তির অধিকারী এই পুরুষ ভিতরে-ভিতরে। দু'টি নয়নদীপে সে-শক্তির জ্যোতিচ্ছটা। এই শক্তি কিছু জন্মগত, কিছু অর্জিত। প্রতি মুহূর্তে তিনি আহরণ

করেছেন এ-শক্তি ছোটবড় নানা কর্মের মাধ্যমে। তাই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত সূর্যসেন বিরাজ করতেন সবার গোচরে। যারা তাঁর নিকট সংস্পর্শে এসেছে তারা মুহূর্তে অগ্নিতাপ অনুভব করেছে। ভস্মের জলুসহীনতা দেখে পিছিয়ে যাবার পূর্বেই তাঁর চরিত্রের অগ্নিজ্বালায় প্রজ্বলিত হতে পেরেছে।...

কি করে এই শক্তি সঞ্চয় করেছেন সূর্যসেন? যাঁরা প্রতিনিয়ত তাঁর সঙ্গে মিশেছেন, তাঁরা জানতেন যে, তিনি নিজেকে তৈয়ের করার রীতি কি কঠোর সংযমেই না পালন করতেন। শ্রীযুক্ত বিনোদ দত্ত বলছেন: "মাস্টারদা তখন কংগ্রেসের সেক্রেটারি। থাকেন কংগ্রেস-আপিসে। এমন সময় একদিন তাঁর দাদা এলেন তাঁর কাছে। দাদা এসেছেন দেশের বাড়ি থেকে। দারিদ্র্যের তাড়নায় ছুটে এসেছেন ভাইয়ের পাশে, সংসার অচল, কিছু অর্থ চাই।...মাস্টারদা মন দিয়ে শুনলেন গৃহের দুঃখদৈন্যের কথা। দাদার ব্যাকুল আবেদন শুনলেন তিনি কান পেতে। অথচ নিশ্চুপ। অনেকক্ষণ পর তাঁর দাদা বললেন—'তুই তো কিছুই দিলি না, চলি তা হলে।'...মাস্টারদা নীরবে তাঁর পায়ের ধূলা নিলেন।...দাদা বিদায় হলেন ভগ্নহৃদয়ে।... আমি তাকিয়ে রইলাম মাস্টারদার পানে। চোখে তাঁর কাতর দৃষ্টি, মুখ মলিন।...এমন সময় একটি ছেলে এল। সে জানাল যে, তার পরীক্ষার ফি যোগাড় হয়নি, কংগ্রেস-সেক্রেটারি কিছু ব্যবস্থা না করলে এ-বছরটি গরীব-ছেলের নষ্ট হয়ে যাবে।.. মাস্টারদা পকেট থেকে টাকা বের করে দিলেন। ছেলেটি হাসিমুখে চলে গেল।... আমি এবার বিস্ময়ে তাকালাম মাস্টারদার মুখের পানে। বললাম—'এ কি করলেন, দাদা! অত টাকা পকেটে থাকতে আপনার দাদাকে কিছু দিলেন না?'...করুণ করে হাসলেন মাস্টারদা। তারপর গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—'সংসার-বন্ধন কাটাতে চাই। দাদাকে একবার দিলে বারে বারে তিনি আসবেন—সংসারের এই দেয়া-নেয়ার চক্রে পিষ্ট হতে চাই না।—এ টাকা কার? এ তো দেশসেবার জন্যে

নির্ধারিত টাকা, আমার পরিজন-সেবার জন্মে নয়। ঐ ছেলেটাকে দিতে গিয়ে বন্ধনভয় নেই। দেশের টাকা দেশবাসীর কল্যাণকল্পে। দেশের ঐ গরীব ছেলেটার ভাগ রয়েছে ঐ টাকায়'…আমি প্রশ্ন করলাম—'আপনার দাদার বুঝি ওতে ভাগ থাকতে নেই? তিনি বুঝি দেশের মানুষ নন?' উত্তরে মাস্টারদা সহাস্যে বললেন—'দাদা তো এসেছেন তাঁর ছোট ভাই 'সূর্যে'র কাছে, কংগ্রেস-সেক্রেটারি সূর্যসেনের কাছে নয়।'…আমি সেদিন অনায়াসে বুঝেছিলাম এই লোকটি কত বড়, কত খাঁটি, কত অনাসক্ত ও মহিমাবিজড়িত।"

বিনোদবাবুর ঐ দিনের আবিষ্কার ভুল ছিল না। ঐ মুহূর্তের আবিষ্কার যে সূর্যসেনের প্রতিটি জীবন-মুহূর্তের পক্ষে সত্য আবিষ্কার, তা উত্তরকালে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি কোন ব্যক্তি বা গৃহবিশেষের লোক ছিলেন না—তিনি ছিলেন সর্বকালের, সর্বদেশের, সর্বমানবের। তাই তিনি হতে পারলেন লোকনেতা, তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রয়ে গেলেন লোকনেতা। মৃত্যুর পরও তিনি সমাদৃত মৃত্যুহীন সর্বলোক-নেতা রূপে।

সূর্যসেন কঠোর বাক্-সংযমী শুধু ছিলেন না, তাঁর সংযম ছিল আহারে-বিহারে-জীবনধারণের প্রতি স্তরে। অর্থ, খাদ্য, বসন, ভূষণ, বাসস্থান সবকিছুর প্রতিই এই মানুষটি ছিলেন উদাসীন। আত্মীয়-স্বজনের চাপে তিনি বিবাহ করেছিলেন পুষ্পকুন্তলা দেবীকে। কিন্তু এই বিবাহ কখনো 'বন্ধন' রূপে তাঁর কাছে আসেনি, এসেছিল মুক্তির স্বর্ণ-সোপান রূপে। কারণ, বিশ্বকবির বাণী তাঁর অন্তরে দানা বেঁধেছিল:

> "অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।"…

সূর্যসেনের উত্থান—সমগ্র দেশবাসীকে নিয়ে, একা নয়। কাজেই দেশের ঐ অগণিত নর-নারীর মধ্যে তাঁর সহধর্মিণীও একজন। তাঁকে তিনি অর্থ-সংসার-সুখ দিতে পারেননি, কিন্তু তাঁর মনকে টেনে নিয়েছিলেন তিনি অগণিত জনতার সুখ-দুঃখ ও সংসারের মধ্যে। কিন্তু বাঁচলেন না পুষ্পকুন্তলা। টাইফয়েড্ রোগে মৃত্যু হল প্রিয়দর্শিনী ঐ গ্রাম্য-বধূটির একান্ত অকালে। বেলগাঁও জেলার রত্নাগিরি-জেল থেকে পুলিশ-পাহারায় রাজবন্দী সূর্যসেনকে আনা হয়েছিল স্ত্রীর রোগশয্যার পাশে। সবার চোখের উপর স্বামীকে মুক্তি দিয়ে চলে গেলেন অভিমানিনী স্বর্গলোকে। অথচ সূর্যসেনকে 'মুক্তি' দেবার কিছু নেই। তিনি জন্ম থেকেই মুক্তপুরুষ। স্ত্রীকে তিনি আরাম ও সাংসারিক-নিরাপত্তা দিতে পারেননি, দিয়েছিলেন প্রেম। এ সেই প্রেম যা বৃহতের পানে মানুষকে ঠেলে দেয়, 'বন্দরের বন্ধনকাল' ছিন্ন করে সুদূর সমুদ্রগর্জনে পাড়ি জমাতে শক্তি দেয়।...

নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে উদাসীন সূর্যসেন কিন্তু অপরের স্বাচ্ছন্দ্যে উদাসীন ছিলেন না। সেখানে তিনি কর্তব্যে অটল, সমবেদনায় প্রেমল।...

একদিনের কথা। বিনোদ দত্তই বলছেন: "দাদার সঙ্গে আছি। আমার নোংরা কাপড়খানা সাবান-কাচা করব, দাদার গেঞ্জিটাও সে-সঙ্গে কাচবার জন্যে সাবান-জলে ডুবিয়েছি। দূর থেকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে এসে ঝট্ করে দাদা তাঁর ভিজে-গেঞ্জিটা তুলে নিলেন, ধুতে দিলেন না। বললেন—'আমি মহান্ত নই! তুই, আমি এবং দলের প্রত্যেকে আমরা এক—আমরা বিপ্লবী। আজকে আমার গেঞ্জি ধুবি, কাল পা টিপবি—এসব চলবে না। এ করতে চাইলে আমার ধারে-কাছেও আসতে দেব না। এতে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়, দাস্যভাব

মাথা চাড়া দেয়। এ করবি না—কখনো না। প্রয়োজনে সবই করতে হয়, করবিও—যেমন মানুষকে শুশ্রূষা করতে গিয়ে মলমূত্রও হাতে তুলে ফেলতে হয়। 'ভক্তি' দেখানর জন্যে কিছু করতে হয় না'।···আমি দাদাকে আমার হৃদয়ের মধ্যে নিবিড়তর করে পেলাম। 'ভক্তি' আমার নিশ্চয়ই বেড়ে গেল কর্তব্যপালনের মধ্যে, বাহ্যিক প্রকাশে নয়।"

'বিপ্লবী নিকেতনে'র জন্য প্রদত্ত একটি প্রবন্ধে শ্রীঅনন্ত সিংহ লিখেছেন: "···সংগঠন ও প্রস্তুতির পথে জটিল সমস্যার সমাধান, গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা ও অতি সংকটজনক মুহূর্তে বৈপ্লবিক নির্দেশ দান প্রভৃতি মাস্টারদার জীবনের আড়ম্বরহীন, প্রকাশহীন গভীরতম দিক। চট্টগ্রামের যুব-বিদ্রোহকে সার্থক করেছে তাঁর সেই অপরিহার্য ভূমিকা। বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা ও নিদারুণ ক্ষয়ক্ষতি থেকে শিক্ষা নিয়ে উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়ে মাস্টারদা যদি তাঁর নিজস্ব বিশেষ ধারায় 'সংগঠন' পরিচালিত না করতেন, তবে (তাঁর অবর্তমানে) অন্য যে-কোন বিপ্লবী নেতার অবস্থানেও ব্রিটিশ-সরকার চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে দিত।"

বিনোদবাবু বলেছেন: "মাস্টারদা ছিলেন 'সূর্য'। তাঁর চতুষ্পার্শ্বে অম্বিকাদা, নির্মলদা, অনন্তদা, লোকনাথদা বা গণেশদা প্রমুখ ছিলেন উপগ্রহের মত। সূর্যের বিভায় তাঁরা ছিলেন উজ্জ্বল, সূর্যের কাছ থেকে সরে গেলেই তাঁদের দীপ্তি ম্লান হয়ে যেত।"

এ-কথা সত্য বলে সবাই মানবে। কারণ, একই ইতিহাস লক্ষ্য করা গেছে যতীন মুখার্জি, রাসবিহারী এবং নেতাজির জগতে। পৃথিবীর ইতিহাসই তাই। জ্যোতির্ময় মহামানবকে কেন্দ্র করে অগণিত গ্রহ-উপগ্রহ রূপ মানুষ কর্মদীপ্ত হন, অসাধ্য সাধন করেন।···

অসাধারণ 'সংগঠক' বলেই সূর্যসেন প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন অপূর্ব দক্ষতায়। সেই নিখুঁত সংগঠন-শক্তিতে শক্তিমান সংস্থাকে নেতৃত্ব দিলেন তিনি ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল, সারা চট্টগ্রাম শহর থেকে ব্রিটিশ-শক্তি উৎখাত করে। হোক সেই স্বাধীনতা স্বল্পকালীন, কিন্তু তার প্রভাব দীর্ঘায়িত পরিসরে প্রসারিত। যে কাজ তিনি অসমাপ্ত রেখে গেলেন তা সমাপ্ত হল বর্মার কূলে, 'আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনী'র আবির্ভাবে, নেতাজির অতুলনীয় নেতৃত্বে।...

১৮৯৭ সালে বিপ্লবের অবিচ্ছিন্ন-ইতিহাসের শুরু হয়েছিল দামোদর চাপেকারের দুর্জয় প্রকাশে, সে বিপ্লব চরম সার্থকতা লাভ করল প্রায় পঞ্চাশ বছর পর নেতাজি সুভাষচন্দ্রের দুঃসহ রণ-যাত্রায়।

এ-গ্রন্থের দশম অধ্যায়ে এই অবিচ্ছিন্ন ভারতীয়-বিপ্লবধারাকে চারটি স্তর বা যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম যুগের প্রবর্তক হলেন মহারাষ্ট্রের চাপেকার ভ্রাতৃত্রয় এবং বাংলার ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল চাকি। তাঁরা অগ্রসর হলেন সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক-নিধনের সংকল্পে। দ্বিতীয় যুগ প্রবর্তন করলেন মহানায়ক যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর-যুদ্ধে, সম্মুখ-সমরে প্রাণদান করে। খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এই যুগে। তৃতীয় যুগের প্রবর্তক হলেন মহা-বিপ্লবী সূর্যসেন। এ যুগ 'ইন্‌সারেক্‌শান্'-এর যুগ। তারপর চতুর্থ যুগ বা বিপ্লবের চরম পরিণতির যুগ। সে-যুগপ্রবর্তক নেতাজি স্বয়ং। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির মূলে এই বিপ্লবের অবদান সীমাহীন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়: "Among the agencies at work towards the attainment of Indian Freedom I have laid special stress on the Revolutionary movements in India and the formation of I. N. A. by Subhas Bose."

('History of Freedom Movement', Vol. 3. Preface. XXIX)

[যেসব সঙ্ঘশক্তি ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সংগ্রাম করেছে তাদের অন্যতম রূপে বিশেষভাবে জোর দিয়েছি আমি সশস্ত্র-বৈপ্লবিক-সংস্থাগুলি এবং সুভাষ বসুর 'আই. এন্. এ.' সংগঠনের উপর।]

ইংরেজ গ্রন্থকার মাইকেল এডোয়ার্ড্‌স্ নেতাজির অবদান সম্পর্কে কি বলছেন? তাঁর ভাষায়: "Congress never became a truly revolutionary movement; Gandhi remained round its neck like the Ancient Mariner's albatross inhibiting its actions, dividing its purpose, confusing the genuine revolutionaries and ultimately ensuring the partition of India.·· Patel was not a thinker but a worker. Nehru was a thinker but not a man of decisive action.···He was no more a revolutionary in fact than the bourgeois leaders of the British Labour Party."

('The Last Years of British India' P.—44, 45, 69)

[কংগ্রেস কোনকালেই যথার্থ বিপ্লবী-আন্দোলনে রূপ নেয়নি। 'প্রাচীন নাবিকে'র এ্যাল্‌বট্রস্-পাখির ন্যায় গান্ধীজি নিয়ত এর কণ্ঠদেশ বেষ্টন করে থাকতেন। এর প্রতি কাজে তাঁর অশরীরী-প্রভাব ছিল বর্তমান। তাতে এর উদ্দেশ্য দ্বিধাবিভক্ত হত, যথার্থ বিপ্লবীরা বিভ্রান্ত হতেন। তার ফলশ্রুতি, দ্বিখণ্ডিত ভারত।···প্যাটেল চিন্তাবিদ ছিলেন না, ছিলেন কর্মী। নেহরু অবশ্য চিন্তাবিদ, কিন্তু কোন কাজে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে জানতেন না।···তিনি 'ব্রিটিশ লেবার পার্টি'র বুর্জোয়া-নেতাদের পর্যায়ে এসে গিয়েছিলেন। তিনি আর বিপ্লবপন্থী ছিলেন না।]

শত্রুপক্ষীয় এই ইংরেজ গ্রন্থকার আরো লিখেছেন: "···Bose (Subhas), the only one with clear-cut view of the world, was far away in Europe nurturing his plans to

liberate India from outside.…Subhas seemed the embodiment of dynamic action, with even Gandhi now apparently supporting him.…It was to be the British who, though they ignored him during the war were to make him a legend after his death. The ghost of Bose was to inhabit the conference rooms four years later as India moved through the last days of British Rule, and in death he was to have the success denied to him in life."

('The Last Years of British India' P.—76, 85, 86)

[বোস (সুভাষ) ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর মতবাদ ছিল পরিচ্ছন্ন। সুদূর ইউরোপে বসে বাইরে থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা তিনি করে যাচ্ছিলেন।…সুভাষ ডিনামিক্‌-য়্যাক্‌শানের প্রতীক। মনে হয়, গান্ধীজিও এখন পরোক্ষে তাঁকে সমর্থন করছেন।…ব্রিটিশ তাঁকে যুদ্ধকালে উপেক্ষা করেছে: কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর ('মৃত্যু' অসমর্থিত, বহু ভারতবাসীর কাছে অবিশ্বাস্য) তাঁকে 'জনশ্রুতি'র পর্যায়ে তুলে দিয়েছে। সুভাষচন্দ্রের অশরীরী উপস্থিতি, চার বছর পরে, ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের শেষ দিনগুলো জুড়ে ব্রিটিশের নানা মন্ত্রণাসভাকক্ষে যেন অনুভূত হয়েছে। জীবনে সাফল্যের যে-স্বীকৃতি সুভাষচন্দ্রকে দেওয়া হয়নি, মৃত্যুর (?) পর ব্রিটিশ তাঁকে সে-স্বীকৃতিই দিয়েছে।]

'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থ থেকে এ-প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হচ্ছে: "নেতাজির দেহ অবসিত হবার সংবাদ প্রমাণাভাবে দেশবাসী আজও বিশ্বাস করে না: গান্ধীজিও বিশ্বাস করেননি। কিন্তু যাঁরা মনে করতে ভালবাসেন যে, নেতাজির বিমান-দুর্ঘটনায়ই মৃত্যু হয়েছিল, তাঁরাও এডোয়ার্ডস্‌-এর ভাষায়ই স্বীকার করবেন—"The ghost of Subhas Bose, like Hamlet's father,

walked the battlements of the Red Fort, and his suddenly amplified figure over-awed the Conferences that were to lead to independence."

('সবার অলক্ষ্যে', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭)

[হ্যামলেটের পিতার মত সুভাষ বসুর অশরীরী দেহও সুরক্ষিত লালকেল্লার অভ্যন্তরে ঘুরে বেড়িয়েছে। তাঁর সহসা অতি-প্রসারিত রূপ আসন্ন স্বাধীনতা-প্রাপ্তি প্রসঙ্গে আয়োজিত আলোচনা-বৈঠক-গুলোকে ত্রাসবিহ্বল করে তুলেছে।]

নেতাজির পূর্বসূরীদের একজন হলেন সূর্যসেন। বলা হয়েছে যে, বিপ্লবী-ভারতবর্ষের তৃতীয় অধ্যায় বা যুগ সূচিত হয়েছে ঐ সূর্যসেনেরই পদক্ষেপে, ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল। তাঁর কর্মকাণ্ড ইতিহাস-বিশ্রুত। অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, জালালাবাদ-যুদ্ধ, শৌর্যময়ী নারী-অধিনায়িকার নেতৃত্বে পাহাড়তলী-ইউরোপীয়ান্-ক্লাব আক্রমণ, অজস্র খণ্ড-সংঘর্ষ, দলে দলে তরুণ-কিশোরের মৃত্যুবরণ—রঙরঙিন বিভায় দেশবাসীর মানস-চক্ষে আজও উদ্ভাসিত। এত বড় কর্ম যাঁরা করেছেন তাঁরা কঠোর নিয়মে বাঁধা তেজোদীপ্ত এবং প্রাণচঞ্চল একটি কর্মসংস্থার কর্মী। সে-সংস্থা সংগোপনে গড়ে তুলেছেন যে রূপকার —তাঁরই নাম শ্রীসূর্যসেন।

'সূর্য' যেমন নিজের প্রাণশক্তি দিয়ে পৃথিবীকে প্রাণদান করেন, সূর্যসেনও তেমনি আপন শৌর্য-রসে পৃথিবী-রূপ তাঁর বিপ্লবী-সংস্থাকে প্রাণবন্ত করে এসেছেন।

'সংগঠক'-সূর্যসেন ব্যতীত 'বিপ্লবী'-সূর্যসেনের আবির্ভাব হলে চট্টগ্রাম যুব-বিপ্লব অঙ্কুরে বিনষ্ট হত।···

আমরা এ অধ্যায়ে তাই মহা সংগঠক সূর্যসেনকে চিনে নেবার চেষ্টা করেছি।

॥ সূর্যসেনের সর্বশেষ বাণী ॥

আমার শেষ বাণী—আদর্শ ও একতা।

ফাঁসির রজ্জু আমার মাথার উপর ঝুলছে। মৃত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে। মন আমার অসীমের পানে ছুটে চলেছে। এই তো আমার মৃত্যুকে বন্ধুর মত আলিঙ্গন করার সময়। হারানো দিনগুলোকে নূতন করে স্মরণ করার সময়।

আমার ভাইবোনগণ, তোমাদের সবার উদ্দেশ্যে বলছি: আমার বৈচিত্র্যহীন (কারাগৃহের) জীবনের একঘেয়েমিকে তোমরা ভেঙে দাও, আমাকে উৎসাহ দাও। এই আনন্দময়, পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের জন্যে কি রেখে গেলাম? শুধু একটি মাত্র জিনিস, তা হল আমার স্বপ্ন। একটি সোনালী স্বপ্ন। এক শুভ মুহূর্তে আমি প্রথমে এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। উৎসাহভরে সারা জীবন তার পেছনে উন্মত্তের মতো ছুটেছিলাম। জানি না, এই স্বপ্নকে কতটুকু সফল করতে পেরেছি।

আমার আসন্ন মৃত্যুর শীতল স্পর্শ যদি তোমাদের মনকে এতটুকু স্পর্শ করে, তবে আমার এই সাধনাকে তোমরা তোমাদের অনুগামীদের মধ্যে ছড়িয়ে দাও—যেমন আমি ছড়িয়ে দিয়েছিলাম তোমাদের মধ্যে। বন্ধুগণ, এগিয়ে চলো। কখনো পিছিয়ে যেও না। দাসত্বের দিন চলে যাচ্ছে। স্বাধীনতার লগ্ন আগত। ওঠো। জাগো। জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের চট্টগ্রাম-বিদ্রোহের কথা কোনদিন ভুলো না। জালালাবাদ, জুলধা, চন্দননগর ও ধলঘাটের সংগ্রামের কথা সব সময় মনে রেখো। যেসব বীর সৈনিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে

দ্রষ্টব্য: এই বাণী 'চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ আলেখ্যমালা' থেকে উদ্ধৃত।

জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের নাম মনের গভীরে রক্তাক্ষরে লিখে রেখো।

আমার একান্ত অনুরোধ, এই সংগঠনকে তোমরা কোনদিন ভেঙে দিও না। জেলের বাইরে ও ভিতরে সবার জন্যে আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা রইল।

বিদায়!

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! বন্দে মাতরম্!

চট্টগ্রাম জেল,
১২ই জানুয়ারি, ১৯৩৪ সাল
॥ সন্ধ্যা সাত ঘটিকা ॥

সূর্য সেন

॥ ছাব্বিশ ॥

নেতাজির আবির্ভাব

ভারতীয়-বিপ্লবের ফলশ্রুতি—আকস্মিক নয়

গত শতাব্দীর কথা। লব্ধপ্রতিষ্ঠ এক আইনজ্ঞ পিতার সন্তান নরেন্দ্রনাথ সকল ঐশ্বর্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেন। সে-সন্ন্যাসী কিন্তু আত্মোদ্ধারের চিন্তায় মন দিলেন না; মন-প্রাণ নিযুক্ত করলেন তিনি 'শতকরা নিরানব্বই জনে'র দুঃখ-বেদনা দূর করার সাধনায়। সে সাধনা সর্বাত্মক। সমগ্র ভারতে শুধু নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য ভূমিতে বিবেকানন্দের জয়রথ ধাবিত হল। তিনি পৃথিবীখ্যাত হলেন। ভারতবর্ষকে বিশ্বসভায় সগৌরবে পরিচিত করলেন বীর সন্ন্যাসী। কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হল:

"বীর সন্ন্যাসী বিবেকের বাণী ছুটেছে জগৎময়—
বাঙালীর ছেলে ব্যাঘ্রে বৃষভে ঘটাবে সমন্বয়।"

(সত্যেন্দ্রনাথ)

তারপর তাঁর অপূর্ব অবদানে সেই ১৮৯৩ সাল থেকে অদ্যাবধি সমগ্র ভারতবর্ষ উদ্ভাসিত হয়ে থাকল। জাতির সর্ববিধ অগ্রগতি স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণায় উদ্বোধিত হল। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাঙলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লব-জিজ্ঞাসা তাই বিবেকানন্দের শৌর্যময় পরোক্ষ নেতৃত্বে প্রাণচঞ্চল।

বিবেকানন্দের রাজনীতিক-চিন্তাধারার ধারক ও বাহকের ভূমিকায় বিপ্লবী-বাঙলা প্রথমেই পেয়েছিল একটি বহ্নিদীপ্তা মহীয়সী নারীকে, যাঁর কথা একাদশ অধ্যায়ে উল্লেখিত হয়েছে, যাঁর নাম সিস্টার নিবেদিতা, তাঁকে ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ অভিহিত করেছিলেন 'লোকমাতা' রূপে। শ্রীঅরবিন্দের বৈপ্লবিক নায়কত্ব অসম্পূর্ণ থেকে

যেত, যদি এই মহাবিপ্লবিনী তথা স্বামী বিবেকানন্দের মানস-কন্যা এবং আইরিশ-বিদ্রোহ-দুহিতা এই বিদুষী তপস্বিনী এসে তাঁর পাশে না দাঁড়াতেন।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতার প্রেরণা শুধু অরবিন্দ নয়, সমগ্র বিপ্লবী-বাঙলাকে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের গত পঞ্চাশ বছর ধরে দুর্গম পথে শক্তি দিয়েছে, পথচলার সঞ্চয় যুগিয়েছে। তাই সেকালে প্রত্যেকটি বিপ্লবীই বিবেকানন্দ ও তাঁর অনন্যা শিষ্যা ভগ্নী নিবেদিতার প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন, কর্মতৎপর ছিলেন, অনাহত সাধনায় দেশ-মুক্তির কঠিন ব্রতে আত্মনিযুক্ত ছিলেন।

শুধু রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়—সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-কলা-সাহিত্যকে ঘিরে-থাকা সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-দর্শন-মানসিক উৎকর্ষতা এবং বীর্য-সাধনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত গুরু ও শিষ্যার অগ্নিস্নাত মন্ত্র বাঙলার কর্মী ও জিজ্ঞাসুর দলকে সেই 'রেনেসাঁ'র যুগে আত্ম-নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছিল। তাই স্বামী বিবেকানন্দকে বলা চলে ভারতীয় সর্বাত্মক-বিপ্লবের ভাব-গুরু, এবং নিবেদিতাকে বলা যেতে পারে বিপ্লব-চঞ্চল ভারতের 'লোকমাতা'।…

উত্তরকালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অপর এক আইনজ্ঞ পিতার সন্তান সুভাষচন্দ্র ঐ বিবেকানন্দের মতই চঞ্চল হয়ে সাংসারিক-জীবনকে প্রত্যাখ্যান করে পথ চলতে চাইলেন। তিনি তথাকথিত সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন না। তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর গৈরিক-বর্ণে মনকে রঙিন করে সেন্ট পার্সেন্ট্ রাজনীতিক হবার পথে পা বাড়ালেন। পা বাড়ালেন ঐ 'শতকরা নিরানব্বই জনে'রই কল্যাণ কামনায়। সাধকের উত্তরীয় অঙ্গে জড়িয়ে কর্মক্ষেত্রে তাঁর যাত্রা শুরু হল। আদর্শের বিনিময়ে আপোষ করার প্রবৃত্তি তাঁর চিত্তকে কোনকালে বিড়ম্বিত করতে পারল না। কারণ, তাঁকে নিয়ত প্রাণশক্তি দান

করতে থাকলেন দূর-গগনে-দীপ্যমান সূর্যের মত মহাবীর্যবান অপর এক আপোষহীন সংগ্রামী, স্বামী বিবেকানন্দ। এই বিবেকানন্দের কর্মধারা তাঁকে নিবেদিতার মতই রাজনীতির ক্ষেত্রে ঠেলে দিল। কোন আশ্রম বা মঠের মায়ায় তিনি জড়িত হলেন না। দেশবাসী আজ বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় বিশ্বাস করে যে, বিবেকানন্দের সর্বসত্তাই বুঝি সুভাষচন্দ্রের মধ্যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে ভারতবর্ষকে ধন্য করেছে। বস্তুতই 'শতকরা নিরানব্বই জনে'র সার্বিক মুক্তি অর্জনে সুভাষচন্দ্রের অভূতপূর্ব সাফল্য যেন তাঁর পূর্বজন্ম-নির্ধারিত, এবং এ-জন্মের তপস্যার ফলশ্রুতি। সুভাষচন্দ্রও সমগ্র ভারতে শুধু নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য ভূমি এবং বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে তাঁর বিজয়-রথ ধাবিত করলেন। পরাধীনতার বিষময় জ্বালা থেকে স্বদেশকে তিনি মুক্তি দিলেন। তাঁরই সশস্ত্র নেতৃত্বে ভারতবর্ষ স্বাধীন-দুনিয়ার দরবারে সদর্পে সমান আসন অধিকার করল।···

ভুললে চলবে না যে, ভারতবর্ষের এই মহাজাগরণের অদম্য স্পৃহা স্বামী বিবেকানন্দের কল্পনা ও কর্মতপস্যা থেকেই প্রধানত উদ্ভূত হয়ে ১৮৯৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বাঙলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের কর্মধারায় নানা ছন্দে রূপান্তরিত হয়ে চলল। বহু নেতা ও কর্মীর রক্তদানে এবং বহু শহিদের আত্মবিলয়নে পুষ্টি লাভ করে পঞ্চাশ বছরের সংগ্রামী ভারত দুর্লভ 'নেতাজি'র দর্শন পেল ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। তাই বাঙলার 'বিপ্লব', ভারতবর্ষের 'বিপ্লব', রাসবিহারীর তপস্যাদৃপ্ত 'বিপ্লব' বর্মার কুলে কুলে অতুলনীয় নেতৃত্বে সার্থক হতে পারল।···

ভারতবর্ষের ইতিহাসে নেতাজি একটি বিচ্ছিন্ন পুরুষ নন। তাঁর ক্রিয়াকাণ্ড কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। নেতাজি ভারতীয় ঐতিহ্যেরই সার্থক অবদান। বাঙলার ভূমিতে শ্রীচৈতন্যের কাল থেকে যে 'রেনেসাঁ'র সূত্রপাত—যাকে একদা রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু,

গিরিশচন্দ্র, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, জগদীশ-চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, শরৎচন্দ্র, অবনীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রমুখ কালজয়ী প্রতিভাধর মানববৃন্দ এবং যতীন্দ্রনাথ-রাসবিহারী সূর্যসেন ও শৌর্যবান শহিদগোষ্ঠী প্রচণ্ড প্রবাহে প্রবাহিত রেখেছিলেন—তারই মহান্ সৃষ্টি এই নেতাজি সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্রের মর্ম-গুরু রূপে পাই স্বামী বিবেকানন্দকে, সক্রিয় বিপ্লব-গুরু রূপে পাই বিপ্লব-স্রষ্টা অরবিন্দকে, কর্ম ও শিক্ষা-গুরু রূপে পাই যথাক্রমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও আচার্য বেণীমাধবকে।

স্বদেশপ্রেমে তন্ময়, কর্মচেতনায় চঞ্চল সুভাষ আই. সি. এস্. পদের দুর্জয় লোভ বর্জন করে দেশসেবার বন্ধুর পথে অবতীর্ণ হলেন মনের দিক থেকে। ভারতবর্ষে পদার্পণ করেই চলে গেলেন তিনি সবরমতী আশ্রমের পুরুষশ্রেষ্ঠের কাছে রাজনীতিক-কর্মকাণ্ডে দীক্ষা গ্রহণের সংকল্পে। আলাপ ও আলোচনায় সেদিন উভয়ে উভয়কে চিনতে পেরেছিলেন হয়ত। গান্ধীজী তাই সুভাষকে পাঠিয়ে দিলেন দেশবন্ধুর কাছে। সরোজিনী নাইডুর ভাষায় ঐ 'Flaming sword'কে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয় বুঝেই কি গান্ধীজি সুভাষকে কাছে টানেননি? গান্ধীজির টেক্‌নিক্ হৃদয়কে স্পর্শ করেনি বলেই কি সুভাষ সহজেই চলে এসেছিলেন দেশবন্ধুর কাছে? যা হোক, এসে কৃতার্থ হলেন। মনের মত নেতার পদতলে বসে শুরু হল নবীন সুভাষের অনন্যসাধনা, দেশজননীর শৃঙ্খলমোচনকল্পে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বিরাট নেতৃত্বে সুভাষচন্দ্রের কর্মযাত্রার আয়ুষ্কাল নাতিদীর্ঘ। কারণ, ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন সর্বত্যাগী ও

সর্ববরেণ্য এই নেতা দেহরক্ষা করলেন। কিন্তু কর্ম-গুরু রূপে কর্মশিষ্য সুভাষচন্দ্রকে স্বস্থানে বসিয়ে যেতে তাঁর কালবিলম্ব হয়নি।...

এরপর শুরু হল সুভাষচন্দ্রের আত্মবিকাশের সংগ্রাম। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন বাঙলার বিপ্লবীদল। মহাত্মার সঙ্গে পাঞ্জা কষে তাঁকে চলতে হবে। কারণ, আপাত উদ্দেশ্য এক হলেও চরম আদর্শের মিল নেই তাঁর গান্ধীজির সঙ্গে। তাই পদে পদে সংঘর্ষ শুরু হল। এই সংঘর্ষের আঘাতেই সুভাষচন্দ্রের প্রতিভা ক্রমশ উল্কার গতিতে প্রকাশিত হতে থাকল। উপলখণ্ডের অবিরাম প্রচণ্ড আঘাতে প্রাণবন্ত হয়ে ঝর্ণাধারা যেমন দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে—সুভাষচন্দ্রও তেমনি মহাত্মার সঙ্গে অজস্র সংঘর্ষে অজেয় হতে থাকলেন। এই সংঘর্ষের কাহিনী দেশবন্ধু লোকান্তরিত হবার পর থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসে আক্ষরিত হয়ে আছে।

একদিক থেকে সুভাষচন্দ্র বসুর 'নেতাজি' হয়ে ওঠার মূলে মহাত্মা গান্ধীর অবদান সামান্য নয়। পূর্বেই বলেছি, সে অবদান প্রবল পাহাড়ী-স্রোতকে দূরন্ত 'ঝর্ণা' হয়ে ওঠার সাধনায় কঠিন উপলখণ্ডের নির্মম অথচ সার্থক বাধা দানের মত। ও বাধা, ও আঘাত না এলে সুভাষচন্দ্রের বুঝি 'নেতাজি' হয়ে ওঠা সম্ভব হত না!...

মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেশবাসীর সমক্ষে সুভাষচন্দ্রের প্রথম সংঘর্ষ পরিলক্ষিত হয় ১৯২৮ সালে, কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে। সুভাষচন্দ্রের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার বাহিনী' কংগ্রেসী 'হিন্দুস্থান সেবাদলে'র ছাঁদে গড়া হয়নি। সামরিক পোশাকে দৃপ্ত, সামরিক কুচকাওয়াজে দক্ষ, বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের সহযোগিতা ও নিষ্ঠায় প্রাণবন্ত এই বিরাট 'পুরুষ ও নারী বাহিনী' যখন জাতির যৌবনের আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে দিচ্ছিল, জাতির আগামী

দিনের রণসজ্জার স্বপ্ন তার রক্তে সঞ্চারিত করছিল—তখন কংগ্রেসের ভাগ্যবিধাতা গান্ধীজি সেই বাহিনী পরিদর্শন করে ব্যঙ্গচ্ছলে তার উদ্দেশে বলেছিলেন : ও যেন ‘ফিলিপ্‌স্ সার্কাস্!’ যেন ‘চিল্‌ড্রেন্‌স্ প্যান্টোমাইম্!’···মহাত্মা গান্ধী সুচতুর লোক। তিনি ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স্’ বা তার ‘জি. ও. সি.’কে সার্কাস-পার্টি বা ছেলেখেলার খেলুড়ে-নেতা মনে করলে অমন কঠোর উপহাস করতেন না। কারণ, তিনি ‘শনিবারের চিঠি’ প্রভৃতি কাগজের তৎকালীন সম্পাদকদের মগজশূন্য বা কাণ্ডজ্ঞানহীন রাজনৈতিক-বুদ্ধি নিয়ে দেশ-নেতৃত্ব করতে আসেননি। আদপে তিনি সুভাষের চোখে এবং তাঁর বাহিনী-গড়ার টেক্‌নিকে সেদিন সর্বনাশের ছায়া দেখেছিলেন। এ সর্বনাশের আগুনে তাঁর অহিংসার প্রাসাদ ভস্মীভূত হবার লক্ষণ তাঁর কাছে হয়ত ধরা পড়েছিল। অথচ তাঁর চিত্ত অহিংসার মোহে আচ্ছন্ন থাকায় তিনি সুদূরের অঞ্জন চোখে পরে ঐ ‘বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স্’-এর মধ্যে ভাবী দিনের ‘আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনী’ বা ‘ঝান্সির রাণী বাহিনী’র অঙ্কুরও দেখতে পাননি, ‘জি. ও. সি.’ সুভাষচন্দ্রের পদক্ষেপে বিশ্ববিশ্রুত সুপ্রীম্ কমাণ্ডার ‘নেতাজি’র পদধ্বনিও শুনতে পাননি।···

তৎপর উক্ত কংগ্রেস-অধিবেশনেরই সাধারণ সভায় সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে স্পষ্ট ভাষায় আনীত হল ‘পূর্ণ স্বাধীনতা’র প্রস্তাব। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বসুর অপূর্ব ভাষণ আজও আমাদের মনে পড়ে। কিন্তু গান্ধীজির প্রভাবে প্রস্তাবটির হার হল। অবশ্য প্রস্তাবক হার মানলেন না।···

আপাতদৃষ্টিতে জয়ী হলেও গান্ধীজি বুঝলেন যে, ‘এ যৌবন-জলতরঙ্গ রোধিবে কে?’ এ যে রোধ করার বস্তু নয়! তাই অচিরে ‘পূর্ণ-স্বাধীনতা’র প্রস্তাব কংগ্রেসকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তখন আরো এগিয়ে গেছেন। তাঁর দাবী—কংগ্রেসকে সঙ্গে সঙ্গে ‘পাশাপাশি জাতীয়-সরকার’ (Parallel Govt.) স্থাপন করার প্রস্তাবও নিতে হবে।···এমনি করে দুর্জয়-যৌবন শাস্ত

প্রবীণের শাসন বারে বারে নাশন করতে চেয়েছিল। তবু বলব, নবীন সুভাষ এবং প্রবীণ গান্ধীর মানসিক ও ব্যবহারিক দ্বন্দ্বে জাতির কিছুমাত্র ক্ষতি হয়নি—বরঞ্চ সেই কালে উহা ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা-লাভের সংগ্রামে আশাতীত গতিবেগে এগিয়ে দিচ্ছিল। কারণ, উভয়ে পরস্পরের প্রতি ছিলেন একান্ত শ্রদ্ধাশীল, অথচ আপন কর্তব্যে অবিচল ও নিষ্ঠায় অনন্যসুন্দর। তাই ইতিহাস বলছে যে, স্বাধীনতার সংগ্রামে দু'টি প্রখর ও অব্যাহত ধারা সশস্ত্র-বিপ্লবের প্রতিনিধি তরুণ সুভাষের ও অহিংস-যুদ্ধের নায়ক প্রবীণ গান্ধীর নেতৃত্বে একই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বিধৌত করেছিল। সেই ধারাস্নানে দুর্ধর্ষ সর্বভারতীয় কংগ্রেস তাই তৎকালে জাতির সংগ্রামতীর্থে পরিণত হয়ে দেশবাসীকে নিয়ে চলেছিল 'আদর্শ' রূপায়ণের পথে, দৃঢ়তর পদক্ষেপে। ··

১৯৩৮ সালের 'হরিপুরা কংগ্রেস'।······সুভাষচন্দ্র তার নির্বাচিত সভাপতি।···এ নির্বাচনে গান্ধীজির নির্দেশে কংগ্রেস হাই-কমাণ্ড্ ছিলেন একমত। কারণ, এ ছিল মহাত্মার শেষ চেষ্টা জওহরলালের মত সুভাষকেও কোন প্রকারে পোষ মানান। কলকাতা কংগ্রেসে 'পূর্ণ-স্বাধীনতা প্রস্তাব' সম্পর্কে জওহরলালজি সুভাষচন্দ্রের সহায়ক ছিলেন, কিন্তু ভোট দানের সময় তিনি গান্ধীজির প্রভাব অতিক্রম করতে না পেরে পিছিয়ে গেলেন। কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের বিরুদ্ধে একাধিক ক্ষেত্রে তরুণ জওহরলালও বিদ্রোহ করতে চেয়েছেন, কিন্তু 'বাপুজি'র স্নেহে ও শাসনে জওহরলালকে পোষ মানতে হয়েছে। কিন্তু সুভাষ যে বহ্নিদেবতার আত্মজ। তাঁকে মন্ত্রপূত বারিবর্ষণে বশীভূত করার মত গুণিন্ ভূ-মণ্ডলে জন্মাননি। গান্ধীজিও নন। তার ফলশ্রুতি স্বরূপ 'সভাপতির ভাষণ'টি কংগ্রেস নেতারা হজম করতে পারলেন না। গান্ধীজি প্রমাদ গনলেন।···রাজনীতিক-দ্রষ্টার সুদূর দৃষ্টি নিয়ে সুভাষ তাঁর ভাষণে যা বললেন তার

মর্ম এই : ইউরোপে মহাযুদ্ধ আসন্ন। সে যুদ্ধের সুযোগ সর্বতোভাবে গ্রহণ করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হবে। ইংরেজের মুখাপেক্ষী হওয়া মানে আত্মহত্যা।···

অহিংস-গান্ধী কি করে এসব কথায় সায় দেবেন? ইংরেজের বিপদের সুযোগ নিতে তিনি নারাজ—থাকুক তাতে স্বদেশের স্বাধীনতা সুদূরের সামগ্রী হয়ে।···

এই যে আদর্শগত পার্থক্য—এর জের টানতে গিয়ে গান্ধীজিকে নিষ্ঠুর হতে হল, সত্যাচারভ্রষ্ট হবার ঝুঁকি নিতে হল! ··১৯৩৯ সালের সভাপতি নির্বাচনে স্বীয় মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামিয়ার পরাজয়ে গান্ধীজি সখেদে বললেন:···"the defeat is more mine than his". আর সুভাষচন্দ্রের জয়ে তাঁর উক্তি হল: "After all Subhas Babu is not an enemy of the country. From the very beginning I was decidedly against his re-election. Nevertheless, I am glad of his victory."

১৯৩৯ সালে ত্রিপুরী কংগ্রেসের ইতিহাস এবং গান্ধীজি চালিত কংগ্রেস হাই-কমাণ্ডের অপকীর্তি সর্বজনবিদিত। তার বিশদ বর্ণনার স্থান এখানে নয়। আমরা এখানে শুধু উল্লেখ করব তৎকালীন ঐসব ঘটনাকে ঘিরে একটি মানুষের রি-য়্যাকশানের কথা। তিনি সামান্য কোন মানুষ নন। তিনি পৃথিবীবরেণ্য রবীন্দ্রনাথ।···

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-সংস্থা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গান্ধীজির অনুমোদনে হাই-কমাণ্ড ডিসিপ্লিনারি য়্যাকশান্ নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ এই জঘন্য অবিমৃষ্যকারিতা সহ্য করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত মহাত্মাকে তার করলেন তিনি ১৯৩৯ সালের ২০শে ডিসেম্বর:

"Owing gravely critical situation all over India and especially in Bengal would urge Congress Working Committee immediately remove ban against Subhas and invite his cordial co-operation in supreme interest national unity."

ছু'দিন পরে কংগ্রেস-কর্ণধার গান্ধীজি উত্তরে জানিয়ে দিলেন: "Your wire was considered by Working Committee. With knowledge they have they are unable lift ban. My personal opinion is you should advise Subhas Babu submit discipline if ban is to be removed. Hope you are well."

উভয়ের মধ্যে আরো পত্রাদির আদান-প্রদান হয়েছিল এ-প্রসঙ্গে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী অনড়-ঔদ্ধত্যে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের (মহাত্মারও 'গুরুদেব') পরপর অনুরোধ উপেক্ষা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি।

এখানেই গান্ধীজি ক্ষান্ত হলেন না। দীনবন্ধু এনড্রুজ সাহেবের পত্রোত্তরে তিনি লিখেছিলেন: "I feel Subhas is behaving like a spoilt child of the family."

সে-পত্রের তারিখ ছিল ১৯৪০ সালের ১০ই জানুয়ারি।

মহাত্মার রাজনৈতিক এসব কার্যের মূলে যে আতঙ্ক ও 'কমপ্লেক্স' ছিল তার আলোচনা এখানে অবান্তর। কারণ, সুভাষ-বিরোধিতা তাঁর ব্যক্তিগত ও দলগত রাজনৈতিক-প্রাধান্য রক্ষার প্রয়োজন ছিল বলেই 'পলিটিশিয়ান্' রূপে তিনি ওসব কাজ করতে পারেন। তাতে বলার কিছু নেই। তবে এখানে এইটুকু বললে অবান্তর হবে না যে, —কালজয়ী-দ্রষ্টার দৃষ্টি থেকে ঋষি-কবি কিন্তু আগামী দিনের সুভাষকে দেখতে পেয়েছিলেন। দেখতে পেয়েছিলেন বলেই তাঁকে 'দেশনেতার' আসনে বরণ করে গেলেন কবি। অথচ আদর্শগত

সংকীর্ণ-স্বার্থের চাপে দৃষ্টিক্ষুণ্ণ হয়ে গান্ধীজি বুঝতে পারলেন না, বা বুঝতে চাইলেন না সেই 'সুভাষ'কে।··· রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে বললেন : "সুভাষচন্দ্র, বাঙালী কবি আমি, বাঙলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশ-নায়কের পদে বরণ করি।" তিনি আরো বললেন : "বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণী-দূত পাঠিয়েছিলুম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাঙলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি।"···

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য দেখে যাননি তাঁর আশীর্বাদপুষ্ট 'বাঙলার অধিনেতা' সুভাষচন্দ্র কি ক্ষিপ্রতম গতিতে সারা ভারতবর্ষের শুধু নয় —সারা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ারও 'নেতাজি'র আসনে বৃত হয়েছেন। তিনি না দেখলেও দেশবাসী প্রত্যক্ষ করেছে যে—ঋষি-কবির বাণী সার্থক হয়েছে, পূর্ণ হয়েছে। তারা আরো প্রত্যক্ষ করেছে যে, সুভাষচন্দ্র অনৈতিহাসিক বা আকস্মিক এক সৃষ্টি নন। তিনি বিপ্লবমুখর বঙ্গের অবদান, ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক। তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে একটি ধারাবাহিক জাতীয়-সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়কের আসন লাভ করেছেন। তিনি ইতিহাসের প্রতিটি ধাপ পেরিয়ে-আসা ঐতিহাসিক পুরুষ। এই পুরুষ বিশ্বখ্যাত শুধু নন—বিশ্বজনস্বীকৃত শ্রদ্ধেয় বীর, শ্রদ্ধেয় রাজনীতিক, শ্রদ্ধেয় সংগঠক ও জাতিস্রষ্টা। তাই তাঁর সম্বন্ধে বরেণ্য পণ্ডিত মিঃ ই. এফ. ওটেন্-এর উক্তি উদ্ধৃত করব। তাঁর 'Song of Aton and Other Verses' নামক কাব্যগ্রন্থে আমরা পাই :

SUBHAS CHANDRA BOSE
Oblit 1945

"Did I once suffer, Subhas, at your hand ?
Your patriot heart is stilled ! I would forget !

Let me recall but this, that while as yet
The Raj that you once challenged in your land
Was mighty, Icarus—like your courage planned
To meet the skies, and storm in battle set
The ramparts of high Heaven, to claim the debt
Of freedom owed, on plain and rude demand.
High Heaven yielded, but in dignity
Like Icarus, you sped towards the sea
Your wings were melted from you by the sun,
The genial patriot fire that brightly glowed
In India's mighty heart and flamed and flowed
Forth from her Army's thousand victories won!"

'কালি ও কলম' নামক পত্রিকার বৈশাখ-সংখ্যায় (১৩৭৬) ডক্টর বিমানবিহারী মজুমদার লিখিত 'ওটেন্ ও সুভাষচন্দ্র' নামক প্রবন্ধে একান্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই কবিতাটি সংযুক্ত হয়েছে। লেখক তাঁর আচার্য ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে কবিতার পুস্তকখানা সংগ্রহ করেছেন। শ্রদ্ধেয় মজুমদারমহাশয় কৃত ওটেন্ সাহেবের কবিতার চমৎকার গদ্যানুবাদটি হল :

"সুভাষ! তোমার হাতেই কি আমি একদিন লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম? তোমার সেই স্বদেশভক্ত হৃদয়ের গতিবেগ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। একথা যে ভুলিতে পারিলেই ভাল হইত। আজ মনে পড়ে যে, তোমার দেশে তুমি যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলে তাহা ছিল প্রচণ্ড। কিন্তু তুমি সাহসের সহিত 'আইক্যারাসে'র (গ্রীক পুরাণের জনৈক বীর) মত আকাশে উঠিয়া অমরাপুরীর দুর্গপ্রাচীর সংগ্রামের মধ্যে ভাঙিয়া ফেলিবার দুর্জয় সাহসময় সংকল্প করিয়াছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল তোমার দেশের যে স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছিল ও যাহার জন্য নিয়মতান্ত্রিক এবং রূঢ় রক্তাক্ত

দাবী করা হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া পাওয়া। ক্যাবিনেট-মিশান্ পাঠাইয়া সেই রাজশক্তি (High Heaven) তোমাদের দাবী মানিয়া লইতে রাজী হইয়াছিল; কিন্তু তোমার সম্মান ও মর্যাদা বোধ তোমাকে আইক্যারাসের মত সমুদ্রের অভিমুখে চালিত করিয়াছিল। তোমার পাখা সূর্যের তাপে গলিয়া গেল। ঐ তাপ হইতেছে ভারতমাতার বিশাল হৃদয়ে যে স্বদেশভক্তির আগুন প্রোজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পাইতেছিল তাহাই। ভারতীয় সেনাদলের সহস্র বিজয়ে ঐ দীপ্তি ভাস্বররূপে প্রবাহিত হইয়াছিল।"

('কালি ও কলম'—পৃঃ ১০০৪-১০০৬)

এই ওটেন্ সাহেবই হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের সেই বিখ্যাত ইংরেজ-অধ্যাপক, যাঁর সঙ্গে উক্ত কলেজের ছাত্র-সুভাষের সংঘর্ষ ঘটেছিল ১৯১৬ সালের এক ঐতিহাসিক লগ্নে। প্রকাশ্যে সসাগরা-পৃথিবীর অধীশ্বর এবং ভারতবর্ষের বিধাতা ব্রিটিশের আত্মজ এক সম্মানিত অধ্যাপকের অঙ্গে হাত তোলা তখনকার দিনে অকল্পনীয়। এই একটি ঘটনায় দুর্ধর্ষ ইংরেজ স্তম্ভিত হয়েছিল - আজও ছোট-বড় অনেক ইংরেজই সেই 'সুভাষ'কে ক্ষমা করতে পারে না। কিন্তু সুভাষচন্দ্র হাত তুলেছিলেন তাঁর অধ্যাপকের উপর ব্যক্তিগত কোন কারণে নয়, জাতির সম্মান রক্ষা করার ন্যায্য প্রত্যয়ে। প্রকাশ্যে ওটেন্ সাহেবও অবশ্য তাঁর জাতির তরফ থেকেই আপত্তিকর এক মন্তব্য করেছিলেন। মোটের উপর ব্যক্তিগত ঈর্ষা বা স্বার্থের কোন স্থান এ-সংঘর্ষে ছিল না। এটা ছিল কম-বেশি একটি 'ন্যাশনাল্-ফাইট'। তাই বোধহয় একটি স্বজাতিবৎসল বীর অপর একটি স্বজাতিবৎসল শৌর্যবান যুবককে প্রতি মুহূর্তে শ্রদ্ধা করে এসেছেন, নিজে 'Sufferer' হয়েও। তাই তিনি প্রায় ত্রিশ বছর পর (১৯৪৫ সালে) 'ইণ্ডিয়ান্ ন্যাশনাল্ আর্মি'র সর্বাধিনায়ক, তাঁর প্রাক্তন বিদ্রোহী-ছাত্র, সুভাষচন্দ্র বসুর বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ

প্রচারিত হতেই এ কবিতাটি লিখে ফেলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘটনার পর থেকে ওটেন্ সাহেব সুভাষচন্দ্রের কার্যকলাপ সাগ্রহে ও সশ্রদ্ধায় অনুধাবন করে করে সবিস্ময়ে তাঁকে দেখলেন ইম্ফল-রণাঙ্গনে বিপ্লবী মহা-নায়কের বেশে, ব্রিটিশ সমর-শক্তির বিরুদ্ধে দুরন্ত লড়াই করতে। ইংরেজ-অধ্যাপক ছাত্র-সুভাষকে তন্মুহূর্তে হয়ত আপন মনে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলেছিলেনঃ 'তরুণ বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়।' 'বিশ্বজয়ীর' গৌরবে যে-অধ্যাপক তাঁর দুরন্ত ছাত্রকে গ্রহণ করতে পেরেছেন তার প্রমাণ ঐ ছোট্ট কবিতা। বীর না হলে বীরত্বের সমাদর করা যায় না। মহানুভব না হলে কালজয়ী মহত্বের স্বরূপ চোখে ধরা পড়ে না।

সুভাষচন্দ্রের 'মৃত্যু' (?) কোনকালেই সঠিকভাবে সমর্থিত হয়নি। ভারতবাসী স্বভাবতই এটাকে অপপ্রচার মনে করে। ওটেন্ সাহেব বিমান-দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু বিশ্বাস করেন কি করেন না— সেটা এখানে বড় কথা নয়। বড় কথা হল প্রতিপক্ষের লোক শুধু নয়, ব্যক্তিগতভাবে লাঞ্ছিত হয়েও প্রখ্যাত পণ্ডিত ও বিদগ্ধ চিন্তানায়ক ইংরেজ মিঃ ই. এফ. ওটেন্ আজ দীর্ঘকাল পর শ্রদ্ধামুগ্ধ চিত্তে নেতাজির যে-মূল্যায়ন করতে পেরেছেন তাতে প্রমাণিত হয়েছে একটি বৃহৎ সত্য। সে 'সত্য' হল— 'নেতাজি'-রূপ সূর্যের আলোক-স্পর্শ পেয়েই ওটেন্ সাহেবের হৃদয়-ঝর্ণা বিগলিত হয়ে এই অপূর্ব কবিতাটির জন্মদান করেছে।

নেতাজি সম্বন্ধে এক চৈনিক-পণ্ডিতের উক্তি উল্লেখ করেই এ অধ্যায় আমরা সমাপ্ত করব। সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মিঃ চিয়াং হাই ডিঙ্ 'From a Colonial Port to Island

Nation' শীর্ষক প্রবন্ধে 'Straits Times' নামক বিখ্যাত ইংরাজি-দৈনিকে লিখেছেন :

"Netaji was no collaborator or supporter of the Japanese ; as a brilliant revolutionary he only made use of the Japanese in an attempt to achieve India's freedom ! ··The facts that are undeniable are (i) Netaji's movement hastened India's ultimate freedom from the British yoke ; (ii) India's emancipation paved the way for the freedom of other Asian nations including, of course, Malay and Singapore. Therefore, events connected with Netaji and his movement should be sacred to one and all Asians." ('A. B. Patrika', 11. 8. '69)

[নেতাজি জাপানীদের সহযোগী বা সমর্থক ছিলেন না। প্রতিভাধর বিপ্লবীরূপে তিনি শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টায় জাপানী-শক্তির সদ্ব্যবহার করেছেন। এখানে অনস্বীকার্য কথা হল—(ক) ইংরেজের কবল থেকে ভারতবর্ষের চূড়ান্ত মুক্তি নেতাজির সংগ্রামে ত্বরান্বিত হয়েছে ; (খ) ভারতের স্বাধীনতা অন্যান্য এশীয়-জাতিগুলির—বিশেষ করে মালয় ও সিঙ্গাপুরের স্বাধীনতা লাভের পথ তৈয়ের করে দিয়েছে। সুতরাং নেতাজি এবং তাঁর সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত যাবতীয় ঘটনাবলী প্রত্যেকটি এশিয়াবাসীর কাছেই মহা পবিত্র।]

বিশ্ববিশ্রুত এই যে মহান্ নেতাজি, তাঁর আবির্ভাব আকস্মিক নয়। তাঁর আবির্ভাব বিস্ময়কর। দেশকালপরিসরে বৈপ্লবিক এ-আবির্ভাবের ফলশ্রুতি একান্ত সংক্রামক, গভীর তাৎপর্যে একান্ত রমণীয়।···

॥ জয়হিন্দ্ ॥

॥ সাতাশ ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শহিদ-স্বীকৃতি

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে

ঋষিকবির প্রার্থনা—যে-মানুষ অন্যায় করে এবং যে-মানুষ অন্যায় সহ্য করে তাদের দু'জনকেই বিধাতার ঘৃণা যেন 'তৃণসম' দহন করে। 'বিধাতা' অর্থে মানুষের সংবুদ্ধিকেই হয়ত কবি এ আহ্বান জানিয়েছেন। 'প্রার্থনা' এখানে তাই আদেশ। কবির আদেশ আর কারো কানে না পৌঁছলেও বিপ্লবীদের কানে তাঁদের ছোট-বড় প্রতি পদক্ষেপের কালেই পৌঁছেছে।

সুভাষচন্দ্র কান পেতে শুনেছিলেন সে-বাণী, মর্ম দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন সে-সত্য। তাই ১৯৪০ সালের ৩রা জুলাই তিনি 'হল্‌ওয়েল্‌ মনুমেণ্ট-অপসারণ' আন্দোলনের ডাক দিলেন। সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। ব্রিটিশ-শক্তি এমনিতেই বিপর্যস্ত। মহাত্মাজির নির্দেশে কংগ্রেস বিপদকালে ব্রিটিশকে বিব্রত করতে নারাজ। কারণ, অহিংসার অভিধানে শত্রুর আপদে তাকে জোর-জবরদস্তি কোন প্যাঁচে ঘায়েল করার নীতি অচল। কিন্তু বিপ্লবী তা বোঝেন না। তাঁর কাছে দেশমাতৃকার স্থান সবার উপরে। শত্রুর বিপদের অজুহাতে তাকে ক্ষমা করা বিপ্লবীর কর্ম-নীতিতে নেই। ক্ষমা করা যায়, যদি চিরাচরিত 'অন্যায়' পরিহার করে পদানত দেশ থেকে সেই শত্রু বিদায় নেয়। কিন্তু এরূপ ঘটনার সাক্ষ্য পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। থাকতে পারে না। কাজেই খ্যাপা কুকুরে মত কাণ্ডজ্ঞানহীন দুর্দান্ত ইংরেজ-শক্তির বহুকালব্যাপী অনুষ্ঠিত একটি 'অন্যায়' কার্যকে 'ইস্যু' করে উক্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে

সুভাষচন্দ্র তাঁর সংগ্রামের ডাক দিলেন। ভারতবর্ষের অধিকাংশ রাজনীতিক দল যখন ক্লীবের মত দাঁড়িয়ে দেখেছেন বিশ্বযুদ্ধ, তখন অপূর্ব সাহসে দৃপ্ত সুভাষচন্দ্র এই বাঙলায় যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিলেন। যুদ্ধ-ডঙ্কা বাজালেন তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে একটি খণ্ড 'ইস্যু' নিয়ে। তিনি বললেন : বাঙালী তথা ভারতবাসীর স্বাধীনতা রক্ষার শেষ লড়াই যিনি করে গেছেন পলাশীর প্রান্তরে, সেই সিরাজদ্দৌলাকে কলঙ্কিত করার হীন চেষ্টায় রচিত হয়েছে ঐ 'হল্‌ওয়েল্ মনুমেণ্ট'! ঐ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অবরুদ্ধ রেখে বহু ইংরেজকে নাকি শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছিলেন বাঙলার নিষ্ঠুর নবাব! জালিয়াৎ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদীর এই মিথ্যা উক্তিকে তথাকথিত ঐ মৃত গোরা-সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে ডালহৌসি স্কোয়ারের বুকে। দেশবাসী এতকাল এ অপমান সহ্য করে এসেছেন। কিন্তু আর নয়। 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে'—বিধাতার ঘৃণায় তারা জ্বলে-পুড়ে মরুক। আমরা সেই ঘৃণা থেকে আজ অব্যাহতি পেতে চাই। আমাদের আন্দোলন শাণিত ইস্পাত হয়ে ঐ মনুমেণ্টকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দিক। আসুন, আমরা এই পুণ্য সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ি।...

কিন্তু আন্দোলন শুরু হবার পূর্বদিনই (২. ৭.'৪০) সুভাষচন্দ্রকে বিনাবিচারে বন্দী করে জেলে পাঠান হয়।

তাতে আন্দোলন থামেনি। ফলে, মুসলিম লীগ-অধ্যুষিত নাজিমুদ্দিন-মিনিস্ট্রি বাধ্য হয়েছিলেন অচিরে ব্রিটিশের ঐ কুকীর্তি অপসারিত করতে। শুধু নবাব সিরাজদ্দৌলা নন, ভারতবর্ষের শহিদকুলও নিশ্চয়ই সেদিন স্বর্গলোক থেকে সংগ্রামী-ভারতবর্ষ ও তার অদ্বিতীয় নেতা সুভাষচন্দ্রকে অলক্ষ্যে আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন।...

অতঃপর একদিন দেশ স্বাধীন হল। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর দীর্ঘ বিশ বছর ধরে বিপ্লবের জন্মস্থান এই বাঙলার বুকে কংগ্রেসের শাসন

ছিল অব্যাহত। কিন্তু ব্রিটিশের কুকীর্তির অজস্র নিদর্শন-চিহ্ন এই বাঙলারই বুক জুড়ে, সেই শাসনকালে, প্রায় অনড় হয়েই বসেছিল।

অক্টারলোনি, ডালহৌসি, কার্জন, কুইন ভিক্টোরিয়া, মিণ্টো, হেস্টিংস, ক্লাইভ, এণ্ডারসন্ প্রমুখ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদের অসংখ্য প্রতীকের স্মৃতিবিজড়িত ঐ স্তম্ভ-স্ট্যাচু-প্রাসাদ বা পার্কগুলো পৃথিবীর মানুষদের সেদিনও জানিয়ে দিচ্ছিল পরাধীন-ভারতের গ্লানিকর ইতিহাস। সাড়ম্বরে জানিয়ে দিচ্ছিল কেমন করে মুষ্টিমেয় বিদেশীর পদতলে তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী এতকাল আশ্রিত ছিল। এই কলঙ্কতিলক ললাটে ধারণ করে একটি মুহূর্তও কী করে একটা স্বাধীন-জাত শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করতে পারে, তা যথার্থ স্বাধীন-মানবের কল্পনাবহির্ভূত। কিন্তু বিশ বছরের কংগ্রেসী-শাসন অম্লান বদনে আপন ললাটে তা ধারণ করে গেছেন!

প্রায় দু'শ বছরের পরাধীন জাত। তার মজ্জায় মজ্জায় ঢুকে রয়েছে দাস্যতার প্রবৃত্তি। এ সূত্রে আবার মনে পড়ে সাহিত্যসম্রাট শরৎচন্দ্রের অভ্রান্ত উক্তি: 'পরাধীন জাতের সব কিছু থাকে, থাকে না শুধু আত্মসম্মানবোধ।'···এই 'বোধ' নষ্ট হয় একদিনে নয়। নষ্ট হয় বহুকালের প্রত্যেকটি মুহূর্তে। তাই হঠাৎ স্বাধীনতা পেয়েছিলাম বলেই আমরা মন থেকে দাস্যভাব ঝেড়ে ফেলতে পারিনি। কারণ, ব্রিটিশের প্রতি মানসিক-আনুগত্য আমাদের রক্তে তখনো প্রবাহিত। ফলে, আমাদের কংগ্রেসী-শাসকদল নিত্য 'ডালহৌসি স্কোয়ারে' পদচারণা করেও ঐ নামের গ্লানি বোধ করেননি; আমাদের কতিপয় খ্যাতিমান ঐতিহাসিক ব্রিটিশ-শাসকদের মর্মর-মূর্তি বা কীর্তিসৌধের নাম পরিবর্তনের মধ্যে বা অপসারণের ইঙ্গিতে ইতিহাসকে দেখলেন ক্ষুণ্ণ হতে; আমাদের কিছু শিল্পী ঐসব মূর্তির শিল্পমাধুর্যে এতই মুগ্ধ যে, ওসবের অপসারণে 'কালাপাহাড়ী'-মনোবৃত্তি লক্ষ্য করে হলেন আতঙ্কিত; আমাদের কিছু জন্ম-প্রবীণ এসব নব-নামকরণ প্রচেষ্টায়

খুঁজে পেলেন শুধু ভাবালুতার আবেগ। 'ব্যাস্টিল্' থেকে দীর্ঘ-মেয়াদী কয়েদীগুলো যেমন মুক্তির আলো সহ্য করতে না-পেরে আবার অন্ধকূপেই ফিরে যেতে চেয়েছিল, তেমনি আমাদের দেশের কতিপয় তথাকথিত গুণীজ্ঞানী, শিল্পী বা প্রাচীনও স্বাধীনতার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে না-পেরে ঐ দাস্যভাব থেকেই ব্রিটিশের স্মৃতিকে আঁকড়ে থাকতে চেয়েছেন। ফলে, ১৯৬৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত দু'চারটি রাস্তাঘাটের নাম দেশনায়কদের স্মরণে কলকাতা কর্পোরেশান পাল্টে দিলেও সমগ্র শহরের বুকে বিরাজিত ছিল তাঁদেরই স্মৃতিলিপি—যাঁরা এই দেশকে পদানত করে রেখেছিলেন, যাঁরা এই দেশেরই অসংখ্য নরনারীর উষ্ণ রক্তে হোলিস্নান করে পৃথিবীপ্রসারী-সাম্রাজ্যে সুখী ছিলেন। তাঁদের কীর্তি, ভারতবাসীর কলঙ্ক। সেই কলঙ্ক প্রতিষ্ঠিত রেখে আমাদের দেশী-শাসকগোষ্ঠি আমাদের বালক-বালিকা ও তরুণ-কিশোরদের প্রতি যে অবিচার করেছেন, তাকে 'ক্রিমিন্যাল্ নেগ্লিজেন্স' বললে অত্যুক্তি হয় না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে যাঁরা লড়াই করে গেছেন, দেশকে যাঁরা দস্যুকবলমুক্ত করেছেন—তাঁদের চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব স্বদেশী-সরকার নিলেন না। তাঁরা চেনাতে থাকলেন তাঁদেরই—যাঁরা নিয়ত 'অন্যায়' করে গেছেন, ভারতবর্ষকে পায়ে দ'লে-দ'লে বিশ্বজয়ী শোষকের দম্ভে পরিস্ফীত হতে পেরেছেন। আর বিদেশাগত ট্যুরিস্ট্ ও জিজ্ঞাসুর দল এসে কি দেখছেন ? দেখছেন তাঁদেরই স্মৃতি-রক্ষণ-সাধনা, যাঁরা বিরাট ভারতবর্ষকে একটা দাসের জাতি করে রেখেছিলেন ; দেখছেন না তাঁদের, যাঁরা শৌর্যে-বীর্যে-জ্ঞানে-পাণ্ডিত্যে ও আত্মদানে মহীয়ান্ হয়ে ঐ সাম্রাজ্যবাদী দানব-ইংরেজকে হটিয়ে দিয়ে স্বদেশের স্বাধীনতা এনেছেন, জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

বাঙলায় কংগ্রেস-শাসনের পতন হল। ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রণ্ট-সরকারকে বঙ্গের মসনদে বসালেন জনসাধারণ। এবার দেশবাসী

এই সরকারের কাছে অনেক কিছুই আশা করলেম। তাঁরা এতাবৎ কি পেয়েছেন, কি পাননি তার হিসেব-নিকেশের স্থান এখানে নয়। এখানে শুধু সন্ধান নেব বিপ্লবদ্রষ্টা সুভাষচন্দ্রের প্রত্যাশা পূর্ণ করার মত বৈপ্লবিক-দৃষ্টিকোণ নিয়ে এ-মন্ত্রিসভা কলকাতা তথা বঙ্গের বুক থেকে কলঙ্কচিহ্ন অপসারিত করার দিকে কতটা পদক্ষেপ করেছেন। আমরা দেখি, পূর্তমন্ত্রী স্পষ্ট একটি বৈপ্লবিক-চিত্ত-প্রসূত আত্ম-সম্মানবোধে দৃঢ়পদে এগিয়ে এসেছেন বাঙলার ললাট থেকে উক্ত কলঙ্কলিপি মুছে ফেলার সংকল্পে।...

বহু অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে পূর্তমন্ত্রী শুরু করলেন একটি একটি করে ব্রিটিশ অধিকর্তাদের স্ট্যাচু উপড়ে ফেলে তাঁদের শূন্যস্থানে স্বদেশের পূজ্য নেতৃবৃন্দের মূর্তি স্থাপন করতে। মূর্তিগুলো মন্ত্রী-মহোদয় ভেঙে ফেলেননি, কারণ তিনি 'কালাপাহাড়' নন। সযত্নে সেগুলো রেখে দিয়েছেন তিনি তথাকথিত শিল্পী ও ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্যে, সাধারণ লোকচক্ষুর অগোচরে।...

অতঃপর সানন্দে দেখলাম এক প্রভাতে ঐ 'অক্টারলোনি মনুমেণ্ট' হয়ে গেল 'শহিদ মিনার'! আবেগস্পিত বক্ষে তাকালাম আকাশ পানে। কই? ইতিপূর্বে তো ঐ স্তম্ভের অমন দিব্য রূপ দেখিনি। আকাশ ফুঁড়ে ওর চূড়া অমন গর্বে কোনদিন তো মাথা তুলে দাঁড়ায়নি।...

তারপর একদিন অপরাহ্ণে দেখলাম 'ব্লাক্ এণ্ড ট্যান্' নীতির জনক বঙ্গের জাঁদরেল লাট এণ্ডারসনের নাম বিলুপ্ত করে ঐ 'এণ্ডার-সন্-বিল্ডিং'টির অঙ্গে লিখিত হল নূতন নাম—'ভবানী ভবন'!...

পূর্তমন্ত্রী এখানেই থেমে পড়েননি। সুভাষচন্দ্রের প্রত্যাশা পূরণ করার তাগিদ অলক্ষ্যেও যাঁকে অনুপ্রাণিত করবে, তার থাকবে অব্যাহত স্পীড্! কারণ, তিনি বিপ্লবী। তাঁর গতি ঝঞ্ঝার মত দুর্বার।...

সহসা তাই সাগ্রহে শুনলেন দেশের মানুষ যুক্তফ্রন্ট-সরকারের নূতনতর একটি পরিকল্পনার কথা। সে-পরিকল্পনা রূপায়িত হতে দেখলেন তাঁরা ১৯৬৯ সালের ৮ই ডিসেম্বর ডালহৌসি স্কোয়ারের নব-নামকরণে। রাইটার্স-প্রাসাদের অলিন্দ-যুদ্ধে আত্মজয়ী শহিদ-ত্রয়ের নামে এই স্কোয়ারের নাম হল 'বিনয়-বাদল-দীনেশ-বাগ'।…

আজ কলকাতার পথে কোথাও কোন উদ্ধত ব্রিটিশ-রাজপুরুষের মর্মর-মূর্তি চোখে পড়ে না। বাঙলার নানা সরকারী-ভবন থেকে আজ ব্রিটিশ শাসকদের নাম বিলুপ্তপ্রায়। শহরের পার্কগুলো আজ ব্রিটিশ-ধুরন্ধরদের স্মৃতিভারে কলঙ্কিত নয়। 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল্' কেন্দ্রীয়-সরকারের অধীনে বলেই যুক্তফ্রন্ট-মন্ত্রিসভা বর্তমানে উক্ত সরকারকে উল্লিখিত স্মৃতিসৌধের নব-নামকরণে উৎসাহিত করতে বদ্ধপরিকর।

শুধু কলকাতা নয়, গোটা বাঙলা জুড়েই অভিযান চলেছে কলঙ্কময় স্থাপত্য-ইতিহাস ধুয়ে-মুছে জাতীয় শৌর্যলিপি উৎকীর্ণ করা ; বিদেশী-শাসকদের নামাঙ্কিত রাস্তাঘাট-সেতু-স্তম্ভ-হাসপাতাল-স্কুল-মূর্তি ও ভবনগুলি দেশের নেতা, কর্মী, শহিদ, মনস্বী ও সংগঠকদের নামে উৎসর্গ করা। কারণ, এটা জাতির দাবী, মানুষের দাবী —ইতিহাস-দেবতার দাবী।…

একটি ঐতিহাসিক প্রত্যুত্তর

(ভবানী ভবন)

বাঙলার বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার জন্যে বিলেত থেকে স্যার্ জন্ এণ্ডারসন্‌কে ডেকে আনা হয়েছিল এই বাঙলারই গভর্ণর পদ দিয়ে। এ-ঔদ্ধত্য বাঙলার বিপ্লবীদল ক্ষমা করলেন না। ১৯৩৪ সালের ৮ই

যে ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ও তাঁর সহকর্মী রবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুলির আঘাতে আহত হলেন দুর্ধর্ষ এই গভর্ণর। ইংরেজ তার সাম্রাজ্য-প্রতীককে চিরস্মরণীয় করে রাখার স্বপ্নে কলকাতায় একটি সরকারী-প্রাসাদ গড়লেন 'এণ্ডারসন্ হাউস' নামে। দাস-জাতি নিয়ত তার প্রভুর কীর্তিগাথা জপ করবে—এ-উদ্দেশ্যেই এই স্মৃতিসংরক্ষণ-ব্যবস্থা।

স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের আদালতে ভবানীর ফাঁসির হুকুম হয়েছিল ১৯৩৪ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর। হাইকোর্টে সে-হুকুম বহাল থাকল। ফাঁসি হল ভবানী ভট্টাচার্যের ১৯৩৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি।

ইতিমধ্যে কেটে গেল বারটি বছর। প্রচুর রক্তক্ষয়ে ও দুর্জয় সংগ্রামের মাধ্যমে একদিন দেশ স্বাধীন হল। তারও পর কেটে গেল আরো বাইশটি বছর। কিন্তু ব্রিটিশের সেই স্মৃতি-রক্ষণ-চেষ্টার কোন 'প্রত্যুত্তর' দেবার জন্যে কেউ এগিয়ে এল না।

আজ দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পর, ১৯৬৯ সালের ঠিক ঐ দিনে—যেদিন ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল, অর্থাৎ সেই ১২ই সেপ্টেম্বর—বাঙলার যুক্তফ্রন্ট-গভর্ণমেন্টের পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধান্বিত-চিত্তে এবং পরম নিষ্ঠায় একটি ঐতিহাসিক প্রত্যুত্তর দান করলেন। আনুষ্ঠানিকভাবে এই তারিখে 'এণ্ডারসন্ হাউসের' নাম পাল্টিয়ে তার নূতন নামকরণ করা হল **ভবানী ভবন**।

আমরা এই 'ঐতিহাসিক প্রত্যুত্তর' দানের জন্যে অনুষ্ঠিত সেদিনকার বিপুল জনসভা সম্পর্কে কিছু আলোচনা এখানে তুলে দিলাম।

॥ সভাপতির ভাষণ ॥

প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতা নলিনী ঘোষ তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন: "আজ শহিদ ভবানীর স্মৃতিবাসরে একটি কথাই বারে বারে মনে হচ্ছে যে, আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কামনা ছিল ঐ

ভবানীপ্রসাদের পরিণতি। কিন্তু তা হল না। আমার বুকে গুলি লাগল, তবু মরলাম না, বেঁচে গেলাম।”…

নলিনীবাবু গৌহাটি ‘নবগ্রহ পাহাড়ে’র কাছে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত হয়েছিলেন ১৯১৭ সালের ৯ই জানুয়ারি। এ তথ্য এই গ্রন্থে পূর্বেই পরিবেশিত হয়েছে। আজ বাহান্ন বছর পরও অশীতিপর বৃদ্ধের মনে ঐ একই আপশোষ জমাট বেঁধে আছে—তার প্রকাশ ঘটল একটি বিপ্লবীর সার্থক জীবনগানের ঐতিহ্য মূল্যায়ন কালে।

॥ প্রধান অতিথির ভাষণ ॥

সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রবীণ বিপ্লবী-নায়ক শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ ‘ভবানী ভবনে’র স্মারক-শিলা উন্মোচনকালে বলেন :

বন্ধুগণ, ‘ভবানী ভবনে’র নামোচ্চারিত শিলালিপি উন্মোচিত হল।

আজ আমি যথার্থই বিহ্বল। আনন্দবেদনায় বিহ্বল আমার চিত্ত। কোনদিন ভাবিনি যে, জীবদ্দশায় দেশকে স্বাধীন দেখব। দেখলাম, দেশ স্বাধীন হল। কোনদিন ভাবিনি যে, একান্ত কনিষ্ঠ সতীর্থদের ‘শহিদতীর্থে’ পৌঁছবার পরও এতকাল বেঁচে থেকে তাঁদের স্মৃতিতর্পণে আসতে হবে, শ্রদ্ধার্ঘ্য হাতে নিয়ে। কিন্তু তা-ও আসতে হল। কাজেই আনন্দে ও দুঃখে ভারাক্রান্ত আমার হৃদয়।

তবে একদিক থেকে সার্থক মনে হয় এই বেঁচে-থাকা, যখন দেখি,—মানীকে মান দিচ্ছে আমার দেশ, বীরকে বরণ করছে আমার দেশবাসী, অখণ্ড বিপ্লব-ধারাকে বুঝবার বুদ্ধি হচ্ছে আজকের কিছু তরুণ-বন্ধুদের। তাঁরা যেন বুঝতে চাইছেন প্রাক্-স্বাধীনতা-যুগের শহিদদের, বুঝতে চাইছেন সেই পঞ্চাশ বছরের সংগ্রামী-ইতিহাসকে—যার একপ্রান্তে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরে দাঁড়িয়ে আছেন দামোদর চাপেকার, এবং অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন মহান্ নেতাজি তাঁর ‘আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনী’র পুরোভাগে, ইম্ফলের রণাঙ্গনে।

একটি কল্যাণদাত্রী শুভ পরিবেশ আগত বলে আমি আশ্বস্ত। আজকের যাঁরা নেতৃবৃন্দ, যাঁরা রাজ্যের কর্ণধার তাঁরা বিপথগামী তরুণ-সম্প্রদায়ের মনকে অনায়াসে বীর্যের পথে, কল্যাণের পথে নিয়ে আসতে পারবেন—যদি শহিদদের 'চরিত্র' অনুকরণে নিজেরা উদ্বুদ্ধ হন, তারুণ্যশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার ব্রত গ্রহণ করেন।

দেশকে যাঁরা স্বাধীন করার আগ্রহে প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের 'চরিত্র' থেকে শিক্ষা না নিলে দেশ গড়া বা দেশ রক্ষার জন্য প্রাণ দেওয়া যাবে না। এই সত্যটুকু বুঝবার মন যেন অনেকের হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করতে পারছি।

আমি আজকের এই কর্মকাণ্ডের নায়ক পূর্তমন্ত্রী ও বাঙলার জনপ্রিয় সরকারকে আন্তরিক অভিনন্দন জানালাম। শহিদদের প্রতি জাতির ঋণ, সামান্যভাবে হলেও, স্বীকার করার রুচিজ্ঞান সকলের থাকে না—গত বিশ বছরের শাসনে এ কর্তব্যবোধ বা রুচিজ্ঞানের পরিচয় আমরা পাইনি। বর্তমান পূর্তমন্ত্রী ও তাঁদের মন্ত্রিসভার কাছে তা পেয়েছি বলেই আমরা দেশবাসী আশ্বস্ত হয়েছি। কাজেই আবার তাঁদের ধন্যবাদ জানালাম।

ভবানী ভট্টাচার্যের অমর আত্মাকে আমি বারে বারে প্রণাম করি। প্রণাম করি পুনর্বার ভারতবর্ষের অবিস্মরণীয় শহিদবৃন্দকে।

সমবেত বন্ধুগণ। জানিয়ে গেলাম আপনাদের আমার বিনীত নমস্কার। ॥ জয়হিন্দ্ ॥

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার-বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পত্রক ॥

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান"

(নজরুল ইসলাম)

এই শতকের তৃতীয় দশকে যুব-বাঙলার গুপ্ত বিপ্লবী-আন্দোলন দমনের জন্য ব্রিটিশ-সরকার স্যার জন্ এ্যাণ্ডারসন্‌কে বাংলার গভর্ণর করে পাঠিয়েছিলেন। ব্রিটিশদের দৃষ্টিতে তিনি এই কাজের যোগ্যতা

অর্জন করেছিলেন প্রথম যুদ্ধোত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে স্বাধীনতাকামী 'সিন ফিন' দলকে দমন করার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। তাঁর এই কুপ্রয়াসের ফল কি হয়েছিল স্বাধীন-আয়ার্ল্যাণ্ডের ইতিহাসই তার সাক্ষ্য বহন করছে। তবু সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের স্বার্থরক্ষাকল্পে এ্যাণ্ডারসন্ সাহেব তাঁর কুখ্যাত 'ব্লাক্ অ্যাণ্ড ট্যান্' বাহিনী গঠন করে স্বাধীনতাকামী আইরিশ জনসমাজের উপর নির্মম ও অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে বিশ্বব্যাপী কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সামরিক ও পুলিস বাহিনীর 'কৃষ্ণ ও তাম্রবর্ণ' উর্দির সংমিশ্রণে এ্যাণ্ডারসন্ সাহেবের গঠিত বাহিনীর উর্দি তৈরি করা হয়েছিল বলে এই বাহিনীর নাম হয়েছিল 'ব্লাক্ অ্যাণ্ড ট্যান্' বাহিনী।

যাই হোক, এ্যাণ্ডারসন্ সাহেবের এই কৃতিত্ব দেখে ব্রিটিশ সরকার হয়ত ভেবেছিলেন যে, তাঁকে বাঙলার গভর্ণর করে পাঠালে তাঁর চণ্ডনীতির দ্বারা তিনি বিপ্লব-বিক্ষুব্ধ বাঙলায় শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবেন এবং ভীরু বাঙালী তাঁর কড়া শাসনের কাছে নতি স্বীকার করবে। স্যার জন্ এ্যাণ্ডারসন্ও বাঙলাদেশে পদার্পণ করে বিপ্লবী-আন্দোলন দমনের নামে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর শাসন হয়ে দাঁড়িয়েছিল নিত্য-নতুন অর্ডিন্যান্সের শাসন। জন-নির্যাতনের চরম ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি প্রচলিত ফৌজদারী আইন সংশোধন করিয়েছিলেন, রাজনৈতিক অপরাধে ধৃত ব্যক্তিদের প্রতি ব্যবহারে এবং তাঁদের অনুসন্ধান ও গ্রেপ্তারের ব্যাপারে তিনি সভ্য-সমাজের রীতিনীতি বিসর্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। অস্ত্র-আইন, বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, ভারতীয় দণ্ড সংহিতা প্রভৃতির বিধিনিষেধ লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির মেয়াদ দিয়েছিলেন অনেক বাড়িয়ে।

স্যার জনের এইসব দমনমূলক কার্যকলাপের জন্য তাঁর উপর বিপ্লবীদের বিষনজর পড়ে এবং তাঁকে চরম শাস্তি দেবার জন্য বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার্স-এর প্রস্তুতি শুরু হয় বিপ্লবী যতীশ গুহের নেতৃত্বে ও

শ্রীসুকুমার ঘোষের পরিচালনায়। এ হল ১৯৩৪ সালের কথা। এ্যাণ্ডারসন্ সাহেবকে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করা যত সহজ ছিল, সেই সংকল্প কার্যে পরিণত করা তত সহজ ছিল না। তার কারণ, তিনি সর্বত্রই কড়া প্রহরী পরিবৃত অবস্থায় বিচরণ করতেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী-দলের সভায় স্থির হয় যে, দার্জিলিঙ্-এর লেবং-এ ঘোড়দৌড়ের মাঠে এ্যাণ্ডারসন্ সাহেবকে হত্যার চেষ্টা করা হবে। এ বিষয়ে যথোচিত ব্যবস্থা করার সকল ভার পড়ে ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার ঘোষ, মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী উজ্জ্বলা মজুমদার (বর্তমানে রক্ষিত-রায়) প্রমুখ বিপ্লবীর উপর। শেষ পর্যন্ত এ্যাণ্ডারসন্-হত্যার মূল দায়িত্ব পড়ে ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্যের উপর এবং তাঁর সহকারীরূপে নির্বাচিত হন রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভবানীপ্রসাদ তখন সবে বিশ বছরের যুবক। ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত জয়দেবপুর গ্রামে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ (১৩২১ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে) তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য ছিলেন বরিশাল জেলার বানরীপাড়ার অধিবাসী। ভাওয়ালের রাণী বিলাসমণি দেবী ছিলেন বসন্তকুমারের ভগ্নী। তাই পরবর্তী কালে জয়দেবপুরেই তিনি স্থায়িভাবে বসবাস করেন। ভবানীপ্রসাদ ছিলেন পিতামাতার তৃতীয় পুত্র। মাতা দময়ন্তী দেবী ও রাণী বিলাসমণির তিনি নয়নের মণি ছিলেন। স্থানীয় 'রাণী বিলাসমণি হাই স্কুলে' যথাসময়ে তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়। ছোট বয়সে তিনি দুরন্ত ও চঞ্চল ছিলেন। তবু পড়াশুনায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। নেতৃত্ব ছিল তাঁর চরিত্রে সহজাত। পাড়ায় ও বিদ্যালয়ে সমবয়সী ছেলেদের দলের নেতা ছিলেন তিনি।

সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময়েই তিনি 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'-এর বিপ্লবী কামাখ্যা রায়ের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁর জীবনের গতিও ফিরে যায়। ভারতের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সেই অল্প বয়সেই তিনি

জয়দেবপুরে গ্রন্থাগার ও ব্যায়ামাগার গড়ে তোলেন। এই প্রতিষ্ঠান দু'টির সহকর্মীদের সহায়তায় রোগীর সেবা, দুঃস্থদের দুর্গতিমোচন প্রভৃতি কাজে তিনি নিরত থাকতেন। আবার দুর্বৃত্তদের দমনেও দলের পুরোভাগে তাঁকে দেখা যেত। জয়দেবপুরকে কেন্দ্র করে তাঁরই উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে বিপ্লবীদলের শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত হয়েছিল। বিপ্লবীদলের ভাবধারা প্রচারের জন্য তাঁরই উদ্যোগে একটি হাতেলেখা পত্রিকাও প্রকাশিত হত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' এবং ম্যাকসিম গোর্কির 'মা' তাঁকে অল্প বয়সে জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রতিও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল বলে জানা যায়। এইভাবে বিপ্লবী কার্যকলাপ পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

এর অব্যবহিত পরেই দেশসেবায় তাঁর কাছে আসে চরম আত্মদানের আহ্বান। বিপ্লবী দল দার্জিলিঙ্-এ স্যার জন্ এ্যাণ্ডারসনের প্রাণনাশ করার যে সিদ্ধান্ত নেন, সে সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব পড়ে অকুতোভয় ভবানীপ্রসাদের উপর। এ বিষয়ে পরামর্শাদি করার জন্য তিনি ও তাঁর নির্বাচিত সহকর্মী রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা আসেন। তারপর তাঁরা ঢাকায় ফিরে ময়মনসিংহের পথে দার্জিলিঙ্ রওনা হয়ে যান। পুলিসী-সূত্রের সংবাদে দেখা যায় যে, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ৫ঠা মে তাঁরা দু'জন দার্জিলিঙ্-এ পৌঁছে লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়ামে ওঠেন। এদিকে কলকাতা থেকে আর দুই বিপ্লবী উজ্জ্বলা মজুমদার ও মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় হারমোনিয়ামের মধ্যে রিভলবার নিয়ে দার্জিলিঙ্ রওনা হন এবং তাঁরা গিয়ে ওঠেন স্নো-ভিউ হোটেলে। ভবানীপ্রসাদ মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট থেকে আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করেন। পুলিসী-সূত্রের সংবাদে প্রকাশ, ৬ই মে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানীপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে দার্জিলিঙ্-এ

ঘুরে বেড়ান এবং লেবং-এর ঘোড়দৌড়-মাঠ সহ যেসব জায়গায় গভর্ণর স্যার জন্ এণ্ডারসন্ যাতায়াত করেন সেসব জায়গা তাঁদের দেখান। প্রকাশ যে, ভবানীপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ ৭ই মে দার্জিলিঙ্-এর পুষ্প-প্রদর্শনীতে গভর্ণরকে গুলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু সময়মত টিকিট যোগাড় করতে না পারায় তাঁদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

১৯৩৪ সালের ৮ই মে, বেলা ৩টা। লেবং-এর ঘোড়দৌড়ের মাঠ লোকে-লোকারণ্য। লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়াম থেকে সাহেবী পোশাক-পরা ভবানীপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথ ঘোড়দৌড়ের মাঠে এসে লাট সাহেবের বক্সের কাছাকাছি জায়গায় নিজেদের স্থান করে নেন। গভর্ণরস্ কাপের দৌড় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্যার জন্ উঠে দাঁড়ালে তাঁকে লক্ষ্য করে ভবানীপ্রসাদ গুলি চালান। পরে রবীন্দ্রনাথও গুলি ছোঁড়েন। দুঃখের বিষয়, উভয়ের গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সাময়িক বিমূঢ়তা কাটার সঙ্গে সঙ্গে লাট সাহেবের দেহরক্ষীরা বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে এবং অতঃপর আহত অবস্থায় তাঁদের দু'জনকেই গ্রেপ্তার করা হয়। আহত আক্রমণকারীদের ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়ামে তল্লাশি চলে। আহত আক্রমণকারীদের দেহ তল্লাশি করে একটি রিভলবার, একটি পিস্তল ও ত্রিশটি কার্তুজ পাওয়া যায়। এই ঘটনার অনেকদিন পরে শ্রীমতী উজ্জ্বলা মজুমদার, সুকুমার ঘোষ ও মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলিকাতায় গ্রেপ্তার করে বিচারার্থে দার্জিলিঙ্-এ চালান দেওয়া হয়েছিল।

অস্ত্র-আইন অনুসারে একটি স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে ৭ই আগস্ট*

* ৭ই আগস্ট ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এম্. এম্. ঘোষের এজলাসে লেবং ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের প্রথম উপস্থিত করা হয়। কিন্তু স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচার শুরু হবার তারিখ ১৪ই আগস্ট (১৯৭৪)। —গ্রন্থকার

ভবানীপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্যদের বিচার আরম্ভ হয়। ১২ই সেপ্টেম্বর ট্রাইবুন্যালের রায়ে হাইকোর্টের অনুমোদন-সাপেক্ষে ভবানীপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের ফাঁসির হুকুম হয়। অন্যান্যদের হয় বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড। ট্রাইবুন্যালের কাছে ভবানীপ্রসাদ যে জবানবন্দী দেন তার মধ্যে তাঁর অকুতোভয় চরিত্র, দৃঢ় মনোভাব ও বিপ্লবের প্রতি আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি এই হত্যা-প্রয়াসের সকল দায়িত্ব নিজেদের উপর নিয়ে বলেন : "রবীন্দ্র ও আমি ছাড়া অন্য কেউ এ কাজে যোগ দেয়নি এবং ঐ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল না। একটি স্যুটকেসের মধ্যে করে আমরা রিভলবার ও পিস্তল এনেছিলাম। লাট সাহেবকে গোপনে হত্যা করার জন্যই আমি এসেছিলাম। তাঁকে হত্যা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে আমি কোন অন্যায় করিনি। তিনি এখনও অক্ষত দেহে বেঁচে আছেন, এজন্য আমি দুঃখিত। তাঁকে হত্যা করতে পারলেই আমি খুব খুশি হতাম।"

হাইকোর্ট ১৯৩৪ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভবানীপ্রসাদ ও রবীন্দ্র-নাথের মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করেন। শেষ পর্যন্ত গভর্ণর রবীন্দ্রনাথের প্রাণদণ্ড মকুব করে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেন। কিন্তু ভবানীপ্রসাদের মৃত্যুদণ্ড বহালই থেকে যায়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি মাত্র একুশ বছর বয়সে রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলের ফাঁসি-মঞ্চে দেশের জন্য চরম আত্মত্যাগ করে ভবানীপ্রসাদ শহিদ হন। তাঁর ফাঁসির অব্যবহিত পূর্বে তিনি জেল থেকে যে পোস্টকার্ড লিখেছিলেন তার শুরু হয়েছিল এই বলে : "অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায়—সাধক সেখানে সিদ্ধিলাভ করে।" মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এরূপ অবিচলিত দৃঢ় সংকল্প বিপ্লববাদের উপর তাঁর গভীর আস্থা এবং নিজের কর্তব্যে অবিচল নিষ্ঠার প্রতীক।

[পরসমু—৬৯/৭০-৪৫৬৭ এফ্-১ হ]

॥ শহিদ ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য ॥

সেদিন ৮ই মে। ১৯৩৪ সাল। দার্জিলিঙ্ শহরে লেবং-এর মাঠে ঘোড়দৌড় হচ্ছে। বাঙলার গভর্ণর স্যার জন্ এণ্ডারসন্ স্বয়ং উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের পুরস্কার দেবেন।

'জুবিলি স্যানাটোরিয়াম' থেকে বেরুলেন দু'টি তরুণ। তাঁদের পরনে ইউরোপীয় পোশাক। দেহে লুকিয়ে-রাখা গুলিভরা আগ্নেয়াস্ত্র। প্রোজ্জ্বল দুই জোড়া চোখ। স্বাস্থ্যপূর্ণ দৃপ্ত চেহারা। ভারিক্কী চালে চলে গেলেন তাঁরা ঘোড়দৌড়ের মাঠের দিকে। মনে হবে রূপকথার গল্প—দুটি রাজপুত্র ছুটে চলেছেন পক্ষিরাজ ঘোড়ায়, যেন তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে, অজানা কোন্ রাজ্য জয় করতে।···

এঁদের নাম ভবানী ভট্টাচার্য এবং রবি ব্যানার্জি।

ভবানী ও রবি এসেছিলেন ঢাকা থেকে। ওঁরা ঢাকা জয়দেবপুরের ছেলে। দু'জনেই তরুণকিশোর।

*　　　*　　　*

এণ্ডারসন্ সাহেবকে টার্গেট করবেন তাঁরা। তাঁদের থেকে একটু দূরে রয়েছেন উজ্জ্বলা মজুমদার ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জি। তাঁদের কাজ সতীর্থদের ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেওয়া। ভবানী ও রবিকে দূর থেকে লাট সাহেবকে চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব মনোরঞ্জনের। ভবানী ও রবি তাঁদের পজিশান্ নিলেই উজ্জ্বলা দেবী ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জি চলে আসবেন দার্জিলিঙ্ শহর ছেড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে।

এণ্ডারসন্‌কে টার্গেট করার কারণটি সে-যুগের মানুষকে বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন ছিল না। তখনকার দিনে বাঙলার ছেলে-বুড়ো প্রত্যেকেরই মনের প্রত্যাশা ছিল যে, এ-কাজটি সত্বর ঘটে যাক।

১৯৩০-'৩৪ সাল জুড়ে বাঙলার বিপ্লবীরা যেমন রুদ্রের বিষাণ বাজিয়ে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিলেন, ব্রিটিশ-রাজশক্তিও তেমনি আঘাতের পর আঘাত খেয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। অত্যাচার, দুঃশাসন ও

অপমানের কষাঘাতে ইংরেজের মিলিটারি, পুলিশ, স্পাই, অনুচর ও স্তাবকের দল বাঙলার ঘরে ঘরে নরক সৃষ্টি করেছিল। সে নির্যাতন ও অপমান যে কি দুঃসহ ছিল, তা আজকের স্বাধীন-ভারতের মানুষ কল্পনা করতে পারে না। কল্পনা করার কথাও নয়। দাস-জাতির গ্লানিকর-বেদনা ও অপমানের জ্বালা স্বাধীন মানুষের অবোধগম্য। আজকের বাঙালী বা ভারতবাসীও তাই প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের ভারতীয়দের দাস-জীবনের দুঃখ বুঝতে অপারগ।

১৯৩৪ সালের কথাই বলি। তরুণ-বাঙলা কারাগৃহে বা বন্দীবাসে শৃঙ্খলিত। মেদিনীপুরে তিন-তিনটি শ্বেত ম্যাজিস্ট্রেট নিহত হবার পর মিলিটারি-রাজের কৃপায় এবং পুলিশ ও স্পাইদের তাণ্ডবে দেশে 'শ্মশানের শান্তি' বিরাজ করছে। ইংরেজ-রাজপুরুষরা একটু দম নিতে পেরেছেন। তাঁরা আরো নিশ্চিন্ত—কারণ, বাঙলার কর্ণধার এমন একজন দুর্ধর্ষ গভর্ণর, যাঁর নামে নাকি আইরিশ-বিপ্লবীরা আতঙ্কিত, যিনি 'ব্ল্যাক্ এণ্ড ট্যান্' নীতির জনক। এই দুর্জয় রাজপুরুষ তথা বাঙলার বিধাতা হলেন স্যার জন্ এণ্ডারসন্। তিনি স্থির করলেন যে, বাঙলার তরুণদের চরিত্র হনন করতে হবে, কারণ গত পঞ্চাশ বছরের সাধনা এঁদের আর কিছু না-দিলেও দিয়েছে একটু চরিত্র।···এণ্ডারসন্ দেশের গুণ্ডা ও অসামাজিক লোকগুলোকে 'ভিলেজ্ গার্ড' নাম দিয়ে সংগঠন করালেন পুলিশের মাধ্যমে। এই সংগঠন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। পুলিশ শহরে-গ্রামে নানা অভিনব উপায়ে তরুণদের চরিত্র-হননের চেষ্টায় মত্ত হল। জাতির 'ক্যারেক্টার' বলতে যা বোঝা যায়, সেইটিকে সুকৌশলে নষ্ট করার নীতি তারা সাদরে গ্রহণ করেছে।

কিন্তু ব্রিটিশের প্রচার ও অপচেষ্টা যত তীব্র ও নিপুণই হোক না কেন—সেদিনের দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদ ও বৈপ্লবিক ঐতিহ্যবোধ এতই দৃঢ়মূল ছিল যে, তরুণদের চরিত্র-হনন চেষ্টায় সরকার ব্যর্থ হল। অগ্নি-স্নাত বাঙলার তরুণ—তার অঙ্গে কাদামাটির দাগ লাগে না।···

* * *

প্রত্যুত্তর পেল ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ লেবং-এর ঘোড়দৌড়ের মাঠে।

প্রচুর জনসমাবেশ। বিত্তের প্রাচুর্যে আসর জমেছে। লাট সাহেব তাঁর রাজকীয়-আসনে আসীন। তাঁবেদারকুল ধন্য-ধন্য করছে। রাজভক্তির সমারোহ সামন্ত-রাজাদের আবির্ভাবে আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। বাঙলার মালিকের দর্শন-সুখে মুগ্ধ নরনারী। এদের ভাবালুতার ফাঁকে ভবানী ও রবি চলে গেছেন লাট সাহেবের কাছাকাছি, একেবারে রিভলভারের রেঞ্জ-এ।

এখন প্রার্থিত লগ্নের অপেক্ষা।…ঘোড়দৌড় শেষ হয়ে গেল। লাট সাহেব আসন ত্যাগ করে দাঁড়িয়েছেন। ভবানী এগিয়ে গেলেন।…

সহসা গর্জে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র।…সভামণ্ডপে কী সে হুলুস্থুল!… কে কোথা দিয়ে পালাবে তার দিশা নেই! দ্বিতীয় গুলি গর্জে উঠার সাথে সাথেই দর্শকদের আসন থেকে কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল ভবানীর উপর। ইত্যবসরে গভর্ণরের এডিকং পর-পর চারটি গুলি ভবানীকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন। ভবানী গুলিবিদ্ধ। ভবানী বন্দী।

এদিকে রবি ব্যানার্জি আরো এগিয়ে গেছেন গভর্ণরের দিকে। ভবানীর রিভলভার গর্জে উঠতেই তিনি গুলি ছুঁড়লেন। একটি গুলি গভর্ণরের ঠোঁট ঘেঁষে ছুটে গেল—ঝলসে গেল খানিকটা। লাটবাহাদুর সলম্ফে মহিলা 'স্টেনো'র পশ্চাতে সরে গেলেন। তাঁর গৌর অঙ্গে লেগেছে মারাত্মক শিহরণ। শ্বেত-সাম্রাজ্যের বনিয়াদ কেঁপে উঠেছে। …রবির দ্বিতীয় গুলি এসে লাগল ঐ মহিলা-স্টেনো মিস্ থর্টনের পায়ে।…

সমগ্র সান্ত্রীবাহিনী ও রাজপুরুষ বুদ্ধিভ্রান্ত। জনতা বিহ্বল। দেহরক্ষী সার্জেণ্টের দেহ থেকে রক্ত ঝরে পড়েছে। রবি-ভবানীদের বুলেট তাকে রেহাই দেয়নি। ··

গভর্ণরের সিংহাসনের কিছু দূরে P. W. D.-র এক সাহেব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্-ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন দাঁড়িয়ে। একলম্ফে তিনি এসে পড়লেন রবির উপর। রবির অস্ত্র এখন বুলেট-শূন্য। সিপাই-সান্ত্রীর দলও মওকা বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র রবির দেহে। চলল অকথ্য মারপিট।···

* * *

রক্তক্ষরিত বন্দী ভবানীর মৃত্যু আসন্ন মনে করে পুলিশ অগ্রসর হয়ে এল 'ডেথ্ ডিক্লারেশন্' নেবার জন্যে। ভবানী ভট্টাচার্য অস্ফুট কণ্ঠে শুধু প্রশ্ন করলেন : 'Is he still alive ?'···এর পর অমন ছেলের কাছে কোন স্বীকারোক্তি আশা করা বাতুলতা মাত্র।

রবি ব্যানার্জির অবস্থা আরো শোচনীয়। তাঁকে কেউ গুলি করেনি। কিন্তু তাজা মানুষটিকে সেদিন পশুর উন্মত্ততায় সেপাই-সান্ত্রীর দল এমন মারপিটই করল যে, তাঁর অস্থি-পাঁজর সব যেন আলাদা হয়ে গেল। নাকমুখচোখ ফেটে ফুলে তাঁর ফুলের মত ঐ সুন্দর মুখখানা কদর্য করে দিল। রবির ডান-হাত ও ডান-পা জীবনের তরে পঙ্গু হল।···

* * *

১৪ই আগস্ট, ১৯২৪ সাল। স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের এজলাসে 'গভর্ণর শুটিং'-এর মামলা। ট্রাইবুন্যালের সভাপতি মিঃ ইয়ুনি। মামলার আসামী ভবানী ও রবি ব্যতীত আরো চারটি তরুণ এবং একটি তরুণী। এঁদের পুলিশ ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করেছে। ঢাকা ও কলকাতার আরো বহু লোককে গ্রেপ্তার করা হলেও মামলা আর কারো বিরুদ্ধে আনা সম্ভব হয়নি।

যথারীতি সমারোহ করে বিচার-পর্ব শেষ হয়ে এল। তৎপূর্বে ভবানী ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোর্টে যে, তিনি কি জানেন! উত্তরে মহাদর্পী বিপ্লবী বলেছিলেন:

"I came to assassinate the Governor. My object was to murder him. I have nothing more to say. None but myself and Rabi took part in this action connected with this conspiracy. I know I have done no wrong, I would have been happy if I could finish him outright."

[আমি লাটকে হত্যা করতে এসেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে ধ্বংস করা। এর অধিক বক্তব্য আমার নেই। এই কাজে বা তার ষড়যন্ত্রে আমি ও রবি ছাড়া আর কারো কোন যোগ নেই। আমি জানি, আমি কোন অন্যায় করিনি। আমি খুশি হতাম, যদি আমি তাঁকে (লাটকে) তন্মুহূর্তে নিঃশেষ করতে পারতাম।]

ভবানীর ভয়হীন এই সংক্ষিপ্ত উক্তি বুলেটের চেয়েও ভীষণ প্রচণ্ডতায় দীর্ণ করে দিল কোর্টের ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য। চোখ তুলে তাকিয়ে রইলেন ক্ষণকাল, বিচারক থেকে শুরু করে আর্দালি পর্যন্ত সবাই ঐ রুদ্র কিশোরের পানে।...

বিচারের রায় বের হল। ভবানী, রবি ও মনোরঞ্জনের ফাঁসির হুকুম হল। উজ্জ্বলা দেবীর ২০ বছর, এবং সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানার্জি ও সুশীল চক্রবর্তির ১৪ বছর থেকে ১২ বছর সাজা হয়ে গেল।

এই বিচারের তারিখ হল ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৫ সাল। পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বের আজকের এই দিনটি।

* * *

হাইকোর্টে সবার সাজাই কিছু কিছু কমে গেল। কমল না ভবানীর। তাঁর ফাঁসির দণ্ড বহাল রইল।

*   *   *

১৯৩৫ সাল। রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেল। ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসির রাত্রি। দেশভক্ত শুধু নন, রবীন্দ্র-কাব্যের একান্ত ভক্ত এই বীর কিশোর। তাঁর কারাজীবন কেটেছে রবীন্দ্রনাথের কত গান গেয়ে গেয়ে। গাইছেন তিনি:

"বজ্রে তোমার বাজে বাঁশী সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি দাও মোরে সেই কান।"

এই সেই তাপস, যিনি ফাঁসির দু'দিন পূর্বে পিতামাতার উদ্দেশ্যে জেলখানা থেকে ছোট্ট পত্রে লিখেছিলেন: "অমাবস্যার শ্মশানে ভীরু ভয় পায়—সাধক সিদ্ধিলাভ করে।"*···

সিদ্ধি লাভ করেছিলেন ভবানী।

বজ্রের ধ্বনিতে তিনি বাঁশীর সুর সত্যি কান পেতে শুনেছিলেন। তাই তীর্থঙ্করের বিভায় 'শহিদ'-তীর্থে তাঁর যাত্রা শুরু হতেই কেবল বাঙলা নয়—সমগ্র ভারতের স্পর্শকাতর মন বেদনায় বিধুর হয়ে উঠল।···বিদ্রোহী বীর—যাঁর তরুণ ধমনীতে ভারতীয় তারুণ্যের উষ্ণ রক্ত প্রবাহিত, যাঁর নবীন মাধুর্যে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার আলোক-তুলির স্পর্শ, যাঁর প্রমত্ত পদক্ষেপে কোটি কোটি ভারতীয়ের মুক্তিবাণী ধ্বনিত—তাঁকে বিদেশী শাসক হত্যা করছে—এ যে 'জাতীয়-বেদনা!'···

* "ভবানীপ্রসাদের ছোট ভাইটির পত্র" শীর্ষক বিষয়বস্তু গ্রন্থের 'পরিশিষ্টে' দ্রষ্টব্য।

কিন্তু দীপ নিভে গেল। নির্মম ফাঁসির রজ্জু ভবানীর কণ্ঠবাণীকে স্তব্ধ করে দিল। মৃত্যুপুরীর অমরলোকে তিনি যাত্রা করলেন। সারা ভারতবর্ষের যুব-কণ্ঠে ধ্বনি উঠল—বন্দেমাতরম্!

সেই মহামৃত্যুর তারিখ ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫ সাল।

॥ যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ভবানীপ্রসাদের আলেখ্যে সেদিন মাল্যদান করেছিলেন ॥

শিলা-স্মারক উন্মোচন অন্তে হেমচন্দ্র ঘোষ; সভাপতি নলিনী ঘোষ; অশ্বিনী গাঙ্গুলি; পশ্চিমবঙ্গ সরকার; পশ্চিমবঙ্গ কর্মচারি কো-অর্ডিনেশান্ কমিটি; মন্ত্রী আব্দুর রেজাক খাঁ; সতীর্থ সংহতি; বালেশ্বর আত্মোৎসর্গ স্মারক সমিতি; অনুশীলন ভবন; আন্দামান প্রাক্তন রাজনৈতিক বন্দী মৈত্রী চক্র; বিপ্লবী পরিষদ; বিপ্লবী নিকেতন; যতীন দাস স্মৃতি সমিতি; ভবানী স্মৃতি সমিতি; রবীন্দ্র লাইব্রেরী; পল্লীনিকেতন (বাগু); সপ্তগ্রাম সর্বেশ্বর বিদ্যালয় (বাগু); ভবানীর পরিবার; শহিদ অসিত ভট্টাচার্য স্মৃতি সমিতি; প্রতীচী সঙ্ঘ; পূর্তমন্ত্রী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়: আরো অনেকে এবং আরো অনেক সংস্থা।

দ্রষ্টব্য: 'সতীর্থ সংহতি' এবং বিপ্লবী-বন্ধুদের পক্ষ থেকে শ্রীশান্তিময় গাঙ্গুলি "শহিদ ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য" এই প্রবন্ধটি উক্ত সভায় পাঠ করেন।

॥ আটাশ ॥

এপার ওপার

এ বঙ্গের ছাব্বিশে জানুয়ারি

"India wants the Sacrifice of at least a thousand of her men—men, and not brutes." (Swami Vivekananda)

১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হয়েছে। তবু অনেকে বলেন, ১৯৭০ সালের শুরুতে এসে'ও প্রশ্ন থেকে যায়—স্বাধীনতা আমাদের কি দিল? তাই ২৬শে জানুয়ারি তাঁদের নাকি সে আনন্দ ও উৎসাহ দেয় না—যে আনন্দ, উৎসাহ ও আবেগ তাঁরা প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের এই তারিখটিতে পেতেন। তাঁরা বলেন—সেই যুগে এই তারিখে আমরা মিলিত হতাম; হাতে-নাতে পেতাম না কিছুই; তবু এক পরম প্রাপ্তির সাধনায় সর্বস্ব ত্যাগ করে যাঁরা এগিয়ে চলেছিলেন, তাঁদের পশ্চাৎযাত্রী হবার কী না ছিল আমাদের আকর্ষণ! সে-যাত্রায় ছিল শিহরণ, ছিল গৌরব, ছিল দিব্য এক প্রশান্তি। সাধারণ মানুষ—পুলিশের লাঠি মাথায় এসে পড়লেও তারা পিছিয়ে যেত না। কিন্তু এ-যুগের এসব অনুষ্ঠানে কোথায় সে নিষ্ঠা বা ইমোশান্?…

বহুজনের কণ্ঠে উচ্চারিত উল্লিখিত অনুশোচনা কেবলই মিথ্যে হা-হুতাশ নয়। সত্যি বলতে কি—আমরা সবাই যা চেয়েছিলাম, তা পাইনি। যা পেয়েছি তাতে প্রতিদিনকার জীবনে খুশি হতে পারছি না।…

দেশ স্বাধীন হয়েছে নিশ্চয়ই। রাষ্ট্রিক-স্বাধীনতা আমাদের করায়ত্তে। দেশ ও সমাজকে ঢেলে সাজাবার ক্ষমতা আমাদের অধিগত। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক-রাষ্ট্র এই ভারতবর্ষের নানা

বিষয়ে প্রচুর উন্নতি হয়েছে। মাল্টি-স্টোরিড্ প্রাসাদে-প্রাসাদে, ব্ল্যাক্টপ্ সড়কে-রাস্তায়, কংক্রিট্ ব্রীজ্ ও ভায়াডাক্টে এবং সর্বোপরি নানাবিধ উন্নয়ন-প্রজেক্টে এই দেশের বহু জনপদ ঐশ্বর্য-ঝলোমলো। নিয়ন্-লাইটের বহর উল্লেখযোগ্য। জল্সা বা প্রমোদ-রজনী বিরামহীন। ধনিকের বিত্ত হয়েছে বহুগুণ। জনসাধারণের আয়ও বেড়েছে—যদিও অনুপাতে নগণ্য। বাক্-স্বাধীনতা সীমাহীন। জনসংখ্যা ঊর্ধ্বগামী। আচারে-বিচারে স্বেচ্ছাচারী হলেও কেউ বাধা দিচ্ছে না। আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে—কারণ, আধুনিক চিকিৎসা-ব্যবস্থায় মৃত্যুর হার নিম্নমুখী। বিশ্বজগতে স্বাধীনদেশের মর্যাদা আমরা পেয়েছি ও পাচ্ছি।

এত সত্ত্বেও 'স্বাধীনতা'র গুণগানে বিহ্বল আমরা হতে পারি না কেন? 'স্বাধীনতা'র ধারাস্নানে দেহমন আমাদের সুখে অবশ হয়ে আসে না কেন? পরাধীন-ভারতের ২৬শে জানুয়ারির উচ্ছল আবেগ কি স্বাধীন-ভারতের ২৬শে জানুয়ারির মরুপথে হারিয়ে গেল? বিমর্ষ চিত্তে মানুষেরা ভাবে—কোথায় গেল সে প্রত্যাশা?

আমাদের প্রশ্ন—কেন এই ক্ষোভ? আজকের দিনে সকল মানুষ কি ফ্রাস্ট্রেটেড্?...

উত্তর খুঁজতে গিয়ে সর্বপ্রথম মনে হয়, আমরা যা পেয়েছি তার জলুস আছে—কিন্তু প্রাণ নেই। ইট-পাথরের প্রাসাদের চতুষ্পার্শ্বে বস্তিগুলোর কান্না আরো বেড়েছে। প্রজেক্টের পর প্রজেক্ট দেখছি, কিন্তু কোথাও 'মানুষ' গড়ার স্বপ্ন দেখছি না। মানবিক-মূল্য স্তিমিতপ্রায়। ধনিকের আয়ের স্তূপ কালো-পথে পিরামিডের উচ্চতা পেরিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু দরিদ্রের আয় সামান্য বাড়লেও দ্রব্যমূল্যের হার আকাশ-ছোঁয়া হতে-হতে তাদের ঠেলে দিচ্ছে দারিদ্র্যের নিম্নতম গহ্বরে। বাক্যের স্বাধীনতা মানুষকে বাচাল ক'রে দিচ্ছে। স্বেচ্ছাচারী আচার-বিচারে যারা উন্মত্ত, তাদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান দেখে বহুজন শঙ্কিত। বাইরের চাকচিক্য বা আলো-

উৎসব অন্তরের রূপকে ফুটিয়ে তুলতে পারছে না। নিঃশ্বাস সেখানে পরিমলহীন, জ্যোতি ও আনন্দ অপগত। মোটের উপর যথার্থ ডিমক্রেসি চালু করার কোন গুণই আমরা আহরণ করতে চাইনি বলেই আয়ত্ত করতে পারিনি। আমাদের দেশ-নেতৃত্ব বরঞ্চ আমাদের 'মবক্রেসি'র দিকেই টেনে নিচ্ছে। তাই আজ নিরানন্দ মানুষ প্রশ্ন করে—এ ঐশ্বর্য কি আমার আভরণ? এ 'স্বাধীনতা' কি আমার স্বপ্নের স্বাধীনতা? এই কি অগণিত শহিদ ও সংগ্রামীর মৃত্যু-মূল্য? তাঁদের আত্মবিলয়ন-দণ্ড দিয়ে সাগর মন্থন করে পেলাম কি এমন অমৃত?...

আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, দেশের রাষ্ট্রিক-স্বাধীনতা আমাদের হাতে এসেছে আমাদের গুণে নয়। আমাদের ত্রুটি ও গ্লানির রন্ধ্রপথে ব্রিটিশ দান করে গেছে যে-বস্তু, তা তাদের পক্ষে বিষবৎ হয়ে উঠেছিল বলেই তাদের নির্দিষ্ট ছকে হাঁটু গেড়ে বসে আমরা হিন্দু-মুসলমান তা উপঢৌকনের মত নিতে পেরেছি।

দেশটা তখনো ছিল ব্রিটিশের বুটের তলায়। দেশের যৌবন বিদ্রোহী। দেশের সৈন্যবাহিনীর আনুগত্য সংশয়াকুল। সাম্রাজ্য শতধাদীর্ণ। আন্তর্জাতিক চাপে তার মেরুদণ্ড বিচূর্ণ। ব্রিটিশকে তাই সরে যেতে হবে। বিপুল ভারতবর্ষ শাসন করার ক্ষমতা তার লুপ্ত। সুতরাং ব্রিটিশ-ডিপ্লমেসি দাবার সুদক্ষ চাল দিতে লাগল রাজনীতির ক্ষেত্রে। বিবদমান 'কংগ্রেস' এবং 'মুসলিম্ লীগে'র হাতে তুলে দিতে চাইল কূটবুদ্ধি ইংরেজ ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক-ক্ষমতা। ইংরেজের তাঁবেদার মুসলিম্ লীগ এবং সংগ্রাম-কাতর তৎকালীন কংগ্রেস-নেতৃত্ব এ-সুযোগকে বিধাতার আশীর্বাদ মনে করে লোলুপ-চিত্তে এগিয়ে এলেন। দাবার চালে তাঁদের হার হল। ভারতকে দ্বি-খণ্ডিত করে দুই খণ্ডের যে-স্বাধীনতা তাঁরা পেলেন তার হাল

আমরা উভয় দেশে গত তেইশ বছর ধরে দেখে আসছি। যেমন বীজ, তার তেমন ফসল। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যে-পথে স্বাধীনতা এসেছে তার অবদানও সেই গ্লানিকর পথ দিয়েই প্রসারিত হচ্ছে। স্বাধীনতা হাত পেতে উপঢৌকন নিতে গিয়ে আমাদের উভয় খণ্ডের লোভাতুর-নেতৃত্ব বুঝলেন না যে, 'ক্ষমতা' অক্ষমতার পথে আসে না। তাঁরা বোঝেননি তখন যে, মুক্তির দেবতা বাঁকা পথে, অসত্যের পথে পা বাড়ান না। না বুঝে যে-হঠকারিতা করা হল, তার ফলশ্রুতি 'দানবে'র আবির্ভাব—অমঙ্গলের ভ্রূকুটি। আত্মকলহ থামাতে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান সেদিন আলাদা হল, শুধুমাত্র বিদেশী-রাষ্ট্রকর্তাদের কারসাজি মেনে মেনে ভারত-পাকিস্তানের লড়াইকে দীর্ঘজীবী করার ফাঁদে পা দিয়ে। সংগ্রামী-ভারতকে 'বিট্রে' করে আপোষলোভী নেতৃত্ব ভাগ করে নিলেন রাষ্ট্রিক-ক্ষমতা, শুধুমাত্র মানসিক ও আর্থিক মুক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করার ষড়যন্ত্রের অজ্ঞান শরিক হয়ে। দুঃখের বিষয়, দেশকে বিভক্তিকরণের অপকর্মে সমর্থন জানিয়েছিলেন আরো একটি দল—নাম তার 'কম্যুনিস্ট্ পার্টি অব্ ইণ্ডিয়া'।

এ-প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্যিক মনোজ বসুর লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করব :

"সমুদ্রের ওপারে বহু দূর থেকে সুভাষচন্দ্র সাবধানবাণী পাঠাচ্ছেন ব্যাকুল কণ্ঠে : 'I have no doubt that if India is divided she will be ruined. I vehemently oppose the vive-section of our motherland. Our divine motherland shall not be cut up.'

[আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, ভারতকে বিভক্ত করলে তার ধ্বংস অনিবার্য। মাতৃভূমির বিভক্তিকরণের তীব্র বিরোধিতা আমি করি। আমাদের দিব্য জন্মভূমি যেন দ্বিখণ্ডিত না হয়।]

"সমুদ্রের এপারে অমনি পাল্টা বাণী রাজগোপালাচারির কণ্ঠে

শোনা গেল : 'Bengal and the Punjab are the two stumbling blocks to the Indian Independence.'
[বাঙলা এবং পাঞ্জাব ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পথে দু'টি বাধা স্বরূপ।]

"তার সঙ্গে সুর মিলে গেল কম্যুনিস্ট্‌দের। জেনারেল সেক্রেটারি যোশি গাইলেন রাজাজির দোহার : 'হ্যাঁ হ্যাঁ, স্বদেশ-খণ্ডন অবশ্যই !'

"জিন্না বোম্বাই শহরে বসে সাংবাদিকের কাছে দেমাক করলেন : 'অন্তত দুইজন হিন্দু উপলব্ধি করেছেন আমার মতবাদ। আমার দলে তারা'।" ('পথ কে রুখবে ?'—পৃ: ৩৫৬)

তৎকালীন 'কম্যুনিস্ট্‌ পার্টি'র কাছে অবশ্য সংগ্রামী-ভারত অন্য কিছু আশা করেননি। কারণ, 'কুইট ইণ্ডিয়া' আন্দোলনের প্রতি তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং 'নেতাজি'কে রুখবার আনন্দে ব্রিটিশ-পুলিশের সঙ্গে তাঁদের কদর্য সহযোগিতা ভারতবর্ষের মানুষ দুঃখে ও ঘৃণায় সেদিন মনে রেখেছিল। কিন্তু হাজার সংগ্রামের যোদ্ধা ভারতীয়-কংগ্রেস-নেতৃত্বের অধঃপতন জাতিকে বিস্মিত করল শুধু নয়, মৃত্যুর মুখেও ঠেলে দিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসে উল্লিখিত তথ্যাবলী অনস্বীকার্য।

আত্মগ্লানি আমাদের প্রচুর। এ-যুগের ২৬শে জানুয়ারি তাই আমাদের পক্ষে হওয়া উচিত আত্ম-বিচারের দিন, আত্মশুদ্ধ হয়ে নূতনতর প্রতিজ্ঞা গ্রহণের দিন।

এ দিনে আমরা উৎসব করব না। দিল্লীর রাজকীয়-উৎসব এবং উপাধি-বিতরণের আনন্দ দুঃখী-ভারতবাসীর উৎসব বা আনন্দ নয়। এই দিনে কঠিন সত্যকে আশ্রয় করে ফিরে তাকাব প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগের পানে। মনে মনে স্মরণ করব সেই যুগের স্বাধীনতা-দিবসের প্রতিজ্ঞা। যা পাইনি, তা পাবার জন্যে প্রতিজ্ঞা।

আমরা ·চেয়েছিলাম ভারতবর্ষের—গরীব ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। মানুষকে সে-স্বাধীনতা মুক্ত করবে মন-প্রাণ-অর্থ ও মর্যাদার দিক থেকে। আপন ঐতিহ্যে, সামর্থ্যে ও মানবিকতায় উন্নত সেই মানুষের দল তাদের মহান দেশকে পৃথিবীর দরবারে প্রতিষ্ঠিত করবে। ভারতবর্ষ হিমাদ্রিশিখরেরই মত গৌরবে তখন অভ্রংলিহ হয়ে থাকবে। এই যে চাওয়া—এর পশ্চাতে ছিল রক্তক্ষরা--সংগ্রাম। আত্মত্যাগ ও নিয়মানুবর্তিতায় অপূর্ব সে-সংগ্রাম শুরু হয় স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পঞ্চাশ বছর পূর্বে।

স্বাধীনতার সে-সংগ্রামের ছিল দুইটি ধারা।···এখানে মহাত্মা গান্ধীরই একটি উক্তি উদ্ধৃত করা হল: "We in India have never given non-violence the trial it deserves. The marvel is that we had attained so much even with our mixed violence". ('HARIJAN', 20. 4. 1940.)

[ভারতবর্ষে অহিংসার যথোপযুক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা কখনো করা হয়নি। তবে আশ্চর্য এই যে, আমরা এতাবৎ হিংসা-অহিংসার মিশ্রণেই অত কিছু লাভ করেছি।]

সশস্ত্র ও নিরস্ত্র বিপ্লবের দুইটি ধারা পাশাপাশি চলে এসেছিল। তারা চলে এসেছিল অভ্রান্ত গতিতে, কখনো পরস্পরের পরিপূরক হয়ে। 'কংগ্রেস' আবেদন-নিবেদনের বিতণ্ডা থেকে নিরস্ত্র 'আইন-অমান্য-আন্দোলন' পেরিয়ে, 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর 'বিপ্লবী-সংস্থা' দামোদর চাপেকারদের যে-বহ্নিজ্বালায় ক্ষুদিরাম থেকে উধম সিং পর্যন্ত শহিদকুলকে এক-একটি অগ্নিশিখায় রূপান্তরিত করেছিল, তারই স্পর্শে আগুন-রঙে রঙিন করে দিল বর্মার তট, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূমিপর্বত। যতীন্দ্রনাথ-রাসবিহারী-সূর্যসেনের সশস্ত্র-রাইজিং-এর দুর্জয় চেষ্টা থেকে রাইটার্স প্রাসাদ-অলিন্দ-যুদ্ধ ও 'ব্ল্যাক্ এণ্ড ট্যান্' নীতির জনক, বাঙলার লাট এণ্ডারসন্‌কে আক্রমণের পটভূমে যে দুর্জয় বিপ্লব-জিজ্ঞাসা বর্তমান ছিল, তারই সম্পূর্ণ রূপায়ণ

ঘটেছিল বিপ্লবীর রাজা নেতাজির নেতৃত্বে 'আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজে'র সশস্ত্র অভিযানে এবং 'আজাদ্ হিন্দ্ হুকমৎ-'এর বৈপ্লবিক সংগঠনে। দুঃখের বিষয় ভারতের 'আগস্ট-বিদ্রোহ' আর আজাদ্ হিন্দ্ বাহিনীর 'ইম্ফল-যুদ্ধ' Synchronise করল না! Synchronise করলে ভারতবর্ষের 'স্বাধীনতা' আসত বিপ্লবের পথে, রক্ত-ক্ষরিত সংগ্রামে শুচিশুদ্ধ হয়ে। ব্রিটিশের দান হয়ে সে আসত না বলেই তার ধার, তার রূপ, তার স্বাদ ও চরিত্র হত স্বতন্ত্র। সে-স্বাধীনতাই ১৮৯৭ সাল থেকে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ ব্যেপে সংগ্রামী-ভারত কামনা করে এসেছিল। সে-স্বাধীনতা এলে নেতাজির ভাষায় শতকরা ৯৯ জনের সর্বাত্মক স্বাধীনতা অখণ্ড-ভারতে এসে যেত। বিভক্ত-ভারতের দুইখণ্ডে বসে আমরা আজকের 'ফ্রাস্ট্রেশানে'র মার খেতাম না।...

*　　　*　　　*

তবু ২৬শে জানুয়ারি আমাদের কাছে পুণ্য-দিবস। এই দিনটিকে মেকানিকেল্-উৎসব ও অর্থহীন হল্লার দিন না করে আমাদের আত্ম-বিশ্লেষণের ও নবতর প্রতিজ্ঞা-গ্রহণের দিন করার প্রয়োজন হয়েছে। এ-দিনে যেন আমরা বলতে পারি যে—যা আমরা পেয়েছি তাকে বরণ করে নিয়েই যা আমরা পাইনি, পঞ্চাশ কোটি নর-নারীর যে-মুক্তি আজো আসেনি—তার জন্যে আমরা তৈয়ের হব সাধকের মত প্রতি মুহূর্তে। প্রাণশক্তির অভাব আমাদের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে নেই, ছাত্র-ছাত্রীদের 'মেটেল্' basically নিম্নমানের মোটেই নয়। সুতরাং তাদের গ্রহণ করতে হবে প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের শহিদ ও আত্মবিলয়নে-বীর্যবানদের কাছ থেকে দেশপ্রেমের ও 'মানুষ' হবার পাঠ। সেই পাঠ গ্রহণ করার সংকল্প নিয়ে তারা যথাপ্রয়োজন পথ গ্রহণ করলে দেশের দুর্দৈব একদিন কেটে যাবে। এবং দুর্দৈব-অপগত সেই দিনের 'ছাব্বিশে জানুয়ারি' সগৌরবে পালন কালে সকল ভারতবাসী বলতে পারবে : যা চেয়েছিলাম, তা পেয়েছি।...

ও বঙ্গের একুশে ফেব্রুয়ারি

"ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক।
একটি মিনার গড়েছি আমরা চারকোটি কারিগর—
বেহালার সুরে, রাঙা হৃদয়ের বর্ণলেখায়।"…
(আলাউদ্দিন আল্‌আজাদ—পূব-বাঙলা)

সাহিত্য ব্যতীত বিপ্লবের সৃষ্টি হয় না। বিপ্লব মুখরিত হয়ে ওঠে খাঁটি সাহিত্যের পটলিখায়। তার প্রমাণ দিয়ে গেছে পৃথিবীর ছোট-বড় সকল বিপ্লব। ধর্ম, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতিগত সকল বিপ্লব। বাঙলার বিপ্লবমুগ্ধ দিনগুলোর ব্যঞ্জনাও অপূর্ব সাহিত্য-সিঞ্চনে। বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব যুগ থেকে শুরু করে, স্বদেশীযুগ থেকে 'আজাদ্ হিন্দ্-পর্ব' তথা রাষ্ট্রবিপ্লবের অর্ধশতাব্দীব্যাপী যুগ অবধি বাঙলার বিপুল সাহিত্যে এ-সত্যই প্রকাশিত।

পূব-বাঙলা আজ বিপ্লবের অনুধ্যানে অগ্নিগর্ভ। তার প্রথম স্ফুরণ ঘটে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। পূব-বাঙলাকে পশ্চিম-পাকিস্তানের 'কলোনি' করে রাখতে নারাজ সে-বঙ্গের তরুণদল। তাঁদের মাতৃভাষা নির্মূল করে দেবার ষড়যন্ত্র তাঁরা প্রতিহত করতে উদ্যত। তাঁরা তনুমনের সাধনায় একটি সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন যে, তাঁরা বাঙালী। ধর্মে তাঁরা মুসলমান, কিন্তু জাতি হিসেবে তাঁরা নির্ভেজাল বাঙালী। বাঙালিত্ব হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, খ্রীষ্টান বা বৌদ্ধেরও নয়। বাঙালিত্ব প্রত্যেকটি বাঙালির। তা থাকুক সে পাহাড়ে-জঙ্গলে-গ্রামে বা শহরে। হোক সে আদিবাসী বা অধুনাতনবাসী। বঙ্গভূমি যার বাসভূমি, বঙ্গভাষা যার মায়ের ভাষা —সে-ই বাঙালী।…

একুশে ফেব্রুয়ারি যে-বিপ্লবের আবাহন, সে-বিপ্লব ক্রমে ব্যর্থ করে দিল লীগ-সরকারকে। এ সেই লীগ সরকার, যার নেতৃবৃন্দ দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন বাঙলাকে, হিন্দু-মুসলমান-বঙ্গবাসীর মধ্যে ধর্মের জিগির তুলে ভ্রাতৃবিরোধ এনে বইয়ে দিয়েছিলেন রক্তগঙ্গা।···আর নয়। এবার জেগেছে পূব-বাঙলার বাঙালী। তারা ছিনিয়ে আনবে স্বায়ত্তশাসন। মাতৃভাষা ও বঙ্গ-সংস্কৃতি লালন করে তারা লাভ করবে পুনর্জীবন।···

হাজারহাজার, লক্ষলক্ষ ছাত্র-তরুণ-চাষী-মজদুর ভাষা-সংরক্ষণের দাবিতে ১৪৪ ধারার শাসন ভেঙে সেদিন (২১শে ফেব্রুয়ারি) যে-শোভাযাত্রা পরিচালনা করেছিলেন—তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিল 'জালিম্' সরকার। বেয়নেটের খোঁচায়, রাইফেলের গুলিতে, লাঠির তাণ্ডবে শ্মশানের শান্তি ফিরিয়ে আনলেন লীগ-কর্তৃপক্ষ। কিন্তু শহিদের তরুণ-রক্তধারা রঙিন করে দিল শহর ঢাকা। সেই রক্তক্ষরণ থেকে, যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের চিতাবহ্নি থেকে যে-বিপ্লবশিখা অভ্রংলিহ হয়ে উঠল—তা ছড়িয়ে গেল সারা বাঙলার শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গ্রামান্তরে, অরণ্যে-পর্বতে, যত্রতত্র।

সূর্যসেন-প্রীতিলতা-নির্মলসেনের পূব-বাঙলা, নলিনীবাগ্‌চি-তারিণীমজুমদারের সোনার বাঙলা, বিনয়-বাদল-দীনেশের মধুময় বাঙলা দস্যুর পদভারে বুঝি হারিয়ে গিয়েছিল! কিন্তু শহিদের রক্ত যে ভূমিকে বড়ই উর্বর করে! অলক্ষ্যে হাসিল হতে থাকে তার কাজ। তাই আজ বাইশ বৎসর অন্তে, ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির শুক্রবার, পূব-বাঙলার উর্বর ভূমিতে, শহর ঢাকায় জন্ম নিলেন বরকত্, রফিক্, জাব্বার! তিনটি শহিদ—মহামুক্তির ত্রিধারা।

সূর্য অস্ত গেল। ঢাকার প্রত্যেকটি ধূলিকণা সে-অস্তরবির সবটুকু রঙ্ সেদিন পরম বেদনায় ধারণ করেছিল। কারণ, শহিদদের রক্তধারায় লেগেছিল ঐ রঙের পরশ!

যুদ্ধ থামল না। পরদিন ২২শে ফেব্রুয়ারি। শহরময় বেয়নেটের নিষেধ ১৪৪ ধারার প্রসাদে। ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে কারো। নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ-তরুণ-তরুণীর আবার মিছিল। এ-মিছিল মৌন। এ-মিছিল শহিদদের শেষকৃত্য সমাপিত করার আবেগে। সরকার লুকিয়ে ফেলেছে বীরত্রয়ীর মৃতদেহ। তাতে দমল না কেউ। কারণ, প্রত্যেক হৃদয়ে মূর্ত হয়ে আছেন যে ঐ মৃত্যুবিজয়ী তিনটি পুরুষ!

শহর ও গ্রামাঞ্চল থেকে বন্যার বেগে জনতা এসে জমা হচ্ছে। মিছিলের আয়তন বিপুল থেকে বিপুলতর হয়ে উঠছে। লক্ষলক্ষ নর-নারীর এই 'গায়বী জনাজা'—অর্থাৎ মৃতের শেষকৃত্যের জন্যে শোকযাত্রা। পুলিশ ছাড়বে কেন? উন্মত্ত নেকড়ের জিঘাংসায় তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল জনতার উপর। টিয়ারগ্যাস্, রাইফেল্, লাঠি। মহা বিক্রমে চলল 'নাজিম্-সব্যসাচী'র আয়ুধপ্রয়োগ—নিরস্ত্র, শোকার্ত, শিশু-মহিলা-পরিবৃত মৌন মিছিলের উপর। গগন দীর্ণ করে সহসা একটি বুলেট এসে ধরাশায়ী করল ল'ক্লাসের ছাত্র শফিকুর রহমান্‌কে। তরুণ-রক্তে ভাষা-দেবীর বেদিমূল ধৌত হল।...জনতা স্তম্ভিত। ছাত্রদল ক্ষিপ্ত। মত্ত আক্রোশে তাঁরা ইট-পাটকেল-পাথর ছুঁড়তে থাকলেন পুলিশের দিকে। ফলে, সুযোগ পেয়ে উন্মাদ পুলিশবাহিনী বর্বরতর হয়ে উঠল। তাদের প্রচণ্ডতর আক্রমণে জনতা ছত্রভঙ্গ হলেও তার বিরাট এক অংশ শহর পরিক্রমণ করে চলে এল, পূর্বদিনের যুদ্ধে যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন তাঁদের বেদি-প্রান্তে। ছাত্ররা রাতারাতি বিদেহী-সতীর্থস্মরণে মিনার তুলে গেছেন এখানে, পথের বুকে—শহিদশোণিতমাখা এই ভূমিতে। কিন্তু মূর্খ লীগ-শাসকদল লাথি মেরে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে সেই মিনার। কবির কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হলঃ "ইটের মিনার ভেঙেছে ভাঙুক।"...কবি-কণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি কোটি কোটি

ব্যথিত, ক্ষুব্ধ, প্রত্যয়সুন্দর মানুষের কণ্ঠেও বেজে ওঠেঃ "একটি মিনার গড়েছি আমরা চারকোটি কারিগর!"...পূব-বাঙলার চার কোটি মানুষ এই যুদ্ধের সামিল। তাই তাদের "রাঙা-হৃদয়ের বর্ণলেখায়" যে-মিনার বিরচিত, তাকে বিনষ্ট করবার শক্তি কোন সরকারেরই থাকল না।...

দু'তিনদিনের এই সংগ্রামে পুলিশের গুলিতে কত লোক মরেছিলেন, কত আহত হয়েছিলেন তার হিসেব আজও হয়নি। তবে মোটামুটি রিপোর্ট এই যে, হাজারের উপর ব্যক্তি কমবেশি যখম হয়েছিলেন। এবং পূব-বাঙলা সংগ্রাম-পরিষদের খতেন মত 'শহিদের-মৃত্যু' বরণ করেছিলেন অন্তত ৩৯ জন মানুষ।

সারা পূব-বাঙলা বিপ্লব-মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ। ভাষা-জননীর সন্তান কোটি কোটি বাঙালী গেয়ে ওঠে: "ও আমার সোনার বাঙলা, আমি তোমায় ভালবাসি।"

পূর্বেই বলা হয়েছে, বিপ্লব যথার্থই জাতির হৃদয়ের বস্তু কিনা তার পরিচয় লেখা থাকে জাতির সাহিত্যে। বিপ্লবের উদ্গাতা চারণ-কবিদের আবির্ভাব না ঘটলে বিপ্লব সার্থক হয় না। পূব-বাঙলায়ও তাই দেখি, কবি ও সাহিত্যিকরা এগিয়ে এলেন 'ঘুম-ভাঙানিয়া'র গান কণ্ঠে নিয়ে।

কবি বলেছেন :

"পলাশের আর
রামধনুকের গভীর চোখের তারায় তারায়
দীপ হয়ে ভাসে যাঁদের জীবন, যুগে যুগে সেই
শহিদের নাম
এঁকেছি প্রেমের ফেনিল শিলায়, তোমাদের নামে।"
(আলাউদ্দিন আল্‌আজাদ)

চারণ-কবির এই বাণী সারা পূব-বাঙলা কান পেতে শুনল, রক্ত-কণিকায় গ্রহণ করল। সকল মানুষ পৃথিবীর স্তব্ধতা বিচূর্ণ করে কবির সঙ্গে বলে উঠল :

"তাই আমাদের
হাজার মুঠির বজ্রশিখরে সূর্যের মত জ্বলে এক
শপথের ভাস্কর ॥"
(আলাউদ্দিন আল্‌আজাদ)

সত্যি প্রত্যেক বাঙালীর বুকে জ্বলতে থাকল এক ভয়ঙ্কর শপথ। সে শপথ হল : পূব-বাঙলা তার মায়ের ভাষায় কথা বলবে। রাষ্ট্রভাষা হতে হবে 'বাঙলা'। উর্দুর সঙ্গে বাঙলা। তৎসঙ্গে পশ্‌তু-সিন্ধি-পাঞ্জাবীও রাষ্ট্রভাষা হলে বাঙালী খুশি হবে। কিন্তু পূব-বাঙলা ভাষা বা সংস্কৃতির জগতে কারো তাঁবে থাকবে না। রাষ্ট্রজীবনেও তার স্বায়ত্তশাসন চাই। এখুনি চাই।

'শপথ-ভাস্কর' অপূর্ব প্রত্যয় এবং অবিচল শক্তির জ্যোতি ছড়িয়ে দিল। জনতার আন্দোলন রুখবে কে ?…"সাড়ে চার কোটি জনতার মহা গর্জনে ধসে গেল মুসলিম্ লীগ-সরকারের সাধের প্রাসাদের ভিৎ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তাদের চিহ্নটুকু পর্যন্ত রইল না। ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলিম্ লীগ পেল মাত্র ৯টি আসন। নুরুল আমিন (লীগপন্থী প্রবল প্রতাপান্বিত প্রধানমন্ত্রী) নিজের জিলায় নিজের এলাকায় একজন সাধারণ ছাত্রনেতার (খালেক নওয়াজ) কাছে শোচনীয়ভাবে হেরে যান।" ('বিক্ষুব্ধ পাকিস্তান,'—পৃঃ ৯৯)

সংগ্রামে পূব-বাঙলার বাঙালীর জয় হল। কিন্তু জয় হল আংশিক। বাঙলাভাষা রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হল উর্দুর পাশে। সরকারী দপ্তরে, স্কুল-কলেজে বা বেসরকারী আপিসে বাঙলাভাষা চালু হল। বাসে-ট্রেনে-ট্যাক্সিতে-মোটরে বা রাস্তাঘাটে বাঙলা হরফে নম্বর এবং দোকানপসারে ও গৃহে গৃহে বাঙলাভাষায় সাইন্-

বোর্ড ও নেম্‌প্লেট লাগান হল। তবু স্বায়ত্তশাসনের দাবি থাকল উপেক্ষিত।

এর পর এল আয়ুবশাহী। কঠিন হস্তে প্রসারিত হল পূব-বাঙলার বুকে নিপীড়ন। কিন্তু তাতে দমেননি ছাত্রদল, ভয় পাননি পূব-বাঙলার বাঙালী। নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ। রাজনীতিক দলগুলোকে বে-আইনী বলে জারি করা হয়েছে। অসংখ্য ছাত্র বন্দী। অমানুষিক জুলুম পথে-ঘাটে। সামরিক-শাসন অনাচারের জয়ধ্বজা তুলে ধরেছে। কিন্তু 'হাজার মুঠির বজ্রশিখরে সূর্যের মত জ্বলে শুধু এক শপথ ভাস্কর।' পূর্ব-পাকিস্তান জুড়ে তরুণ-রক্তে 'লেগেছে আজ সর্বনাশের নেশা'!···

আন্দোলন থামে না। বিক্ষোভ মেটে না। পথে-ঘাটে-মাঠে একটি মাত্র কথা—বাঙালী জেগেছে। ও-বঙ্গের চারণ-কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হল:

"বাঙালী, বাঙালী!
রক্ত দিয়ে রাজপথ তুই রাঙালি!"···

রক্তের বিনিময়ে বাঙালী সত্যি জেগেছে। 'পূব-বাঙলা' নাম নিয়ে বাঙালী জেগেছে। এ-ভূমিকে কোন বাঙালী 'পূর্ব-পাকিস্তান' বলে বঙ্গজননীর অপমান করবে না।

বাঙালী শপথ নিল: আমাদের অঙ্গীকার—আরো রক্ত ঢেলে মায়ের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করব।

আয়ুব জবরদস্ত্ চেঙ্গিজ্ খাঁ। চেঙ্গিজ্, জার্ বা হিট্‌লারকেও টপ্‌কে তাঁর নিষ্ঠুর শাসন-মিনারের চূড়া মাথা তুলে দাঁড়াবে। নইলে

দৈত্যরাজের তৃপ্তি কই ? অনেক মগজ খরচ করে একটি ষড়যন্ত্র-মামলা রুজু করলেন আয়ুব-সরকার। তার নাম—'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'। মামলা শুরু হল ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুন। মুজিবর রহমন্‌কে প্রধান আসামী করে আওয়ামী লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ এবং সমর-বিভাগীয় বহু অফিসারদের বিরুদ্ধে আনীতএই মামলা। এঁরা নাকি ভারতের সঙ্গে যোগসাজসে বহিরাগত অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে পশ্চিম-পাকিস্তানের শাসন বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্র করছেন! উদ্দেশ্য হল, পূব-বাঙলাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা।

বিচার হবে। ও তো লোক-দেখানো একটি প্রহসন মাত্র! তার ফলশ্রুতি—মুজিবর থেকে ছোটবড় সকল আসামীরই ঘটবে মৃত্যুলাভ, মিলিটারি কায়দায়।...

পূব-বাঙলার তরুণগোষ্ঠী তা হতে দেবেন কেন? জেগেছে তো সবাই! ছাত্রদলের ডাকে বেরিয়ে পড়েছে তরুণ-কিশোর-বালক, বেরিয়ে পড়েছে মজতুর-কৃষাণ-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত, বেরিয়ে পড়েছে শহর ও গ্রামের নর-নারী। ১৪৪ ধারা জারী হয়ে আছে পূর্ববঙ্গের প্রায় সর্বত্র। তাতে ভ্রূক্ষেপ কার? দেশ জুড়ে বিক্ষোভ, মিছিল, পুলিশের নির্মম তাণ্ডব, রক্ত-ঝরানো ইতিহাস।

১৯৬৮ সালের ২৪শে নভেম্বর। ঢাকা শহরের রাস্তাঘাট কাঁপিয়ে চলেছে বিপুল ছাত্র-মিছিল। জনতার একটি দাবী: 'বাঙলা হবে বাঙালীর'।...রক্ত-বন্যায় সে-মিছিল ভেসে গেল। চতুর্দিকে শুধু হাহাকার, ক্ষুব্ধ আক্রোশ।...

১৩ই ডিসেম্বর নারায়ণগঞ্জে 'আদমজি জুট মিলে'র অভিমুখে চলল বিরাট শ্রমিক-শোভাযাত্রা। তার ধ্বনি: 'আগরতলা-মামলা বাতিল হোক!' 'মুজিবরের মুক্তি চাই!' 'প্রত্যেক আসামীকে ফিরিয়ে আনব!' 'মণিসিংকে মুক্ত করব!'

সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্য ছেড়ে দেওয়া হল শ্রমিকদের উপর। কী জিঘাংসা! দানবের কী বীভৎস রূপ! কসাইয়ের নির্মমতায় তারা বেয়নেটের খোঁচায়, বুলেটের আঘাতে মৃতের স্তূপ গড়ে চলল। সেই স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে বীরদর্পে আয়ুব-সন্তানরা পলায়মান নিরস্ত্র জনতাকে টার্গেট্ করে-করে নিশানা ঠিক রাখল।

পূব-বাঙলা আগ্নেয়গিরি। অবিরাম নির্গত হচ্ছে গলিত লাভা 'শপথের ভাস্কর' থেকে। 'হাজার মুঠির বজ্রশিখরে' বিদ্রোহের অগ্নি-ধ্বজা। দিনের পর দিন সারা দেশের সর্বত্র ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে লক্ষলক্ষ কণ্ঠের ভাষা: 'গণতন্ত্র ও বঙ্গের স্বায়ত্তশাসন আমাদের রক্তের দাবী, জীবনের নিঃশ্বাস।'···চলছে মিছিলের পর মিছিল— প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ। ১৯৬৯ সালের ১৭ই জানুয়ারি থেকে নূতন উদ্যমে শুরু হয়েছে ছাত্র-শোভাযাত্রার হিড়িক। সারা পূব-বাঙলা ভেসে গেল জনতার মুখর দাবী-তরঙ্গে: 'মুজিবরের মুক্তি চাই!' 'আগরতলা-মামলা তুলে নাও!' 'আয়ুবশাহী মুর্দাবাদ!' 'গণতন্ত্র জিন্দাবাদ!' 'বাঙলা হল বাঙালীর!'···

সেদিন ২০শে জানুয়ারি। ১৯৬৯ সালেরই বিশে জানুয়ারি। সারা ঢাকা শহর বিদ্রোহ-বন্যায় প্লাবিত। দূর দূর গ্রাম এবং মফঃস্বল শহরগুলো থেকেও এসেছে কাতারে-কাতারে চাষী-মজদুর ও সাধারণ মানুষ। তাদের ঢেউ এসে জনসমুদ্রকে আরো উত্তাল, আরো বিপুল করে তুলছে। লক্ষলক্ষ ছাত্র-চাষী-মজদুরের সে-বিক্ষোভযাত্রা যেন সৃষ্টিসূচক মহাধ্বংসের সংকেত। সেদিনকার বিদ্রোহ-বার্তা কলকাতার 'কম্পাস'-সাপ্তাহিকে প্রকাশিত একটি লেখা থেকে নিম্নে কিছুটা তুলে দেওয়া হল:

"মানি না, মানি না—তোমাদের একশ' চুয়াল্লিশ ধারা মানি না!' এই শ্লোগান দিতে দিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন থেকে বেরিয়ে এল

বিরাট এক ছাত্র-মিছিল। হাতে তাদের হকি স্টিক্, কণ্ঠে শ্লোগান—'জাগো, জাগো'—তার পাদপূরণ-ধ্বনি, 'বাঙালী জাগো!'

"সত্যি সেদিন পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙালী জেগেছিল। জেগেছিল সূর্যসেনের বাঙালী। জেগেছিল বিনয় বসুর বাঙালী।

"ছাত্র-জনতার তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখে ক্ষিপ্ত পুলিশ। কাউকে সতর্ক না-করে সহসা ছুঁড়ল গুলি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুজ্জমান্ লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে, পুলিশের বুলেট খেয়ে।

"তারপর? তারপর শহর ঢাকায় তরুণ-রক্তে কী সে উত্তেজনা! হাজারেহাজারে বেরিয়ে এসেছে তারা, ছুটে এসেছে তারা অকুণ্ঠ দাবী নিয়েঃ 'ফিরিয়ে দাও, ফিরিয়ে দাও আসাদ্-এর মৃতদেহ।'... কিন্তু পুলিশ—আয়ুবের পুলিশ—অচঞ্চল।...ছাত্রজনতা ক্ষিপ্ত। পা থেকে জুতো খুলে প্রত্যেকে পুলিশের দিকে ছুঁড়ে মারে। এ শোক অশ্রুসিক্ত নয়—অগ্নিদীপ্ত।...সকলে অবাক—এই মিছিলের সক্রিয় শরিক দেখা যাচ্ছে বহু নারী!...

"এগিয়ে চলল নীরব শোকযাত্রা। পূর্ব-বাঙলার আত্মপ্রত্যয় সুপ্রতিষ্ঠিত। তার রক্তক্ষরা মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ঐ বিপুল জনতার পদভারে।

"ক্রমে মিছিলের আয়তন বিরাট থেকে বিরাটতর হয়ে গেল। যে যেখানে ছিল, ছুটে এসেছে ও আসছে। এত বড় বিক্ষোভ, এত বড় সমাবেশ বড় একটা ঘটে না। জনস্রোতের কণ্ঠ-ধ্বনিঃ 'রক্ত নিল কার?' উত্তর এল শতসহস্র কণ্ঠেঃ 'বাঙালীর!' 'বাঙালীর!'...

"সুশৃঙ্খল জনযাত্রার উপর পথে পথে উভয় পার্শ্বের গৃহশীর্ষ থেকে বর্ষিত হচ্ছে পুষ্পগুচ্ছ। লক্ষাধিক লোকের এই অভিযানে ছিল ছাত্র-ছাত্রী, সাধারণ মানুষ, শ্রমিকদল।...

"হঠাৎ থমকে দাঁড়াল মিছিল। সুরাবর্দির 'মস্তাৱে'র সম্মুখে চৌরাস্তার মোড়ে সামরিক-বাহিনী সহ পুলিশ রচনা করেছে বেরিকেড্। মাইক্-এ বারে বারে পুলিশ জানাচ্ছেঃ 'শহরে এক শ'

চুয়াল্লিশ জারি হয়েছে, কেউ এগুবেন না, ছত্রভঙ্গ হয়ে শান্তিতে আপনারা ঘরে ফিরে যান।'

"ছাত্রজনতা নিশ্চল। নিশ্চুপ হয়ে শুনছে সেই বজ্রনির্ঘোষ। পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে মিছিল। কারো কণ্ঠে শব্দ নেই। একটি কালো পতাকা হস্তে মিছিলের পুরোভাগে দণ্ডায়মান একটি ছাত্র।

"মিছিল এগুচ্ছে না। উত্তেজনা প্রশমিত। রণভঙ্গিতে দণ্ডায়মান উদ্যত-রাইফেল্‌ধারী সামরিক-বাহিনীর নির্দেশ মানা-না-মানার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হচ্ছে ছাত্র-নেতৃত্বের। কারণ, শান্ত চিত্তের বিচার কঠিন এবং দূরসন্ধানী। ছাত্রদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান লক্ষাধিক নির্বাক ও নিশ্চল জনতা। প্রত্যয়ের দীপশিখায় পথরেখা পাঠ করতে দেরি হচ্ছে। বিচলিত হয়ে পড়েছে ছাত্র-নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত-গ্রহণ-কালে। 'লঙ্‌ মার্চ্‌'-এর মধ্যস্থানে তার অবস্থা—ন যযৌ ন তস্থৌ! ··

"এমন সময় এগিয়ে আসছেন ধীরে, অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে একটি তরুণী। নাম তাঁর দীপা দত্ত। কাছে এসে কৃষ্ণপতাকাবাহী ছাত্রটির হাত থেকে আস্তে তুলে নিলেন দীপা পতাকাখানি। মূর্ত-অগ্নিশিখার মত কৃষ্ণধ্বজাধারিণী নারী নেতৃত্বদান করলেন। তাঁর পশ্চাতে ছাত্র-সমুদ্র। জনতা ও শ্রমিক-কিষাণ সমন্বিত লক্ষাধিক লোকের মিছিল সগর্বে এগিয়ে যেতে উৎসুক।···

"দীপা দত্ত অতি ধীরে পা ফেলছেন সম্মুখের দিকে কৃষ্ণপতাকা হস্তে। দুই গণ্ডে অশ্রুধারা সতীর্থের মহামরণে।···কিন্তু নয়নে বহ্নিজ্বালা, হৃদয়ে সংগ্রাম-প্রত্যয়।···

"মিছিল থেকে অবিরাম ধ্বনি উঠছেঃ 'দীপা দত্ত—জিন্দাবাদ'!···লক্ষ কণ্ঠের জয়ধ্বনির মধুর আবেশে এগিয়ে চলছেন দীপা দত্ত মন্থর ছন্দে।···ওদিকে পুলিশের রাইফেল্‌ উঁচিয়ে আছে। রেড্‌ সিগ্‌ন্যাল জ্বালিয়ে, সশস্ত্র-বাহিনী জানিয়ে দিয়েছে আশু বিপদ-বার্তা। বলছে সে রক্ত-সঙ্কেতঃ 'আর এগুবে না।' 'এক পা-ও না।'···কিন্তু দীপা থামতে পারেন না।···" ('কম্পাস'—১৯. ৩. ৬৯)

দীপা থামবেন কি করে ? তাঁর রক্তে যে ছোঁয়া দিয়েছে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের রক্ত, মাতঙ্গিনী হাজরার শোণিত ! মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়েই তাঁর আজকের পদযাত্রা !

পটভূমি প্যাল্টে দিলেন ঐ বিদ্রোহিনী। সাহস হল না আয়ুবশাহীর উন্মত্ত সান্ত্রীদেরও দীপা দত্তকে বাধা দেবার। হয়ত পুলিশের বুকও কেঁপে উঠেছিল নিঃশঙ্ক সে-নারীর মধ্যে তাদের জায়া-জননী-ভগ্নীর উপেক্ষা ও ঘৃণা বিমিশ্রিত তিরস্কার লক্ষ্য করে।···

পুলিশ ছেড়ে দিল পথ।···দীপার পশ্চাতে লক্ষ কণ্ঠে ধ্বনি তুলে এগিয়ে গিয়েছিল সমগ্র মিছিল। দীপা দত্ত সেদিন 'শক্তিরূপিণী' হয়ে ছাত্র-আন্দোলনকে শক্তি দান করলেন। পূব-বাঙলার বাঙালী জয়লাভ করল সেদিনকার খণ্ড-যুদ্ধে।···

১৮ই ফেব্রুয়ারি (১৯৬৯) রাজসাহী থেকে সংবাদ এল যে, ছাত্র-বিক্ষোভের প্রত্যুত্তরে রাজসাহী-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত প্রফেসর ডক্টর সামছুজ্জোহাকে বিনা কারণে গুলি করে মেরেছে আয়ুবের সেনা-বাহিনী। ছাত্র-বন্ধু, সংস্কৃতি ও বিদ্যার উপাসক, দেশপ্রেমী ডক্টর জোহা আর ইহজগতে নেই ! দৈত্যের গুলিতে বাণী-সাধকের অপমৃত্যু ! এ তো মৃত্যু নয়—এ যে শহিদ-বরণে দিব্য জীবন-লাভ ! ··

সারা বাঙলা ফেটে পড়ল এই দুঃসংবাদে। রাজধানী ঢাকা শহর ; —উত্তেজনায় উন্মাদ, শোকে প্রতিশোধপরায়ণ, প্রত্যয়ে অবিচল, শপথ-পালনে আপোষহীন ছাত্রদল বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। দূর দূর গ্রাম থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে যুক্ত হল ঢাকার পথে-ঘাটে জমতে-থাকা মানব-সাগরের সীমানায়। এ জন-তরঙ্গ রোধিবে কে ? মানব-কণ্ঠে ধ্বনি : 'বাঙলা-সিন্ধু-পাঞ্জাব-উত্তরপশ্চিম সীমান্তের দাবী

মানতে হবে!' 'এ সংগ্রাম সাড়ে ছয় কোটি বাঙালীর শুধু নয়—এ সংগ্রাম সাড়ে এগার কোটি পাকিস্তানবাসীরও!' 'এখুনি তুলে নাও আগরতলা-মামলা'! 'মুজিবরকে ছাড়ো'! 'জেলের তালা ভাঙব—মুজিবর, মণিসিং, মতিয়া চৌধুরিকে আনব'!···

তারপর সেদিন থেকে আবার শুরু হল রক্তের হোলি-উৎসব। পূব-বাঙলার শোণিতধারায় ভিজে গেল আয়ুবের বারুদ। বাঙলা, পেশোয়ার ও বেলুচিস্তানে বিপ্লবী-জনতাকে নিধন করে করে আয়ুবের বুলেট্ গেল খতম হয়ে। তাঁর শাণিত-কৃপাণে আর ধার রইল না।···

এল ২০শে ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালের পর এটা ১৯৬৯ সাল। খবর এল—আয়ুব-সরকার 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' বিনা সর্তে তুলে নিয়েছে; বন্দীরা সবাই মুক্তি পাচ্ছেন।···

হাজারহাজার নর-নারী শোভাযাত্রা করে নিয়ে এল জেল থেকে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমন্‌কে, শ্রমিক নেতা মণিসিংকে, শৌর্যশালিনী নেত্রী মতিয়া চৌধুরিকে। তারা নিয়ে এল বন্ধনমুক্ত অপর নেতা ও কর্মীদের পরম আগ্রহে।···

মুজিবর রহমন্। পূব-বাঙলার একচ্ছত্র নেতা—ছাত্র, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, মজদুর, কৃষক, যুবা-বৃদ্ধ নরনারী যাঁকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নাম দিয়েছেন "বঙ্গবন্ধু মুজিবর"। অনেকের মতে আজকের যুগে উভয় বঙ্গে জনদরদী এবং নিঃস্বার্থ সত্যিকারের দেশনেতা রূপে আবির্ভূত হয়েছেন একটি পুরুষ—তাঁর নাম মুজিবর রহমন্। দীর্ঘকাল কারাযন্ত্রণা ভোগ করে আজ তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন অগণিত দেশবাসীর কাছে। লক্ষাধিক লোক হৃদয় ভরে সাড়ে ছয় কোটি বাঙালীর মমতা বহন করে এনেছে এই সমাবেশে। নেতার উদ্দেশে তারা উজাড় করে দেবে সেই মমতা। মুজিবর আবেশবিহ্বল। যে

প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন তা তাঁকে মৃত্যু পর্যন্ত রক্ষা করতেই হবে। দৃপ্তকণ্ঠে তিনি ঘোষণা করলেন পুনর্বার: বাঙলা আমাদের দেশ। বঙ্গভাষা আমাদের মাতৃভাষা। বাঙালী আমাদের ভাই। গণতন্ত্র আমাদের প্রথম দাবী। বাঙলার স্বায়ত্তশাসন আমরা বিলম্বিত হতে দেব না। সিন্ধু-পেশোয়ার-আফগান-বেলুচ সবার স্বাধিকার লাভের সংগ্রামে আমাদের সমর্থন অকৃত্রিম।

বিপুল জনতার কণ্ঠে: 'জেলের তালা ভেঙেছি, মুজিবরকে এনেছি'!...'জেলের তালা ভাঙলাম, মণিসিংকে আনলাম'!...'জেলের তালা ভাঙা হল, বেগম মতিয়াকে আনা হল'!—'জাগো, জাগো বাঙালী! ছাত্র-শক্তি জিন্দাবাদ্!'...

আয়ুব-সূর্য ডুবে গেল। পাকিস্তানের গগনে ইয়াহিয়া-সূর্যের ঘটল নব আবির্ভাব। দেশবাসী নূতন করে মার্শাল্ ল'র কারাগারে বন্দী।

ইয়াহিয়া পূব-বাঙলাকে পদানত রাখার উদ্দেশে পাঠালেন জাহাজ-বোঝাই বেলুচ ও পাঞ্জাবী সৈন্য। তারা নামবে চট্টগ্রাম-বন্দরে। সংগ্রামী পূব-বাঙলা শপথ নিল—সৈন্যদের তারা নামতে দেবে না। বিপ্লবীর জীবনে বিদ্রোহ বড় কথা। সাফল্য আপাতদৃষ্টিতে ধরা না-পড়লেও ক্ষতি নেই।

সংকল্প কার্যে রূপ নিল। অসংখ্য নিরস্ত্র শ্রমিক ও ছাত্রদল ২১শে মার্চ (১৯৬৯) চট্টগ্রাম-বন্দরে মিছিল করে ঢুকল। তারা দেবে না একটি সৈন্যকেও জাহাজ থেকে নামতে। তারা দেবে না পাঞ্জাবকে বাঙলা শাসন করতে।

চলল প্রত্যুত্তরে গুলি-গোলা। চলল অকথ্য নির্যাতন। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল নিরস্ত্র-জনতার প্রতিরোধ। শুধু রক্তের স্রোত! শুধু মৃতের স্তূপ! শুধু ঘরে ঘরে হাহাকার!...

কিন্তু ব্যর্থ হবে না এই বিদ্রোহ। কারণ, আজও সারা পূব-বাঙলায় বিপ্লব-বহ্নি জ্বলছে। জ্বলছে তার আগুন বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। পাকিস্তানে গণ-স্বাধীনতা গণতন্ত্রের রথে চড়ে আবির্ভূত হবেই। 'একুশে ফেব্রুয়ারি'কে না ভুললে পূব-বাঙলা বিপ্লবের বহ্নি-স্নানে পূত হয়ে একদিন স্বাধিকার লাভ করবেই।...

পূব-বাঙলার প্রথম বিপ্লব-অভিব্যক্তি ঘটে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। প্রতি বছর ওই দিবসটি পালিত হয় বিপ্লবী পূব-বাঙলায়। 'হাজার মুঠির বজ্রশিখরে' প্রতি বছর 'জ্বলে ওঠে শপথের এক ভাস্কর'।...

প্রণাম, একুশে ফেব্রুয়ারি!...

এ-পারে বঙ্গভাষা

এ পারে বাঙালী কিন্তু পিছিয়ে থাকল। ভাষা-জননীর আরাধনা তেমন একাগ্রতায় সে করল না। বাঙলার আপিসে, আদালতে বা সরকারী-বেসরকারী দপ্তরে বঙ্গভাষার চলন আজও হল না। কারণ, বাঙালীর কোন মহল থেকেই এ-জন্যে কোন চাপ আসছে না। বসনেভূষণে এ-পারের তরুণ-বঙ্গ ক্রমশ না-বাঙালী হয়ে উঠছে। তারা 'প্যারোকিয়েল' নয়। তাদের দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। কাছের বস্তু নিয়ে থাকার মত ঘরকুণো তারা আর নেই। তাই কাছাড় যেদিন ভাষার মান রাখার জন্যে প্রতিজ্ঞা করেছিল—"জান দেব জবান দেব না"—সেদিন পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গে একটুও শিহরণ লাগেনি। সেই সংগ্রামে শহর শিলচরে, নিরস্ত্র এক অভিযানে, সশস্ত্র-পুলিশের বুলেটে প্রাণ দিয়েছিলেন এগারটি বাঙালী; আহত হয়েছিলেন বাঙালীর একান্নটি নারী-পুরুষ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীর তা মনে নেই। ১৯৬১ সালের ১৯শে মে।—মাত্র ন'টি বছর পূর্বের কথা। জীবন দান করেছিলেন সেদিন ভাষা-জননীর পাদমূলে কুমারী কমলা ভট্টাচার্য, হিতেশ বিশ্বাস, কুমুদ দাস, তরণী দেবনাথ, চণ্ডী

সূত্রধর, সুকমল পুরকায়স্থ, কানাই নিয়োগী, শচীন পাল, সুনীল সরকার, সত্যেন দেব ও বীরেন্দ্র সূত্রধর। কিন্তু তাঁদের ভুলে গেছে এ-বঙ্গের বাঙালী!

এ-ভুল স্বাভাবিক। কারণ, এ-খণ্ডের বঙ্গবাসী আজ বিভ্রান্ত। শতধাবিভক্ত-দেশনেতৃত্ব তাকে এক গোলকধাঁধার আবর্তে ঠেলে দিচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। জওহরলাল, মার্ক্স, লেনিন বা মাওসেতুং— কেউ তো 'বাঙলা ভাষা'কে মর্যাদাদানের কথা তাঁদের পুঁথিপত্রে কোন কালে বলে যাননি! কাজেই 'কংগ্রেস' থেকে 'নক্সাল' পর্যন্ত প্রায় কোন দলনেতা বা দলকর্মীরই তো বৈজ্ঞানিক-দায়িত্ব থাকল না বঙ্গভাষাকে নিয়ে মাতামাতি করার!

ফলশ্রুতি লক্ষণীয়। এ-পারের সাহিত্য এক অনুর্বর ভূমিতে ফলাচ্ছে নিস্তেজ ফসল, অথচ ও-পারের উর্বর জমিতে দুলছে কাব্য ও সাহিত্যের সবুজ ও সতেজ প্লাবন। এ-পারের মানুষ বাঙালিত্ব হারিয়ে হয়ে উঠেছে বর্ণহীন না-বাঙালী, আর ও-পারের মানুষ বাঙালিত্বের গৌরবে তুলেছে "হাজার মুঠির বজ্র-শিখর"—যেখানে "সূর্যের মত জ্বলছে এক শপথ-ভাস্কর"। সেই শপথ-সূর্যের সহস্র আলোকধারায় সেখানকার বাঙালী চিনেছে ভাষা-জননীকে। এখানকার বাঙালীকে অমন 'শপথ' শোনানর মত চারণ-কবি জন্মাচ্ছেন না। তাই এখানে এ-বঙ্গের বাঙালীকে অমন 'শপথ' গ্রহণ করানর মত নেতৃত্বও আবির্ভূত হচ্ছে না।

— • —

পরিশিষ্ট

চির উন্নত মম শির

(আল্লুরি সীতারাম রাজু)

[আল্লুরি সীতারাম রাজু চিরবিদ্রোহী। তিনি কোন বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও ১৯২৬ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে যে-বিদ্রোহ সৃষ্টি করে গেছেন ব্রিটিশ-রাজের বিরুদ্ধে, তা বিপ্লবের ইতিহাসে একটি অপরিহার্য অধ্যায়। অন্ধ্রপ্রদেশের বর্তমান রাজ্যপাল প্রদত্ত ইংরেজি ভাষায় লিখিত সীতারাম রাজুর সংক্ষিপ্ত জীবন-কাহিনী 'বিপ্লবীনিকেতন'-কর্মপরিষদের সৌজন্যে প্রাপ্ত হওয়াতে আমরা কৃতজ্ঞ। উক্ত ইংরেজি-রচনা অবলম্বনে নিম্নোক্ত রচনা লিখিত হয়েছে।]

ভাবীকালের ভারতবর্ষের কাছে আল্লুরি সীতারাম রাজু গল্পলোকের একটি বিস্ময়কর বীর হয়ে হয়ত থাকবেন। মহাশৌর্যবান এই সংগ্রামী-পুরুষ ছিলেন বিদ্রোহী-দেশপ্রেমী। ভারতীয় বৈপ্লবিক-যুগে তরুণ-রক্তে জাতীয়তাবোধ পুনরুজ্জীবিত করার ব্রতে তাঁর সাফল্য স্বীকার না করে উপায় নেই।

তাঁর জীবদ্দশায়ই তাঁর নাম বিদ্রোহী-দেশভক্ত, মহাবীর্যবান যোদ্ধা রূপে ঘরে ঘরে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কর্মকাহিনী সবার কণ্ঠে উচ্চারিত হত।

রাজুর জন্ম ১৮৯৭ সালের ৪ঠা জুলাই। গ্রামের নাম 'পাণ্ড্রেন্কি'। অন্ধ্র-প্রদেশের বিশাখাপত্তনম্ জিলায় অবস্থিত এই গ্রাম। পিতার নাম ভেঙ্কটরাম রাজু। কিন্তু শৈশবেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। কাকার কাছে তিনি বড় হন। কাকা রামকৃষ্ণ রাজু ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। ১৯২৫ সালে তিনি সরকারী কাজ থেকে অবসর নেন।

সীতারাম রাজুর পড়াশুনায় দিকে মোটেই মন ছিল না। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় তাঁর ইতিমধ্যে রীতিমত দখল হয়ে গেছে।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-গগন তখন উত্তপ্ত। ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যবাদ ধারণ করেছে চরম উগ্রমূর্তি। সংগ্রামীদের সম্মুখে দুটি পথ। অহিংসা বা হিংসার পথ। কোন্ পথে রুখতে হবে ব্রিটিশ-শক্তিকে? বহুর কাছেই এটা সমস্যা,

কিন্তু বিদ্রোহী রাজুর কোন সমস্যা নেই। মুক্তি-যুদ্ধে রক্তক্ষরা-পথে তাঁর অনায়াস যাত্রা শুরু হল। তিনটি বছর ধরে তিনি ইংরেজের দুঃস্বপ্ন হয়ে অন্ধ্রের বুকে বিচরণ করে গেলেন।

১৯২১ সাল। কৃষ্ণাদেবীপেট অঞ্চলে নীলকাম্বেশ্বর-মন্দিরে ধ্যানস্থ এক যুবক। কিন্তু তাঁর তপস্যা ভগবানকে পাবার জন্যে নয়। তাঁর তপস্যা ভগবানের কাছে জানার জন্যে যে, দেশমাতার পায়ের শেঁকল কি করে ভাঙবে!...হঠাৎ তিনি বাহুতে অসীম শক্তি, হৃদয়ে অপূর্ব বল অনুভব করলেন। তাঁর কল্পনায় জ্বলে উঠল একটি পথরেখা—যার আহ্বান উপেক্ষা করার উপায় নেই। সে-আহ্বান অভ্রান্ত। বলছে: ধ্বংস কর—আমূল ধ্বংস কর ব্রিটিশ-শক্তিকে।...দেশের সর্বত্র—বিশেষ করে 'এজেন্সি অঞ্চলে'—শ্বেতজাতির দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত দরিদ্র ভারতীয়দের অবস্থা দেখে-দেখে, শাসকদের প্রতিনিধি ও নায়েব-নাজির সিপাহীদের নির্লজ্জ বর্বরতা লক্ষ্য করে-করে রাজুর চোখে জল আসত প্রথমটায়। কিন্তু সে-জল কখন যে আগুন হয়ে উঠেছিল তা তিনিও বুঝি খেয়াল করেননি!...

রাজু বিদ্রোহ করলেন। তাঁর পদভারে গোদাবরী-জিলাগুলো কেঁপে উঠল।

রাজুর প্রধান কর্মসহায়ক ছিলেন গাম্ গৌতন্না ডোরা এবং গাম্ মল্লানা ডোরা। গৌতন্না ডোরা ইংরেজ-সৈন্যদের বিরুদ্ধে ভীষণ এক রক্তক্ষয়ী-যুদ্ধে বিদ্রোহীদলের নায়করূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সে যুদ্ধের কথাও গোদাবরীর তীরে তীরে আজ 'কাহিনী' হয়ে রয়েছে। কারণ, ঐ যুদ্ধেই প্রাণ দিয়েছিলেন বীর গৌতন্না। রাজুর দলে আরো যাঁরা নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্তত মোট্টাডম্ বীরা ডোরা, এণ্ডু পাডুলু ও আগ্‌গিরাজুর নাম উল্লেখ করতে হবে।

রাজু হঠাৎ একদিন বিদ্যুৎবেগে 'চিন্তাপল্লি' থানা আক্রমণ করে বসলেন। তাঁর দলে তিনশ' জোয়ান। থানা অবলীলাক্রমে দখল হল। প্রচুর বন্দুক ও গুলি হস্তগত করে বিদ্রোহী-বাহিনী সরে পড়ল। অতঃপর রাজু ঝাঁপিয়ে

পড়লেন একদিন 'কৃষ্ণাদেবীপেট পুলিশ-থানা'র উপরে। এবারও বিজয়ীর গৌরবে ফিরে এলেন তিনি তাঁর গোপন আস্তানায়। সারা অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে ইতিমধ্যে রাজুর দুঃসাহসী-কর্মের কথা ছড়িয়ে পড়ল।

রাজুর বিদ্রোহী-দল গড়ে উঠেছিল বিশাখাপত্তনম্-এজেন্সির পার্বত্য-অঞ্চলে, আদিবাসীদের মধ্যে বিশেষ করে। গেরিলা-যুদ্ধের অনুকরণে রাজুর যুদ্ধ বারে বারে ব্রিটিশ-বাহিনীকে বিপর্যস্ত করেছে, ব্রিটিশ-শাসনকে আতঙ্কিত করেছে। স্বাধীনতা-যুদ্ধের সৈনিক, বিদ্রোহের ধ্বজাবাহী, বিপ্লবের বন্ধু সীতারাম রাজু পরাধীনতাকে মেনে নেবার জন্যে জন্মাননি। ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁকে লড়ে যেতেই হবে।

১৯২২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর। বিশাখাপত্তনম্-এজেন্সির বিপ্লব-ইতিহাসের পাতায় আক্ষরিত অগ্নিক্ষরা দিন। স্থান—ওন্জেরি। দুঃসহ যুদ্ধ ঘটেছে ব্রিটিশ-বাহিনীর সঙ্গে রাজুর বাহিনীর। স্কট্ ও হেইটার নামক দু'জন শ্বেত লেফট্ন্যান্ট্কে প্রচণ্ড সেই যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। বিদেশী শাসক এ-পরাজয় মেনে নিতে পারেন না।

তাঁরা স্থির করলেন যে, এ বিদ্রোহ দমন করতেই হবে। তাঁরা বুঝেছেন যে, নইলে 'এজেন্সি'র আগুন সারা অন্ধ্রপ্রদেশকে প্রজ্জলিত করবে, ইংরেজের সুখনিদ্রা দূর হয়ে যাবে।

এজেন্সি-অঞ্চলটি অরণ্যপর্বতে-ঘেরা দুর্ভেদ্য স্থান। ওখান থেকে নেমে এসে গেরিলা-যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া সহজ, তাকে রোধ করা কঠিন। বছরের পর বছর তাই সীতারাম রাজু চালিয়ে যাচ্ছেন সংগ্রাম। ইংরেজ শুধুই মার খাচ্ছে।···গভর্ণমেণ্ট তাই মিঃ স্যাট্ নামক এক সমর-কুশলীকে পাঠালেন ঐ অঞ্চলে বিদ্রোহীদের দমন করার ব্যবস্থাকল্পে। তাঁর সঙ্গে গেলেন পুলিশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল্ মিঃ সোয়েন্। স্থানে স্থানে পোস্ট্আপিস, টেলিগ্রাফ আপিস ও বেতার আপিস বসান হল। খবরাখবরের ব্যবস্থা ঐ দুর্গম অঞ্চলে এভাবেই তো করতে হবে। নইলে বিদ্রোহীদের চলাচল সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কি করে সত্বর অবহিত হতে পারবেন?

আল্লুরি সীতারাম রাজু। অত্যন্ত সাদাসিধে ধরনের মানুষ। কোন আড়ম্বর নেই তাঁর প্রতিদিনকার জীবনে। কিন্তু বন্দী পুলিশ-অফিসারদের জন্যে ব্যয় করতেন তিনি অতিরিক্ত। তাঁদের একটুও কষ্ট দিতেন না শুধু নয়, অত্যধিক আরামই বরঞ্চ দিতেন। বন্দী অফিসারদের কেউ কেউ মনে করতেন—কঠিন ঐ মানুষটির হৃদয়ের বুঝি পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে; বুঝি শেষটায় তিনি অহিংস-পন্থার পথিক হয়ে যাবেন!…

রাজুকে ধরার জন্যে ফাঁদ পেতে রেখেছে পুলিশ। দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে রাজুকে ধরিয়ে দেবার মূল্য বাবদ। আর দোষী-নির্দোষ নির্বিশেষে পাইকারী হারে অসহায় আদিবাসী নরনারী ও শিশুবৃদ্ধের উপর ইংরেজ চালিয়ে যাচ্ছে নির্মম ও নৃশংস অত্যাচার।

সেদিন ৭ই মে, ১৯২৪ সাল। রাজু একটি পাহাড়ী স্রোতধারায় স্নান করছেন। এমন সময় সেনাবাহিনীর কানে এ-খবর কোন গুপ্তচরের মাধ্যমে পৌছয়। ফলে, রাজু বন্দী হন। কিন্তু বন্দীর কোন বিচার হল না! কোন প্রহসনেরও প্রয়োজন ছিল না তথাকথিত বীর সৈন্যচালকদের! 'গুডাল্' নামক এক ইংরেজ আল্লুরি সীতারাম রাজুকে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে তৎক্ষণাৎ গুলি করে মেরে মহা বিক্রমের পরিচয় দিল।

ব্রিটিশ বীরের জাত। কিন্তু ব্রিটিশের মধ্যে কাপুরুষেরও অন্ত নেই। এই কাপুরুষতাই তার সাম্রাজ্য হারানর মূলে।

রাজু ধরায় এসেছিলেন একটি উল্কার মত। নির্ভীক পদক্ষেপে চতুষ্পার্শ্বের মানুষকে তিনি ভয়মুক্ত করেছিলেন, চতুর্দিকের অন্ধকারে তিনি আলোর চমক দিয়েছিলেন। গোদাবরীর স্রোতধারা যতকাল অন্ধ্রের সমতলভূমির বুকে বয়ে যাবে, যতকাল ভারতবাসী স্বাধীনতাকে প্রেয় বলে মনে করবে—ততকাল সীতারাম রাজু সবার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।

১৯২৪ সালের ৭ই মে ইংরেজের ইতিহাসে একটি কালিমালিপ্ত জঘন্য দিন! ইংরেজদের কাপুরুষতা, নিম্নগামী নৃশংস বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় ঐ দিনে

ব্যক্ত হয়ে আছে। তারা আচম্বিতে রাজুকে বন্দী করে গাছে ঝুলিয়ে ঐ তারিখে হত্যা করেছে। অথচ কপট ব্রিটিশ-শাসকের কণ্ঠে 'ব্রিটিশ-জাস্টিস্' কথাটির উল্লেখে বিরতি নেই!

১৯২৪ সালের ৭ই মে ভারতবাসীর ইতিহাসে একটি সম্ভাবনাময় অপূর্ব গৌরবের দিন। বিদ্রোহীর 'চির উন্নত শির' দেখে 'হিমাদ্রি-শিখর' ঐ দিনে 'নতশির' হয়েছেন, দেশবাসী পরম শ্রদ্ধায় মহাশৌর্যবানকে ঐ দিনে প্রণাম করেছেন।

আল্লুরি সীতারাম রাজুর 'শহিদলোকে যাত্রা'র দিনটি তাই তাৎপর্যপূর্ণ। রাজুকে ভুলে যাবার উপায় নেই।*

---

* রাজ্যপালের ইংরেজি রিপোর্টটি অনেক বিলম্বে 'বিপ্লবী নিকেতন' কর্তৃপক্ষের হস্তগত হওয়ায় আমাদের প্রবন্ধ তৈয়ের করতে দেরি হয়েছে। লেখাটি সেই কারণে 'পরিশিষ্টে' দেওয়া হল।

রডা কোম্পানির অস্ত্র-হরণের তাৎপর্য

[প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতা হরিদাস দত্ত রডা-অস্ত্র-লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক। উক্ত ম্যাকশানে সরাসরি অংশগ্রহণ যাঁরা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র দত্ত মহাশয়ই বর্তমানে জীবিত আছেন। 'বি. ভি.'-র প্রচণ্ড বৈপ্লবিক-কর্মকাণ্ডে শেষ দিন পর্যন্ত হরিদাসবাবুর অবদান স্বাক্ষরিত। এই প্রবন্ধ 'ভস্টোরথে'র অগ্নিযুগ-সংখ্যায় (১৯৬৮) হরিদাসবাবু কর্তৃক লিখিত হয়েছিল।]

১৯১৪ সালের ২৬শে আগস্ট 'রডা কোম্পানি'র অস্ত্র দিনে-দুপুরে রাজপথ থেকে লুণ্ঠিত হয়।

'রডা-অস্ত্র-লুণ্ঠন' ঘটনাটি সম্পর্কে নানারূপ গল্প শোনা যায়। কোন্ গল্প ঠিক এবং কোন্‌টি বেঠিক তাহা সাধারণ পাঠকের বোঝা মুশকিল। পুলিশ-রিপোর্ট বা ষড়যন্ত্র-মামলার রিপোর্ট থেকে ঘটনার কিছু খবর পাওয়া যায়, আর বাকিটা পাওয়া যায় শোনা গল্প হতে। সরকারী রিপোর্টে সাল-তারিখ বা সরকারের জানা তথ্যাদি (তা ভুলও হতে পারে) পাওয়া যাবে, কিন্তু শোনা গল্প নানা মুখে নানারকম হতে বাধ্য। যাঁরা হাতে-নাতে এই কাজটি করেছিলেন, তাঁদের কেহ কোন কথা বহুকাল বলার সুযোগ পাননি বলেই এই বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্য দেশবাসী এতদিন জানেননি। রডা-ষড়যন্ত্রের কথা পুলিশ যা জানে, তা থেকে তারা যা জানতে পারেনি তার গুরুত্ব অধিক।

দেশ স্বাধীন হবার পর আমি অনেক সময় ভেবেছি যে, 'রডা' সম্পর্কে সঠিক সংবাদ দেশবাসীকে জানালে ভাল হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কার্যত আমরা কেউই কিছু করিনি। যাঁরা রডা-ম্যাকশানে বা তার ষড়যন্ত্র রচনায় সরাসরি যুক্ত ছিলেন তাঁরা একে একে দেহরক্ষা করলেন। একমাত্র আমি আজও বেঁচে আছি। তবে আমি খুবই আনন্দিত যে, হালে দু'খানি প্রামাণ্য গ্রন্থে রডা-ষড়যন্ত্র ও রডা-অস্ত্র-লুণ্ঠন সম্পর্কে একান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের যথাক্রমে পরিচয়: শ্রীযুত ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়ের 'সবার অলক্ষ্যে' (১ম ও ২য় পর্ব) এবং শ্রীমতী উমা মুখার্জির 'টু গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ রেভলিউশনারিস্'। ভূপেনবাবুর পাণ্ডুলিপি আমার প্রদত্ত তথ্যের উপর লিখিত, এবং উক্ত পাণ্ডুলিপি আমার অনুমোদিত। সুতরাং

রডা-অস্ত্র-লুণ্ঠনের গল্প আমি এখানে পুনরুল্লেখ করব না। আমি উক্ত অ্যাকশানের রাজনীতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করব।

সে-যুগের দুর্ধর্ষ পুলিশ-কর্তা টেগার্ট সাহেব তাঁর নোট-এ লিখেছিলেন: "আমাদের অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, হেম ঘোষের দল আত্মোন্নতি সমিতির ভগ্নাবশেষের সঙ্গে কলকাতায় মিলিত হয়েছে।"

(দ্রষ্টব্য: আই. বি. রেকর্ড এফ. এন., ১০৩০।১৯১৪)

তারপর লিখেছিলেন: "যে দলটি রডা-অস্ত্র অপহরণ ঘটনাটি সংঘটিত করেছিল, তারা ঢাকার হেম ঘোষের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল।"

(দ্রষ্টব্য: আই. বি. রেকর্ড ১০৩০।১৯১৪)

আরো আছে রিপোর্টে: "ডাকাতির (রডার অস্ত্র) ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে। এই সময় বিশ্বাসযোগ্য সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে, হেম ঘোষের দলের দু'জন নাম-করা সদস্য হরিদাস দত্ত এবং খগেন দাসকে কলকাতায় পাঠনো হয়েছে বিপ্লবীদলের পক্ষ থেকে গুপ্ত-হত্যা সংঘটিত করবার জন্যে।" (আই. বি. রেকর্ড, ১০৩০।১৯১৪)

এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ তাঁর বিপ্লবী গুপ্ত-সমিতি 'মুক্তিসঙ্ঘে'র (উত্তরকালের 'বি. ভি.') তরফ থেকে খগেন দাস (স্বর্গত) ও আমাকে তাঁর দলের কলকাতা-শাখায় কাজ করবার জন্য পাঠান। ঐ গুপ্ত-কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক ছিলেন শ্রীশচন্দ্র পাল (স্বর্গত)। আমরা শ্রীশদার কাছে হাজির হবার পর শুনলাম যে, 'যুগান্তর' ও 'আত্মোন্নতি সমিতি'র সঙ্গে একযোগে কাজ করার নির্দেশ নাকি হেমদা ঢাকা থেকে পাঠিয়েছেন। এবং সেই জন্যই শ্রীশদা স্বয়ং বিপিন গাঙ্গুলি মশাইয়ের 'আত্মোন্নতি' দলের সঙ্গে এবং তাঁরই নির্দেশে হরি ঘোষ (গুণেন ঘোষ) তাঁর সহকারীরূপে মুনসেফ অবিনাশ চক্রবর্তি মশাইয়ের মাধ্যমে যতীনদার (মুখার্জি) সঙ্গে সংযোগ-রক্ষা করছেন।

আমাদের কলকাতায় আসবার আগে বিপিনবাবুর 'আত্মোন্নতি দলে'র সঙ্গে শ্রীশদার মাধ্যমে 'মুক্তিসঙ্ঘে'র একত্রিত প্রথম বৈপ্লবিক-কাজ হল 'নন্দলাল ব্যানার্জি হত্যা'। ১৯০৮ সালের ৯ই নভেম্বর কলকাতা সার্পেণ্টাইন লেনে শ্রীশদা নিজে হাতে শহিদ প্রফুল্ল চাকিকে গ্রেপ্তারার্থে নিযুক্ত নন্দলাল ব্যানার্জিকে নিধন করেন। তাঁর কর্ম-সহায়ক ছিলেন 'আত্মোন্নতি'র রণেন গঙ্গোপাধ্যায়।

আমরা কলকাতা আসার পর ১৯১২ সালে জগদ্দল অঞ্চলে (২৪-পরগনা) আলেকজাণ্ডার জুট মিলের সাহেব-এঞ্জিনিয়ার ও'ব্রায়েনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হয়। শ্রীশদা এবং 'আত্মোন্নতি'র অনুকূলবাবু পরামর্শ করে খগেনবাবু ও আমাকে ও'ব্রায়েনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য জগদ্দলে পাঠান। খগেনবাবু ও আমি পুরো তিনটি মাস দিনের পর দিন সাধারণ কুলি সেজে ঐ চটকলে কুলির কাজ করেছি। কিন্তু এত করেও আসল কাজ হল না। ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেল। ও'ব্রায়েন্ রক্ষা পেলেন। আমি পলাতক হলাম এক সমুদ্রগামী জাহাজের স্টোর-কীপার হয়ে। খগেন দাসও শ্রীশদার নির্দেশমত দেশেই পলাতকের জীবন গ্রহণ করলেন। কিন্তু টেগার্ট সাহেবের উল্লিখিত রিপোর্ট থেকে আজ জানতে পারি যে, আমাদের কার্যকলাপ তৎকালে পুলিশ সত্যই জ্ঞাত হয়েছিল। আমরা অধিক অগ্রসর না হয়ে তখন তাই ভালই করেছিলাম।

তারপর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এসে গেল। ১৯১৪ সাল। মহানায়কদ্বয় যতীন মুখার্জি ও রাসবিহারী বসু সমগ্র বিপ্লবী দলগুলি নিয়ে সারা ভারতবর্ষে একটি সশস্ত্র-বিপ্লবের পরিকল্পনা করার আগে কিছু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য তৎপর হলেন। বিদেশে নির্বাসিত বিপ্লবী-নেতারা জার্মানির সঙ্গে যোগসাজসে ভারতের বিপ্লব সংঘটিত করতে ক্রমশ ব্যস্ত হলেন। ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত হলে জাহাজ-বোঝাই অস্ত্র আসতে পারে, প্রচুর অর্থও পাওয়া যেতে পারে—কিন্তু তার আগে নিজেদের তো কিছুটা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকা চাই! স্মাগ্‌ল্-করা রিভলবার-পিস্তলে প্রকৃত লড়াই চলে না।

সুতরাং নেতারা অস্ত্র-সংগ্রহের নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারে তৎপর। এমন সময় বিপিনবাবুদের তরুণ বন্ধু হাবু মিত্র একটি সংবাদ দিলেন যে, 'রডা কোম্পানি' ২৬শে আগস্ট (১৯১৪) তারিখে বহু অস্ত্রশস্ত্র কাস্টমস্-আপিস থেকে খালাস করে নিচ্ছে। তার মধ্যে থাকবে দালাই লামার অর্ডার মত ৫০টি মাউজার পিস্তল ও পঞ্চাশ হাজার রাউণ্ড কার্তুজ। রাস্তা থেকে গাড়ি-বোঝাই মাল কি করে আত্মসাৎ করা যায় সেটা নেতারা ভেবে দেখতে পারেন। হাবুভাই শুধু খবর দেওয়া নয়, তাঁকে যা করতে বলা হবে তিনি তাই করতে রাজি। হাবু ছিলেন 'আর. বি. রডা কোম্পানি'র একজন কেরানি (টালিক্লার্ক)। এই খবরটি পাবার পর যুগান্তর-আত্মোন্নতি-মুক্তিসঙ্ঘ, বরিশাল পার্টি ইত্যাদি সর্বদলের নেতাদের বৈঠক, এবং পরিশেষে শ্রীশ পালের নেতৃত্বে 'মুক্তিসঙ্ঘ' ও

'আত্মোন্নতি'র কর্মীদের দ্বারা দিনে-দুপুরে সংঘটিত ঐ য়্যাকশান্ ইত্যাদি আমি নতুন করে এখানে লিখব না। যাঁরা এ-বিষয়ে উৎসুক, তাঁরা 'সবার অলক্ষ্যে' গ্রন্থের (১ম পর্ব) 'রডা-ষড়যন্ত্র'-অধ্যায় পড়তে পারেন।

কার্য সমাধা হবার পর ব্রিটিশ সরকার যেমন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, বিপ্লবীরাও তেমনি আনন্দে ও আত্মপ্রত্যয়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। অতি যত্নে ও সঙ্গোপনে 'মাউজার' পিস্তলগুলি (উহা রাইফেলের মত ব্যবহার করা যেত) বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হল। এসময় কিন্তু কোন দলাদলি থাকল না—কে অনুশীলন, কে যুগান্তর, কে কোন্ ছোটবড় দলের লোক তা ভাববার কারো অবসর ছিল না। মহাযুদ্ধ সমাগত। সেই যুদ্ধের সৈনিক হবার পূর্বে অস্ত্রের প্রয়োজন। সেই অস্ত্র এসেছে। এখন ইণ্ডো-জর্মান ষড়যন্ত্র সফল হোক। আসুক জাহাজ-বোঝাই আগ্নেয়াস্ত্র, আসুক ভাণ্ডার-বোঝাই অর্থ।

আমাদের সেইদিনের ভাগ্যলিপি অবশ্য শুভ ছিল না। আরো দুঃখ সহ্য করতে হবে। আরো প্রস্তুতির প্রয়োজন। আরো রক্ত, আরো প্রাণবলি না দিলে প্রার্থিত স্বাধীনতা আসবে না। তাই 'ইণ্ডো-জর্মান-ষড়যন্ত্র' ফেঁসে গেল। তাই মহাবিপ্লবী রাসবিহারীকে আগামী দিনের প্রচণ্ডতর বিপ্লবের সম্ভাবনা সৃষ্টির প্রতিজ্ঞায় সুদূর জাপানে পলাতক হতে হল। তাই মহানায়ক যতীন্দ্রনাথকে বালেশ্বরের প্রাঙ্গণে চিত্তপ্রিয়প্রমুখ তরুণ-বন্ধুদের সহ ব্রিটিশের সঙ্গে মৃত্যুযুদ্ধ করে মৃত্যুঞ্জয়ীর আরক্ত-বাণী রচনা করতে হল। সেই অবিস্মরণীয় ঘটনায় যতীন্দ্রনাথদের শৌর্যশালী হবার সহায়তা করেছিল কিন্তু 'রডা কোম্পানি'র ঐ মাউজার পিস্তল ও কার্তুজগুলি।

১৯১৪ সাল থেকে অনুষ্ঠিত বিপ্লবীদের যুদ্ধকালীন যত ভয়াল য়্যাকশান্, তার মূলে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 'রডা'র অস্ত্রাগার থেকে লুণ্ঠিত 'মাউজার'-এর শক্তি। এবং এই কারণেই আমি বলব যে, 'রডা-য়্যাকশান্' শুধু দুঃসাহসী ও চমকপ্রদ নহে—এর পলিটিক্যাল্ গুরুত্ব প্রচুর।

উপসংহারে আমি এই য়্যাকশানের অন্যতম হোতা স্বর্গীয় হাবুভাইয়ের উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাই, এবং এর প্রখ্যাত নেতা স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র পালের উদ্দেশে আমার বিনম্র প্রণাম নিবেদন করি।

—হরিদাস দত্ত

(A LETTER)

(একটি পত্র)

[স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ১৯০৬ সালে সাক্ষাৎকার সম্পর্কে প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতা হেমচন্দ্র ঘোষের লিখিত পত্র। এই পত্র লিখিত হয় স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে, তাঁরই অনুরোধে, তাঁর লিখিত "Swami Vivekananda—Patriot-Prophet" নামক পুস্তকে সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যে]

Dear Dr. Dutta,

...While Swami Vivekananda set out on a tour in the eastern districts of India in 1901, we, the youngmen of Dacca, especially those of us of the Shyamakanta-Pareshnath's Gymnasium, hastened to listen to the Hero of the Age. Besides myself, were my Comrades-in-faith late Srish Paul, who at a later day, dealt death-penalty to Inspector Nandalal Banerjee for the arrest of the first martyr of Bengal, Shaheed Prafulla Chaki, (whose death was not an accident) in 1908, late Maulvi Alimuddin, popularly known as 'Master Shaheb' in swadeshi days, late Jogendra Datta, the elder brother of Sri Haridas Datta of the 'Rodda Arms Case' in 1914, and a few chosen others. We were there to seek the Seer's guidance and 'Ashirbad' (blessings) at Mohini Babu's Villa at Farashganj, Dacca, where Swamiji was staying at the time. We sought to know from him direct and in seclusion as to what he wanted us, Young Bengal, to do in reality for Humanity and Patriotism. We met the Great Master on 13th and 14th April of 1901.

Swamiji endearingly drew us near and patted us with his pet phrase: Ye, sons of immortal bliss ('Amritasya Putrah') !...The very touch and tone electrified us with enthusiasm and surrender. The veins in us quickened and our hearts throbbed. It was the majestic touch of Baptism. The cyclonic monk was speaking before us !

In the course of an intimate exchange of heart, rather communion, so to say, Swamiji emphasized on the fundamental unity of the universal aspects of all religions, "Expansion is life, contraction is death. And what is religion after all, if it is not realization of the divinity in man ?" He questioned, and asked us for the pursuit of a dynamic life dedicated to the cult of Humanism—'Manava Dharma', and the doctrine of synthesis 'Samannaya-Vad'—to build up a base of National character in Bengal for India and the world, nay, foremost for the sake of one's own enlightened self and neighbours. "It is all a question of head and heart. Our conscience dictates the gospel of duty. Virtue ever means close introspection, sincere enthusiasm and honest effort, masculinity that is valour, and self-help with a never-flagging zeal for a righteous cause. Virtue is its own reward. And this virtue is tenacity of purpose and moral stamina. That is real heroism—'Paurush' or 'Viratwa' of the effulgent and efflorescent youth"—he impressed on us.

He stressed on cadre-building for a noble cause. He was not happy with the ways of the Indian National Congress. "That is not the way to build up 'Patriotism' any where. Beggar's bowl has no place in a Banik's (merchant's) world of machine, mammon and merchandise. Everything has got to be controlled and directed by the invocation of human conscience that is Mahamaya's voice, the latent energy in man"—the Mahapurusha asserted. "First thing first", he went on, "and body-building and dare-devilry are the primary concerns before the buoyant young Bengal (Shariram Adyam) ! This urgency of physical fitness must take the top-most priority even to the reading of the Bhagavata Gita itself. And in the pursuit of dare-devilry—'Paurusha'—the spirit of chivalry that is 'Vir-niti', must be observed in siding always with the weak and rescuing them. Honour women-folk, as the physical embodiment of Mahamaya herself and the Mother-land itself in human form. Know ye not, 'Janani Janmabhumischa Swargadapi Gariyashi' (the Mother and the Mother-land—more glorious than Heaven) ?...I must ask all of you to take to organising social service—'Sanghabaddha

Sevabrata'—with devotion, side by side with study as the fulfilment of all education, for 'Jiva' is 'Siva', this idea of ideas which will rejuvenate the lowly and make them holy—the 'Daridra Narayanas', with throbbing pulsations of life and vigour, with infusion of confidence enough to build their own destiny."

Swamiji continued, "In the psyche of every nation, man and institution, there are the three fundamental qualities—the 'Sattva' (the enlightened state), the 'Rajas' (the dynamic state), the 'Tamas' (the dark inert state)—all intermingled to a degree or proportion, according to the stamp-on-mind out of one's 'Own Commission or Omission of discharging duties.' As you sow, so you reap, and Mahamaya helps those who help themselves", he roared.

"The 'Tamas' has enveloped the psyche in us, or else, how could it be possible for any foreigner to come and kick at sweet will the land and people, that is India, for centuries ?" —he questioned. "Oh, it is no longer the 'Punyabhumi' ! It is the land of downright 'Don't-touchism' and 'Jo-Hukums (subserviency to the master's will) ! It is 'Dasa-bhumi'—the land of the serfs and slaves ; of hewer of wood and drawers of water", he moaned.

Swamiji held hopes before us. He said, "India had a glorious past, India will have a Future certainly more majestic. Or else, God in Nature will lose all meaning. An extra dose of 'Rajas' only will serve as the elixir of life in India. So the pressing need of the moment is to pursue consciously the quality of 'Rajas', that is dynamism. The soul-stirring death-defying mantram 'Abhi' —fearlessness—will shake off age long vestiges of slave-mentality, superstition and inferiority complex. In order to match boldly in equal pace with other martially advanced nations of the world—ye, young Bengal, emulate the manly ways of Laxmi Bai, the Rani of Jhansi, whose gallantry the English commanders had to recognise. Imitate the virtues of other nations, cultivate their technical skill and qualities of life, and then, with a modern standard of morale and efficiency attained, pay them, the

foreign userpers, in their own coin. Be bold to unfasten the alien octopus-hold on the citadel of Oriental culture. But know it for certain, mere imitation will lead you nowhere. You will be swept away from the moorings of your real life!...I have come not to destroy but to fulfil. Imitation in toto is another form of slavery. What I mean is rational discrimination and assimilation of what is best in other cultures and climes. But let us not forget that Indian culture in its essence is the most sublime in the world. And as such India has a mission to preach and propagate all through the world."

Swamiji then exorted us with a passion divine to take up the work of service to the poor and the down-trodden, the suppressed and the oppressed, the repressed masses of men that are mere apology of a man. He said, "All backwardness must vanish. Don't-touchism is the sin of sins that has got to go. There are no more 'mlechhas' or sub-men in the world. They are 'Narayanas'. Their days are dawning."

The Great Master gave us a Four-fold programme of work : 'Going-in among the masses, eradication of Don't-touchism, opening of Gymnasium, and Library movement.'

The patriot-saint blessed me with a gentle look and said, "Man-making is my mission of life. Hemchandra, you try with your comrades to translate this mission of mine into action of reality. Read Bankimchandra and Bankimchandra —and emulate his 'Desha-Bhakti' and 'Santan-Dharma' (Volunteer movement). Your duty should be service to the Motherland. India should be freed politically first."

With reverence and awe we paid homage to the Hero. And the Seer smiled on us in benediction.

In the course of further talk, the prophet in Swamiji said, as if, in soliloquy : "Yes, the 'Sudras' of the world will rise. And that is the dictate of social Dynamics, that is 'Sivam'. It is as clear as day-light that the entire Orient will have a resurrection to build a new a human world. Lo ! the future greatness of China, and in the wake of it all the Asiatic nations."

With humble submission I asked, how he could visualize that. The Prophet roared in assertion : "Don't you see, I can see through the veil the shadow of coming events of the world. By God's grace it has descended on me, this insight of mine. Study and travel with close observation,—that is Sadhana. You take it from me, this rising of the Sudras will take place first in Russia, and then in China. India will rise next and will play a vital role in shaping the future of the world."

Swami Vivekananda appeared to us to be more a political prophet than a religious teacher. We begged leave of him. And we have ever remembered the words of the Great Master. Along with our hosts of friends and compatriots, we have tried in our humble ways to carry out his behest to build up a better Bengal in a happier India in a newer World to live in. With inspiration and blessing of Vivekananda we set out on our pilgrimage for the temple of 'Liberty' with heart within and God over head.

18.5.1954

Yours etc.,

7-B Nafar Kundu Lane,
Calcutta-26,

Hem Chandra Ghose

(Hemchandra Ghosh)

দ্বিতীয় পত্র

[বিপ্লবী-নিকেতনের ট্রাস্টি এবং উহার কার্যকরী-সভার সদস্য শ্রীভক্তকুমার ঘোষকে লিখিত প্রখ্যাত বিপ্লবী-নেতা হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পত্র]

পরমকল্যাণীয়,

স্নেহের ভক্ত, শুনলাম আগামী বৎসর ২৩শে জানুয়ারি তোমরা 'বিপ্লবী নিকেতন' থেকে দ্বিতীয় 'সুভেনির' প্রকাশ করছ। ভাল প্রস্তাব। ঐ দিন আদপে ভারতের 'বিপ্লব-দিবস'। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের অন্যতম হলেন সুভাষ। সেই সুভাষের জন্মদিন ঐ ২৩শে জানুয়ারি।

তুমি বৈপ্লবিক গুপ্ত-সমিতিতে ঠিক কোন্ সালে প্রবেশ করেছিলে আমার মনে নেই। ১৯২২ সালে কি? তবে মনে আছে, তুমি তখন স্কুলের ছাত্র। সবেমাত্র কৈশোরে পা দিয়েছ। প্রথম সাক্ষাতেই তোমাকে যেন বলেছিলাম : দেশকে আমরা 'মা' বলি কেন জান? মা'র চেয়ে পৃথিবীতে আর কাউকেই আমরা বেশি ভালবাসি না বলে। দেশকে মা'র মত ভালবাসলেই মা'র শত্রুর মত দেশের শত্রুকেও আমরা নির্মম হস্তে তাড়িয়ে দিতে পারব।...পরাধীন দেশের ছোটবড় প্রত্যেক সংগ্রামীই এ-সত্যে বিশ্বাসী। কিন্তু এ-সত্য নেতাজির মত নিখুঁত করে আর কেউ বুঝি উপলব্ধি করেননি! দেশমাতৃকার শৃঙ্খল-মোচনে এই মহাশক্তিধর পুরুষের সংগ্রাম তাই বিরামহীন, আপোষহীন, নিখুঁত, অনবদ্য।

বিপ্লবদেবতার সন্তান সুভাষচন্দ্র। জন্ম-জন্মান্তরের বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র। বিপ্লবীদের কর্মসাধনার ধারক ও বাহক সুভাষচন্দ্র।

ভারতীয় স্পিরিচুয়ালিজম্-এর প্রতীকরূপে দক্ষিণেশ্বরের পুরোহিত শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বিশ্বপালিনী কালীমূর্তির আরাধনায় বসতেন, তখন তাঁর মধ্যে আর মহাদেবীর মধ্যে কোন আবরণ থাকত না। 'মৃন্ময়ী' মুহূর্তে 'চিন্ময়ী' হয়ে উঠতেন। সামান্য পুরোহিতের অসামান্য সাধনার স্পর্শে পাষাণের কণ্ঠে ভাষা ফুটে উঠত।

ঠিক তেমনি ভারতীয় বিপ্লব-ঐতিহ্যের প্রতীক হয়ে নেতাজি যখন দেশজননীর পায়ের শৃঙ্খল মুক্ত করার শৌর্যমণ্ডিত-তপস্যায় দৃপ্ত, তখন দেশমাতা

ও দেশসন্তানের চেতনা একাকার হয়ে গেছে। দেশ তখন আর মাটি-পাথর নয়। সন্তানের সাধনাস্পর্শে জড়-দেশ ষড়ৈশ্বর্যশালিনী জননীরূপে তেত্রিশকোটি নর-নারীকে বুকে ধারণ করে আছেন।

নেতাজি বিপ্লব-দেবতার পূজারী। তিনি বিপ্লবের প্রতীক। তাঁর জন্মদিন বিপ্লব-সাধনার নবতর কলেবর ধারণ করার দিন। এ দিনটির মর্যাদা অনন্যসাধারণ। এইদিনে তোমাদের স্মভেনির বের করার কল্পনা 'বিপ্লবী নিকেতনে'র আদর্শ ও স্পিরিট-এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখেছে চমৎকার।

৩১শে আষাঢ়, ১৩৭৬
(১৬. ৭. ৬৯)
১০।১বি, রজনী ভট্টাচার্য লেন,
কলিকাতা-২৬

আশীর্বাদক
শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ

দ্রষ্টব্য : 'দ্বিতীয় পত্রটি বিপ্লবী-নিকেতন প্রকাশিত 'নেতাজি জয়ন্তী সংখ্যা' (১৯৭০) থেকে উদ্ধৃত।

মহাজাতি সদন কর্তৃক গৃহীত 'টেপ্-রেকর্ডস্'-এর অনুলিপি

হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলোচন

প্রশ্ন : বাঙলাদেশের দুর্ধর্ষ একটি বিপ্লবীদলের প্রতিষ্ঠাতা আপনি। কিভাবে আপনি বিপ্লবের পথে পা বাড়ালেন, কবে গুপ্ত-সমিতি পত্তন করলেন, এবং ঐ দলটির কিভাবে দুর্জয় পরিণতি লাভ হল সে সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন।

উত্তর : সেটা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ। স্কুলে পড়ি। ছোট বয়স থেকেই ইংরেজের প্রভুত্ব ভাল লাগত না। নীল-বিদ্রোহের কথা শুনতে, রাজপুত-মারাঠাদের কাহিনী পড়তে, বারভূঁইঞাদের কীর্তি জানতে, সিপাহী-বিদ্রোহের গল্প আলোচনা করতে উৎসাহ পেতাম। টিকেন্দ্রজিৎ ও জেনারেল থাঙ্গাল্‌কে ফাঁসি দেবার ঘটনা আমাকে বিচলিত করে। তারপর 'বুয়র যুদ্ধ'। ইংরেজের হার হয়। দুর্বলের ললাটে জয়তিলক দেখে আমি আশ্বস্ত হই। সেদিন ভেবেছি—দুর্বলও তাহলে শক্তিমান হতে পারে!...

১৯০৭ সালের ১৩ই এপ্রিল স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ঢাকায় আমার প্রথম দেখা। আমার সঙ্গে ছিলেন শ্রীশ পাল। স্বামীজির অনুমতি নিয়ে কতিপয় বন্ধুসহ দ্বিতীয় দিন আবার তাঁর কাছে যাই। জ্বলন্ত অগ্নিশিখার স্পর্শ পেলাম। অপূর্ব এক চৈতন্যলোকে নিয়ে গেল তাঁর বাণী। তিনি বলেছিলেন : "পরাধীন জাতির ধর্ম নেই। তোদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তিলাভ করে পরস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া।" সেদিনই আমি এবং আমার কতিপয় বন্ধু বিপ্লব-ধর্মে যথার্থ দীক্ষিত হয়েছিলাম।

ঋষি বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' বিপ্লব-সংস্থা গড়ার প্রেরণা দিল। শারীরচর্চায় আমরা মন দিলাম। ডনকুস্তি ও লাঠিখেলা আমার নেশা হয়ে দাঁড়াল। তারপর এল রুশো-জাপানী যুদ্ধের কাল। এ যুদ্ধে সাদা-রুশের হার হল। এশিয়ার জাতিগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। তার দোলা আমার রক্তেও লাগল। আমরা গুপ্ত-সমিতি গড়ায় মন দিলাম।

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর প্রখ্যাত পি. মিত্র সাহেবের সঙ্গে ঢাকায়ই আলাপ হল। ইতিমধ্যে যথারীতি শপথগ্রহণ করে আমরা যে গুপ্ত-সমিতি স্থাপন করলাম, তার নাম সংগোপনে রাখলাম 'মুক্তিসঙ্ঘ'। সভ্যদের মধ্যে শ্রীশ পাল, হরিদাস দত্ত, খগেন দাস পরবর্তী কালে ১৯১৪ সালে রডা-অস্ত্র-লুণ্ঠনে প্রচুর কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। শ্রীশ পাল স্বনামধন্য বিপ্লবী-নেতা। তিনি ১৯০৮ সালের ৯ই নভেম্বর কলকাতা সার্পেনটাইন্ লেনে পুলিশের নন্দলাল ব্যানার্জিকে হত্যা করেন। এই নন্দলালই প্রফুল্ল চাকিকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। আবার ১৯১৫ সালের ২৫শে আগস্ট স্পাই মুরারি মিত্রকে তার আগরপাড়ার গৃহে শ্রীশ পালই গুলির আঘাতে নিধন করেন। সে-যুগে—অর্থাৎ ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত—আমার বন্ধুরা কলকাতায় সমস্ত য়্যাকশান্ই আত্মোন্নতি-দলের সঙ্গে মিলেমিশে করেছিলেন। শ্রীশচন্দ্র ছিলেন কলকাতায় আমাদের দলের প্রতিনিধি। তিনি যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির সঙ্গেও আমার এবং আমাদের দলের প্রতিনিধি হয়ে যোগাযোগ রাখতেন।

১৯০৬ সালে আমি কলকাতা এসে ভবানী দত্ত লেনে এক বন্ধুর বাড়িতে উঠি। তখনই উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁর সঙ্গে গভীর আলোচনার ফলেই স্পষ্ট করে চলার পথ আমি খুঁজে পাই। তিনি আমাদের দলের নামকরণে তুষ্ট হলেন। বললেন, 'মুক্তিসঙ্ঘ' নামটি চমৎকার। তবে তা একনিষ্ঠ কর্মীদের কণ্ঠে গোপনে মন্ত্রের মত থাকবে—সে নামের প্রচার যেন না হয়। কাজেই আমাদের দলের নাম দলের অনেকেই জানত না, অপরে বা পুলিশে জানবে কি করে? গুপ্ত-সমিতির নাম প্রচারিত হলে তার পক্ষে গোপনে কাজ করা কঠিন।...

১৯০৬ সালেই কলকাতায় আমি শ্রীঅরবিন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র পাল, ডন্ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশ মুখার্জি প্রমুখ প্রতিভাধর নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হই। বিপ্লবের তত্ত্ব, দর্শন, ইতিহাস ও কর্মধারা সম্পর্কিত তাঁদের নানা চিন্তাধারার সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ঘটে।...১৯০৯ সালে আমার পরিচয় হয় মহানায়ক যতীন মুখার্জির সঙ্গে। অগ্রজের আশীর্বাদ আমি তাঁর কাছ থেকে পাই। অপর মহানায়ক রাসবিহারী বসুর সঙ্গে সে-সময়েই আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। একদিক থেকে আমার ভাগ্য প্রসন্ন। কারণ, বিপ্লবের যাঁরা জন্মদাতা, তাঁদের অধিকাংশেরই স্নেহে আমি ধন্য।...

'মুক্তিসঙ্ঘ' ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত 'আত্মোন্নতি-সমিতি'র সঙ্গে মিলেমিশে যেসব দুর্ধর্ষ কাজ করেছে তা মোটামুটি বললাম।

তারপর এল ব্যর্থতার যুগ। ইণ্ডো-জার্মান-ষড়যন্ত্র ভেঙে গেল। চতুর্দিকে ধর-পাকড়। এই ব্যর্থতার মধ্যেও দাদা যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে বালেশ্বরে এক অগ্নিকরা অধ্যায় লিখিত হল। বিপ্লবের ইতিহাসে সে-অধ্যায়ের অবদান অসমান্য।

১৯১৫ সালেই আমরা জেলে আবদ্ধ হই। আমাদের কেহ কেহ দেশান্তরিত হন। আমাদের বন্ধু প্রমথ চৌধুরি এবং আলিমুদ্দিন সাহেব (মাস্টারসাহেব) সংগোপনে পুলিশের নজর থেকে দলের 'নিউক্লিয়াসটিকে' বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন কৃষ্ণকান্ত অধিকারী। তাঁরা কেহই আজ জীবিত নেই। এই তিনটি সুদক্ষ সংগঠক ও আত্মনিবেদিত বিপ্লবী-নায়কের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অন্তহীন।

১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমি মুক্তিলাভ করি। ইতিমধ্যে বন্ধুরা সকলেই মুক্ত হয়েছেন। কিন্তু আমি কর্মধারার টেক্‌নিক বদলে দিলাম। পুলিশের ছাপ থাকলে Secret work হয় না। Secret work ব্যতীত 'বিপ্লব' করা সম্ভব নয়।

দলের নামী কর্মীরা তাই আপাতদৃষ্টিতে কাজ ছেড়ে দিলেন। প্রকাশ্যে তাঁরা পুরাদস্তুর গৃহী। অতি সংগোপনে তাঁরা নূতন গড়ে-ওঠা দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এইভাবে ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২০ সাল, এবং ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের প্রথমার্ধ—দীর্ঘ এই তের বছর চলেছিল 'মুক্তিসঙ্ঘে'র প্রস্তুতি-পর্ব।

তৎপর ১৯৩০ সালের শুরু থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত যেসব অ্যাকশানের কথা সবার কণ্ঠে আজ আলোচিত, তার বেশ কিছু এই 'মুক্তিসঙ্ঘ' অর্থাৎ 'বি.ভি.'র-ই কার্যকলাপ। 'মুক্তিসঙ্ঘ' নাম কেউ জানে না—পুলিশের খাতায় উহার নামকরণ ইতিমধ্যে 'বি.ভি.' হয়ে গেছে। ১৯০৫ সালের 'মুক্তিসঙ্ঘ'ই উত্তরকালের 'বি.ভি.' অর্থাৎ 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'। মেজর সত্য গুপ্ত, জ্যোতিষ জোয়ারদার প্রমুখের অনলস চেষ্টায় আমাদের কর্মীরা সুভাষচন্দ্রের 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স মুভমেন্ট'কে আন্দোলনের পর্যায় থেকে বৈপ্লবিক-সত্তায় কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় করাতেই কালক্রমে পুলিশের তালিকায় ঐ দলের ব্যক্ত নাম হয়েছিল

'বি.ভি'। অজানিত 'মুক্তিসঙ্ঘে'র সর্বজন জানিত নাম 'বি.ভি.'। সারা বাঙলায় ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তার বৈপ্লবিক রোল্ আপনাদের অজানা নয়।…

প্রশ্ন : আচ্ছা, কত বীরের জন্ম দিয়েছেন আপনারা, কত ত্যাগ ও দুঃখবরণ করেছেন সবাই স্বাধীনতা আনতে! কিন্তু আজ দেশের এ দুর্দশা কেন?

উত্তর : এর উত্তর সংক্ষেপে দেওয়া যায় না। তবে একটি কথায় বলতে হলে বলব যে, এর মূলে দেশবিভাগের অমার্জনীয় মনোবৃত্তি। যে লোভ ও দুর্বলতা থেকে নেতারা দেশকে ১৯৪৭ সালে বিভক্ত করে শাসনভার গ্রহণ করলেন—সেই লোভ ও দুর্বলতার পাঁকে তাঁরাও ডুবলেন, দেশও ডুবল এবং আমরা যারা সফল প্রতিবাদ করতে পারলাম না, তারাও ডুবলাম। ধৈর্য ধরে, সংগ্রামী মন নিয়ে কিছুদিন অপেক্ষা করলে ব্রিটিশকে বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়তে হত—দান-খয়রাত রূপে তাদের হাত থেকে বিভক্ত-ভারতবর্ষের শাসনভার আমাদের হাতে আসত না। কিন্তু বাঞ্ছিত সে-বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলেন তৎকালীন 'কংগ্রেস' ও 'মুসলীম-লীগ' নেতৃত্ব।

দুর্বলতা ও লোভের সঙ্গে আপোষ হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় কংগ্রেসের কর্ণধারগণ সে-সত্য কোনদিনই গ্রাহ্য করেননি। বৃহত্তম নেতাদের মধ্যে যিনি প্রথম থেকেই এমন আপোষের মনোবৃত্তি সহ্য করতে পারেননি, তিনি দেশ-ত্যাগী হলেন। দেশত্যাগী হলেন বলেই আপন সৌরমণ্ডল রচনা করে তিনি 'নেতাজি'র দিব্য দীপ্তি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে পারলেন। তাঁর দেওয়া আলোকই হল বিপ্লব-বহ্নি; সে আলোকে দীপ্ত না হতে পারলে, তাঁর চরিত্রে চরিত্রবান না হতে জানলে এ জাতির ভবিষ্যৎ নেই। যথার্থ বিপ্লব-জিজ্ঞাসার বহ্নিকে না ছুঁতে পারলে দেশের তরুণ-তরুণীদের পক্ষেও কল্যাণকর কিছু করার সুযোগ আসবে না। কিন্তু আজকের অশুভ পরিস্থিতিতেও আমি আশাবাদী। আমি বিশ্বাস করি সকল গ্লানি দূর করে, সকল ক্লৈব্য ও সংশয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এই জাতি ও তার তারুণ্য-শক্তি সেই গন্তব্যস্থানেই একদিন পৌঁছাবে—যেখানে পৌঁছবার স্বপ্ন আমরা ১৯০১ সাল থেকে অদ্যাবধি দেখে আসছি।

॥ জয়হিন্দ ॥

দ্রষ্টব্য : প্রবীণ বিপ্লবী-নেতা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে মহাজাতি সদনের স্মৃতি-পরিষদের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারের বিবরণ। সাক্ষাৎকার ঘণ্টা এবং কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা হয় ১৯৬৯ সালের ১৪ই জুন, সকাল ৮ ঘটিকায়।

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার গুহের সঙ্গে আলোচনা

প্রশ্ন :—আপনি তো 'বি.ভি.' গুপ্ত-সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম? আপনার বিশিষ্ট পরিচয় নামী এবং দুর্জয় বিপ্লবী-পলাতকদের আশ্রয়-দানের ইতিহাসে। আমাদের সে-সব গোপন কথা কিছু বলবেন কি?

উত্তর : আমি শুরুতেই অর্থাৎ ১৯০৫ সালে আমাদের দলের সর্বাধিনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সংস্পর্শে আসি ঢাকা শহরে, পরেশনাথ ঘোষের কুস্তির আখড়ায়। আমার বাড়ি কুমিল্লার চাঁদপুর মহকুমায়। আমাদের দলের গোপন নাম ছিল মুক্তিসঙ্ঘ। পরে পুলিশ এর নাম দিল 'বি.ভি.'।

আমি চিরকালই দলের Secret wing-এ কাজ করতাম। ১৯৩০ সালের ২৯শে আগস্ট বিনয় বসু লোম্যান হত্যা করে পলাতক হয়ে আমার কলকাতার বাসায় এলেন। তাঁকে লুকিয়ে রাখলাম। আমি তখন মেটিয়াবুরুজ অঞ্চলে থাকি। আমি I. G. N. R. কম্পানিতে চাকুরি করতাম।

রসময় শূর বিনয়কে আমার কাছে দিয়ে গেলেন। আমার ছোট্ট বাসা। একখানা ঘর আমার স্ত্রী সরযূবালা দেবী আটকে রেখেছেন সদ্যোজাত তাঁর শিশুকে নিয়ে; বিনয় আসতেই তথাকথিত জাতক-ঔসচের সংস্কার ত্যাগ করে তিনি স্নান সেরে আমাদের শোবার ঘরে উঠে এলেন। বিনয়ের স্থান হল তাঁর বৌদির পরিত্যক্ত, কিন্তু নিখুঁতভাবে ধোয়ামোছা ঘরখানিতে। রাজার দুলাল আমাদের ঘরে এলেন—আমি ও আমার স্ত্রী তাঁকে পেয়ে যেন কৃতার্থ হলাম।

পুরো তিন মাস বিনয় ছিলেন আমাদের কাছে। আমাদের জীবনে সে এক অবিস্মরণীয় কাল। আমার স্ত্রীর হারাই-হারাই ভাব। বিনয়কে নিয়ে তিনি মেতে উঠলেন।

বিনয়কে অতি কাছে তিন মাস ধরে প্রতিমুহূর্তে আমি পেয়েছি। অমন একটি মানুষ আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি। এ যে তরুণ-কিশোর, দেবতার পূর্ণ অংশে রূপ ধারণ করে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন দুষ্কৃত দমনের দৈবশক্তি নিয়ে। মুখে অনর্থক কথা নেই, ওষ্ঠে সবক্ষণের জন্য স্মিতহাসি। কোন চিন্তা নেই তাঁর। সর্ব প্রাণ ও মন নিবেদিত আদর্শের পায়ে, দেশমাতৃকার বন্ধনমুক্তির

স্বপ্নে, এবং পার্টির নির্দেশ সম্পূর্ণ করার দায়িত্বে।...আমার ছেলেমেয়েগুলো বিনয়ের একান্ত অনুগত হয়ে গেল। তারা প্রত্যেকে বিনয়ের মধ্যে সমবয়সী এক বন্ধুকে আবিষ্কার করেছিল।

রসময় একদিন এসে বিনয়কে জানালেন যে, দেশের বড় বড় নেতাদের অভিমত—বিশেষ করে সুভাষচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র বসু ও পি. সি. রায়ের একান্ত ইচ্ছা যে—বিনয়কে বিদেশে স্মাগল্ করে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। হরিদাস (প্রখ্যাত বিপ্লবী হরিদাস দত্ত) তার ব্যবস্থাও করে ফেলেছেন। বিনয়ের কি মত?

বিনয় গম্ভীর হয়ে গেলেন। মুহূর্তে আবার ফুটে উঠল ওষ্ঠের সেই হাসিটুকু। আস্তে বললেন: 'আমি দ্বিতীয় ম্যাকশানেও যাব।'...ঐ ছোট্ট একটি বাক্য।...

রসময় গভীরকণ্ঠে উত্তর দিলেন: 'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তুমি পথ কেটে-কেটে চল—আমরা সেই পথে পা বাড়াব।'...

এক মিনিটে সিদ্ধান্ত প্রকাশিত ও গৃহীত হল।...

তারপর এল 'রাইটার্স-দুর্গ' রেইড্ করার অবিস্মরণীয় দিন। তারিখ—৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩০ সাল।

রাজার দুলাল চলে গেলেন আমার দীন কুটির ছেড়ে। যিনি অনায়াসে এসেছিলেন, তিনি অনায়াসে চলে গেলেন। একবার ফিরেও তাকালেন না আমাদের পানে। তাঁর বৌদি—অর্থাৎ আমার স্ত্রী সরযূ দেবীকে সামলান মুস্কিল হয়ে উঠল। তাঁর সে কি অব্যক্ত বেদনায় অঝোর কান্না!...এ তো বিরাগী সন্তানের ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া নয়! এ যে প্রিয়তম সন্তানের মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে অব্যর্থ যাত্রা!...

* * * *

এর পর ১৯৩১ সালে আমার গৃহে এসেছিলেন পেডি-সাহেবকে হত্যা করে পলাতকের বেশে মেদিনীপুর থেকে বিমল দাশগুপ্ত। তাঁকে নিয়েও ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। তিনিও বিনয়কৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত। দ্বিতীয় ম্যাকশানে যাবার জন্যে বদ্ধপরিকর। গেলেন চলে তরুণ বীর ১৯৩১ সালের ২৯শে অক্টোবর ভয়ডরহীন বিপ্লবীর পদক্ষেপে গিলিণ্ডার্স হাউসের দ্বিতলে ভিলিয়ার্স-হত্যার কঠিন ব্রত নিয়ে।...

* * * *

তারপর এল ১৯৩৪ সাল। ইতিপূর্বে 'দেওভোগ শুটিং-'এর পলাতক কর্মী সুকুমার ঘোষ (লাণ্টু ঘোষ) আমার গৃহে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু 'গভর্ণর এণ্ডারসন্ শুটিং'-এর পর কি করে যেন পুলিশ খোঁজ পেল যে, সুকুমার আছেন আমার গৃহে। ঘিরে ফেলল পুলিশ আমার গৃহ। বন্দী হলেন সুকুমার। বন্দী করল আমাকে ও আমার বড় পুত্র গিরীনকে।

মামলা চলল। আমাকে ও গিরীনকে বহু চেষ্টা করেও পুলিশ ফাঁসাতে পারল না। 'দার্জিলিঙ্ গভর্ণর শুটিং' মামলায় ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসির হুকুম হল।

আমি বাড়ি ফিরে এলাম। আমার চাকুরি গেল। পুলিশের অযথা নির্যাতন আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। দুঃখের দিন আমার শুরু হল। কিন্তু তাতে আমার বা আমার স্ত্রীর মানসিক ক্ষতি বিন্দুমাত্র হয়নি।

আমার গৃহ-মন্দিরে বাঙলার শহিদদের পূজা হয় নিত্য দুই বেলা। আমার গৃহ-সংলগ্ন 'বিনয়-বাদল-দীনেশ-স্মৃতিস্তম্ভে' নিত্য আমি ও আমার স্ত্রী পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে ধন্য হই। এঁরাই আমার বেদ-বেদান্ত, গীতা-উপনিষদ। এঁরাই আমার ৮৬ বৎসর বয়সের ধর্মকর্ম।...

দ্রষ্টব্য :—'বি.ভি.' তথা 'মুক্তিসঙ্ঘে'র প্রতিষ্ঠাতা-সভ্যদের অন্যতম শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার গুহের সঙ্গে মহাজাতি সদনের অছি-পরিষদের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারের বিবরণ। সাক্ষাৎকার ঘটে এবং কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা হয় ১৯৬৯ সালের ১৮ই জুন, বেলা দুই ঘটিকায়।

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ বর্ধনের সঙ্গে আলোচনা

প্রশ্ন :—রডা-অস্ত্র-লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক শ্রীশচন্দ্র মিত্র ওরফে হাবু মিত্র তো য়্যাকশানের পরই আপনার কাছে পলাতক ছিলেন। আপনার কাছে তিনি কিভাবে কোন্ সূত্রে এসেছিলেন, এবং তাঁর শেষ পরিণতি কি হল আমাদের বলবেন কি ?

উত্তর : আমি প্রখ্যাত বিপ্লবী-নায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের 'মুক্তি-সঙ্ঘের' সভ্য ছিলাম প্রথম থেকেই। 'মুক্তিসঙ্ঘ'ই উত্তরকালের প্রসিদ্ধ 'বি.ভি.'।...রংপুর নাগেশ্বরী থানায় আমার কর্মকেন্দ্র ছিল। চিকিৎসক হিসেবে আমি থাকতাম নাগেশ্বরী নামক পল্লীতে। রডা-য়্যাকশানের অল্প পূর্বেই ঢাকা থেকে নেতা হেমচন্দ্র আমাকে জানিয়ে রেখেছিলেন যে, প্রয়োজনে আমাকে শেল্টার দিতে হবে, আমি যেন প্রস্তুত থাকি।

ঘটনা ঘটল কলকাতায় ১৯১৪ সালের ২৬শে আগস্ট। সেদিনই শ্রীশদা অর্থাৎ, শ্রীশচন্দ্র পাল দার্জিলিঙ্-মেলে রওনা হয়েছিলেন হাবু মিত্রকে নিয়ে আমার উদ্দেশে। পরদিন নাগেশ্বরী পৌঁছে আমার কাছে হাবু মিত্রকে রেখে শ্রীশদা পরের গাড়িতেই কলকাতা ফিরে গেলেন।

হাবুভাই বরাবর আমার জানাশোনা শেল্টারেই ছিলেন। কয়েকদিন নাগেশ্বরীতে থাকার পর তাঁকে আসামে আমারই বন্ধুদের কাছে পাঠাতে হয়। কারণ, আমার গৃহ কলকাতা থেকে আই-বি পুলিশ এসে সার্চ্ করবে বলে থানার লোকেরা গোপনে আমাকে পূর্বাহ্নে জানিয়ে দিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি হাবুকে হরিদাস দত্তের ছোট ভাই-এর সঙ্গে আসামে পাঠিয়ে দেই। পরদিন সত্যই কলকাতার আই-বি ইন্সপেক্টররা এসে থানার পুলিশ-সহ আমার গৃহ তচ্‌নচ্ করে তল্লাশি করে।

আসামের সীমান্তে 'রাভা' নামক একপ্রকার ট্রাইব্যাল্ জাতি আছে। তাঁদের মধ্যে ডাক্তার হিসেবে আমার কিছু প্রভাব ছিল সেই সূত্রে কিছু তরুণ-রাভাকে আমি 'স্বদেশী'র মন্ত্র দিয়েছিলাম। তাঁরা আমার খুবই বাধ্য ও বন্ধু ছিলেন। হাবুভাইকে ঐ রাভাদের হেপাজতেই পাঠাই। অল্পদিনের মধ্যেই পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে। জেলে ও অন্তরীণে বছরগুলি কেটে

যায়। কয়েক বছর পর বন্ধনদশা থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে এসে বহু খোঁজ করেও হাবুভাইয়ের সন্ধান পাই না। যেখানে হাবুভাই ছিলেন সেখানে খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, তাঁর এবং তাঁর সঙ্গী 'রাভা'-যুবকটিরও পাত্তা কেউ জানে না। তাঁরা কোথায় গেছেন তাও কেউ বলতে পারে না। সুতরাং হাবু মিত্রের শেষ পরিণতি অজ্ঞাত। তিনি ও তাঁর সাথী সেই 'রাভা'-যুবক একদিন মোষ চড়াতে গিয়ে আর ঘরে ফিরেন নাই, গভীর জঙ্গলে মোষ নিয়ে ঢুকতে তাঁদের দেখা গিয়েছিল—এইটুকুই হল গ্রামবাসীদের শেষ খবর। সুতরাং পাহাড় ডিঙিয়ে তাঁরা ফ্রন্টিয়ার পার হতে পারেন। জানি না, কোথায় কিভাবে তাঁর শেষ পরিণতি লাভ হয়েছে!···

তবে আমি লক্ষ্য করেছি যে, হাবুভাইয়ের মধ্যে এক ধরনের ঝোঁক ছিল, সেই ঝোঁকের বশেই তিনি চলতেন, অসম্ভব কার্যে হাত দিয়ে বিপদগ্রস্ত হওয়া তাঁর পক্ষে একটুও অসম্ভব নয়। আমি তাঁর সঙ্গে একান্তে মিশে তাঁকে যতটা জানতাম তা থেকে আমি নিশ্চয় মনে করি যে, হাবুভাই 'সন্ন্যাসী' হবার লোক নন, 'আত্মহত্যা' করাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আত্মহত্যা করার পূর্বে হাবুভাই বরঞ্চ দু'দশটা দেশ-শত্রু খুন করে ফাঁসি যেতে পারতেন। কাহারো-কাহারো এসব ভুল ধারণা আছে বলেই একথা বললাম।···

হাবু মিত্র ছিলেন একখানি অগ্নি-শিখা। 'আত্মোন্নতি-সমিতি'র হাবু মিত্র তাই আগুন নিয়ে খেলা করে গেছেন তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত, এইটুকু আমি গভীর করে বুঝেছি। কর্মরত অবস্থায় যেখানে যেভাবেই হোক তাঁর মৃত্যু ঘটেছে বলে আজ পঞ্চান্ন বছর পর আমরা ধরে নিতে পারি। তাঁর মৃত্যু পলাতক জীবনে দেশব্রতের চিন্তায় বন্ধুহীন, আত্মীয়হীন, নিঃসঙ্গ অবস্থায়ই ঘটেছে। হয়তো পাশে ছিলেন সেই 'রাভা'-তরুণ। হাবু মিত্র নিশ্চয়ই বরণীয় শহিদ। ঐ 'রাভা'-যুবকও প্রণম্য শহিদ। উভয়কে আমি প্রণাম করি।

দ্রষ্টব্য : প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বর্ধনের সঙ্গে মহাজাতি সদনের অছি-পরিষদের প্রতিনিধির সাক্ষাৎকারের বিবরণ। ডাক্তার বর্ধন 'মুক্তিসঙ্ঘের' তথা 'বি.ভি.'র প্রতিষ্ঠাতা-সভ্যদের অন্যতম। এই সাক্ষাৎকার ঘটে এবং কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা হয় ১৯৬৯ সালের ২৯শে জুন, সকাল ৯টায়।

শহিদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের টেস্টামেণ্ট

(ইংরাজি)

[প্রীতিলতার মৃতদেহের সঙ্গে প্রাপ্ত বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে প্রীতির নিজের হাতে লেখা একটি বিবৃতি ছিল। জাজমেণ্ট কপিতে দেখা যাচ্ছে: "Lastly there was found a statement in manuscript Ex. 56 which weare satisfied from the evidence of P. Ws. 170 and 48 as well as by our personal comparison with the specimon writing Ex. 328 taken by P. W. 166 to be in the writing of Pritilata. This statement appears to us of much importance that we quote it *in extenso* as follows."]

"LONG LIVE THE REVOLUTION"

"I solemnly declare—I belong to the Chittagong Branch of the 'Indian Republican Army' whose lofty ideal is to liberate my mother-country from the yoke of the tyrannical exploiting and imperialistic British Government and to establish a Federated Indian Republic instead. This remarkable Chittagong party has captured the imagination of the youths and has given a new impetus to the Revolutionaries of Bengal, nay of the whole of India by its unprecedented display of the memorable 18th April, 1930, and its subsequent heroic achievements on the holy Jalalabad hill, at Samirpur, at Feni, at Chandannagar, at Chandpur, at Dacca, at Comilla and at Dhalghat. I feel proud that I have been thought fit to be a member of such a glorious party.

"We are fighting freedom's battle. To-day's action is one of the items of that continued fight. British people have snatched away our independence, have bled India white and have played havoc with the lives of millions of Indians both male and female. They are the sole cause of our complete ruin—moral, physical, political and economic - and thus have proved the worst enemy of our country, the greatest obstacle in the way of recovering our independence. So we have been compelled to take up arms against the lives of any and every member of the British community, official or non-

official, though it is not at all a pleasant thing to us to take the life of any human being. In a fight for freedom we must be ready to remove, by any means whatsoever, every obstacle that stand in our way.

"When I was summoned by Great 'Masterda' the venerable leader of my party to join to-day's armed raid I felt myself fortunate enough seeing my long-felt hankering fulfilled at last and accepted the task with full sense of responsibility. But when I was asked by that exalted personality to lead the raid, I felt diffident and protested by saying why a sister should take the lead when so many able and experienced brothers were present. Masterda soon convinced me by his able arguments and I took my leader's command on my head and invoked the Almighty Father, whom I have adored since my childhood, to assist me in discharging my grave duty.

"I think I owe an explanation to my countrymen. Unfortunately there are still many among my countrymen who may be shocked to learn how a woman brought up in the best tradition of Indian womanhood has taken up such a horrible deed as to massacre human lives. I wonder why there should be any distinction between males and females in a fight for her cause (*sic*) why not the sisters ? Instances are not rare that the Rajput ladies of hallowed memory fought bravely in the battlefield and did not hesitate to kill their country's enemies. The pages of history are replete with high admiration for the heroic exploits of these distinguished ladies. Then why should we, the modern Indian women, be deprived of joining this noble fight to redeem our country from foreign domination ? If sisters can stand side by side with the brothers in a Satyagraha movement ? Is it because the method is different or because females are not fit to take part in it ? As regards the method, i.e., armed rebellion it is not a novel method. It has been successfully adopted in many countries and the females have joined it in hundreds. Then why should India alone regard this method as an abominable one ? As regards fitness, is it not sheer injustice to the females that they will always be

thought less fit and weaker than the males in a fight for freedom? Time is come when this false notion must go. If they are yet less fit it is because they have been left behind.

"Females are determined that they will no more lag behind and stand side by side with their brothers in any activities however dangerous or difficult. I earnestly hope that my sisters will no more think themselves weaker and will get themselves ready to face all dangers and difficulties and join the revolutionary movement in their thousands.

"Now I shall briefly relate how I was drawn into the revolutionary organisation.

"When I was studying in the Matriculation class in the Dr. Khastagir's Girls' School, I got an idea of a revolutionary organisation in Chittagong and was told that there was a very powerful man, endowed with many qualities befitting a revolutionary leader, at the helm of this organisation.

"During the two years stay at Dacca for my Intermediate Course I was engaged in preparing myself as a fit comrade of the Great Masterda. However, I did not neglect my study and in the year 1930, I passed the Intermediate examination standing first among girls and fifth in the General Competition.

"It was the morning of the 19th April, 1930, when I came home after the examination and heard of the glorious activities (of the previous night) of the Chittagong heroes. My heart was filled with deep admiration for these great souls. But it pained me much that I could not take part in much (such ?) heroic exploits and could not have a glimpse of 'Masterda' whom I have adored since I heard his name. The thought of Jalalabad Martyr tinged my heart to its very depth. With such a state of mind I left for Calcutta for my B. A. Degree. The thought of my country was ever predominant in my mind. I saw the tears of mothers mourning the loss of their beloved sons who sacrificed their lives on the altar of freedom.

"With all these a new impetus came to me when I was asked by one of my brothers to visit Ramkrishna in the

Alipore Central Jail where in a solitary cell he was awaiting extreme penalty meted out to him by the British Law for his love of country. I passed for a cousin-sister of Ramkrishnada and anyhow managed to see everyday this smart jolly young hero. I had about forty interviews with him before his execution. His dignified look, free conversation, calm surrender to death, sincere devotion to God, childlike simplicity, loving heart, sound knowledge and profound realisation impressed me very deeply and made me ten times more forward than what I have been. The association of this dying patriot made a great contribution to the advancement of my life towards perfection. After Ramkrishnada's execution my hankering after some practical revolutionary action grew more intense. However, I had to pass some 9 months more in Calcutta for my B. A. examination. In the meantime I tried several times to have an interview with Masterda but failed.

"After my examination in 1932, I hurried towards home with a strong determination to interview Masterda anyhow. In a few days my long-cherished desire was fulfilled and I soon stood before Masterda and Nirmalda the two great personalities guiding the famous Chittagong Revolutionary Party.

"In my short interviews with Nirmalda I recognised his noble and beautiful heart in which staunch revolutionary principles and strong religious temperament so nicely combined. I am fortunate that I got opportunities to come in touch with such a great soul that silently passed away from the world without giving the countrymen any opportunity to know how pure, how great, how uncommon it was.

"Nirmalda's tragic end gave me a severe shock and I became more desperate. The result of my B. A. examination was out by this time and I passed with Distintion. A few days after I plunged myself heart and soul into the revolutionary preparation leaving for good my beloved family.

"Firm faith in my Almighty Father and cordial devotion to Him have been the most valuable treasure to me since my

childhood. I have carefully cherished this treasure in my bosom throughout my whole life and to-day when I have come finally prepared to embrace His feet, that I have so earnestly hankered, my treasure seems to me more precious, more pleasant and more illuminating. Had not my revolutionary ideal been thoroughly consistent with my devotion to the Almighty I would never been a revolutionary.

"With an invocation to Him, I launch to discharge my to-day's responsibility and pray to Him to purge me clean so that I may be a worthy offering to Him."

['সাপ্তাহিক বসুমতী,' ১৮. ৯. '৬৯,—পৃঃ ৭৯৩—৭৯৫]

ভবানীপ্রসাদের ছোট ভাইটির পত্র

[ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্যের ছোট ভাই শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য ভবানীর আত্মদানে তাঁদের পরিবারের মানসিক-প্রতিক্রিয়া কিরূপ হয়েছিল তা জানতে চাওয়াতে গ্রন্থকারকে নিম্নোক্ত পত্র পাঠিয়ে দেন। শহিদ ভবানী থেকে দুর্গাপ্রসাদ বছর তিনেকের ছোট। ঘটনার কালে দুর্গাপ্রসাদ স্কুলের ছাত্র। স্কুলের ছাত্র হলেও সেই যুগে দলের কিছুটা প্রভাব তাঁর মধ্যেও প্রতিফলিত হয়েছিল। কাজেই তার স্মৃতিচারণ ইতিহাসগ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে। অন্য দিক থেকেও এ-পত্রের গুরুত্ব আছে। ভবানীর পিতামাতার যে-চরিত্রপরিচয় পত্র-মাধ্যমে পেলাম, তার আলোকে আমরা যেকোন শহিদের পিতামাতার চরিত্রও অনেকটা বুঝতে পারব।]

বেলঘরিয়া,
১০. ২. ১৯৭০

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

…ঘটনা ঘটে যাবার পূর্ব পর্যন্ত আমরা তো কিছুই জানতাম না। তবে ছোড়দাকে (ভবানী) চিরদিনই মনে হত একটু স্বতন্ত্র ধরনের। তাঁর বন্ধু-বান্ধব ছাড়া বাইরে থেকেও নানা বয়সের লোক মাঝে মাঝে আসতেন আমাদের বাড়ি। তাঁরা একটু গোপনে মেলামেশা করতে যেন পছন্দ করতেন। ম্যাকশানে যাবার পূর্বদিন আমাকে একগাদা 'বেণু' পত্রিকা দিয়ে তিনি বলেছিলেন: 'এগুলো প্রবোধকে দিয়ে দিবি।' প্রবোধ রায় ছোড়দারই বন্ধু। পরে জেনেছিলাম যে, তিনিও ছিলেন 'বি.ভি.'-দলের সক্রিয় সভ্য। এখানে আমি উল্লেখ করতে পারি যে, ঘর ছাড়ার কয়েকদিন আগে তাঁকে অনন্যমনা হয়ে 'বেণু'র দীনেশ-সংখ্যা পড়তে দেখেছি। দেখেছি, তন্ময় হয়ে বারে বারে তিনি পড়ে যাচ্ছেন শহীদ দীনেশ গুপ্তের পত্রাবলী। আজ বুঝি যে, ঐ পত্রের বাণী তিনি সেদিন মর্ম দিয়ে গ্রহণ করে, রক্ত-প্রবাহে সঞ্চারিত করে তুলেছিলেন আসন্ন মহামৃত্যুর আহ্বানে আত্মাহুতি দেবার কামনায়।…এ ছাড়া আমাদের গ্রাম্য-সঙ্ঘের লাইব্রেরির কিছু বই, বইয়ের তালিকা, গ্রাহকদের নামের তালিকাও আমাকে দিয়ে ছোড়দা বলেছিলেন পুড়িয়ে ফেলতে। বলাবাহুল্য ছোড়দার নির্দেশ আমি অবিলম্বে অক্ষরে অক্ষরে পালন করি।…

পরের দিন ছোড়দা চলে গেলেন। যাবার সময় মাকে বলে গেলেন যে,

তিনি ঢাকা যাচ্ছেন বোর্ডিং-এ সীট্‌ যোগাড় করতে। ম্যাট্রিক পাশ করলেই কলেজে ভর্তি হতে হবে তো! তা দু'একদিনের মধ্যেই তিনি ফিরে আসছেন।

দাদা খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। স্কুলে চিরকাল তিনি স্টাইপেণ্ড্‌ পেয়ে এসেছেন মেধাবী-ছাত্ররূপে। তাঁকে দিয়ে আমার বাবা-মা'র খুব আশা ছিল।

কিন্তু দিন যায়, রাত যায়—ছোড়দা আর ফেরেন না! আমাদের ভাইবোনেদের কখনো ছাড়াছাড়ি হয়নি এর আগে। বাবা-মা'র কাছে-পিঠেই আমরা চার ভাই ও এক বোন থাকি; দিদির অবশ্য বিয়ে হয়ে গিয়েছিল অনেকদিন পূর্বে। তবে তাঁর শ্বশুরবাড়িও ছিল আমাদেরই গ্রামে, দেওভোগে।

ছোড়দা আর আসেন না। সহসা একদিন ভোর হতেই দেখি সারা বাড়ি পুলিশে ঘেরাও করে ফেলেছে। উঃ! এত পুলিশ আমি তো দূরের কথা—আমাদের গাঁয়ের লোকেরাও কখনো দেখেনি। পুলিশ তচ্‌নচ্‌ করে সারাটা বাড়ি সার্চ করল। বাবা-মা-দাদাকে কত জিজ্ঞাসাবাদ করল, আমাকেও বাদ দিল না। সেই সময়ই আমরা জানলাম যে, ৮ই মে (১৯৩৪) দার্জিলিঙ্‌ শহরে ঘোড়দৌড়ের মাঠে বাঙলার লাট সাহেবকে কে বা কারা গুলি করেছেন, এবং আমার ছোড়দা নাকি তাঁদের অন্যতম!

গ্র্যাস্‌বি সাহেব তখন 'আই.বি'র অতিরিক্ত এস. পি.। বিপ্লবীরা তাঁকেও রেহাই দেননি। কাজেই আহত গ্র্যাস্‌বির রাগ ছিল বিপ্লবীদের উপর শুধু জাতিগত নয়, ব্যক্তিগতও। গ্র্যাস্‌বি স্বয়ং এসেছিলেন সার্চ-পার্টির অধিকর্তা হয়ে। মেজদা ও গ্রামের আরো কয়েকজনসহ আমার উপর আদেশ হল ঢাকায় আই.বি.-আপিসে রিপোর্ট করার জন্যে। যেতে হবে আমাদের অনতিবিলম্বে।

পুলিশ-বাহিনী চলে যাবার পর সারাটা বাড়ি যেন শ্মশানের রূপ ধারণ করল। বাবা-মা নিশ্চুপ। মা'র মত ধৈর্যশীলা মহিলা আমাদের চোখে আজ পর্যন্ত পড়েননি। প্রাণ দিয়ে তিনি ছোড়দাকে ভালবাসতেন। তাঁর দুরন্তপনা হাসিমুখে সইতেন। বাবা চিরদিনই কথা বলতেন খুব কম। পড়াশুনা নিয়েই থাকতেন। বাবা-মা কোনদিন আমাদের গালমন্দ করতেন না। সবসময় তাঁদের চেষ্টা ছিল যুক্তি দিয়ে শিশুকে বশ করা, প্রাণ ঢেলে ভালবেসে তাকে জয় করা। কিন্তু উভয়েই ছিলেন বিশেষ রাশভারী। কাজেই ভয় করতাম যেমন, শ্রদ্ধাও করতাম তেমনি। এমন পরিবেশেই আমরা মানুষ হচ্ছিলাম।

১৯৩৫ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি ছোড়দার ফাঁসি হয়ে গেল। খবর পেলাম খবরের কাগজে। সরকারপক্ষ ভবানী ভট্টাচার্যের পিতা-মাতা বা ভাইবোনদের পূর্বাহ্নে কোন সংবাদ দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি।

ফাঁসির খবর পেতেই আমার দিদি তো কান্নায়-কান্নায় বুক ভাসিয়ে দিলেন। তাঁর সে-কান্না আজও শেষ হয়নি। তা যাক-না ইতিমধ্যে পুরো পঁয়ত্রিশটি বছর পেরিয়ে! শোকার্তা দিদির কণ্ঠে ঐ একটি আকুল প্রার্থনাই ছিল: 'ভগবান! দাও, দাও ফিরিয়ে আমার ভাইকে—ওর বদলে আমার তিনটি স্নেহের সন্তানের যে-কোন একটিকে না-হয় নিয়ে নাও। তবু, দাও ফিরিয়ে আমার ভাইকে!'—এত ভালবাসতেন আমাদের দিদি তাঁর 'টুনু'কে (ভবানী)!

কিন্তু মা? মা'র চোখে জল নেই। মুখে কথা নেই। হায়-আপশোষ প্রকাশের কোন লক্ষণ নেই। একেবারে স্থির, পাষাণ-প্রতিমা। ঐ পাষাণের নিচে যে আকুল কান্না উদ্বেল হয়ে ছিল, তার বেগ চেপে রাখতেই তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। কারো সান্ত্বনার প্রত্যাশী তিনি ছিলেন না। নিজেই সান্ত্বনা দিতেন নিজেকে। ছোড়দার সহযাত্রী রবি ব্যানার্জি আমাদেরই গ্রামবাসী। তাঁরও ট্রাইবুন্যালে ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। মা শুনে শুধু বলেছিলেন: 'আমার দু'টি সন্তান বড় হয়ে মারা গেছে, শোক আমার কাছে নতুন নয়। কিন্তু রবির মা সইবেন কি করে? তাঁর তো এই প্রথম।'...

আমরা জানি ছোড়দার ফাঁসির পর মা যেন সুদূরের মানুষ হয়ে গেলেন! বেঁচে ছিলেন ওর পরে আরো দশ-বার বছর। কিন্তু কখনো তাঁকে শোক করতে দেখিনি। কি এক অন্তর্নিহিত সম্পদ স্পর্শ করে তিনি যেন তাঁর দিনগুলো কাটিয়ে দিতেন।

শোকসন্তপ্তা মহিলারা সর্বদা আসতেন তাঁর কাছে একটু শান্তি পেতে। মা'র সান্ত্বনা তাঁদের শান্ত করত।

বাবা ছিলেন একটি দুর্জ্ঞেয় পুরুষ। নিজের মধ্যেই তিনি নিজেকে ধরে রাখতেন। তাঁরই প্রভাবে মা-ও অনেকটা 'ইন্ট্রোভার্ট' গোছের হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা উভয়েই বাস করতেন এক সুদূর রাজ্যে। আমরা তাঁদের মনের অন্দর-মহলে প্রবেশের পথ না-জানলেও তাঁদের উষ্ণ সান্নিধ্যটুকুর স্পর্শেই সকল ঐশ্বর্য খুঁজে পেতাম। তাঁরা উভয়েই কখনো-সখনো বলতেন: 'টুনুর এরকম পরিণতি আমাদের আশঙ্কার বাইরে ছিল না।'

'হ্যাঁ, ছোড়দার মত মাতৃভক্ত আমি খুব কমই দেখেছি। মা'র সঙ্গে ছোড়দার ছিল অতি নিকট সম্পর্ক। বাবাকে দূর থেকে তিনি ভক্তি করতেন, বাবাও দূর থেকে তাঁকে ভালবেসে গেছেন। কিন্তু ছোড়দার ফাঁসির পর সহসা একদিন বাবা যেন কাছের মানুষটি হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: 'যে-কাজে তোমার পরিবারের মুখ উজ্জ্বল হয়, তুমি নিজেকে উন্নত কর—সে-কাজ সারা জীবন করবে।'

আমি অল্প বয়সের ছেলে হলেও সেদিন এইটুকু বুঝেছিলাম যে—ছোড়দার গরবে 'গরবী' হয়ে আছেন বাবা, স্বল্পভাষীর এ হল অল্প কথায় অফুরন্ত এপ্রিসিয়েশান্! ··

অতঃপর বাবা বছর পনের বেঁচে ছিলেন। কোনদিন চোখের জল ফেলতে তাঁকে দেখিনি। কোনদিন আক্ষেপ করতে শুনিনি। · তিনি কান পেতে শুনতেন, যখন আমার স্বল্পভাষিণী মা গভীর কণ্ঠে তাঁর ছেলেমেয়ে ও স্বামীর কাছে বলে যেতেন: "সে এক রাত। আমি স্বপ্নে দেখছি যেন একজন ফকির-সাহেব আমার কাছে এসে বলছেন—তোর ছোট দু'টি ছেলের একটি আমাকে দিয়ে দে। আমাব কাজ আছে—মহান কাজ। তুই 'না' করিস না। তুই দিয়ে দে, দিয়ে দে। ··শুনে আমাব বুক কেঁপে উঠল, রক্ত হিম হয়ে গেল, ঘুম আর হল না।···বিছানা ছেড়ে বাইরে চলে এলাম। দেখি, ফর্সা হয়ে গেছে, পূব-আকাশে রক্তরাগ। ··সে ফকিরসাহেবের জলজলে দু'টো চোখ আর দিব্য রূপ আজও আমি ভুলিনি।" ··

বলেই মা থেমে যেতেন। বাবা উদাস হতেন।···মা আরো একটি কথা বলতেন: "ও তো যাবেই। ওর গলায় যে ফাঁসির দাগ ছিল!" ছোড়দার গলায় সত্যি একটি রেখা ছিল। ওরকম হয়ত অনেকেরই থাকে। কিন্তু স্বপ্ন দেখার পর থেকে মা'র দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, ছোড়দার গলার ঐ দাগটা সত্যি ফাঁসিরই দাগ, ওকে ধরে রাখা যাবে না। মা'র হৃদয়-গভীরে ছিল ছোড়দাকে ঘিরে একটি হারাই-হারাই ভাব। আমরা কেউ তা টের পাইনি। তাই যা অবধারিত তা ঘটে যাওয়াতে মা-বাবা অন্তত আকস্মিক দুর্ঘটনার মার খাননি। আমরা ভাই বোনেরা এইটুকু বুঝতাম যে—ছোড়দাকে 'মহান্ কাজে'র বেদিতলে অর্ঘ্যরূপে দান করে ভগবানের নির্দেশ পালিত হয়েছে বলে মা বিশ্বাস করেছেন সে-বিশ্বাসের অংশীদার ছিলেন আমাদের বাবাও। কাজেই তাঁদের ঘরে ছোড়দার মত ছেলের জন্ম হওয়া স্বাভাবিক।··

ছোড়দার খান-দশেক চিঠি আমাদের কাছে ছিল। কিন্তু দেশবিভাগের ডামাডোলে এবং পুলিশের নির্যাতনে বিভ্রান্ত এই পরিবারের কাছ থেকে সে-সব চিঠি হারিয়ে গেছে। এ ক্ষতি আমাদের অপূরণীয়।

ছোড়দার শেষ চিঠি—একখানা পোস্টকার্ড—আমাদের কাছে ছিল। তারই অনুলিপি পাঠালাম।

আপনার একান্ত স্নেহের
দুর্গাপ্রসাদ (খোকা)

সমাপ্ত

দ্রষ্টব্য ঃ গ্রন্থের ১১৬-১১৭ নং পৃষ্ঠায় সংযুক্ত করা চলে যে, লর্ড্ জেটল্যাণ্ড্-ও উধম সিং-এর টার্গেট্ ছিলেন শুধু নয়—তিনি সামান্য আহতও হয়েছিলেন। তবে তাঁর প্রাণহানি ঘটে নি। এ-ছাড়া উধমের গুলিতে পাঞ্জাবের প্রাক্তন লেঃ গভর্ণর স্যার লুইস্ ডেনের ডান হাত ভেঙে যায়, বোম্বাই-এর ভূতপূর্ব গভর্ণর লর্ড্ লেসিংটন জখম হন।

['জালিয়ানওয়ালাবাগ'—পৃঃ ৩৮ (প্রকাশ—১৩.৪.৭০), Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India]

গ্রন্থ-তালিকা

['ভারতে সশস্ত্র-বিপ্লব' সংকলনে যেসব গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে]

কারাকাহিনী—শ্রীঅরবিন্দ

আত্মকথা—বারীন ঘোষ

বাঙলায় বিপ্লবপ্রচেষ্টা—হেমচন্দ্র কাননগো

শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙলার স্বদেশীযুগ—গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরি

বাঙলায় বিপ্লববাদ—নলিনীকিশোর গুহ

উত্তরপাড়া বক্তৃতা—শ্রীঅরবিন্দ

বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্র রচনাবলী—পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা—উদ্বোধন কার্যালয়

পথের দাবী—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আনন্দ মঠ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঞ্চিতা—নজরুল ইসলাম

পলাশীর যুদ্ধ – নবীন সেন

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস—ডক্টর ভূপেন দত্ত

বিপ্লবতীর্থে—ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন—চারুবিকাশ দত্ত

বক্সা ক্যাম্প—অমলেন্দু দাশগুপ্ত

নিবেদিতা লোকমাতা—শঙ্করীপ্রসাদ বসু

আন্দামানে ত্রিশ বৎসর—ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তি

বিপ্লবের পদচিহ্ন—ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

কাকোরী ষড়যন্ত্র—মণীন্দ্রনারায়ণ রায়

বন্দীজীবন—শচীন্দ্রনাথ সান্যাল

সবার অলক্ষ্যে (১ম ও ২য় পর্ব)—ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়

History of Freedom Movement in India—Dr. Ramesh Ch. Mazumdar.
India Wins Freedom—Abul Kalam Azad.
Sedition Committee's Report (1918)—President of the Committee, Justice Rowlatt.
The Last Days of British Raj—Leonard Mosely.
The Last Years of British India—Michael Edwards.
Indian Politics—Coupland.
Springing Tiger—Hugh Toy.
Pilgrimage To Freedom—K. M. Munshi.
Swami Vivekananda, Patriot Prophet—Dr. Bhupendra Nath Datta.
The History of the Indian National Congress—Dr. Pattavi Sitaramyya.
Roll of Honour—Kali Charan Ghosh.
Indian Freedom Movement: Revolutionaries in America—Kalyan Kumar Banerjee.
Memoirs—M. N. Ray.
India As I Knew it—Michael O'Dwyer.
The Sepoy Mutini, 1857—Hara Prasad Chatterjee.
The Indian Unrest—V. Chirol.
Two Great Indian Revolutionaries—Uma Mukherjee.
Bhagat Singh and His Comrades—Ajoy Ghosh.
Police Reports—Central and Provincial.
Government Reports—Central and Provincial.

নাম-সূচী